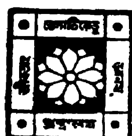
স্মৃতি সততই সুখের



গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড । কলকাতা-৭৩

প্রকাশক :

আনন্দরূপ চক্রবর্তী

গ্রন্থালয় প্রা. লি.

১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট

কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

মুদ্রাকর :

বংশীধর সিংহ

বাণী মুদ্রণ

১২, নরেন সেন স্কোয়ার

কলকাতা-৯

উৎসর্গ

তাঁদের জন্য যাঁদের আর কখনো দেখবো না।

আর সেই পরিজনদের জন্য, যাদের কাছে আমিও

অচিরেই স্মৃতিতে পর্যবসিত হবো।

ত্রুটি স্বীকার : দু-একটি বিষয় মুদ্রণে বিশেষ ত্রুটি ঘটেছে। বইটির প্রকৃত নাম 'স্মৃতি সততই সুখের'। কিন্তু ২০৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ প্রমাদে প্রতি পৃষ্ঠার মাথায় 'স্মৃতি সততই সুখকর' মুদ্রিত হয়েছে। দু-একটি জায়গায় 'তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ' স্থলে 'তুলনামূলক ভাষা সাহিত্য' মুদ্রিত হয়েছে। এই প্রমাদের জন্য আমরা লেখিকা এবং তাঁর অগণিত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। এই ভুলের জন্য আমরাই দায়ী।

ভূমিকা

নানা কারণে একটি ভূমিকা লেখার প্রয়োজন হলো। পুস্তকটিতে কিছু প্রমাদ ঘটেছে। প্রথম প্রমাদ এর নাম। 'স্মৃতি সততই সুখের' এই নামের জায়গায় প্রতি পৃষ্ঠায় 'স্মৃতি সততই সুখকর' ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয় ভুল : লেখাটি যখন 'দেশ' পত্রিকায় এক দু সপ্তাহ অন্তর অন্তর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো, তখন প্রতিটি কিস্তিই এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে শেষ করে লিখে পাঠাতাম। এই জন্যেই পাঠাতাম যাতে যাঁরা পড়বেন তাদের যেন অন্তত তখনকার মতো কোনো অতৃপ্তি না থাকে। কিন্তু এই পুস্তকে সেই নিয়ম রক্ষা না ক'রে সব কিস্তিই বিরতিহীন ভাবে এক কিস্তিতে পরিণত করায় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে পাঠকের হোঁচট খাবার সম্ভাবনা ষোলো আনার জায়গায় আঠেরো আনা। তৃতীয় ভুল : এক জায়গায় 'তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ' শব্দটিকে 'তুলনামূলক ভাষা সাহিত্য' নামে ছাপা হয়েছে। এই ভুল যদি কেউ আমার লেখনী নিঃসৃত বলে মনে করেন লজ্জার সীমা থাকবে না।

বই যখন আমার এই ভুলের দায়ীত্বও নিশ্চয়ই আমার। অনুরোধ, ক্ষমাশীল হয়ে মনে মনে সংশোধন করে নেবেন।

স্মৃতি সততই সুখের

একদা এক দ্বিপ্রহরে, একটি ছোটো ছেলে আমাকে বললো, 'কাকিমা, তুমি খেয়েছো ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ !'

'এখন তুমি শোবে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ?'

'আয়, তুইও শুবি আমার সঙ্গে।'

'গল্প বলবে ?'

'আমার ঘুম পাবে।'

'আমার পায় না।'

'তোর চোখে কাকের বাসা, তাই তোর ঘুম পায় না।'

'শোনো কাকিমা—'

'কী ?'

'তুমি এরোপ্লেনে চড়েছো ?'

'না তো।'

'কেন চড়োনি ?'

'আমার যে টাকা নেই।'

'কাকা তো চড়েছে।'

'কাকার টাকা আছে।'

'কাকা তোমাকে নেয় না।'

'কই নিল ?'

'তুমি কাকাকে বলো, তবেই নিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা বলবো। এবার আয়, দু'জনেই একটু ঘুমিয়ে নিই।'

আট বছরের বালক কুশ খুশি হয়ে আমার পাশে শুলো। কবি অজিত দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। ওরা থাকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বাড়ির তেতলায়, আমরা থাকি দোতলায়। কিন্তু আমার সব সময়ের সঙ্গী। কাকিমার কাছে আসতে পারলে সে খেলাও ভুলে যায়। তার মা বলে 'আপনার পোষ্য পুত্র।' নিতান্ত মিথ্যে বলে

না। দুরন্ত কুশ শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত হাত পা নাড়ছিলো, তন্দ্রাচ্ছন্ন আমি বিরক্ত হয়ে বলছিলাম, 'ওরকম হাত পা ছুঁড়লে শোবার দরকার নেই, উঠে যা।'

এরই মধ্যে একটি ফোন এলো। ঘুমটুম সব ছিঁড়ে ফুঁড়ে একাকার।

উঠলাম। ফোন ধরলাম। যাঁকে চাইলেন তাঁকে দিলাম। সে ব্যক্তি আমার লিখন পঠনরত স্বামী বুদ্ধদেব বসু। এপিঠ থেকে যা বললেন, তা এই রকম, 'না না অসম্ভব।' 'না না আমার একেবারে সময় নেই।' 'আরে প্লেনে যাতায়াত করলেও তো থাকতে হবে পাঁচ দিন।' 'না' 'না' 'না'। (এরপর সহাস্যে) 'করতে পারেন, কিন্তু আমার মত বদল হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে।' 'ঠিক আছে।'

ফোন ছেড়ে আবার যথাস্থানে বসতে যাচ্ছিলেন। আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?'

'যতো সব আজেবাজে ইয়ে—'

'কী।'

'কাশ্মীর যেতে বলছে।'

'কাশ্মীর! সে তো খুব ভালো কথা। কাশ্মীরে কী?'

'যা হয়। সরকার বাহাদুরের বাসনা আমি গিয়ে বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতিভূ হই। পাঁচ দিন ধরে সভা চলবে, আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।'

কুশ ততোক্ষণে কোথায় চলে গেছে। আমি উঠে বসে আগ্রহ সহকারে বললাম, 'ওরা তো প্লেন ভাড়া দিতে চাইছে?'

'কী আশ্চর্য! প্লেন ভাড়া দিলেই যাওয়া যায় নাকি? আর অতদূরে, প্লেন ছাড়া যাবোই বা কেন?'

'শোনো।'

'কী?'

'তুমি রাজী হও।'

'ধ্যুৎ।'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি যাবো। আমি কোনোদিন প্লেনে চড়িনি।'

অট্টহাসিতে ঘর ভরে গেল।

'কী ছেলেমানুষ। প্লেনে চড়ার এতো শখ?'

'হ্যাঁ।'

'তা ওরা তো আর তোমাকে চাইছে না, তোমার ভাড়া দেবে কেন ?'

'না দিল, তোমারটা তো দেবে ? তোমাকে থাকার খরচও দেবে নিশ্চয়ই—'

'তা তো দেবেই। দৈনন্দিন হাত খরচও দেবে।'

'তবে আর কী। তোমার খরচ তো লাগছে না, আমার একার খরচ, সে আমি নিজেই দেব। আমরা তো এমনিতেই একবার কাশ্মীর যাবার কথা ভাবছিলাম, খরচের কথা ভেবেই যেতে পারছি না। এখন যদি একজনের খরচ অন্যরা বহন করে, তবে আদ্ধেক হয়ে গেল।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আর আমি তো প্লেনে চড়িনি, সেটাও হয়ে যাবে। নিজেরা গেলে তো ট্রেনেই যেতাম। তুমি কি একেবারে নাকচ করে দিয়েছো ?'

'করলেও শুনছে কই ? দু' ঘণ্টা বাদে আবার ফোন করবে, যদি আমার মত বদল হয়।'

'মত বদল করো।'

'অসম্ভব কথা। বলছে পশুর্ই রওনা হতে হবে।'

'বেশ তো।'

'বেশ তো ? বললেই হলো ? একদিনে প্রস্তুত হওয়া যায় ?'

'আমাকে সঙ্গে নিলে আর ভাবনা কী ? আমিই তো করবো সব।'

'পারবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা ?'

'থাকবে। কেউ তো ছোটো নয় ? মাত্রই তো পাঁচ দিনের ব্যাপার। না হয় এই পাঁচ দিন মিমি জ্যোতি এসে (আমাদের কন্যা এবং জামাতা) থাকবে ওদের সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, তা হলে চল।'

দু' ঘণ্টা বাদে ফোন এলো। আমার স্বামী রাজী হলেন। বিকেলে চায়ের আসরে ছেলেমেয়েদের জানানো হলো সে কথা। সবাই খুশি হয়ে কাশ্মীর থেকে আনবার জন্য সাংঘাতিক সব ফরমাস করেও ভাবতে লাগলো আর কী বলবে।

কুশকে বললাম, 'তোর কথাতেই আমার এরোপ্লেনে চড়া হচ্ছে। তুই-ই আমার আসল, বল, তোর জন্য কী আনবো।'

কুশ সলজ্জ হয়ে বললো, 'কিচ্ছু না।'

'ওমা এতো ভালো ছেলে! আর তোর দাদা-দিদিদের দ্যাখ কী লম্বা ফর্দ। আমি তোর জন্যেই সবচেয়ে ভালো জিনিস আনবো।'

গদগদ হয়ে একদিনের মধ্যেই গুছিয়ে নিলাম সব। অসুবিধের তো কিছু নেই, মাত্র তো পাঁচ দিনের ব্যাপার। আসল প্রস্তুতিটা মানসিক। বুদ্ধদেব কখনোই অত চটপট মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে পারেন না। কিন্তু আমি সঙ্গে যাচ্ছি, মস্ত ভরসা, এখন খুব খুশী। এটা নিয়েছো তো? সেটা নিয়েছো তো? অমুক বইটা কোথায়? প্যাড নাও, কলম নাও—আমার ঘুমোবার পোশাকটা কোথায় দিলে? এই সব কথাই চলছে সারাদিন।

কিন্তু, 'সেজেগুজে রইলাম বসে, বর এলো না কপাল দোষে।'

শেষ মুহূর্তে খবর এলো, একসঙ্গে দু'খানা প্লেনের টিকিট ঐ তারিখে পাওয়া যাচ্ছে না, আগেই সব ভরে আছে। ওঁরা একখানাই কাটতে চাইছেন বুদ্ধদেবের জন্য। বুদ্ধদেব তাতে রাজী হলেন না। আমি বললাম, 'কী হয়েছে, তুমি গেলেই পারতে।'

'পাগল!' নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে নিমগ্ন হলেন। আমার কিন্তু বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। এতো আশা করেছিলাম!

রাত্তিরে খাবার টেবিলে যখন ছেলেমেয়ে জামাতা ভাইঝি সব একত্র হলাম, বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমরা একটু গোলমাল থামাও, আমার একটি প্রস্তাব আছে।'

জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত টেবিল চাপড়ালো, 'সায়লেন্স সায়লেন্স—'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমরা সবাই দেখছো এরোপ্লেনে ওঠা হলো না বলে রাণুর কী অবস্থা?'

'আমার আবার কী অবস্থা?' আমি তক্ষুণি প্রতিবাদ করলাম।

বড়ো মেয়ে মিমি বললো, 'সত্যি, ঠাট্টা নয়, মার মন কিন্তু বেশ খারাপ হয়েছে।'

আমি বললাম, 'য্যাঃ—'

ছোটো মেয়ে রুমি বললো, 'যা আবার কী? তুমি তো শুধু কাঁদতে বাকী রেখেছ।'

আমি আবার বললাম, 'যুযোঃ—'

বুদ্ধদেব বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, পাপপা রুমি যদি রাজী থাকে তা হলে রানুকে এবার আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাই।'

সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'কোথায় ?'

সেটা উনিশ শো একষট্টি সাল। বুদ্ধদেব নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হয়ে পড়াতে যাচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে প্রায় সারা পৃথিবী-ব্যাপী বক্তৃতার আমন্ত্রণ।

বললেন, 'ভেবে দ্যাখ, কোথায় গেলে প্লেনে ওড়ার সাধ মেটে।'

দু' ভাইবোন একযোগে লাফিয়ে উঠে বললো, 'রাজী, রাজী।'

'তুমি কী বলো মহুয়া ?'

মহুয়া আমার ভাইঝির নাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী, আমার কাছে থেকে পড়ে। সে-ও বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই।' কন্যা জামাতাও হাত তুললো, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।'

কয়েক বছর আগে বুদ্ধদেব যখন প্রথম ওদেশে যান, তখন অতি বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ি ছিলেন আমার বাধা, এবারকার বাঁধা আমার পুত্রের আসন্ন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। তাছাড়া অবিবাহিত মেয়ে অবিবাহিত ভাইঝিও কম বাঁধা নয়। এই তিনটিকে একা একটি ফ্ল্যাটে শুধু ভৃত্য ভরসা করে অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি, উপরন্তু টাকার প্রশ্নটাও তো কম বড়ো নয়। কিম্বা সেইটাই প্রথম। তাই হঠাৎ এই প্রস্তাবে হকচকিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। মিনমিন করে বললাম, 'ওমা, তা কী করে হয় ? তিন মাস বাদেই ওর পরীক্ষা। আমি না থাকলে—'

পনেরো বছরের ছেলে পঁচিশ বছরের মতো বিজ্ঞ মুখ করে বললো, 'তুমি থাকা না থাকার সঙ্গে আমার পরীক্ষার কী সম্পর্ক ? তুমি কি আমাকে পড়াচ্ছো ?'

'তা না হলেই বা কী, একটা দেখাশুনো আছে না ?'

'ন' মাস তো দেখাশুনো করেছ, তিন মাসের অদর্শনেই যদি সব গোল্লায় যায় তবে তা যাওয়াই ভালো।'

পাপপার কথায় সবাই বলে উঠলো, 'ব্র্যাভো ব্র্যাভো—'

আমি এবং বুদ্ধদেব দুজনেই ওদের এই উৎসাহিত সম্মতিতে কিঞ্চিৎ অবাক হলাম। কাশ্মীর যাত্রার ব্যাপারটা এভাবে ভেস্তে না গেলে আমার যাওয়া বিষয়ে

কোন প্রশ্নই উঠত না। আমরা ভেবেই নিয়েছিলাম, সেটা একান্ত অসম্ভব। বুদ্ধদেবের যাওয়ার কথা তো অনেক আগেই ঠিক হয়ে আছে। আমেরিকার এক যুবক কবি, যার নাম গলওয়ে কিনেল, যার চেহারা যে কোনো হৃদয়ে তরঙ্গ তোলে, যে ইচ্ছে করে' খেয়ালহীনভাবে একগুচ্ছ চুল ফেলে রাখে কপালের উপর, খেতে খেতে যে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে পছন্দসই মহিলাদের দিকে, সেই বন্ধুটি তো ছ' মাস আগে এসেই ঠিকঠাক করে গেছে সব। আমাকে বলেছিলো, 'তুমিও কিন্তু যেয়ো।' আমি বলেছিলাম, 'সন্তানাদি নিয়ে দেখছো তো আমার একার সংসার ?'

সে বলেছিলো, 'তাতে কী ?'

তাতে যে কী সে কথা একজন বিদেশীকে তখন আর বোঝাতে বসিনি; শুধু একটু হেসেছিলাম।

কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা যে আমার যাওয়াটা এভাবে মেনে নেবে কে জানতো। এবং যার জন্যে আমার বেশী ভাবনা সে-ই দেখলাম সবচেয়ে বেশী উৎসাহী। দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো বড় ম্যাপ নিয়ে এসে বললো, 'এসো মা তোমাকে দেখাই তুমি কোন্ কোন্ দেশের উপর দিয়ে কীভাবে যাবে।'

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললো, 'আমার পরীক্ষার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না, ফার্স্ট ডিভিশনে না গেলেও একটা সেকেন্ড ডিভিশন ঠিকই পাবো। ফেল আমি করবো না। সুযোগ পেলে আমি কি তোমার জন্যে কখনো বসে থাকবো ? তমিও এই সুযোগ ছাড়বে কেন ?'

এর পরে খাবার টেবিল একেবারে সরগরম হয়ে উঠলো। মনে হলো আমি গেলে এঁদেরই যাওয়া হয়ে যায় এমনি উৎসাহের বন্যা।

জ্যোতি কাগজ কলম নিয়ে এলো, 'দেখুন, কলকাতা থেকে এই আপনারা উড়লেন, সঙ্গে থাকবে দুখানা রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড টিকিট—প্রথম স্টেশন—'

আমি বললাম, 'বার্মা। আমার ভারি বার্মা যাবার শখ।'

'বার্মা! বেশ। বার্মার পরে—', সে খস্‌খস্ করে একটি জাপানী মেয়ের ছবি আঁকতে আঁকতে বললো, 'ওসাকাতে বিমান বন্দর, সেখানে বক্তৃতা সেরে—'

আমি বললাম, 'না, তার আগে হংকং নামতে হবে।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, মা সেখানে নেমে জিনিস কিনবে, কী মজা কী মজা—'

বুদ্ধদেব সগৌরবে আমার দিকে তাকালেন, 'তা হলে রাণু ? যাচ্ছো ?'

কী থেকে কী! কোথায় প্লেনে চড়ে কাশ্মীর যেতে না পারার দুঃখে কাঁদছিলাম, আর তার বদলে এই!

অবশ্য টেবিলে বসে সভা করে রওনা হওয়া যতো সহজ কর্ম বলে মনে হচ্ছিলো বাস্তবে তা হলো না। অন্য একটি বাধার কথা এতোক্ষণ ভাবিনি, সে হলো আমার কুকুর ভুতু। ভুতু মাতৃহীন অবস্থায় একুশ দিন বয়েস থেকে আমার কাছে প্রতিপালিত। তাকে তুলো দিয়ে দুধ খাইয়েছি, টিপে টিপে ভাত খাইয়েছি, কাঁদে বলে বিছানার পাশে বিছানা দিয়ে শুইয়ে রেখেছি। এই করতে করতে তার স্বভাব খুব খারাপ হয়ে গেছে। এখন বড়ো হয়ে গিয়েও সেই সব অভ্যাস ছাড়তে পারছে না। বেড়াতে গেলেও আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি যখন আমাদের তেতলায় কুশের মার কাছে গল্প করতে যেতে চাই তখনও সে যাবার জন্য কাপড় কামড়ে জবরদস্তি করে, জোর করে রেখে গেলে পাড়া ফাটিয়ে উ—উ—উ শব্দে এমন কান্না জুড়ে দেয় যে, বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হয়।

বর্তমানে তার অসুখ চলেছে। কানে যন্ত্রণা। বিখ্যাত পশু চিকিৎসক ডক্টর আমেদের রোগী সে। পনেরো দিন অন্তর কিড স্ট্রীটে 'অল লাভার্স অব অ্যানিমেলে' নিয়ে যাই চেক্ করাতে। সেখানে সব দামী দামী কুকুর আসে, আমার মাতৃহারা কানখাড়া পথ থেকে কুড়িয়ে আনা দিশী কুকুরটিকে তারা করুণার চোখে দেখে। বেয়ারারা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হেসে বলে, 'ঐ—আমাদের ক্যালকাটা টেরিয়ারটি এলেন।' আমি অটল গাম্ভীর্যে তার চেন ধরে ঘরে নিয়ে আসি দেখাতে। আনতে কি পারি! অসভ্যের মতো টেনে হেঁচড়ে রাস্তায় ফেলে দিতে চায়! অসভ্যের মতো নয়, বেশ একটু অসভ্যই। কোনো কথা শোনে না। আয় আয় বললে কোমর দুলিয়ে চলে যায়, যা যা বললে তৎক্ষণাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে যেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি সুপুরুষ। মুখে খুব লাবণ্য, আমার মনে হয় না ভুতুর তুল্য সুন্দর কুকুর আর একটিও ভুভারতে আছে।

এখন আমি না থাকলে কে ওর কান ধোয়াবে, লোম পরিষ্কার করবে, ঠিক মতো লাঞ্চ ডিনার ও ব্রেকফাস্ট তৈরি করে দেবে। খাওয়া নিয়ে যা ঝকমারি। আমি না দিলে রেগে যায়, ঐখানে গিয়ে বসে থাকে চুপচাপ, তেড়িয়ে তেড়িয়ে আমাকে দ্যাখে। আমি তখন সোনা লক্ষ্মী বলে খাওয়াই।

ডক্টর আমেদকে বললাম, 'বেশী দিন নয়, ছ' মাসের জন্যে যাবো, ও ঠিক থাকবে তো ? আপনি মাসে একবার এসে দেখে যাবেন কিন্তু, আর হ্যারি যেন রোজ সকালে এসে কানে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে যায়।'

ডক্টর আমেদের চেহারা দর্শনযোগ্য। টকটকে রঙ, প্রায় ছ' ফুট লম্বা, টানা টানা চোখে প্রেম প্রেম ভাব। সেই ভাব বজায় রেখে হেসে বললেন, 'কেউ কি কিছু কথা দিতে পারে ? তবে আপনার কথা আমি রাখবো। মুশকিল কি জানেন ? আপনি ওকে বড্ড বেশী ইয়ে ক'রে ফেলেছেন, অসুখ করলে বাচ্চারা মাকে ছাড়তে চায় না, ও-ও হয়েছে তেমনি। এ অবস্থায় দুর্বল হয়ে যাবে কিছুটা, অনেক সময় দেখেছি আদুরে কুকুরেরা চট ক'রে হার্টফেল করে।'

হ্যারির আসল নাম হরি, কায়দা করে নিজেকে হ্যারি করেছে, যাতে লোকেরা সাহেব ভাবে। ওঁর আদরের বেয়ারা। চেহারা কিন্তু মনিবের সম্পূর্ণ উল্টো। রঙ আবলুস কাঠ, তার উপরে মুখে বসন্তের দাগ, এইটুকু বেঁটে খাটো, মাথায় শক্ত ব্রাশের মতো খাড়া খাড়া চুল। অবশ্য তারই মধ্যে চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। সব সময়ে মুখে তার হাসি। হেসে মনিবকে একান্তভাবে অগ্রাহ্য করে বললো, 'না না কিচ্ছু হবে না। আপনি যান না, আমি রোজ আসবো। ছ' মাস তো চক্ষের পলক, দেখতে দেখতে কেটে যাবে আমি বলছি। ছ' বছরেও এর কিছু হবে না।'

আমেদ সস্নেহে তাকিয়ে পাইপ টানতে টানতে বললেন, 'ব্যাটা সব জান্তা।'

এর পরে আসল সমস্যার অন্ধকারে প্রবিষ্ট হলাম। টাকা। আমাদের টাকা কোথায় ? দুজনে মিলে লিখি পড়ি খাই, সব কোথায় ভোজবাজি হয়ে যায়। বুদ্ধদেবকে তো যাঁরা নিচ্ছেন তাঁরা নিচ্ছেন, আমারটা কে দেবে ? তার মধ্যে সত্যি সত্যিই 'রাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' টিকিট কেনার প্ল্যান হয়েছে। দাম কি সোজা ? পূর্বতট হয়ে যাবো, পশ্চিমতট হয়ে ফিরবো।

জ্যোতি বললো, 'প্রকাশক বধ করুন।'

ভেবেচিন্তে সেটাই স্থির হলো। কিন্তু কাকে ? কিছুদিন যাবত একজন প্রকাশক আমাকে খুব বিরক্ত করছিলেন একটি উপন্যাসের জন্য। কিন্তু তিনি আমার স্বামীকে যাবজ্জীবন ঠকিয়েছেন, সেই কারণে আমি তাঁকে উপেক্ষার দ্বারা নিরস্ত করেছি। সেই তাঁকেই তখন মনে মনে ভজনা করলাম, যদি আসে।

আশ্চর্য, তিনি এলেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে, বললেন, 'বৌমা, শুনতে পেলাম বিলেত যাচ্ছেন। (এঁদের কাছে সারা দুনিয়াটাই বিলেত)। ভাবলাম কবে আছি, কবে নেই, একবার দেখে যাই আপনাদের।'

আমি বিয়ে হয়ে থেকে এই ভদ্রলোককে দেখছি, বৌমা ডাক শুনছি, কাছে দেখলে সমীহ না করে পারি না। তাড়াতাড়ি আদর যত্ন করে বসালাম, চা জলখাবার দিলাম, বধ করার কথা ভুলে গেলাম।

যাবার আগে ভদ্রলোক নিজেই বললেন, 'আমি আজ কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম, এটা রাখুন—'

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'তারপর ?'

'আপনার যখন খুশি নভেল লিখে শোধ করবেন।'

হাত বাড়িয়ে নিলাম টাকাটা।

ভদ্রলোক বললেন,'একটা আনুমানিক দাম ধরে পুরোটাই দিলাম।'

দু হাজার বইয়ের পুরো দামটা নিতান্ত মন্দ হলো না। প্রকাশকটি ঝোপ বুঝেই কোপটা দিতে এসেছিলেন, ঠিকই বুঝেছিলেন, এবার ওঁর ফাঁদে না পড়ে আমার উপায় থাকবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কৃতজ্ঞ হলাম। কেননা, অনুমান করে দাম ধরে যে টাকাটা আমাকে ভদ্রলোক দিয়েছিলেন আসলে সেটা একটা বইয়ের নয়, দুটো বইয়ের। কেননা, অত দামের একটা বই লিখতে গেলে আমাকে কমপক্ষে পাঁচশো পৃষ্ঠার বই লিখতে হয়। ততো বড়ো বই আমার হাতে এখনো বেরোয়নি।

ভাগ্য অনুকূল হলে এভাবেই হয়ে যায় সব। যাবো স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব গলওয়ে কিনেলকেও চিঠি লিখে দিয়েছিলেন যে, 'সস্ত্রীক যেতে চাই, কিন্তু পাথেয় কিছু বেশী না দিলে সেটা তো সম্ভাবনার পরপারে।'

তক্ষুনি জবাব দিলেন গলওয়ে, 'তোমার স্ত্রীও তো সাহিত্যিক, তার জন্য আমি যেভাবে পারি কর্তৃপক্ষকে বলে টিকিটের টাকাটার বন্দোবস্ত করে দেবো। কিছু ভেবো না। সুতরাং—'

সুতরাং, দেখতে দেখতে হয়ে গেল সব বন্দোবস্ত। শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে এলো রওনা হবার দিন। সেই দুপুরে যে বালক আমাকে এরোপ্লেনে চড়াবার জন্য তার কাকাকে বলতে বলেছিলো, যাবার দিনে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। সে কেঁদে ফেললো। যে ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের পৃথিবী ভ্রমণের উত্তেজনায় কিছু আগেও টগবগ করছিলো, দেখলাম তাদের অবস্থাও কুশের চেয়ে খুব উৎকৃষ্ট নয়। দেড় বছরের নাতনীটি জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা দেখা থেকেই কোলে উঠে বসেছিলো কোথাও বেড়াতে যাবে বলে, তাকে তার আয়ার সঙ্গে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কুকুরটিও ভেকু ভেকু হয়ে পায়ে পায়ে চলছিলো, তাকেও

চেন বেঁধে সরিয়ে নিয়ে গেল ছোটো থেকে পালিত নেপালী যুবক গজে। তারপর আমি পা বাড়ালাম বাড়ি থেকে। সেই মুহূর্তে বাড়ির চার দেয়াল ছেড়ে বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে পড়তে একফোঁটা সাধও আমার অবশিষ্ট রইলো না।

দমদম এয়ার পোর্ট থেকে প্লেন ছেড়েছিলো বেলা এগারোটায়, বিদায় জানাতে জনসংখ্যা প্রায় ভরে ফেলেছিলো লবি। এক সময়ে ছাড়াছাড়ি হতে হলো। পিছনে মন রেখে শারীরিকভাবে কখন যেন বিমানযানের গহ্বরে এসে বসলাম। ঝাপসা চোখে জানালায় তাকিয়ে দেখলাম, ওরা সবাই-ই ঝাপসা হয়ে নিষিদ্ধ বেড়ার ওপিঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে, রুমাল নাড়ছে, আমার ছেলেমেয়েরা চোখ মুছছে। মিষ্টি একটি মেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, এয়ার হস্টেস, মৃদু কণ্ঠে বললো, 'ফাসন্ ইয়োর বেল্ট'। আমি মুখ ফেরালাম, চেয়ারের সঙ্গে আটকান বেল্ট বাঁধলাম কোমরে। সঙ্গে সঙ্গে, ভীম বেগে দৌড়লো গাড়ি, তারপর হুস্ করে আকাশে উড্ডীন!

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম সকাল আটটায়, বেলা এগারোটায় প্লেন দমদম বিমান-বন্দরের মাটি ছাড়লো।

আই এ সি প্লেন। ছোটো, কিন্তু বন্দোবস্ত ভারি সুন্দর। দেখতে দেখতে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গেল। ওঠার সময় কোটি কোটি অর্বুদ অর্বুদ ভ্রমরের গুঞ্জন, তাদের সমবেত ঐকতান বাদনে অস্থির করে তুললো শ্রবণ, কানের পর্দা থরহরি কম্পমান। পরিজনকে ছেড়ে আসার দরুন মনটা স্বভাবতই কাতর ছিলো, কখন আস্তে আস্তে উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

ঊর্ধ্বে উঠে আকাশের ঔজ্জ্বল্য দেখে মুগ্ধ হলাম। রৌদ্রের উষ্ণ অভ্যর্থনায় অপার্থিব সুখ অনুভব করলাম। নিচে পড়ে রইলো বিশ্বচরাচর, ঝোপ ঝাড় জঙ্গল মাঠ ঘাট নদী নালা খাল বিল সব হয়ে গেল একাকার।

যত্নআত্তি চলছিলো খুব। বারে বারে ট্রে ভর্তি মুখরোচক খাদ্য নিয়ে এয়ার হস্টেসটি সকলের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিলো। বাঙালী মেয়ে, অল্প বয়েস, দেখতে সুশ্রী, হাসিটি মিষ্টি।

তারই মধ্যে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। লাঞ্চ সাঙ্গ করে এক কাপ কফি নিয়ে জানালা দিয়ে আকাশে তাকিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বুকটা হিম হয়ে এলো। আমি পরিষ্কার অনুভব করলাম, প্লেনটা নিচে পড়ে যাচ্ছে। কলের পাখায় আকাশে ওড়া এই আমার প্রথম। সভয়ে সকলের দিকে তাকালাম, দেখলাম কারো

মুখেই কোনো বিকার নেই। আমার সঙ্গীটিরও নয়। নিশ্চিন্ত মনে তিনি বই পড়ছেন।

সবাইকে এতো শান্ত দেখে ভেবে পেলাম না কী করবো। ভেবে না পাবার মতো কারণ অবিশ্যি মুহুর্মুহু ঘটছিলো। প্লেনটা নিচে পড়ে যেতে যেতে আবার ফস্ করে উঠে গেল উঁচুতে, আবার পড়ে যেতে থাকলো। আবার উঠলো, তারপর আবার, আবার। কে একজন বললো, 'বড্ড বাম্প করছে।' এর নাম বাম্প করা! অন্যজন বললো, 'নামছে।' নামছে! খানিক পরেই চোখেরসামনে আলোর অক্ষরে লেখা ফুটলো, 'ফাসন্ ইয়োর বেল্ট।'

চকিত স্বরে বললাম, 'বেল্ট বাঁধতে বলছে কেন? কী হলো?'

বুদ্ধদেব সামনে তাকিয়ে বললে, 'সে কী? এসে গেলাম?' বই বন্ধ করলেন।

এসে গেলাম? এসে গেলাম কী? এই তো রওনা হলাম কলকাতা থেকে। বিদেশ যাত্রার প্রথম বন্দর আমাদের ব্রহ্মদেশ। সে দেশ কি তবে কলকাতা থেকে এতো কাছে? কই, আমি তো জানতাম না! সে তো জানি সাত দিনের পথ। উড়ো জাহাজে উঠেও আমি জলের জাহাজের সময় মাপছিলাম।

মনটা অনেক পিছনে চলে গেল। ইংরেজ আমলে আমাদের দু এক ঘর আত্মীয় বাস করতেন সেখানে। দু তিন বছর পর-পর জল-পথে সাতদিন কাটিয়ে দেশে ফিরতেন তারা, প্রভূত জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন, আমরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতাম। রব উঠে যেতো, 'রেঙ্গুন থেকে অমুক এসেছে।' রেঙ্গুন থেকে আসা প্রায় বিলেত থেকে আসার মতোই।

একজন 'অমুকের' নাম ছিলো পুঁটু ঘোষ, আমার পিসেমশায়ের ভাই। তাঁর সম্বন্ধে একটি ভারি মজার গল্প শুনতাম তখন। তিনি নাকি আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে একদিন নিজের চেহারার দৈন্য দেখে রাগে উত্তেজনায় খিঁচিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'মা, শালির জন্যই আমার এই দশা।' অবশ্য গল্প গল্পই, আদতে আমি তাকে কখনো অত খারাপ দেখতে বলে ভাবতাম না। আমার বালিকা বয়সে যেবার তাঁকে প্রথম দেখি তখন তিনি বয়স্ক। যেমন মিষ্টি কথা তেমনি মধুর ব্যবহার। এবং তা মৌখিক নয়, আন্তরিক। রেঙ্গুনে অ্যাডভোকেট ছিলেন, দু হাতকে দশ হাত বানিয়েও অর্থ-বিত্তের থই পাননি। পিসেমশায় ছিলেন ইস্কুল মাস্টার, সন্তান সংখ্যা দশ থেকে চৌদ্দোর মধ্যে। বলাই বাহুল্য ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোতো না। এই ভদ্রলোক এলে বাড়িতে একেবারে

বিলাসিতার বন্যা বয়ে যেতো। শুধু বাড়িতেও কুলোতো না, প্রমোদ ভ্রমণের জন্য মাসিক ভাড়ায় বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে পিনিস ভাড়া করে রাখতেন। পিসিমাকে কুটোটি নাড়তে দিতেন না। বলতেন, 'যে দু মাস আমি আছি, সে দু মাস তুমি শুধু খাবে বেড়াবে বিশ্রাম করবে।'

দেওরের আদরে বারো মাস রান্নাঘরের তাপে পোড়া পিসিমার মলিন হয়ে যাওয়া ফর্সা রং ছাইচাপা আগুনের মতো ফুটে বেরুতো, মুখে আর হাসি ধরতো না। আমার অতি শান্ত স্নেহশীল পিসেমশায়ও মৃদু মৃদু হাসতেন, সস্নেহে তাকাতেন ভাইয়ের দিকে। তখনকার দিনের সংসারে পিতার মৃত্যুর পরে সবচেয়ে বড়ো ভাইয়েরা তো অসহায় মা আর ছোটো ভাইবোনদের সর্বদাই স্নেহে যত্নে পালন করতেন, কিন্তু এমন প্রতিদান আর কে কবে দিয়েছে তাঁর ভাই পুঁটুর মতো!

পুঁটুর বেশী মনোযোগ তাঁর বৌঠানের দিকেই। তিনি বলতেন, 'দাদা তো দানাপানি যোগাড়ের জন্য সর্বদাই বাইরে, ঘরে আমরা বৌঠানের আদরেই মানুষ। কতো বিরক্ত করেছি, রাগ করেছি, মতলব করে জ্বালিয়েছি, বৌঠানের মুখে কোনোদিন এতোটুকু অসন্তোষ দেখিনি। বৌঠান আমাদের জন্য কোনোদিন একটা ভালো জিনিস মুখে দিতে পারেননি, ভালো কাপড় পরতে পারেননি, একটু বসে গল্প করারও সময় ছিলো না। আমরা তো কম ভাইবোন ছিলাম না, সকলের প্রতিই সমান যত্ন, সমান মমতা। অবশ্যি আমি ছোটো বলে আমার উপরই বেশী টান ছিলো। না বৌঠান?' বলতে বলতে বৌঠানের দিকে তাকিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

আর তাঁর স্ত্রী, আমি যাঁকে ছোটো পিসিমা বলতে শিখেছিলাম; সেই ছোটো পিসিমাকেও দেখেছি, বড়োজায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছেন, ঢাকার পিকচার হাউসে সিনেমা দেখতে যাবার জন্য জোর জবরদস্তি করছেন, নয়তো সুন্দর সুন্দর শাড়ি কিনে এনে পরাচ্ছেন। পিসেমশায়ের জীর্ণ পোশাকও একেবারে ধোপদুরস্ত। ছেলেমেয়েরা নতুন জামা কাপড়ে ফিটফাট। যেন মন্ত্রবলে বদলে যেতো সব। আমার পিসতুতো দাদা, নাইন-টেনে পড়তো তখন, তার একটু বেলায় ওঠার অভ্যেস ছিলো। সকালবেলা উঠে পিসেমশায় ডাকতেন, 'পচু, বাবা পচু, তুমি এখনো ঘুমিয়ে আছ? তোমার কাকু যে তোমাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাবেন। ওঠো বাবা, একদিন তো চিরদিনের মতো ঘুমুতে হবে, যতোক্ষণ পারো একটু বেশীক্ষণ জেগে থাকো মানিক—'

পিসিমা ভুরু কুঁচকে বলতেন, 'ছিছী, এমন করে নাকি কেউ বলে নিজের ছেলেকে ?'

পিসেমশায় রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেন চায়ের জন্য, হাসতে হাসতে বলতেন, 'রাগ করো কেন ? কথাটা কি মিথ্যা বলেছি ?'

আমার মা আর দিদা, অর্থাৎ ঠাকুমা, দুপুরে একসঙ্গে খেতে বসে কেবল ওঁদের আলোচনাই করতেন। বলতেন, 'রেঙ্গুনে টাকার খনি আছে, যে যায় সেই রাজা।'

অন্য একজন পিসেমশায়ের চাকরি ছিলো না, বি. এ. পাশ করে, বিয়ে করে কোনোরকমেই কিছু যোগাড় করে উঠতে পারছিলেন না। সবাই বললো, আরে রেঙ্গুন যাও, রেঙ্গুন যাও বড়োলোক হয়ে আসবে।

ঢাকা থেকে রেঙ্গুন যাওয়া তো বড়ো চাট্টিখানি কথা নয় ? ভেসে পড়ার পাথেয় সংগ্রহ করা দস্তুরমতো কষ্টকর। কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হলো না, হতাশ হয়ে সকলের কাছে ধারদেনা করে সেই পিসেমশায় ওই সুদূরেই পাড়ি দিলেন। এবং সত্যি সত্যি এক বছর বাদে তিনিও বেশ ধনী ব্যক্তির মতো হালে চালে ফিরে এলেন। আমার জন্যে দামী সিলকের খুব সুন্দর একখানা শাড়ি এনেছিলেন, অন্যদের জন্যেও জুতো ছাতা লুঙ্গি—আরো কতো কী।

বার্মা আমার আবাল্যের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের দেশে টুনি পাখির মতো এমন ফুড়ুৎ করে এসে গেলাম। কী আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য !

আমরা দুজনে দূর দেশের যাত্রী, এই আমাদের শুরু। দু রাত এখানে কাটিয়ে হংকং যাবো, তারপর জাপান যাবো। জাপান থেকে মার্কিন মুলুকে। তবে কি সব স্বপ্নের দেশগুলোই এমন অনায়াসে ধরা দেবে আমার কাছে ?

এ সব দেশে যাবার স্মৃতিও আমার কাছে জলযানের সঙ্গে যুক্ত। জলযানের সময়টাই মনের মধ্যে শক্ত হয়ে এঁটে আছে। আমার বিয়ের আগে একজন আমাকে জাহাজ থেকে একটা চিঠি লিখেছিলো, আমি তার চোখের জল ছুঁতে পেরেছিলাম। প্লাসগোতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছিল সে, আমি তাকে কলকাতার গঙ্গার ঘাট থেকে বম্বেগামী জাহাজে তুলে দিয়েছিলাম। বম্বে থেকে জাহাজে উঠে এক মাস সে ভেসেছিল, এক মাস ধরে সে প্রত্যেক বন্দর থেকে চিঠি লিখেছিলো, এক মাস ধরে তার চোখের নোনা জল আর সমুদ্রের নোনা জল একাকার হয়ে

গিয়েছিলো। কিন্তু এ যে ভোজবাজি। মন যে একটু তৈরি হবারও সময় দেয় না। চলচ্চিত্রের ছবির মতো পলকে পলকে দৃশ্য বদল।

আমাকে হকচকিয়ে বন্‌বন করতে করতে নেমে এলো প্লেন, শব্দ করে মাটি ছুঁলো, ঝড়ের বেগে চক্কর মেরে থামলো এসে নির্দিষ্ট জায়গায়। আস্তে আস্তে ডিম্বাকৃতি পেটের ভিতর থেকে নামতে লাগলো যাত্রীরা। আমরাও নামলাম। মাসটা জানুয়ারী, কিন্তু নেমেই ঘেমে উঠলাম গরমে। বার্মা এমন গরম দেশ নাকি?

রেঙ্গুন বিমান বন্দরটির চেহারা দমদম বিমান বন্দরের চাইতে সম্পূর্ণই আলাদা। বাংলা দেশের স্থাপত্যের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সব বাড়ির ছাদই খোলা ছাতার মতো। সব ছাদই নানা রংয়ে রঙিন। বাড়িগুলো সব নিচু নিচু। এয়ারপোর্টটি দোতলা।

সেদিন আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার ছিলো, নীলে নীল। উজ্জ্বল রোদে ঝক ঝক করছিলো চারদিক। জায়গাটা এতো পরিচ্ছন্ন যে মনে হচ্ছিলো সিঁদুর পড়লে সিঁদুর তুলে নেয়া যায়।

ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে ব্রহ্মদেশ সিংহল সবই ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিলো। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তারাও স্বাধীন রাষ্ট্র। এখন বার্মায় আমরা বিদেশী। ব্রহ্মসরকার বিদেশীদের প্রতি খুব কড়া নজর রাখছিলেন। বিশেষত বাঙালী বংশোদ্ভূত সন্তানদের। অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতেন তাদের। আর সেই সন্দেহ অমূলকও ছিলো না।

কাস্টমস-এ এসে খুব হয়রান হতে হলো। দেখবার জন্যে প্রত্যেকটা জিনিস তছনছ করছিলো। নিষিদ্ধ রেলিংয়ের ওপিঠে বন্ধু পূর্ণেন্দু বসু এবং তাঁর স্ত্রী মায়া এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। এখানে যে কদিন থাকবো, তাঁদেরই অতিথি আমরা।

ভদ্রলোক এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং বেশ বিশিষ্ট বাসিন্দাও বটে। ব্যবসায়ী মহলে তাঁর নাম মান সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের বেশী। আমাদের ব্যতিব্যস্ত হ'তে দেখে কী ভাবে ঢুকে পড়লেন সেখানে। সর্বত্রই ফাঁকির বন্দোবস্ত আছে, সম্ভবত সেই ফোঁকরেই মাথা গলিয়েছিলেন।

তিনি এসে কী ইশারা ইঙ্গিত করতেই হুসহাস বাকস প্যাটরা বন্ধ হ'য়ে গেল সব। আসল স্যুটকেসটা খুললোই না।

'চলুন চলুন, কী কাণ্ড! কতোক্ষণ ধরে জ্বালাচ্ছে।' বলতে বলতে আমাদের বার ক'রে নিয়ে এলেন।

রাস্তায় এসে চারদিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। একেবারে ছবির শহর, রঙিন ছবি। আমি চীন দেখিনি, কিন্তু ধারণা আছে। ধারণার উৎস অবশ্য ইতিহাস নয়, চীনে রেস্তোরাঁ। তাদের আলো, তাদের রংয়ের ব্যবহার, সাজাবার ঢং, আদর-আপ্যায়ন পরিবেশন, চেরা চোখে হাসির মাহাত্ম্য, কিছুই অচেনা নয়। শুধু এখানে বাড়ির মাথার উপর থরে থরে রঙিন গোল ছাঁদের চালগুলোই কলকাতায় নেই। নইলে বার্মার সঙ্গে তাদের মিল খুব স্পষ্ট।

প্রত্যেক জাতিরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বিদেশে থাকা কালীনও দেখেছি কোনো চীনা বা জাপানীর বাড়িতে গেলে, সেই সৌরভ বেশ বহুল পরিমাণেই পাওয়া যায়। শুধু ভারতীয়রাই একান্ত ভাবে ইংরেজদের বশংবদ। পোশাক পরিচ্ছদ জীবনযাপন পদ্ধতি সব তাদের অনুকরণে তৈরি। অনুকরণীয় জাত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের শক্তি সাহস নিষ্ঠা অধ্যবসায় পরিশ্রম ক্ষমতা আলস্যহীনতা এ সবের সঙ্গে সংশ্রব না রেখে অন্য সব গ্রহণের স্পৃহা দীনতারই নামান্তর।

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো, দরজা খুলে ধরে পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'মিস্টার বোস তো এর আগেও এসেছেন, মিসেস বোসের বোধ হয় এই প্রথম?'

হেসে বললাম, 'মনে মনে অনেকবার এসেছি, অনেক রাস্তার নাম জানি, ধাম জানি, চেহারা জানি কিন্তু সশরীরে এই প্রথম।'

পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী, তিনিও মিসেস বোস, ভালোমানুষ এবং সরলতার প্রতিমূর্তি, আমার হাত ধ'রে বললেন, 'সুন্দর না?'

আমি অকৃত্রিম ভাবে বললাম, 'খুব!'

পূর্ণেন্দুবাবুদের মতো এ রকম অতিথিপরায়ণ মানুষ অবিরল নয়। বাড়ি আসতে আসতে এখানকার অবস্থান মাত্র একদিনের জেনে দু'জনই ভীষণ আপত্তি করতে লাগলেন।

বললাম, 'একদিন কোথায়? দু রাত তো। আমরা তো পরশু সকালে যাবো।'

'তার নামই একদিন। আজকে তো বেলা প্রায় গত।'

এ-রাস্তা সে-রাস্তা বেয়ে বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। আমার যন্দুর

২

মনে পড়ে বসার ঘর একতলায়। তার পাশ দিয়েই দোতলার কাঠের সিঁড়ি। দোতলায় খান চার-পাঁচ ঘরের মধ্যে আমাদের জন্যে যে ঘরটি নির্দিষ্ট ছিলো, সে ঘরে এসে ঢুকলাম। পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী বললেন, 'একটু হাত পা ছড়িয়ে বসুন, চা নিয়ে আসছি।'

চায়ের টেবিলে বললেন, 'বেরুবেন নাকি?'

'কোথায়?'

'চলুন শহরটা ঘুরিয়ে আনি। এখানকার বাঁশের জিনিস তো বিখ্যাত। যদি কিছু কেনেন তাও হ'তে পারে। অবশ্য ক্লান্ত থাকলে—'

এইমাত্র এই প্রথম ছেলেমেয়েদের ছেড়ে এসেছি, তক্ষুণি তাদের জন্যে কিছু কিনে নিদর্শন পাঠাতে মন ব্যস্ত হয়ে উঠলো, বললাম, 'ক্লান্ত একেবারেই নই। এই তো কলকাতা ছিলাম, এই তো এখানে এসে চা খাচ্ছি। শহর তো দেখতেই হবে! সেই সঙ্গে দোকানপাটগুলোও দেখা হয়ে গেলে মন্দ কী? তবে, যদি কিছু কিনি ছেলেমেয়েদের জন্যই কিনবো, কিন্তু পাঠাবো কী করে?'

মায়া বললেন, 'আমি কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতা যাচ্ছি, আপনি আমার কাছে রেখে গেলে আমিই নিয়ে যেতে পারি।'

সমস্যা তাতেও মিটলো না। আমাদের কাছে ডলার ছাড়া তো আর কোনো মুদ্রাই নেই।

এই সমস্যারও সমাধান করলেন মায়া। বললেন, 'যা লাগে আমি না হয় দিয়ে দেব, অত ভাবছেন কেন?'

'তা অবশ্য ঠিক, কলকাতা গেলে ওরাই আপনাকে টাকাটা ফেরত দিতে পারবে।'

'চলুন তা হলে।'

'চলুন!'

এতোক্ষণ বুদ্ধদেব চুপ করে ছিলেন। এবার শঙ্কিত ভাবে বললেন, 'না না, রাণুকে আপনি দয়া করে কোনো দোকানে-টোকানে নিয়ে যাবেন না, তবেই হয়েছে।'

বস্তুবাদী বলে আমার দুর্নাম আছে। আমিও তা অস্বীকার করি না। সুযোগ সুবিধে মতো কিনতে দিতে রাখতে জমাতে আমি খুব ভালোবাসি। আমার সংসারে আমার এই স্বভাব বেশ কাজে লাগে। আমার উপর নির্ভরশীল পরিজনেরা তাতে সুখে থাকে, সচ্ছন্দে থাকে, খরচ এবং উদ্বেগ দুটোরই যথেষ্ট

সাশ্রয় হয়। বুদ্ধদেবও সেটা সহাস্যে স্বীকার করেন, কিন্তু সংগ্রহের পরিশ্রমে নারাজ। দোকান বাজারের নাম শুনলেই তাঁর গায়ে জ্বর আসে। অবশ্য এটা সংগ্রহ নয়, শখ। এ মুহূর্তে সন্তানদের জন্য কোনো উপহার না পাঠালে বিশ্বভুবন ধ্বংস হয়ে যাবে না। তা ছাড়া কিনবোই যে এমনও কোনো প্রতিজ্ঞা ছিলো না। আমি তাঁর আতঙ্ক দেখে হাসছিলাম, মায়া কৌতুক বোধ করছিলেন, মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা উদারচেতা হয়ে গিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন আপনাদের সঙ্গে দোকান-বাজারেই যাই। ছাতা জুতো যা কিনতে চায় রাণু কিনুক।'

পূর্ণেন্দুবাবু বাঁচালেন। বললেন, 'আরে না না, এখন বেরুবে কোথায়? সাড়ে সাতটার মধ্যে আমাদের নিয়ে ওখানে পৌঁছতে হবে। এখন বেরুলে ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

পূর্ণেন্দুবাবু আমাদের জন্য একটি বিখ্যাত বর্মী রেস্তোরাঁয় মস্ত বড়ো এক নৈশভোজের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। বার্মা শহরের অনেক রথী মহারথীরা সেখানে নিমন্ত্রিত। সবাই-ই বণিক, সকলের ঘরেই অচলা লক্ষ্মী। এবং সবাই-ই ঐ দেশের। মাত্র একজন বাঙালী মহিলা ছিলেন, আর একজন পর্তুগীজ মেয়ে। তার বাড়ি হংকং। বার্মার পরেই আমরা হংকং যাচ্ছি শুনে মহা খুশি। আমার পাশে এসে বসে, আমার কোলের উপর হাত রেখে হংকং বিষয়ে সে অনর্গল কথা বলতে লাগলো। আমি অপলক নয়নে একবার তার মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম, একবার তার হাতের দিকে তাকাতে লাগলাম। একেবারে ক্ষীরের পুতুল।

ফিরতে ফিরতে রাত হলো অনেক। ঘরে ঢুকে এবার ক্লান্ত লাগলো। রওনা হবার ব্যস্ততায় কদিন থেকে আমার এক ফোঁটা বিশ্রাম ছিলো না। আর সেদিন তো ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয়েছে। মনে হলো ঘুমোতে পারলে বাঁচি। হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে আরাম করে হাত পা ছড়াতেই মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ঘরে পাখা ছিলো না, কী যে গরম তা বলা যায় না। অর্থাৎ মশারী না ফেললে মশা, ফেললে গরম। রাতটা একেবারে হা হুতাশ করেই কাটলো।

সকাল বেলা চায়ের পাট সেরে রান্নার ব্যবস্থা করে মায়া বললেন, 'বুদ্ধদেব-বাবু আপনারা দুজনেই আসুন, চলুন আমরা বেরোই।'

গাড়িতে উঠে বললেন, 'প্রথমে প্যাগোডায় যাই, সেখানে উঠতে নামতে অনেক দোকান পাট আছে, দেখতেও পাবেন কিনতেও পাবেন। বহুশ্রুত প্যাগোডা দেখার আকাঙ্ক্ষায় আমার আর কেনার গরজ রইলো না, গাড়ি এসে পদতলে দাঁড়ানো মাত্রই, খাড়া রাস্তা বেয়ে উঠে এলাম উঁচুতে, উঁচুতে উঠে মালভূমির মতো সমতল আঙিনায় সুউচ্চ মন্দিরের গাঢ়ভাবে সোনার জল করা চূড়োটি দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কাছে কারুকার্যখচিত দরজার বৃহৎ পাল্লাটি অর্ধউন্মুক্ত ছিলো। ভিতর থেকে একটা মদির গন্ধের ঝাপটা এসে মুহূর্তে মনটাকে পবিত্রতায় ভরে দিল। ছবিটা এখন আমার স্মৃতিতে ঝাপসা ঝাপসা, মনে হয় শ্বেতপাথরের প্রশস্ত একটা বারান্দা ছিলো, আমরা সিঁড়ির ধাপে বসেছিলুম। দরজাটি খুলে গেল, একজন সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে হাসলেন, আমি ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলাম। ঘং ঘং করে ড্রামের গম্ভীর নিনাদে ভরে গেল পাহাড়, সন্ন্যাসীরা মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। হৃদয়মন ক্ষণিকের জন্য পরম সত্তায় বিলীন হলো।

দুপুরে বাড়ির ভাত খেয়ে বিশ্রাম। রাত্রিতেই আবার আর এক নৈশভোজের ব্যবস্থা। এই পার্টি দিচ্ছেন ওখানকার এক' বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি। বাঙালী বিষয়ে তাঁর অসীম কৌতূহল। বাঙালী লেখক বিষয়ে অসীম ভক্তি।

বিশাল এক প্রাসাদের মালিক। বসার ঘরটি তিন ভাগে বিভক্ত। বিভক্ত হয়েছে নানা আকৃতির কারুকার্যখচিত বর্মী পার্টিশন দিয়ে। কোনো পার্টিশনে জালির কাজ, কোনো পার্টিশন লাক্ষার রংয়ে রঞ্জিত, কোনো পার্টিশনে মিনে করা ছবির বাহার। একটি হাতির দাঁতের পার্টিশনও শোভা পাচ্ছিলো কোণের দিকে।

গৃহকর্তা মখমল জাতীয় গভীর রংয়ের লম্বা পোশাকে রাজার মতো এগিয়ে এসে নিচু হয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিশাল কক্ষটিতে মন্দ জনসমাগম ছিলো না। আমরা যেতে সবাই-ই উঠে দাঁড়িয়ে আবক্ষ আনত হলেন। পুরুষদের সকলের মুখই দাড়ি গোফহীন, কারো কারো থুতনিতে পাৎলা লম্বা নুর। গায়ের রং হলদে, ঠোঁট আর চোখ একই ধরনের। ফং ফং করে ইংরিজিতে বললেন, 'কম ইন, কম ইন।'

এটা যে 'কাম ইন', বুঝতে সময় গেল আমার। ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর আধিক্য সাংঘাতিক। ছেলেদের গলা খাদে এবং মোটা। মেয়েদের গলা সরু এবং মাজা। প্রত্যেকেই জাতীয় পোশাক পড়েছেন। মেয়েদের বুক থেকে সিলকের লুঙ্গি

নেমে গেছে পায়ের পাতায়, পা দুখানা ছোট্ট ; পুঁতির কাজ করা খড়ম জাতীয় জুতো গুলোই নজরে পড়লো। কালো কুচকুচে চুলে উঁচু করে বাহারে খোঁপা বেঁধেছে, খোঁপায় পাখা গোঁজা। হেসে হেসে সরু গলায় কংকং করে আদর জানালো।

মাথার উপরে সব কাট্‌গ্লাসের আলোর ঝাড়, ঘরের এ কোণে ও কোণে বাগান, বাঁশ ঝোঁপ, বিশাল ট্যাংকে আশ্চর্য সুন্দর মাছ। ঘরের মধ্যেই নন্দন কানন। তারপরেই ঝলসে উঠলো মদের গ্লাস। ড্রইংরুমের তিনভাগের একটি ভাগ অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বার কাউণ্টারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বিলিতি মদের ছড়াছড়ি।

আমি এর আগে আর কখনো কোনো বার-কাউণ্টার দেখিনি। এতো মদ একসঙ্গে দেখিনি। আমার স্বামীর নামে আমি বিবাহের পূর্ব থেকে জেনে এসেছি তিনি মদ্যপান করেন, কিন্তু কুড়ি বছরের মধ্যে কোনোদিন তাঁকে পান করতে দেখিনি, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। বোতলগুলো হরেক চেহারা নিয়ে এক একটি মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলো। ঘরের অন্য অংশে আরামদায়ক রঙিন আসনে বসে সকলেই সকলের স্বাস্থ্যপানে সঙ্গত হলেন। আমাকেও দেড়শো বছরের পুরোনো কোনো দ্রাক্ষারসের মধুর পানীয় হাতে ধরিয়ে দিয়ে গৃহকর্তা হুঁ হুঁ করে হাসতে লাগলেন।

হাসিই এদের মুখের শোভা। মুখ কখনো ম্লান ক'রে থাকে না।

নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টাধ্বনি হ'লো। খাবার ডাক। ডাইনিং হলটি কাচে মোড়া। মাঝখানে এ-মাথা ও-মাথা পর্যন্ত শ্বেতপাথরের মস্ত টেবিল, বসবার আসনগুলো বাঁশের তৈরি, টুকটুকে লাল। শ্বেতপাথরের চারপাশে ঐ লাল চেয়ারগুলোকে সাদা দুধ-গরদ শাড়ির চারদিকে নকশি কাটা লাল পাড় বলে ভ্রম হচ্ছিলো।

ধীরে ধীরে নাম দেখে সবাই এসে আসন নিলেন। চামচসহ চিনে মাটির স্যুপ প্লেটে সাজানো আছে, দুজন পরিচারিকা প্রকাণ্ড এক সোনার মতো পিতলের গামলার দু'পাশের দুই কড়া ধরে স্যুপ নিয়ে এলো, অন্য একজন পরিচারিকা কাঠের হাতা ভর্তি ক'রে ক'রে সেই স্যুপ পরিবেশন করতে লাগলো। এতো গরম স্যুপ যে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল টেবিল।

স্যুপ খাওয়া শেষ হ'তেই বদলে গেল প্লেট, চামচে। তারপর থেকে যে কী এলো আর এলো না তার হিসেব নেই। মাত্র তেইশ পদ খাইয়েছেন বলে গৃহস্বামী লজ্জায় লাল হ'য়ে ঘুরে ঘুরে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

মনে হয় ভদ্রলোক বিপত্নীক, অথবা স্ত্রী তখন অন্যত্র কোথাও ছিলেন। কেননা আদর অভ্যর্থনা ভদ্রতা সবই তিনি একা করেছিলেন। পাঁচ ছ'জন মহিলা অবশ্য ছিল, তারা পরিচারিকা। শুধুই নামে কিন্তু পরিচারিকা ভাবতে অসুবিধে হচ্ছিলো, সাজে-সজ্জায় ব্যবহারে এতোই নিখুঁত তারা! একজন মোটা হেড পরিচারিকা ছিলো, সে ঘুরে দেখছিলো কাকে কী দেয়া দরকার, অধীনস্থ চারজন ছুটে-ছুটে তার হুকুম পালন করছিলো।

খাওয়া শেষ হ'লে দেখা গেলো, যতটা খাওয়া হ'য়েছে, ফেলা গেছে তার দ্বিগুণ। তখন গৃহস্বামীর লজ্জা সামান্য কমলো।

ড্রইংরুমের দু'টি অংশ দেখে এসেছি, এবার তৃতীয় অংশে বসে অদ্ভুত এক ছায়াস্নিগ্ধ গাছতলায় বসার সুখ অনুভব করলাম। আলোর কারসাজিতে দেয়ালের ছবিতে এবং বসবার আসনের কারুকলায় এমন এক বিশ্রামের আবহাওয়া তৈরি করে রেখেছে যে গুরুভোজনের পর দেহের শৈথিল্য আলস্যে ঢলে পড়ার আরাম পায়।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। পাখা হাতে সোনালি মেয়ে-আঁকা লাল টুকটুকে এক মুঠো হাত উঁচু গোল টেবিলে, যে টেবিল ঘরের প্রায় আট ফুট বাই আট ফুট অংশ জুড়ে আছে, তা ভর্তি ফল আর মিষ্টি এলো। 'খাও,খাও, খেতেই হবে। অত লজ্জা করলে চলবে না।' হাতে হাতে ওয়াইনের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে গেল বেয়ারা। এবার আমার পাশে যে মহিলা বসলেন, শোনা গেল তিনি দু-দু'বার বিশ্বভ্রমণ করেছেন। আমাদের কাছেও দু'খানা 'রাউণ্ড দ্য ওয়াল্ড'' টিকিট আছে শুনে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন।

পার্টি ভাঙতে কিছু রাত হ'লো। ফেরার পথে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী মায়া বললেন, 'তা হ'লে কালই যাবেন?'

আমি হাসলাম।

উনি বললেন, 'কোনোরকমেই কি আর একটা দিন থেকে যাওয়া যায় না?'

'সব জায়গাতেই যে তারিখ নির্দিষ্ট হয়ে আছে।'

'কিন্তু আপনি তো এ শহরের কিছুই দেখলেন না, কিছুই জানলেন না, এদের নাচ, গান, সাধারণ জীবনযাত্রা—'

'তা ঠিক। যেদেশে সোনার খনি আছে, যে দেশ থেকে পুঁটু ঘোষ তাঁর দাদা বৌদির প্রতি কৃতজ্ঞতার সমস্ত নিদর্শন নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির আয়নায় যে দেশকে দেখতে দেখতে স্বপ্নলোকে বিরাজ করেছি,

সে দেশের সঙ্গে কি দুই রাত্রি ভোজনেই চেনা জানা হ'য়ে যায় ? হয় না, হতে পারে না। তা হ'লে কি এখানে আসা বৃথাই হলো ?

সহসা সব ছাপিয়ে এই দু'টি নতুন বন্ধুর জন্য অন্তরে বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করলাম। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এ'দের পরিচয় ছিলো, আমার সঙ্গে এই প্রথম।

পূর্ণেন্দুবাবু গাড়ি চালাতে চালাতে মুখ ফেরালেন, 'এটা কিছুই হলো না মিসেস বোস, আর একবার আসতে হবে।' মায়া আবেগের সঙ্গে হাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'সত্যি।'

তার পরের দিন সকাল আটটায় যখন এয়ারপোর্ট ছাড়লাম, পূর্ণেন্দু বসু আর মায়া বিষণ্ণ মুখে রুমাল উড়োতে লাগলেন, আমি ত বিধুর হয়ে উঠলাম। মনে মনে বললাম, এই দেশে না এলে আর এ'দের সঙ্গে কেমন করে দেখা হতো ? যে ভদ্রলোক কাল কতো আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন, তিনিও তো এই দেশেরই প্রতিভূ ? সর্বোপরি সেই বৌদ্ধ মন্দির ? তার গন্ধ শব্দ মন্ত্র ! মুহূর্তের জন্য হলেও যে আমার সব গ্লানি ধুয়ে মুছে দিয়েছিলো !

তবে আর দুঃখ কিসের ? এই তো এতো বছর পরেও সেকথা আমি ভুলিনি, ভুলতে পারিনি, বার্মার স্মৃতি এখনো হৃদয়ে অমলিন। এমন ছোটো জীবনে এই সংগ্রহই বা কম কী ?

হংকং বিমান বন্দরটি সমুদ্রের ধারে। এমনিতেই বন্দরগুলো সদাসর্বদা উদাত্ত আকাশের তলায় উদাত্ত মাঠ নিয়ে দিগন্তব্যাপী, তার মধ্যে অনন্ত সমুদ্র পাশে থাকলে তার যে কী মহান চেহারা হয় সেটা কল্পনা করা কঠিন নয়। জগতের অনেক বিমান বন্দরই আমি দেখেছি। দৈর্ঘে প্রস্থে ব্যস্ততায় বিমানের সংখ্যাহীনতায় তারা এই বিমান বন্দরের চাইতে এতোটাই বৃহৎ যার কাছে এই বন্দর সদ্যোজাত শিশুমাত্র। কিন্তু এমন সুন্দর বন্দর যেন আর দেখিনি। হয়তো জলের এতো কাছে বলেই। প্লেনে চীনে যাত্রী, জাপানী যাত্রী আর বর্মী যাত্রীতেই ঠাসা। দু'চারজন তরকারির মধ্যে ফোড়নের মতো পশ্চিমী মানুষও আছে অবশ্য। ভারতীয় একমাত্র আমরাই। চোরা চোখে সকলেই আমাদের লক্ষ করছিলো। অথবা শুধু আমাকেই। পুরুষের পোশাক এখন মাত্র একটি, সর্বত্রই একরকম। সেখানে কোনো বৈচিত্র্য নেই, তাতে কে কোন দেশের লোক ধরাও শক্ত। হঠাৎ শাড়িপরা মেয়ে দেখলেই বিদেশীদের চোখ চলে যায় সেখানে। অন্তত ষোলো বছর আগে তো বেশ যেতো। এখন অবিশ্যি সবই জলভাত।

যাওয়া-আসা মেলামেশা আদান-প্রদান বিবাহ প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার। এখন আর কেউ কারো অচেনা অতিথি নয়। কেউ কারো দিকে তাকিয়ে অবাকও হয় না।

আমি অবাক হতে খুব ভালবাসি। বুদ্ধদেব বলতেন, 'রাণুর অবাক হবার ক্ষমতা অপরিসীম।' আমি বলতাম, 'এ আবার একটা ক্ষমতা কী, অবাক কাণ্ড দেখলে তো অবাক হতেই হয়।'

বিদেশের পথে সত্যি আমি খুব অবাক হচ্ছিলাম। চীনা আর জাপানীর চেহারার আকাশ পাতাল তফাত দেখে অবাক হচ্ছিলাম, প্রত্যেকের আচরণের নম্রতা দেখে অবাক হচ্ছিলাম। পরিচিত অপরিচিত সকলেই সকলের চোখে চেয়ে হাসে দেখে অবাক হচ্ছিলাম। আর প্লেন যখন সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামবার প্রস্তুতিতে ওঠা-নামা করছিলো তখন যে কেমন করে ডুবে না গিয়ে বেঁচে থাকছিলাম সেটা দেখে যে কতো অবাক হচ্ছিলাম তার কোনো তুলনা নেই।

এবার আর ছোট প্লেন নয়, বিশাল পক্ষযুক্ত প্যান-আমেরিকানে চল্লিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ছিলাম, চারশো পঁচাত্তর মাইল স্পীডে চলছিলো সেই জেট প্লেন। উপরে মেঘহীন নিঃসীম নীলাকাশ, নীচে অন্তহীন প্রশান্ত মহাসাগর।

যতোবার প্লেন নেমে নেমে আসছিলো আমি ভাবছিলাম সাগরের তলায় যেতে আর বেশী দেরি নেই। বুঝতে পারছিলাম না এখানে কোথায় নামবে। কোনো তীর দেখতে পাচ্ছিলাম না। এক সময়ে ঠক করে যে কীভাবে হংকং-এর মাটি পেলো সেটা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভবই ছিলো না। আমি দাঁতে দাঁত লাগিয়ে তখন 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' জপবার চেষ্টা করছিলাম।

সমুদ্রের ধারে বাঁধানো বে, তার পাশে এয়ারপোর্ট। যখন নামলাম, বেলা তখন পাঁচটা, সূর্যের লাল আভা পাহাড়ের মাথায় মাথায় আবির ছিটিয়ে রেখেছে। অভ্যর্থনা জানাতে দু'জন ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বাইরে এসে হাত ঝাঁকাঝাঁকি হলো একপ্রস্থ, তাঁরাই হোটেল ঠিক করে রেখেছেন। হোটেল মারিনার। বললেন, এখানকার অন্যতম বিশিষ্ট হোটেল, আশা করি অসুবিধে হবে না।

তা অবশ্যই হলো না। পুরু কার্পেট মোড়া মস্ত এক সুসজ্জিত বিলাসবহুল কক্ষ দেখে ভালো লাগলো। এখানে নেমেই ভীষণ শীত করছিলো, ঘরে ঢুকে আরাম বোধ হলো। ঘরটি গরম। বাথরুমেও গরম জলের কল পাওয়া গেল। হাত মুখ ধুয়ে আসতেই ভ্যালেট চা নিয়ে এলো। কোজি ঢাকা রুপোলী ট্রেতে

খাদ্যসম্ভার দেখে যতো চমৎকৃত হলুম, ভ্যালেটটিকে দেখে ততোধিক। অসম্ভব সুন্দর একটি ছেলে। টকটকে লাল রংয়ের প্যান্টের উপর পুরোহাত ধবধবে সাদা শার্ট, শার্টের উপর আবার লাল টুকটুকে কোর্তা, কোর্তার বুকে সোনালী বোতাম।

ট্রে রেখে হাসিমুখে অভিবাদন জানালো। এর আগে আমি ঠিক এই জাতীয় পরিচারক দেখিনি। ফরাসী গল্পে উপন্যাসে ভ্যালেট শব্দটা অনেকবার চোখে পড়েছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার-সৌজন্য এসবের ব্যাখ্যাও জানা ছিলো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি এই হোটেলে অনেক দিন আছো?' এই জিজ্ঞাসা একান্তই অকারণ। কিন্তু ছেলেটি এতো সুন্দর যে কথা না বলে থাকতে পারছিলাম না।

ছেলেটি চলে যেতে যেতে থমকালো। ব্যক্তিগত আলাপের জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। জবাবে পেশীর দ্বারা চর্চিত অভ্যস্ত হাসি হাসলো না। চোখের কালো তারায় ঝিলিক তুলে সত্যিই হাসলো। বললো, 'দশ বছর।'

'দশ বছর! তোমার বয়েস কতো যে দশ বছর যাবত কাজ করছো?'

'তখন চোদ্দো ছিলো এখন চব্বিশ।'

'তোমার দেশ কোথায়?'

'শুনেছি বাবার দেশ কাশ্মীরে ছিলো, মা পর্তুগীজ। আমি আদ্দেক ভারতীয়।'

'অনেক দিন এ দেশে আছো, না?'

'আমার বাবার জন্মও এখানে। কিন্তু আমি বাবাকে দেখিনি, সবাই বলে আমার চেহারা বাবার মতো। আমার চোখ কালো চুল কালো—তাই না?'

'তাই তো তুমি এতো সুন্দর।'

ছেলেটি সলজ্জ হলো, চোখ নিচু করে হেসে বললো, 'না মামমি, আমার চেয়ে আমার ভাই অনেক বেশী সুন্দর। আমাদের ঘর খুব দূরে নয়, তুমি কদ্দিন থাকবে? তা হলে আমি আমার ভাইকে একদিন দেখাবো।'

এই সময়ে বুদ্ধদেব বললেন, 'চা দাও; চা দাও, শীগ্গির চা দাও, তেষ্টায় মরে যাচ্ছি।'

কাচ ঢাকা জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে সন্ধ্যার দৃশ্য দেখছিলেন, ফিরেই চায়ের সরঞ্জাম দেখে মহা খুশি। ছেলেটিকে বোধ হয় লক্ষ্যও করেন নি। কিন্তু ছেলেটি

থতোমতো খেয়ে গেল। যদিও বাংলায় বললেন তবুও সে বুঝতে পারলো যে তার যাওয়া দরকার। এটা রীতি নয়। ভ্যালেট অবনত মস্তকে ঘরে ঢুকবে, নিঃশব্দে কর্তব্য সম্পাদন করবে, যতোটুকু হাসি বরাদ্দ ততোটুকু হেসে চলে যাবে। এই নীতি সে লঙ্ঘন করেছে, সে শাস্তির যোগ্য। কিন্তু নিয়ম তো সে ভঙ্গ করেনি, আমি করেছি। তাই তার মুখে যেই মাপা হাসি ফুটে উঠলো, আমি ব্যথিত হলাম। হঠাৎ কোন দুর্বল মুহূর্তে এই বিদেশে, এই পরিবেশে কেন সে আমাকে ম্যাডাম না বলার অপরাধে অপরাধী হয়ে 'মাম্‌মি' সম্বোধন করলো কে জানে।

চায়ের পাট সাঙ্গ হতেই যাঁরা আমাদের দেখাশুনো করবার জন্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা এলেন। বললেন, 'কিছু কেনাকাটার আছে? ডলার চাই?'

কেনাকাটার আমাদের অনেক আছে কিন্তু চাইলেই ডলার পাওয়া যাবে সেটা জানা ছিলো না। অবাক হয়ে বুদ্ধদেব বললেন, 'ডলার! কে দেবে?'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বেরুলো, 'কতো চাও?'

'কী করে শোধ করবো?'

'আমাদের ব্যবসা আছে ভারতবর্ষে, আমরা কলকাতা যাই, তখন শোধ করে দিও।'

'ভারতীয় মুদ্রায়?'

'নিশ্চয়ই, তবে দাম বেশি পড়বে।'

আমাদের ইতস্তত করতে দেখে বললেন, 'ঠিক আছে, আগে চলো নিয়ে যাই দোকানে, তারপর যদি প্রয়োজন বোঝো—'

হংকং আমাদের কাছে নতুন দেশ, কিছুই চিনি না জানি না, সেজন্যও এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক দুজনকে বার্মা থেকেই কোনো বন্ধু ঠিক করে দিয়েছিলেন। এখন আর মনে করতে পারছি না, কার সূত্রে তাঁরা আমাদের দেখাশুনো করার ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

চেনা বলে একটি ছোটো সাইজের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে নিয়ে তাঁরা এলেন আমাদের। আমি সদ্য কলকাতা থেকে আসছি, স্টোরের সেই ছোটো সাইজটি দেখেই যথেষ্ট চমৎকৃত হলুম। সম্ভারের প্রাচুর্য দেখে হকচকিয়ে গেলুম। অত্যন্ত দামী বলে যে সব জিনিস প্রায় ছুঁতেই সাহস পাই না, করমুক্ত বন্দর বলে তা-ও দেখলাম আয়ত্তের মধ্যে।

একটা হাত-ঘড়ি কেনার উদ্দেশ্য ছিলো, ভদ্রলোকদের সাহায্যে কেনা হলো

সেটি। বেশ দামবস্তুর করতে হয়। শীতকালে শীতের দেশে চলেছি, গরম কাপড়ের প্রাচুর্য বিশেষ ছিলো না। এখানে নেমে থেকেই বুঝতে পারছি, শীতের কামড় কাকে বলে। অতএব সেই বিভাগেও এগুতে হলো।

ও'রা বললেন, 'চলুন আপনাদের অন্য একটা পাড়ায় নিয়ে যাই, অনেক ছোটো ছোটো দোকান আছে সেখানে, খুব শস্তায় সব পাবেন। একটা দোকানে না হলে অন্য দোকানে যেতে পারবেন।'

এলাম সে পাড়ায়। আমাদের পৌঁছে দিয়ে ও'রা কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'এটা শহরের অনেকটা কাছে, ট্যাক্সি পাওয়া সহজ হবে, আশা করি অসুবিধে হবে না কোনো।'

অসুবিধা আর কী। বরং সুবিধা হলো। অন্যকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেদের প্রয়োজন মেটানো বড়ো অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিলো। স্বাধীন হয়ে দশ ডলারের জিনিসকে পাঁচ ডলারে দেবে নাকি বলতেও আর লজ্জা থাকলো না কোনো।

কিনতে কিনতে শেষে অনেক কিছুই কেনা হয়ে গেল। গরম কাপড় এখানে অস্বাভাবিক সস্তা। মোজা, টুপি, কোট, ওভারকোট, গরম গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট—সস্তায় শাপলা ক্ষেতে পড়ে গিয়ে কতো কী যে কেনা হলো তার ঠিক নেই। এর মধ্যে অনেকগুলো অবশ্য কিনবো ভেবেই হংকংয়ে থেমেছিলাম। বেশি হয়ে গেল অনেক। তার ফলে পোঁটলা-পুঁটলি বাড়লো, হাতে আর ধরে না। সব শেষ করে পথে এসে দেখি, একেবারে সুনসান নির্জন। জায়গাটা বড়ো রাস্তা থেকে সরে একটু গলির মধ্যে। আমরা বেরুতেই ঝপঝপ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে তাকিয়ে কিছুটা অসহায় বোধ করলাম। বুঝতে পারছিলাম না ট্যাক্সির জন্যে কোনদিকে এগুই। অদূরে বহু কণ্ঠের বিহ্বল কোলাহল শোনা যাচ্ছিলো। মনে হলো নেশাখোর জুয়াখোরের দল জুটেছে। খোলা ছোরা হাতে নিয়ে প্রায় মারামারি করতে করতে দু'জন চৈনিক চলে গেল পাশ দিয়ে। মাতালের চিৎকারে সহসা নিস্তব্ধ ফুটপাত সচকিত হয়ে উঠলো। আমি ভয়ে দিকবিদিক হারা হয়ে সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। বুদ্ধদেব বললেন, 'এখানে দাঁড়াও, নিশ্চয়ই একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাবো, এলোমেলো অচেনা পথে গিয়ে কী হবে?'

'ভদ্রলোকেরা কী রকম? আমাদের কেমন একটা বিশ্রী জায়গায় এনে ছেড়ে দিয়ে গেলেন!' আমি প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি!

ঐ ভয়ংকর শীতে খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে থাকাটাও কি কম কঠিন? প্রত্যেকটি মুহূর্তকে এক একটি ঘণ্টা বলে বোধ হচ্ছিলো। হঠাৎ চোখে পড়লো, যে দোকান থেকে শেষ জিনিসটি কিনে বেরিয়েছিলাম, তার দরজাটি অর্ধনমিত। তলা দিয়ে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমাদের দেখেই দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'ট্যাক্সি পাচ্ছেন না, না?'

একেই বলে ঈশ্বর প্রেরিত। আমরা কাতরভাবে মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, 'ট্যাক্সি এখন এখান দিয়ে যাবে না। পাড়াটা ভালো নয়। চলুন, বড়ো রাস্তায় যাই, কোথায় যাবেন?'

'হোটেল মারিনার।'

'ও, সমুদ্রের ধারে? ঠিক আছে, আমিও ঐ পথেই যাবো।'

এতোক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে চারদিকে তাকালাম। দূরে অতিকায় প্রাণীর মস্ত ঢেউ খেলানো পিঠের মতো গড়িয়ে আছে পর্বতশ্রেণী, এখানে ওখানে বিজ্ঞাপনের আলো জ্বলছে, আকাশভরা তারা, কী সুন্দর শহর!

নিরাপদেই হোটেলে এসে পেঁছিনো গেল। সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় আহার সেরে তারপর উপরে উঠে নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম।

বিশ্রাম! এখানে এই এক রাত্রিরই অবস্থান। পরের দিন সকালেই জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। ঘরের দিকে তাকিয়ে হাত পা ঠাণ্ডা। এর মধ্যেই এতো জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে হয়েছে? আরো তো কতো কিনে নিয়ে এসেছি তার তো ঠিকই নেই। এখন এসব গুছোতে বসলে ঘুমোবো কখন? আর এতো জিনিস ঢোকাই বা কোথায়?

এদিকে প্লেনের যাত্রী, বেশী মালবাহী হবারও উপায় নেই, নইলে আরো দুটো স্যুটকেশ কিনে এনে দিব্যি ঝপাঝপ ভরে ফেলা যেতো সব। ভেবেচিন্তে শেষে মস্ত মস্ত দুটো থলি ভর্তি করতে হলো হাতে নেবার জন্য। হাতের মালের ওজন নেই।

বুদ্ধদেব শুয়ে পড়েছেন তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসমতো একখানা বই নিয়ে।

আমার কাজ সারতে সারতে রাত হয়ে গেল। তারপর বাথরুমে এলাম স্নানের জন্য। ঘোরাঘুরি করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিজেকে ভারি অপরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছিলো, তা ছাড়া ঐ শীতে খানিকক্ষণ গরম জলের টবে গা ডুবিয়ে রাখতেও লোভ হচ্ছিল।

স্নান করে সত্যিই সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। কিন্তু সেই সুখ সম্যক

উপলব্ধি করতে না করতেই সাড়ে চারশো টাকা দামের নতুন ঘড়িটির দুর্দশা দেখে সেই শৈত্যই আবার আরো গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলো।

দোকান থেকে কিনেই ঘড়িটি হাতে পরেছিলাম। দোকানের ভদ্রলোকই পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে হাতেই আছে, স্নানের আগে আর খুলতে মনে নেই। গরম জলে ডুবে থেকে সেটির যা দশা হয়েছে। ভিতরে জল ঢুকে কাঁটাটাঁটা আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ঘড়ি পরার অভ্যেস নেই আমার। কোনোদিন আমি ঘড়ি পরিনি। সেই ছেলেবেলায় এক সাহেব গান শুনে সোনার মেডেলের বদলে এক সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন, পেয়ে সুখী হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনো হাতে পরিনি। ভীষণ রোগা ছিলাম, সেই হাতে ঘড়িটা কী যে বিশ্রী দেখাতো। আমার মায়ের চোখ নেই, বলতেন, 'কেন ? বেশ তো সুন্দর লাগে।'

আমি এ কথার পরে মাকে ভ্রূকুটির দ্বারা ভস্ম করে ঘড়িটি বাক্সে ভরে রাখতাম। হাতে না পরলে কী হবে, ঘড়িটির প্রতি আমার মমত্ব ছিলো খুব। বেশ যত্ন করতাম। কোনোদিন চাবি দিতে ভুল হতো না।

একদিন কিন্তু ঘড়িটি হারিয়ে গেল। দেখা গেল, বাক্সটি তেমনি আছে। বাক্সের উপর একটি শৌখিন রুমাল ভাঁজ করা ছিলো, সেটিও তেমনি আছে ভিতরে ঘড়িটিই শুধু নেই। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা খোঁজাখুঁজি করে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা আবার ঘুরে ফিরে আমাকেই নানাভাবে জেরা করে জানতে চাইলেন, কখন আমি সেটা শেষ দেখেছি। অথবা মনের ভুলে অন্যত্র কোথাও ফেলে রেখেছি কিনা। বাড়িতে তো আমি মা বাবা, এই তিনটিই প্রাণী আমরা। কাজেই পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া গতি কি ?

আরো দুজন আছে বটে, একজন আমাদের পুরোনো রাঁধুনি কামিনী মাসিমা, আর তার দশ এগারো বছরের ছেলে মাখনধলা।

আসলে ছেলেটার নাম মাখনলাল। একদিন আমাদের এক আত্মীয় এসে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই তোর নাম কী রে ?'

সে বললো, 'মাখনলাল দাস।'

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন, 'মাখন আবার লাল কী, মাখন কখনো লাল হয় ? মাখন তো ধলা। এখন থেকে বলবি আমার নাম মাখনধলা দাস। বুঝলি ?'

সে মাথা নেড়ে জানালো, বুঝেছে। পূর্ব বাংলায় ধলা মানে সাদা। আমরা সেই থেকে তাকে মাখনধলা বলতাম।

মাখনধলা বেশ একটু দুষ্টু হয়ে উঠেছিলো। তার মা তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলো লেখাপড়া শিখতে। সে মোটেই তাতে রাজি ছিলো না। মায়ের তাড়া খেয়ে রোজ ঠিক সময় বেরিয়ে যেতো বইখাতা নিয়ে, তারপর খেলাধুলো সেরে, শহরময় টহল দিয়ে ফিরে আসতো চারটের সময়।

ছেলে ইস্কুল থেকে ফিরেছে, কামিনী মাসিমা তো ঘুম ছেড়ে ধড়ফড় করে উঠে খেতে দিত ছেলেকে। সন্ধ্যেবেলা আমাকে বলতো, 'রানি, তুমি একটু পড়াও ওকে। বড়ো অমনোযোগী, কারো কথা শোনে না, কেবল তোমার কথাই শোনে।'

তা শুনতো। মাখনধলা আমার খুব ভক্ত ছিলো। দিদি অন্ত প্রাণ।

ইস্কুলের নাম করে পথে পথে খেলেই যে সে তার দুষ্টুমির অবসান করতো তা নয়; মাসে মাসে ইস্কুলের মাইনেটাও ঠিক মতো তাগাদা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঢাকাই পরোটা আর চপ খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ি ফিরতো।

মা তো ভয়ে অস্থির, ছেলের কেন এমন অগ্নিমান্দ্য চলছে। ছেলে তার প্রাণ। এই কামিনীর আরো একটা ছেলে আছে, তার নাম ননী। সেটা সাংঘাতিক বোকা। কিছু মনে রাখতে পারে না। স্মরণশক্তি নামক একটা বস্তু তার মগজের কোথাও নেই। সেই গোবরেও কামিনী ফুল ফোটাতে চেয়েছিলো, পারেনি। তারপর তাকে ঢাকা শহরের নবাবপুর অঞ্চলে একটা চপ পরোটার দোকানে ছোকরার কাজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন আমার বাবা। মাখনধলাটা সেখানে গিয়েই বোকা দাদাটাকে ধমক-ধামক দিয়ে খেয়ে আসতো।

সেই ননীটাই বলে দিল একদিন। তারপর ইস্কুলে না যাবার দরুন আর মাইনে না দেবার দরুন মাখনধলার নামটাও কাটা গেল ইস্কুল থেকে। যেহেতু লোকাল গার্জেন হিসেবে আমার বাবার নাম ছিলো, হেডমাস্টার মশাই ভদ্রতা করে ডাকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন সে কথা।

ঈশ্‌স্‌, তারপর কামিনী যে ওকে কী মারটাই মারলো। আমি দোতলায় ছিলাম, একতলায় তর্জনগর্জন কান্না চিৎকার হুসহাস কতো যে শব্দ হচ্ছিলো। নেমে এলাম অতিষ্ঠ হয়ে, এসেই দেখি সে এক দৃশ্য। একটা চ্যালা কাঠ দিয়ে পিটিয়ে ছেলেটাকে আর রাখছে না। হামলে পড়ে জড়িয়ে ধরলাম, ভীষণ রাগারাগি করতে করতে দোতলায় আমার ঘরে নিয়ে এলাম, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, মুখ মুছিয়ে

আদর করে শান্ত করলাম। নিচে তার মা হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো। তখন আবার আমার মা তাকে শান্ত করতে বসলেন।

এরই কয়েক দিন পরে ঘড়িটা হারালো। আমার এক আত্মীয় ভ্রাতা বেড়াতে এসেছিলো, অল্প বয়েস, বরিশাল কলেজের ছাত্র, পিতৃমাতৃহীন। কিন্তু জ্যাঠা-মশায়ের আদরে অসুখী যুবক নয়। সে বললো, 'তোমাদের ঐ মাখনধলাটাকে খুব পিট্টি দাও, দেখবে সুড় সুড় করে বাঁছাধন চোরাই মালটি বার করে দেবে।'

আমি চকিত হয়ে বললাম, 'না না সে কী কথা।' সভয়ে চারদিকে তাকালাম। পাওয়া যাচ্ছে না শুনে থেকেই কামিনী ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। রান্নায় মন নেই, অন্য কাজেও মন মেই। তারও ভয় বুঝি ছেলেটারই কীর্তি। মাখনধলার কিন্তু কোনো ভাবান্তর নেই, আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও বাড়িময় ঘড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার মা বাবাও ভাবছিলেন মাখনধলারই কীর্তি এটা।

আমি সমানে তার হয়ে যুদ্ধ করছিলাম। আমাকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা আর ওকে কোনো শাসন করতে পারছিলেন না। তা ছাড়া কামিনীর কথা ভেবেও কিছুটা নিরস্ত ছিলেন।

আমি নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপেচুপে বললাম, 'দ্যাখ, তুই যদি নিয়ে থাকিস, আমাকে দিয়ে দে। আমি কাউকে বলবো না।'

মাখনের মুখটা অনেকটা নেপালী ধাঁচের। চোখ খুদে খুদে, নাক চ্যাপ্টা, অবশ্য রং ফর্সা নয়, খুব কালো। আমার চোখে বেশ সুন্দর লাগতো সেই মুখ। আর খুব বেঁটে গাঁট্টাও ছিলো। তা-ও আমার ভালো লাগতো। আসলে মাখনধলাকে আমি খুব ভালবাসতাম। আমার কথা শুনে হাসলো সে, বললো, 'ধ্যেৎ, তোমার ঘড়ি আমি কেন নিতে যাবো ?'

আমি বললাম, 'তুই তো খুব দুষ্টু হয়েছিস, লোভী হয়েছিস, বলা কি যায় কার না কার কাছে দু'চার পাঁচ টাকায় বেচে দিয়ে খুব করে আবার কদিন মাংস পরোটা খাবি।'

'না না।'

'বল না নিয়েছিস কিনা।'

'এই তো তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, নিইনি, তবে ?'

ব্যস, যেন আমাকে ছুঁলে আর মিথ্যে কথা বলা যায় না। আর আমারও বিশ্বাস হলো। তারপরে সেখানেই চুকে গেল ব্যাপারটা। হারিয়ে গেছে তো হারিয়ে গেছে, কী আর করা!

তবু আমার মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে থাকলো। ঘড়িটা বড়ো পছন্দের ছিলো। নিজস্ব জিনিস তো! মলিন মুখ দেখে আমার মা বাবা আমাকে আর একটা কিনে দেবেন বলে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। চুপ করে থাকলাম। আমি তাঁদের বোঝাতে পারলাম না অন্য একটা ঘড়ির জন্য আমার কোনোই লোভ নেই, কষ্ট আমার যে ঘড়িটা গেছে ঠিক সেটার জন্যই।

আমার মতো আরো একজনের মনও খুব খারাপ হয়ে থাকলো, সে মাখনধলার মা। ছেলের জন্যে লজ্জায় দুঃখে সে-ই চোর হয়ে থাকলো। তারপর একদিন চোখের জল মুছতে মুছতে দেশে চলে গেল। সবাই বললো, ঐ মাখনাটাই নিয়েছে, তাই ওর মা আর থাকতে সাহস পেলো না। জেনেশুনে তোমরা জিনিসটা হারালে। আমি অবশ্য বরাবরের মতো তখনো প্রতিবাদ করলাম। মাখনধলাকে কেউ চোর ভাবছে এটা আমার প্রাণে সইছিলো না।

নতুন পরিচারিকা এলো পুনার মা। এসেই সে এই চুরির গল্পটা শুনলো। শুনেই বললো, 'ও মা, তাতে কী হয়েছে, মৈশণ্ডীর কেশবঠাকুরের কাছে যাও না, সব গুনে দেবে। চোরের নামধাম সব জানতে পারবে, তারপর পুলিস দিয়ে বার করে নিলেই হবে।'

আমার অবিশ্বাসী পিতামাতা সহাস্যে বললেন, 'তাই নাকি?'

কেশবঠাকুরের গুণাগুণ যে কতো সত্যি সে বিষয়ে পুনার মা অনেক প্রমাণ দাখিল করলো। শুনতে শুনতে আমার মা কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'একবার দেখলে হয়।' বাবা বললেন, 'ধ্যেৎ।'

পুনরায় মা কিন্তু লেগে রইলো। এবার আমিও একটু ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। আমার ইচ্ছে আমার বাবা ফেলতে পারেন না। এক রোববার আমাকে খুশী করতেই তিনি শার্ট গায়ে দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন। ঘণ্টা দুই বাদে ফিরে এসে বললেন, 'আশ্চর্য!'

মা বললেন, 'কী! কী! গণকের কাছে সত্যি গিয়েছিলে নাকি?'

বাবা বললেন, 'চুরি করেছে শম্ভু।'

'শম্ভু!' আমি আর মা একসঙ্গেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

শম্ভু আমার সেই আত্মীয় ভ্রাতা।

বাবা যেতেই কেশবঠাকুর খড়ি পেতে বসেছেন, তারপর বলেছেন, 'নাম বলবো না, কিন্তু আর সব বলে দিচ্ছি মিলিয়ে নিন।'

চেহারার সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন, বয়েস বলেছেন, এবং ঘড়ি যে জলপথে তার সঙ্গে চলে গেছে তাও বলেছেন।

এর পরে মা আর বাবা বসে তিন দিন ধরে মুসাবিদা করে একখানা চিঠি লিখলেন শম্ভুর জ্যাঠামশায়ের কাছে। শুধু এটুকুই জানতে চাইলেন, ভুলবশত এই কোম্পানীর এইরকম একটি সোনার ঘড়ি শম্ভু নিয়ে গেছে কিনা।

শম্ভু বরিশাল শহরে হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করতো। শম্ভুর জ্যাঠামশায় একটু দূরে একটা গাঁয়ে থাকতেন, ছুটি হলেই শম্ভু চলে যেতো সেখানে। বাবা এও লিখলেন, 'যেহেতু শম্ভু এই মুহূর্তে কোথায় আছে জানি না, তাই আপনাকেই লিখলাম। ঘড়িটি আমার মেয়েকে একজন উপহার দিয়েছিলেন, সেইজন্য ঘড়িটির মূল্য আমাদের কাছে একটু বেশী। আমার মেয়ের খুব মন খারাপ। যদি জানতে পারি ওর কাছে আছে, তা হলে নিশ্চিন্ত হই।'

চিঠি লিখে ডাকে পাঠিয়ে খুবই লজ্জাবোধ করতে লাগলেন তাঁরা। বারে-বারেই বলছিলেন, এটা খুব খারাপ হয়ে গেল। উনি কি ভাববেন। যা গেছে তা গেছে। এরকম একজনের কথার উপর নির্ভর করে ওকে সত্যি সত্যি দায়ী করে চিঠি লেখা একেবারেই উচিত হয়নি। কিন্তু উত্তেজনার মুখে হাতের তীর ছুটে গেছে। আর তো তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না।

কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই জবাব এসে গেল শম্ভুর জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে। খুব দুঃখ জানিয়ে লিখলেন, 'ঘড়িটি সে ভুলবশত আনেনি, ইচ্ছাকৃতভাবেই এনেছে। কেননা আমি যখন তার হাতে ঘড়ি দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এ ঘড়ি তুমি কোথায় পেলে, সে বললো, আমার বন্ধু আমাকে উপহার দিয়েছে। তা হলেই বুঝতে পারছেন, তার প্রকৃতি কতোটা দূষিত হয়েছে। যাই হোক, ঘড়ি আমি যেভাবে পারি আদায় করে পাঠিয়ে দেব।'

তা তিনি দিলেন। ঠিক ছ' মাস বাদে ঘড়িটি ফেরত পেয়ে আমার আবার মাখনধলা আর তার মার জন্য নতুন করে কষ্ট হলো। কতো দুঃখ লজ্জা নিয়ে যে কামিনী মাসিমা এ বাড়ির কাজ ছেড়েছিলো তা তো আমি জানি।

কিন্তু ঘড়িটি ফেরত পাবার পরেও আমি হাতে পরিনি। তেমনি সযত্নে ভরে রেখেছি বাক্সে, রোজ চাবি দিয়েছি। সুতরাং ঘড়ি পরা এই প্রথম। তাড়া-তাড়ি মুছে নেবার জন্যে খোলবার চেষ্টা করে দেখি পারছি না। কী যে আধুনিক পদ্ধতি, আমি জানিই না খুলতে! বহু চেষ্টা করে বিফল হয়ে

বুদ্ধদেবের কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য হলাম। যদিও জানতাম যা আমার পক্ষেই কঠিন তা তো তাঁর পক্ষে একান্তই দুরতিক্রম্য।

একবার তাঁকে ট্রপিক্যালে যেতে হয়েছিলো কয়েক দিনের জন্য। কিছু কাপড়-চোপড় নিতে হলো সঙ্গে। একটি স্যুটকেসে সব গুছিয়ে দিয়ে বললাম, 'যখন ঘর থেকে বাইরে যাবে, স্যুটকেসটায় চাবি দিয়ে যেয়ো, নয়তো চুরি হতে পারে।' চুপ করে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে।' আমি বললাম, 'চাবি লাগাতে পারবে তো?' 'কেন পারবো না, নিশ্চয়ই পারবো।' 'তবে লাগাও দেখি একবার।' তৎক্ষণাৎ লাগাতে চেষ্টা করে বিফল হলেন।

তারপর সেই চাবি লাগানোর ব্যাপারে সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অনেক শিক্ষা-দীক্ষা চললো কিন্তু কিছুতেই ঐ কর্মটি তিনি সমাধা করতে পারলেন না। লিখন-পঠনের দক্ষতা যেমন অতুলনীয়, সাংসারিক কৌশলে অপটুত্বও তেমনিই তুলনাহীন। প্রায় গল্পকথার মতোই। কাজেই সেই মানুষ যে এই ঘড়ি খোলায় আমার সহায়ক হতে পারে না, তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু আর কাকে বলি?

অপটু অধীর হাতে এক টানে দশ ক্যারেটের অতি মনোরম গহনাটি প্রায় ছিঁড়ে দিচ্ছিলেন, আমি ত্রাহি ত্রাহি করে হাত সরিয়ে নিলাম। তারপর আবার বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে, আশা—যদি সেই কাশ্মীরী ছেলেটির দেখা পাই, অথবা দেখা পাবার চেষ্টা করতে পারি।

করিডোরে হাঁটাহাঁটি করছিলাম, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম, লিফট এসে থামলো। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক মধ্যবয়স্ক সাহেব। দেখলাম ভদ্রলোকটি শুধু আমাদের ফ্লোরেরই অধিবাসী নন, ঠিক পাশের ঘরের মানুষ। দরজা খুলে ঢুকতে গিয়ে আমার দিকে তাঁর নজর পড়লো। তৎক্ষণাৎ সহাস্য সম্ভাষণ করে এগিয়ে এলেন কাছে, 'কী ব্যাপার? কাউকে খুঁজছো? আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

সামান্য একটা ঘড়ির ব্যাণ্ড খোলার জন্যে এই সম্ভ্রান্ত সুন্দর বয়স্ক বিদেশীটিকে অনুরোধ করতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিলো। মিনমিন করে বললাম, 'না, মানে, এই ঘড়িটা কিছুতেই খুলতে পারছি না—'

'ও, এই?' তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে এক নিমেষে খুলে দিলেন। হেসে বললেন, 'ভারতীয়? আঃ, এই স্মল বোন ভারতীয় মেয়েদের যে আমার কী ভালো লাগে। একটা কথা রাখবে?'

এরকম সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোক এই মধ্যরাত্রে একজন মহিলাকে কী কথা রাখার জন্য অনুরোধ করছে আমি ভেবে পেলাম না। অতি নির্জন এবং অতি লম্বা করিডোরের কার্পেটে পা রেখে অতি মৃদু আলোর তলায় দাঁড়িয়ে আমার অস্বস্তি হলো। তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি এবার যাই।'

ভদ্রলোক কাছাকাছি হয়ে প্রায় বাঘের থাবার মতো একটা হাত আমার কাঁধে রেখে বললেন, 'কাল সকালে সমুদ্রের ধারে আসবে আমার সঙ্গে? একটা ছবি আঁকবো। এইরকম চুল ছেড়ে রাখবে।'

'না, না, কাল আমার সময় হবে না, আমরা কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবো।'

আর দ্বিতীয় কথার অবসর না দিয়ে আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে তবে নিশ্চিন্ত। বুদ্ধদেব ঘুমিয়ে পড়েছেন ততোক্ষণে। আমিও আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকাল আটটার মধ্যে হোটেল ছাড়তে হবে। বুদ্ধদেব নিচে ম্যানেজারের সঙ্গে বিল মেটাতে গেলেন। বললেন, 'যাবে নাকি?'

নিচে অনেক দোকানপাট দেখে এসেছি কাল রাত্রে সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু তখনো শেষ মুহূর্তের কিছু টুকিটাকি ভরে নেবার ছিলো। এখুনি মালপত্র বের করবার লোক এসে যাবে, আমারও চুল বাঁধা বাকি, সুতরাং যেতে গিয়েও গেলাম না। যখন বেরুলাম, একেবারেই বেরুলাম।

আবার সেই সমুদ্রের ধারে সুন্দর এয়ারপোর্ট, সমুদ্রের উতরোল হাওয়া, গর্জন। পাহাড়ের মাথায় মাথায় আলো-ছায়ার খেলা। বুদ্ধদেব বললেন, 'জানো, হোটেলের কাউন্টারে গিয়ে চমৎকার একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। একজন ইটালিয়ান পেইনটার, সামান্য পাগলাটে, কিন্তু প্রতিভাবান। নাম আছে বেশ।'

'তাই নাকি?'

'আধুনিক চিত্রকর, আমি গতবার গোগেনহাইমে এঁর ছবি দেখেছি। তোমার সঙ্গে আলাপ হলে বেশ ভালো হতো। আমাদের পাশের ঘরেই ছিলেন।'

'পাশের ঘরে? ছাপ্পান্ন নম্বর?'

'হ্যাঁ।'

'এ মা, আমার ঘড়িটা তো কাল রাত্রে উনিই খুলে দিলেন। আবার সমুদ্রের

ধারে নিয়ে গিয়ে ছবি আঁকতে চাইলেন। দুষ্টুলোক ভেবে আমি তো ভয়টয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকলাম।'

বুদ্ধদেব অট্টহাস্য করে উঠলেন।

বন্দরের অন্যান্য অপেক্ষমান যাত্রীরা চকিত হয়ে ফিরে তাকালেন। তারপরেই ঘোষিত হলো, বিমান আর দশ মিনিটের মধ্যেই বন্দর ছাড়ছে। 'চলো, চলো, চলো।'

আবার প্লেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুক ছুঁয়ে আকাশে উড়লো।

শুনেছি ওসাকা বিমানবন্দর হংকং থেকে মাত্রই একটা স্টেশন। সুন্দর সকালের সুন্দর রোদে ঝলমলু করছিলো চারদিক, আকাশ একান্তভাবে মেঘশূন্য।

সমুদ্রের ভিতর থেকে বিশাল বিশাল পর্বতের মাথা স্বর্গের প্রহরীর মতো উঁচু উঁচু হয়ে আছে। লতাগুল্মহীন পাথরের রঙ তামাটে লোহার মতো, পুরন্ত সূর্যের তীব্র আলো ঠিকরে পড়েছে সেখানে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো এক্ষুণি ধাক্কা খেয়ে মনুষ্যচালিত বায়ুযান ঈশ্বর নির্মিত প্রস্তরে সমাধিস্থ হবে। মানুষের সমস্ত স্পর্ধা পলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

তা হলো না, লুকোচুরি খেলতে খেলতে ফাঁকে-ফিকিরে কখন বিমান সোঁ ক'রে উঠে গেল উপরে। প্রশান্ত মহাসাগর একটি নিস্তরঙ্গ সাদা চাদর হয়ে বিছিয়ে থাকলো নিচে, পাহাড়ের চূড়োগুলোকে সব অসম বয়সী বাচ্চা ছেলের মতো দেখাতে লাগলো।

মাত্র এক স্টেশন হলেও হংকং থেকে কিয়োটো খুব কাছে নয়, সময় মন্দ লাগে না। কিন্তু খানিক পরেই নামতে লাগলো প্লেন, যাত্রীদের উচ্চকিত ক'রে সহসা পাখা ঝাপটিয়ে উটপাখির মতো এক নির্জন দ্বীপে এসে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ভাষায় ঘোষিত হ'লো, 'সবাই নেমে পড়ুন, সবাই নেমে পড়ুন।'

কী ব্যাপার? চোখে চোখে খেলা করলো প্রশ্ন। কারোই কিছু বোধগম্য হলো না। একজন তার সঙ্গীকে অস্ফুটে বললো, 'এটা তো খুব নিরাপদ জায়গা নয়, এখানে নামবো কেন?'

আর একজন বললো, 'কেউ কি বাধ্য করলো নামতে?'

'এখানে যুদ্ধের জাহাজই শুধু নামে।'

'আটক-ফাটক করছে না তো ?'

মনে হ'লো সকলের মধ্যেই বেশ একটু ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। তবু নামতে হলো। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের ইচ্ছাধীন নই। সকলেই হুকুমের দাস।

নেমে মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলাম সবাই। চারদিকে পাহাড় ঘেরা এক প্রান্তর। চত্বরটি অন্য বিমান চত্বরের মতো সংস্কৃত নয়। প্রয়োজনীয় জায়গাটুকু ছাড়া একটুকো বেশী বাঁধায়নি, সুদৃশ্য তো নয়ই। ভীষণ শীতে-বরফে ঘাস-পাতা নির্মূল হয়ে গেছে, জমে গেছে, যতো দূর চোখ চলে শুধু সীমান্তব্যাপী উন্নত পর্বতমালা আর খসখসে লক্ষ্মীছাড়া চেহারার মাঠ।

প্রচণ্ড রোদে সকলের মাথা পুড়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু ছায়া কোথায় ? বসবার জায়গাই বা কোথায় ? অদূরে একটি আপিস ঘর আছে বটে, বারান্দাও আছে, সেখানে কাজের লোকেরাই ঘোরাঘুরি করছে, ভিড় ক'রে আছে। যদি বা দূরে কোনো গাছতলার আভাস ছিলো কেউ সাহস ক'রে যাচ্ছিলো না অত দূরে। কে জানে যেমন হঠাৎ এনে এক অজানা জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে, তেমনি হঠাৎই যদি ফেলে রেখে উড়ে চলে যায় ?

বেশীর ভাগ যাত্রীই চীনা বা জাপানী, অল্প কয়েকজন আমেরিকান নারী-পুরুষ, ভারতীয় শুধু আমরাই। কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছিলো না, তাই জায়গাটা থমথম করছিলো। একটা পাখি পর্যন্ত উড়ছিলো না আকাশে, কেবল মাঝে মাঝে মৃত্যুর মতো হিমেল হাওয়া শরীরের মাংস মজ্জা ভেদ ক'রে হাড়ে গিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিলো। চত্বরে আমাদের প্লেনটা ছাড়া আর দুটি অদ্ভুত আকৃতির উড়ো-জাহাজ ছিলো বটে, সেগুলো যাত্রীবাহী নয়, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম বহনকারী। কিছু সশস্ত্র সৈনিক ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে টহল দিচ্ছিলো দূরে দূরে।

পরে খবর নিয়ে জানা গেল, এতোক্ষণ চীন সীমান্তে অবতীর্ণ ছিলাম। আমাদের বিমান সেখানে তেল নিতে নেমেছিলো। যাঁরা ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা তারা স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হতে পারে, কেননা জায়গাটা তারা চেনে। আমরা দু'জন ভারতীয়, কিছু না জেনে এক ধরনের সুখেই ছিলাম, কিছু কিছু বুঝে আবার এক ধরনের আতঙ্কেও ছিলাম। সেই অজানা অচেনা দৃশ্য দেখে শীতে বিধ্বস্ত হয়েও রোদ আর আলো নিয়ে তাই আমরা ঐটুকু সময়ের মধ্যেই অন্যদের মতো ততো অধীর হয়ে উঠিনি। আমি খুব সুন্দর সুন্দর অনেক পাথর কুড়িয়ে

ব্যাগে ভরে রাখছিলাম, বুদ্ধদেব আবার প্লেনে ওঠার আগে এই সুযোগে প্রাণপণে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে নিচ্ছিলেন।

প্লেনের তেল খেতে ঠিক কুড়ি মিনিট লাগলো। ডাক পড়তে ধীরে আস্তে সভ্য শান্তভাবে সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে উঠতে লাগলো আবার সবাই। বুঝলাম এরা মনে অস্থির হলেও দেহকে অস্থির হ'তে দেয় না। আমাদের মতো ছটফট করা এদের অভ্যাস নয়। হাহুতাশ করাকে এরা চিরতরে বর্জন করেছে। সবাই সকলকে সম্ভ্রম করে, বিশ্বাস করে, তাই কেউ কারো পা মাড়িয়ে দিয়ে আগে গিয়ে উঠে বসে না।

যার যার জায়গা নিয়ে বসতে না বসতেই গাড়ি দৌড়োলো। গাড়ি উড়লো। তারপর একটানা ঝিম ঝিম শব্দ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে কোথায় মাটি কোথায় পাহাড় কোথায় সমুদ্র! সব একাকার। শুধু মহাশূন্যের কোলে অনন্ত অতলতায় মাত্র কয়েকটি পৃথিবীর শিশু।

ওসাকা বিমানবন্দরে গিয়ে পেঁছিতে পেঁছিতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। কোথাও সন্ধ্যাবেলা পেঁছিতে ভালো লাগে না। মন কেমন করে। সেই মন কেমন করা অবস্থা আরো শোচনীয় হলো যখন প্লেন থেকে নামলাম। বিশাল ধু-ধু বন্দরটি যেন মরে পড়ে আছে একা। কোথাও একটি লোক দেখা যাচ্ছিলো না, আর তার উপরে নামামাত্র শীতের প্রাবল্য এমন কর্কশভাবে আক্রমণ করলো যে দিশাহারা বোধ করলাম। দাঁতে দাঁত আটকে গেল, পায়ে পা আটকে গেল, দুরন্ত বাতাস ছিটকে ফেলে দিতে চাইলো পাথরের মাটিতে। আমাদের চোখ দিয়ে নাক দিয়ে প্লাবনের মতো জল এলো।

যদিও হংকং থেকেই এই শীতের অভিজ্ঞতার শুরু এবং সেখান থেকে এর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য বেশ মোটা আবরণই কিনে নিয়েছিলাম, পরিধানও করেছিলাম, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সেই আবরণ সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মতো। তারা আমাদের একটু উত্তপ্ত রাখতে পারছিলো না। বরঞ্চ তারা নিজেরাই ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়ে আরো শীতলতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো।

বন্দরে আমরা ছাড়া আর অল্পই দু-চারজন যাত্রী নামলো। তারা মোটা কোটে বুটে টুপিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে দৌড়ে পার হ'য়ে গেল আকাশের তলা। আমরাও অনুসরণ করলাম। কাচে ঢাকা ঘরে ঢুকে প্রাণ বাঁচলো। এবার মাল আসবে। দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা নির্দিষ্ট ক'রে দিল কাস্টমস, কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল স্যুটকেস দুটি, অল্প সময়ের মধ্যেই কার্য সমাধা হ'লো।

লোকজনেরা নিঃশব্দ এবং তৎপর। যার যা কাজ তা তারা নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে। সুতরাং কম হয়রান হ'তে হয়। অধীর হবার সুযোগ মিললো না।

এই জাপান থেকেই বুদ্ধদেবের বক্তৃতা শুরু। এখানকার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারা তিনি আমন্ত্রিত। আমি সঙ্গী। তবে কয়েকখানা বই লিখেছি জেনে কিঞ্চিৎ পৃথক সম্মান প্রাপ্য হয়েছে। আর্থিক ভাবেও আত্মিক ভাবেও। না চাইতে জলের মতো একজন শাড়ি পরিহিতা লেখিকাকে পেয়ে তারা সাদরেই গ্রহণ করেছে।

মালপত্রের বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলে আমরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম, পোর্টারের আশায়। স্যুটকেশ দুটি কম ভারি নয়, দুটি ক্ষীণকায় বঙ্গবাসীর দ্বারা সে দুটি উত্তোলিত হবার বস্তু নয়। তা ছাড়া হাতে অন্য মাল আছে না? আমার তো ঘাড়ের কাছে হাতের জোড়াটা প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছিলো। এরই মধ্যে ঘষা কাচের পাল্লা ঠেলে ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, চোখে চোখে চেয়ে হাসলেন। দু'হাত বুকের মাঝখানে যুক্ত করে বললেন, 'আমার নাম কেনিচিরো হায়াসি। আপনারা নিশ্চয়ই—'

আমরাও আমাদের পরিচয় দিয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম। তিনি আমাদের নিয়ে লাউঞ্জে এলেন। মালের জন্য ভাবতে বারণ করলেন। লাউঞ্জটি চোখ জুড়োনো। এখানে ওখানে সেখানে কোথায় কোথায় সব লুক্কায়িত আলোর নীলচে প্রভা জায়গাটাকে একেবারে অলৌকিক করে রেখেছে। অতি সুন্দর ভাবে নিচু নিচু রঙিন আসনে সাজানো গুছোনো। আমরা জানি জাপানীরা সৌন্দর্য-প্রিয় জাত, পরিচ্ছন্নতার প্রতীক। তার এমন হুবহু সংস্করণ দেখে চমৎকৃত হলুম।

লাউঞ্জের সেই সব আসনে আরো ছ'জন বিভিন্ন বয়সের সম্ভ্রান্ত সুবেশ ভদ্রলোক বসেছিলেন। আমাদের দেখেই তাঁরা সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণবভঙ্গিতে আনত হ'য়ে অভিবাদন জানালেন। কেনিচিরো হায়াসি পরিচয় করিয়ে দিলেন একে একে। প্রত্যেকেই অধ্যাপক, আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন।

পরিচয়ের পরে প্রায় আনুষ্ঠানিকভাবে সকলেই একসঙ্গে বুকে হাত রেখে একসঙ্গে নিচু হ'য়ে আবার বিনীত জানালেন। তারপর শেষ হ'লো প্রথম পরিচয়ের সম্ভাষণ। কিন্তু আরো আছে। এবার কেনিচিরো হায়াসি নয়, অন্য

একজন অধ্যাপক গলা খাঁকারি দিয়ে প্রস্তুত হলেন কিছু বলবার জন্য। তিনি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক, নাম য়ুটাকা ওজিহারা। যে ক'দিন আমরা তাঁদের অতিথি সে কয়দিনের কর্মসূচী বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। খুব ঠেকে ঠেকে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলছিলেন তিনি। বলবার সময়ে তাঁকে পুরোহিতের মতো গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। সম্ভবত ইংরিজি বলার পরিশ্রমে। বলা শেষ হ'লে তিনি মিষ্টি ক'রে হাসলেন, পেশী শিথিল করে মাথা নোওয়ালেন, তারপর বসা হ'লো।

চা এলো এবার। পাতলা জলের মতো জাপানী চা। সেই গরম পানীয় শীতার্ত শরীরে মন্দ আরাম দিল না। সকলেই সহাস্যে গল্পগুজবে মেতে উঠলেন। অনেক জিজ্ঞাসা অনেক উত্তর—সিগারেটের সম্মিলিত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বন্ধ ঘরের নিচু সিলিংয়ে গিয়ে জমা হ'লো। তারপর ঘড়ি দেখে উঠলেন সবাই। আসর ভাঙলো। বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, আমাদের তুলে দিলেন গাড়িতে, সঙ্গে শুধু কোনিচিরো হায়াসি এলেন, আর সবাই ছবি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অভ্যর্থনার উষ্ণতায় আমাদের মন স্বভাবতই অভিভূত হ'লো। তাছাড়া এই ধরনের গাঢ় অভ্যর্থনার ধরনও আমাদের ঠিক পরিচিত নয়। নতুনত্বের স্বাদও কম আনন্দ দিল না। মনটা ভালো হ'য়ে গেল, শীতের শত্রুতা সত্ত্বেও দেশটাকে আপন মনে হ'লো।

ওসাকা বিমানবন্দর থেকে কিয়োটো শহরের দূরত্ব কম নয়। সারা শহর পেরিয়ে শীতের কুয়াশা দেখতে দেখতে, কুয়াশার ভিতরে নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে এক সময়ে পেঁছিনো গেল হোটেলে। নাম কিয়োটো হোটেল।

এতোটা পথ আমাদের একঘেয়ে কাটেনি। হায়াসির সঙ্গে অনেক বাক্য বিনিময় হয়েছে এবং বেশ ভাব হ'য়ে গেছে। ভদ্রলোকটি একটু ভারিসারি, অস্ফুট শব্দে ছোট্ট ক'রে হাসেন, পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘন ঘন মুখ মোছেন।

আমার শরীর থেকে শীতের প্রকোপ কিছুতেই কমছিলো না, খেয়াল ক'রে হায়াসি ঈষৎ ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন, তারপর একটি ভারি সুন্দর উপহার দিলেন। ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়া হাত গরম করবার জিনিস। একটি লম্বাটে সিগারেট কেইসের মতো হালকা পাতলা রুপোলী নিকেলের কেইস, ঘন নীল রঙের মখমল দিয়ে মোড়া। ভিতরে পেটরোল দিয়ে তুলোট কাপড় ভেজানো আছে, সেটা ঐ

কেসের ভিতরে ফুটো ফুটো আর একটি কেইস নিরাপদে রক্ষিত। তাতে আগুন দেয়া আছে, পকেটে রাখলে পকেট গরম হ'য়ে যায়, হাত ঢুকিয়ে রাখলেই হ'লো।

নিজের হাত গরম রাখবার জন্য ওজিহায়ার পকেটে সেটি ছিলো, কখন যে সেটা পকেট থেকে বার ক'রে আমার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছেন বুঝতে পারিনি। বললেন, 'দেখুন তো এবার একটু শীত কমে কিনা ?'

পকেটে হাত দিয়ে আমি অবাক। কী যে আরাম লাগলো।

আসলে আমি বুদ্ধদেবকে বলছিলাম যে, 'আমার হাত দু'টো ঠাণ্ডায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।' বুদ্ধদেবকে বললেন, 'যে ক'রে হোক, কালকের মধ্যেই তোমাকে একটা গরম দস্তানা কিনে দিতে হবে।' বলাই বাহুল্য এই কথোপকথন খুব মৃদুস্বরে এবং বাংলা ভাষাতেই হয়েছিলো। ওঁর বোঝবার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেল বুঝেছেন। বোধহয় ভঙ্গী দেখে। আর তারপরেই এই প্রতিবিধান। কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম।

হোটেলে পেঁছে দিয়েই চলে গেলেন না ভদ্রলোক। বসলেন। হোটেলটি কল্পনার ইন্দ্রপুরী। জাঁকজমকের জন্য নয়, বিলাসবহুলতার জন্য নয়, বহুতল বিশিষ্ট বাড়িটির হালকা গড়ন, অভ্যন্তরের সাজসজ্জা, প্রত্যেকটি মানুষের বিনীত ব্যবহার, অতিথিদের প্রতি মনোযোগ। ওবি-পরিহিত পরীর মতো মেয়েদের বারে বারে কাছে এসে মধুর সম্ভাষণ, সবটা মিলিয়ে যেন এক অন্য জগৎ।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হায়াসি যখন যাবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন বেশ রাত হ'য়ে গেছে। গল্পে গল্পে কখন যে এতো সময় কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। আমরা বললাম, 'দেরি যখন হয়েই গেছে কী আর করা। বরং একসঙ্গে খেয়ে নেয়া যাক।'

উঠে মস্ত ডাইনিং হলে এসে ঢুকলাম, সুমসাম, চুপচাপ, একটি ছেলে জানিয়ে দিল, হল আজ রাতের মতো বন্ধ হ'য়ে গেছে। কী বিড়ম্বনা। শেষে হায়াসির চেষ্টাতেই জায়গা মিললো একটা। আমাদের বেইসমেণ্টে নিয়ে এলো একজন। সেখানে রান্নাঘর সংলগ্ন ভারি সুন্দর ঝকঝকে তকতকে একটি খাবার জায়গা। একেবারে প্রমীলার রাজত্ব। টস্‌টসে আঙুর ফলের মতো টলটলে চামড়ার হাস্যমুখী সুন্দরীরাই আদর-যত্ন করলো সেখানে। জাপানীরা নিজের ভাষা ছাড়া অন্য আর কোন ভাষা জানে কিনা জানি না, ইংরিজিতে অন্তত কোনো দখল নেই। জনসাধারণের মধ্যে তো বলার প্রশ্নই নেই, উচ্চশিক্ষিত

লোকেরাও যেটুকু জানে তা কাজ চালাবার মতো। হায়াসিই তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে দিলেন অবস্থাটা। তৎক্ষণাৎ রঙ করা পাৎলা সজল ঠোঁটে হেসে, নিমীলিত চোখে ঢেউ খেলিয়ে আমাদের আদর জানিয়ে বললো, 'পীজ, থিত্ দাউন, থিত্ দাউন।' বুদ্ধদেব একেবারে আত্মহারা, কেবল বলেন, 'আরিগাত, আরিগাত।' 'আরিগাত' মানে ধন্যবাদ। এই একটা কথাই জানা ছিলো। লাগাবার এমন সুযোগ পেয়ে সুখের আর সীমা কী?

ছোটো ছোটো বাটিতে প্রথমেই কি ফল দিল, তারপর কিছু সবজিসহ বাছুরের মাংস, এক বাটি ভাত, কাঁটা চামচের বদলে তিনটি কাঠি, লম্বা লম্বা তপসে মাছের মতো একরকম মাছভাজা, আর কোনো মিষ্টি। বোধহয় নিজেদের ঘরোয়া খাবার। আমরা ছাড়া আর কেউ ছিলো না সেখানে। সেখানেও গল্পে গল্পে মন্দ সময় কাটলো না। বোঝা গেল হায়াসি আমাদের মতোই আড্ডাপ্রিয়। যাবার সময় আমি মনে ক'রে সেই হাত গরমের যন্ত্রটি ফিরিয়ে দিতে উদ্যত হ'য়েছিলাম, উনি ঐ চেরা চোখেই আপত্তির ঝড়বাদল তুলে গটমট বেরিয়ে গেলেন।

চীন দেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা চিরকালের। বাল্যকাল থেকে তাদের আমরা দেখেছি, শুনেছি, চিনেছি। গ্রীষ্মের দুরন্ত দুপুরে বোঁচকা পিঠে চীনে ফেরিওলাদের ডাক অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে। কতো জিনিস আনতো তারা! চীনে সিলক, কিমোনো, বাচচাদের পোশাক, রঙিন কাপড়ের জুতো, গালার ট্রে, ছাইদান, সিঁদুর,—চীনে সিঁদুর তো বিখ্যাত। যদিও সিঁদুর আমাদের সাধব্যের চিহ্ন, কিন্তু জন্মস্থান তার চীন।

বাড়ির পথে হাঁক শুনলেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকতাম। সরু চোখে তাকিয়ে ডাক অনুসরণ ক'রে ভিতরে আসতো। হলদে রং রোদে লাল। ঘাম মুছে বেসাতি খুলে বসে হেসে বলতো, 'লুলেও, লুলেও, ফাৎক্লাৎ, ফাৎক্লাৎ।'

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হ'লে পিঠের বোঁচকা নামিয়ে যেকোনো গৃহস্থের বাড়িতে আঁজলা ভর্তি জল খেয়ে ছায়াঢাকা বারান্দায় বসে বিশ্রাম করতো, আবার ঘুমিয়েও পড়তো।

চীনেপাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। চীনে রেস্তোরাঁও। শত বছর ধরে স্বদেশে বাস না করলেও তারা চলনে-বলনে খাদ্যে বস্ত্রে সর্বতোভাবেই চীনা।

জাপান যুদ্ধের সময় তো কলকাতা শহর ভরে গিয়েছিলো চীনা সৈন্যে। এখন দক্ষিণ শহরে যেখানে উদ্বাস্তু বসতি সেই অঞ্চলে এদের ছাউনি ছিলো।

দু-একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কী ভাবে যেন আলাপ হ'য়ে গিয়েছিলো, সেই আলাপ বন্ধুতায়ও পরিণত হয়েছিলো। আমাদের দু'শো দুই নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে ওঁরা একাধিকবার এসেছেন, আমাদেরও দু-একবার নিয়ে গিয়ে চা-পানে আপ্যায়িত করেছেন।

সেই বহুকাল আগে কিন্তু জাপানী ভদ্রলোক কবি নগুচিকে দেখেছিলাম, তার আগে ঢাকাতে আর একজনকে। একটি গ্লাস্ফ্যাক্টরি করেছিলেন তিনি। সেই একমাত্র গ্লাস্ ফ্যাক্টরি তখন সেখানে। নাম সম্ভবত তাগদা গ্লাস্ ফ্যাক্টরি। নিজের নামের নাম। থাকতে থাকতে ভদ্রলোক প্রায় বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি বঙ্গললনার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। বিয়ের পরে একবার তাঁকে নিয়ে দেশে গিয়েছিলেন। ঢাকায় সে কী আলোড়ন। স্থানীয় কাগজে মোটা মোটা হরফে খবর বেরুলো, 'বঙ্গমহিলার জাপান ভ্রমণ'।

আসল কথা জাপান আমাদের কাছে এক সুদূর দ্বীপ। যে দ্বীপের অধিবাসীরা পৃথিবীর সংশ্রববহির্ভূত হয়ে বহুকাল একাই ছিলো, একা একাই যারা সুখী ও স্বাধীন। আর্থিক পারমার্থিক কোনোভাবেই যারা পরমুখাপেক্ষী নয়। পশ্চিমী দুনিয়া যখন সারা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করে বেড়াচ্ছে, তখনো জাপান একবারের জন্যও মেনে নেয়নি তাদের দাপট। প্রভুত্ব তো দূরের কথা, এক ফোঁটা প্রভাবও সমুদ্র পেরিয়ে তাদের মাটিতে গিয়ে বীজ ফেলতে পারেনি। তা বলে অগ্রগতিতে তারা পিছিয়ে ছিলো না। প্রযুক্তিবিদ্যায় ঈর্ষাযোগ্য, শিল্পে সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত, শুনেছি পৃথিবীর প্রথম উপন্যাস জাপানের মাটিতেই জন্ম নেয়। শ্রীমতী মুরাসাকির 'গেঞ্জি কাহিনী'।

জগৎময় জাপানের বাণিজ্য সম্ভার। প্রতিযোগিতায় কেউ তাদের হারাতে পারে না। জিনিসপত্র যেমন সস্তা তেমন সুন্দর, তেমনি পোক্ত। পাখা হাতে জাপানী মেয়ের ছবি আঁকা রসুনের খোসার মতো পাতলা সাদা কাপগুলোর কথা ভাবলে এখন স্বপ্ন মনে হয়। গভীর গভীর রঙে ছোপানো কাঁপা কাঁপা স্বচ্ছ হাওয়ার মতো অসম্ভব সুন্দর একরকমের কাপড় কিনে ব্লাউস করতাম আমরা, নাম ছিলো জাপানী খদ্দর। লোকেরা শস্তার জন্য বিলিতি জিনিস না কিনে জাপানী জিনিসই কিনতো। আর ঘরে ঘরে যখন বিলিতি বর্জন শুরু হলো তখন তো জাপানী জিনিসই প্রধান। শুধু তো সেই জাপানী খদ্দরই নয়, গৃহস্থালির সমস্ত জিনিসও রপ্তানি করতো তারা।

যে দু'জন জাপানীকে আমি দেখেছিলাম, তাঁদের মধ্যে একজন কবি নগুচি, অন্যজন কাচের কারখানার মালিক তাগদা। দু'জনেই দেখতে খুব ভালো ছিলেন না। মোটা বেঁটে এবং তামাটে রঙ। কিন্তু জাপানে গিয়ে জাপানীদের দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। যে সাতজন অধ্যাপক আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন, প্রত্যেকেই অত্যন্ত সুশ্রী স্বাস্থ্যবান, ঋজু এবং গাত্রবর্ণ বেতফলের মতো সতেজ ও সোনালী। উচ্চতা দশাসই বাঙালীর মতো।

বুদ্ধদেবের পক্ষে যা সবচেয়ে কষ্টের অবস্থা তা হ'লো বন্ধুহীন সন্ধ্যা। আমি বিবাহের পরে এমন কোনো সন্ধ্যাই দেখিনি যেদিন বন্ধুরা আসেননি। এই সুদূর জাপানে এসেও এভাবে সন্ধ্যাযাপন তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সুখের হ'লো।

কথা ছিলো পরের দিন সকাল ন'টায় সেই সংস্কৃতের অধ্যাপক য়ুটাকা ওজিহারা আসবেন আমাদের নিতে। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার কথা বুদ্ধদেবের। তিনি কাঁটায় কাঁটায় ন'টাতেই এলেন।

সকাল ন'টা এমন কিছু সকাল নয়, কিন্তু বেশী রাত্রে শোবার দরুন, অবিরাম পথশ্রমে ক্লান্তির দরুন একটু বেলা হ'য়ে গিয়েছিলো ঘুম ভাঙতে। আমরা তখনো প্রস্তুত হ'য়ে উঠতে পারিনি। ব্রেকফাস্ট হয়নি। এমনি সময় ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠলো। ফোন ধরেই বুদ্ধদেবের মাথায় বজ্রাঘাত 'এই রে, উনি এসে গেছেন। এখন ?'

'এখন আর কী! চটপট চলো। নিচে যাই, চা খেয়ে নাও—' কিন্তু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থায় তিনি পারঙ্গম নন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটা কোথায় রুমালটা কোথায়, চশমা কোথায়, শুরু হ'য়ে গেল 'কোথায়, কোথায়'।

চোখে চশমা আছে, চশমা খুঁজে পান না, পকেটে ব্যাগ আছে, ব্যাগ খুঁজে পান না, হাতে রুমাল আছে, তবু বললেন, রুমাল দাও। এই করতে করতে আরো মাথা গরম। যতো বলি 'সব ঠিক আছে, চলো নিচে যাই' ততো রেগে যান।

নিচে এসে আরো দিশেহারা। ঐটুকু সময়ের হেরফেরেই ওজিহারা চঞ্চল হয়ে পড়েছেন, ঘড়ি দেখছেন ঘন ঘন, দেখেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি চলুন, তাহলে এই ট্রেনটাই ধরতে পারবো।'

'কিন্তু আমাদের যে এখনো চা খাওয়া হয়নি।' বুদ্ধদেবের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে।

মানুষটি একান্তভাবেই অভ্যাসের দাস। প্রাত্যহিক জীবনে পৃথিবী উল্টে গেলেও তিনি তাঁর নিয়ম থেকে কখনো এক চুল সরতে পারেন না। এদিকে খুব ক্ষিপ্র মানুষও নন যে তাড়াতাড়ি ক'রে নেবেন। নিজের এই স্বভাব নিজেও খুব ভালো ক'রে জানেন। জানেন বলেই কখনো কোথাও কোনো নিয়োগ থাকলে অনেক আগে থেকে শুরু করেন। কোনো কোনো সময় এতো আগে থেকে করেন যে সারা বাড়ি অস্থির। যেমন ঃ বিকেল পাঁচটায় যদি তাঁর কোথাও যাবার থাকে, সকাল থেকেই সকলকে সাবধান করতে থাকবেন। পরিচারিকাকে ডেকে বলবেন, 'গঙ্গামণি শোনো, আজ তোমার দুপুরে ঘুমুলে চলবে না, আমি বিকেলে বেরুবো, আমাকে চা ক'রে দিতে হবে।' ছেলেমেয়েদের বলবেন, 'গুলতানি নয়, তাড়াতাড়ি চানটান ক'রে খেয়ে মাকে অবসর ক'রে দাও, বেরুনো আছে।' আর আমাকে তো অস্থির করে তুলবেনই, 'ওকি, এখনো তৈরি হওনি? ওঠো ওঠো, শীগ্গির করো, শেষে তো গাড়ি এসে গেলে বলবে এটা হয়নি ওটা হয়নি—'

আজ যখন ন'টায় বেরুবার কথা স্বাভাবিক নিয়মে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি পর্ব শুরু হ'য়ে যেতে পারতো। না হবার কারণ ঐ ক্লান্তি। যখন তাঁকে ডেকে দিলাম, ঘড়ি দেখে তখুনি আমি প্রমাদ গুনেছিলাম।

কিন্তু এখন যদি নিয়ম অনুসারে চা না খেয়ে বেরুতে হয় তা হ'লে তো সব পণ্ড। বক্তৃতা কি আর বেরুবে মুখ দিয়ে? মেজাজ এমন বিগড়ে থাকবে যে বলবার নয়।

ওজিহারা বললেন, 'চা খাননি? কিন্তু—'

আমিই ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'ক'মিনিট আর লাগবে—চাটা খেয়েই বেরোই।'

'ঠিক আছে চলুন। পঁচিশ মিনিট বাদে আর একটা ট্রেন, সেটাই ধরা যাবে।'

তারপর তাঁর নির্দেশেই সরকারি খাবার টেবিলে না বসে দোতালায় এলাম। দেখলাম সেখানেও চমৎকার একটি ছোটো ব্যবস্থা। দেয়াল ভরা ছবি, মেঝেতে লাল গালিচা পাতা, বন্ধ জানালার প্রশস্ত তাকে ফুল গাছ, গাছে ফুল। বেশ বড়ো বড়ো বেগুনি রংয়ের ফুল ফুটেছে। কোণে মস্ত পিতলের টবে অন্য এক ধরনের ঝোঁপ গাছ, তার অর্ধেক পাতা সবুজ অর্ধেক পাতা লাল। ছোট ছোট টেবিলে আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা, বোধহয় দ্রুতগামী অতিথীদের দ্রুত দেয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে। আবার যারা ধীরে আস্তে উঠবে তাদের জন্য

ধীরে। ওজিহারা তার নিজস্ব ভাষায় পরিচারকটিকে ট্রেনের সময় ব'লে দিলেন, তৎক্ষণাৎ সে তীর বেগে ভিতরে গিয়ে নিয়ে এল চায়ের সরঞ্জাম। সঙ্গে বিলিতি পদ্ধতিতে ডিম রুটি মাখন চীজ। ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে সুচারুরূপে সাঙ্গ হ'লো ব্রেকফাস্ট, তারপর দশ মিনিটে মাটির তলার স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন।

ষোলো বছর আগের অভিজ্ঞতা, মাটির তলার ট্রেনের কথা স্বপ্নের মতো শোনা। সেই পাতালপুরীর ইস্টিশন দেখে আমার মতো অবাক হওয়া স্বভাবের মানুষ যে অবাক হবে তাতে আর সন্দেহ কী? উজ্জ্বল আলোকিত পরিচ্ছন্ন স্টেশন, যাত্রীরা সব অপেক্ষা ক'রে আছে, ট্রেন থামলে ধীরে আস্তে উঠলো। ট্রেনটি থামলেই দরজা খুলে যায়, ওঠা শেষ হলেই বন্ধ হ'য়ে যায়। অবশ্য তার নির্দিষ্ট সময় আছে। আমরাও উঠলাম। ওজিহারা চোখে হেসে বললেন, 'কী আর একবার চা হবে নাকি?'

ও'র ধারণা হয়েছে আমি বেশ চা-খোর তাই চা না খেয়ে বেরুতে চাইনি; কিন্তু তৃষ্ণাটা যে আমার ছিলো না সেটা বোঝানো গেলো না।

আমি চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও চা-ওলা দেখতে না পেয়ে বললাম, 'কোথায় চা?'

'এই যে। এই—', একটি আপাদমস্তক গরম কাপড়ে মোড়া, নাক ঢাকা লোককে ডাকলেন তিনি। শীতের প্রকোপে লোকেদের যাদের আকাশের তলায় কাজ থাকে তারা ওরকম নাক ঢেকে রাখে নইলে ফেটে রক্ত বেরোয়। স্টেশনে আসতে আসতে পথেও এই রকম অনেক নাক ঢাকা লোক দেখে এসেছি। যেমন হাত মোজা, পা মোজা, তেমন নাক মোজা।

লোকটির হাতে একটি ঝুলোনো সুদৃশ্য রঙ করা বেতের বাসকেট। বোতাম টিপতে ডালাটা উঠে গেল, ভিতর থেকে ছোটো একটি কোরিয়ার বৈয়ম বেরুলো। একটা পেটমোটা গ্লাশের সমান তার সাইজ, হলদেটে রঙ, মুখের ঢাকনাটি কুচকুচে কালো। ঢাকনাটা এমন সুন্দর মুখে মুখে আটকানো যে একটু বাতাস ঢোকে না। ঢাকনা খুললে একটি সুন্দর সাদা ফুটফুটে কড়াহীন কাপ বেরোয়, সেটাতেই চা ঢেলে খেতে হয়। খাওয়া হ'য়ে গেলে লোকেরা কোণে গিয়ে গার্বেজে ফেলে দেয়।

ওজিহারা তিনটি বৈয়ম কিনে ট্রেনে উঠলেন, লোকটি পয়সা নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। হেসে বললেন, 'এদের চা ভালো, আমি তখন চা খাওয়া হয়নি শুনে

ভাবছিলাম এই স্টেশনেই আপনাদের প্রাতঃরাশ করাবো, খুব ভালো ভালো খাবারও রাখে এরা।'

ট্রেনটি ঝকঝকে, ভিতরে বেশ প্রশস্ত আসন। মাঝখান দিয়ে পথ, দু'পাশে চেয়ার। আমাদের এখানকার জনতা ট্রেনের মতো। কিন্তু তখন এই ধরনের ট্রেন আমার দেখা ছিলো না, খুব ভালো লাগলো। খুব আরাম হ'লো বসতে। এই ট্রেন ওদের অবিরত চলে, দূরে দূরে কোথায় কোথায় থাকে লোকেরা, ট্রেনে শহরে আসতে পাঁচ মিনিট। ট্রেনের গতি অত্যন্ত দ্রুত, চলাফেরা কাঁটায় কাঁটায়। সময়ানুবর্তিতায় যন্ত্র এবং মানুষ সমান সমান।

দূরত্ব কম ছিলো না। অনেকগুলো স্টেশন পার হতে হলো। তারপর আবার আকাশের তলা। সেখানে এসে ওজিহারা ট্যাকসি নিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছানো গেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

সুন্দর বাগান। বলা উচিত বাগানের কাঠামো। কেননা শীতের প্রকোপে সকল বৃক্ষই পত্রপুষ্পহীন। তবু তারই মধ্যে যত্নের অভাব নেই, কিছু শীত সহ্য করা গাছে ফুলও ফুটেছে, ছাঁটাকাটা লালচে ঘাস মাঝখান দিয়ে, নুড়ি বিছোনো রাস্তায় খানিকটা এসে তারপর নিচু বারান্দা। বারান্দার কাছে গাড়ি থামতেই অপেক্ষমান অধ্যাপকেরা ছাত্ররা নড়ে চড়ে উঠে এগিয়ে এলেন। অধ্যাপকেরা ছাত্রদের থেকে আলাদা হয়ে কালকের মতোই সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। সংখ্যায় অন্তত জনা পনেরো। তার মধ্যে অধ্যক্ষ উপাচার্য ডীন সকলেই উপস্থিত। অর্ধেক নিচু হয়ে আবার সেই সম্ভাষণ।

আমাদের ডীনের ঘরে নিয়ে বসানো হলো। সুন্দর সাজানো ঘর। নিচু নিচু সব আসবাবপত্র। প্রত্যেক দুটি আসনের মাঝে মাঝে দাঁড়ানো ছাইদান, লাল রং। ঢোকা মাত্রই একটি জাপানী মেয়ে চা নিয়ে এলো ট্রে সাজিয়ে, সামান্য খাদ্যসহ। সবাই এতো আদর যত্ন করতে লাগলেন যে বলা যায় না। মনে হলো পারলে পা ধুইয়ে দেয়, হাঁটবার জন্য বুক পেতে দেয়। অতিথি নারায়ণ কথাটা এদের উপরই প্রযোজ্য।

চায়ের পরে হলঘরে গিয়ে বক্তৃতা। এটা ওসাকার বৈদেশিক ভাষা বিদ্যালয়। পথে আসতে আরো দু'জন যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিলো, তাঁরাও এই বিদ্যালয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত, আমাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন। একজন যুবকের নাম নরিহিকো উচিদা। অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়ে পড়ে নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখেছেন। কোবেতে নাকি একজন বাঙালী আছেন, খুব ভালো

জাপানী জানেন, তাঁর কাছেও সাহায্য নিয়েছেন মাঝে মাঝে। পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করছিলেন, 'আপনাদের দেশে কি এখন প্রেম-বিবাহ হয় ?'

প্রশ্ন শুনে অবাক। বাংলা শুনে তো বটেই। যুবকটি এসে আমার পাশে বসলেন। একবার বাংলাদেশে আসবার তাঁর একান্ত বাসনা। হলঘরে কেন্দ্রীয় তাপ ছিলো না। কোণে কোণে লোহার চুল্লীতে আগুন জ্বলছিলো, বারে বারে খুঁচিয়ে দিয়ে আসছিলেন গিয়ে। মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে বললেন, 'বাংলা আমাকে শিখতেই হবে। আমি এর পরের সালেই যাবো তোমাদের দেশে।' আর সত্যি এসেওছিলেন।

বক্তৃতার শেষে অধ্যক্ষের ঘরে বসেই লাঞ্চ হলো। সেখানেও জমে উঠলো আসর। আরো খানিকক্ষণ থাকতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু উপায় ছিলো না। কুড়ি মাইল দূরে কোবে নামক আর একটি জায়গায় যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিলো, সেখানে ইণ্ডিয়া ক্লাব নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে বক্তৃতা।

কোবেতে যাবার কুড়ি মাইল রাস্তা পেরুতে পেরুতে ঐ শহরের গোটা চেহারার সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ঘটলো। পাহাড়ের ধাপে ধাপে সব বাড়িঘর, নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাঠের বাড়িই বেশী, কংক্রীটের বাড়িও আছে। সর্বত্রই বাগান, সর্বত্রই এই শীতেও ফুলের বাহার। পথের দু'পাশে চেরি ফুলের গাছ। রাস্তা আয়নার মতো পরিষ্কার। কোথাও কোনো ডাস্টবিন চোখে পড়লো না। কুকুর বেড়ালও না।

যিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি বললেন, 'এখানকার কর্পোরেশনের ব্যবস্থা ততো ভালো নয়।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। বুদ্ধদেব বললেন, 'শহর দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।' ভদ্রলোক বললেন, 'শহরের অধিবাসীরা নিজেরাই পরিষ্কার রাখে। প্রত্যেকেই নিজের বাড়ির সামনের রাস্তা নিজেরা পরিষ্কার করে, এমন কি যে পাড়ায় আলো কম, সেখানেও সবাই মিলে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করে। দোকান পাড়াগুলোও সবই তাই। কেউ একফোঁটা ময়লা ফেলে না, নিয়মিত ফুটপাত ঝাঁট দেয়, কর্পোরেশনের লোক এসে একবার ধুয়ে দেয় শুধু।'

'কী চমৎকার।'

ভদ্রলোক সহজেই বললেন, 'তা ভেবে দেখতে গেলে সেটাই তো স্বাভাবিক। তৃতীয় সাহায্য একটা থাকুক কিন্তু দায়িত্ব তো আমাদেরও কম নয় ? আমরাই তো বাস করি ?'

এরই নাম স্বাধীন জাতির দেশাত্মবোধ। যতোক্ষণ 'চলবে না চলবে না' বলে মিছিলে ঘুরবে ততোক্ষণ যার যার নিজের কাজটা ঠিক ভাবে করে ফেলাই এরা সমীচীন বলে মনে করে। তাতে সময়ও নষ্ট হয় না, কাজও উদ্ধার হয়।

বক্তৃতার পরে রাত্তিরের খাওয়াটা কোবেতেই সাঙ্গ হলো। আসলে ওখানে জাপান ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামের প্রতিষ্ঠানই এই সভার বন্দোবস্ত করেছিলো। বক্তৃতার আসরে জনাকয়েক ভারতীয়ও ছিলো। সবাই সিন্ধি, গুজরাটি, ব্যবসা সূত্রে সে দেশের প্রায় স্থায়ী অধিবাসী। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে শুনতে এসেছিলেন তাঁরা।

ইংরিজীতে বক্তৃতা সেখানে অনেকেরই বোধগম্য হবে না জেনে নাকমুরা নামে এক ভদ্রলোক দোভাষীর কাজ করলেন। কয়েক মিনিট ইংরিজীতে বলা হওয়া মাত্রই সে কটি লাইন আবার তিনি জাপানী ভাষায় তর্জমা করে বলে দিতে লাগলেন। দেখলাম ভদ্রলোকের উচ্চারণ বেশ দুরস্ত, একটুও ঠেকছিলেন না। শুনলাম আমেরিকাতে ছিলেন ছেলেবেলা থেকে। এদের বলে নিসী জাপানী।

বিশুদ্ধ জাপানী প্রথায়ই খাওয়া হলো তারপর। অর্থাৎ সুকিয়াকি। যে বাড়িটিতে নিয়ে গেলেন আমাদের সেটি একটি ছোট্ট নিচু লাল টালির বাংলো। বাঁশের দেয়াল। সামনের একফোঁটা জায়গায় অপূর্ব সুন্দর এক বাগান। কী করে যে ঐটুকু জায়গায় ওরকম বাগান করে ভেবে পাই না। বাগানটা আসলে সমতল রাখে না, কাঁকর পাথর মাটি দিয়ে উঁচু নিচু করে নেয়, উঁচু নিচুতেই ফুল ফোটায়, জলাশয় করে, সেতু বানায়।

বাড়িটির চৌহদ্দি ঘিরেছে রং মিলিয়ে বাঁশের বেড়া দিয়ে। আস্ত আস্ত বাঁশগুলো আড়াআড়ি করে সাজিয়ে সেই জোড়াগুলোর মুখে রঙিন দড়ির একটা একটা ছোট ফাঁস দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, তাতে সেগুলোকেও নানা রংয়ের ফুল বলে ভ্রম হচ্ছে। ফটকটিও বাঁশের।

ফটক ঠেলে নিচু বাংলোর নিচু বারান্দার কাছে পৌঁছুতেই দেখলাম সারি সারি ঘাসের চটি সাজানো। বাইরের জুতো পরে এরা ভিতরে ঢোকে না। দু'টি জাপানী পরিচারিকা এগিয়ে এসে হাঁটু ভেঙে বসলো জুতো ছাড়িয়ে জুতো পরিয়ে দিতে।

ভিতরে ঢুকে মোহিত হয়ে গেলাম। জাপানে সবই প্রায় টানা দরজা এবং

সেই দরজা কখনো খোলা দেখিনি, সুতরাং পর্দার পাটও নেই। কাছে যেতেই খুলে দেয়, ঢোকামাত্রই বন্ধ। যে ঘরটায় প্রথম ঢুকলাম, সেটা বসবার ঘর। মেঝেটা ছবি আঁকা সরু মাদুরে আচ্ছাদিত। একেবারে দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত। আমরা পাশ্চাত্ত্য প্রথায় ঘর সাজাই, এই প্রাচ্য প্রথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কি আর কারো চোখে পড়েনি? আসবাবগুলো যে কী সুন্দর! সবই বাদামী রং লকারের উপর সোনালী লতাপাতা আঁকা হালকা হালকা জিনিস। ফাঁকে ফাঁকে গাছ। গাছগুলোকে এরা দরকার মতো বেঁটে করে, লম্বা করে, রোগা করে, মোটা করে। তারপর প্রয়োজন অনুপাতে স্থাপন করে। প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা বড়ো নিবিড়।

দেয়ালজোড়া ছবি, সিলিংয়েও ছবি আঁকা। বসা মাত্রই বেতের ট্রে ভর্তি নিংড়ানো ছোটো ছোটো রুমাল সাইজের ধোঁয়া ওঠা তোয়ালে নিয়ে ঘরে পরিচারিকা ঢুকলো। প্রত্যেকেই একটা একটা করে নিয়ে ভাঁপা গরম তোয়ালেতে হাত মুখ মুছে আরাম পেলেন। টুকটাক সামান্য গল্প, এককাপ জাপানী চা, তারপরেই খাবার ডাক।

বসবার ঘরের সঙ্গে খাবার ঘরের কোনো দরজা নেই, ছোটো ঘর থেকে মোড় ঘুরে আর একটা বড় ঘরে এসে পৌঁছনো গেল। এ ঘরটিও মাদুরে মোড়া। ঘরময় এখানে ওখানে জলচৌকির মতো নিচু এক একটি চৌকো টেবিল, টেবিলের চার-দিকে চারটি করে গদির আসন। গুণে দেখলাম চারটি টেবিলে কুড়িজনের মতো আসন পেতে রেখেছে। আমরা সেখানে কুড়িজনই ছিলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি সেটাই খাবার ঘর, যেহেতু আমাদের জন্যই এই পার্টি, আমাদেরই প্রথমে বসতে অনুরোধ করলেন। তারপরে সকলেই আসন গ্রহণ করলেন। আমি ছাড়া আর একটি মাত্র মেয়ে ছিলো সেখানে, সে আমার সঙ্গে বসলো। বসে দেখতে পেলাম প্রত্যেক টেবিলের মাঝখানেই একটি লাল টুকটুকে গোল পাত্র, নিচের দিকে খাপে খাপে বসানো। তার মধ্যে গনগনে আগুন। প্রত্যেক টেবিলের পাশে একটি করে ট্রে-ভর্তি নানারকম কাঁচা সবজি আর সরু সরু করে কাটা কাঁচা মাংস সাজিয়ে রাখা আছে। পরিচারিকারা এসে প্রত্যেক টেবিলে প্রত্যেকের সামনে ছোটো একটি বাটিতে ছোটো ছোটো দুটি ফল আর দুটি পাতা দিয়ে গেল, আর একটি বাটিতে সয়াবিন দিয়ে গেল। এই টুকুটুকু করে আঙুলের মতো কোমর-সরু ছবি-আঁকা গ্লাসে ঈষদুষ্ণ সাকি দিয়ে গেল। এক বিঘৎ উঁচু পেটমোটা গলা সরু সাকি ভর্তি বোতলও রাখলো। জল নেই, জলের বদলে ঐ সাকি।

আমাদের সঙ্গীরা, সবাই অধ্যাপক। ওসাকা কিয়োটো দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টাররাই জুটেছেন সেখানে। প্রত্যেক টেবিলে দলের একটি করে অধ্যাপক রাঁধুনি হয়ে টেবিলের মাঝখানকার উনুনে পাত্র চাপিয়ে দিলেন, কাঠি দিয়ে তুলে চর্বি দিলেন, চর্বি গলে তরল হতে হতেই সেই সরু সরু কাগজের মতো পাতলা ক'রে কাটা খানিকটা মাংস দিয়ে দিলেন। হাতা খুন্তি কিন্তু কিচ্ছু নেই, ঐ এক কাঠি। একটু নেড়ে চেড়ে চর্বিটার সঙ্গে মাংসটা মিলিয়েই সবজি দিতে লাগলেন। মুলোকুচি, বীন, মটরশুঁটি, কপিপাতা আরো সব কী কী—তিন মিনিটেই হয়ে গেল রান্না।

একটি ক'রে গালার পাতলা বড়ো বাটি আছে সকলের সামনে, রাঁধুনি রাঁধতে লাগলেন আর কাঠি দিয়ে তুলে নিতে লাগলেন, আর সেই কাঠি দিয়েই খেতে লাগলেন।

গন্ধ বেরুচ্ছিলো সুন্দর। কিন্তু আমি ভাবলাম কাঁচা। সকলেই খাওয়া শুরু করেছে, আমাকেও শুরু করতে হলো। মুখে দিয়েই অবাক। কী স্বাদ!

কাঠি দিয়ে পারছিলাম না, একজন দাসী এসে কার ইঙ্গিতে একটা কাঁটা দিয়ে গেল। আমি অদ্যাবধি ভেবে পাই না কী করে ঐ সময়ের মধ্যে এরকম রান্না সম্ভব হলো। ঐ একই রান্না হতে লাগলো আর দিতে লাগলেন। সবাই বেশ পরিতৃপ্ত। আমিও।

খাওয়া শেষ হ'লে আবার দাসীরা এসে পাত্র বদল করলো। তারা যেন আসে না, উদয় হয়। যেন যায় না অদৃশ্য হয়। কাঠের দেয়াল যে কখন সরে যায় আর তারা নিঃশব্দে ঢোকে বুঝতেও পারি না। কখন কী দরকার কেমন করে যে জানে তাও বুঝি না। আমার জল দরকার ছিলো, সাকি আমার তৃষ্ণার সহায় হচ্ছিল না, মিষ্টি হেসে জল দিয়ে গেল।

যে মেয়েটি আমার সঙ্গে বসেছিলো, শোনা গেল এক ধনী কিমোনো ব্যবসায়ীর কন্যা। নাম মাৎসুমোতো। তার সঙ্গে আমার ভাষার ব্যবধান দুস্তর। সে ইংরিজীতে কথা বলতে পারে না, আমি জাপানী জানি না। কী ক'রে বন্ধুতা হয়? তবু হলো। পকেট থেকে ভাষা শিক্ষার বই বেরুলো তার। জাপানী থেকে ইংরিজীতে অনুবাদ করা ছোটো কথোপকথন।

কিছু কিছু ইংরিজী সে জানতো, বইয়ের সাহায্যে কাজ চালাবার মতো বলতে পারলো। তাই যথেষ্ট, তার দৌলতেই আমাদের বন্ধুতা গাঢ় হ'য়ে উঠলো। এতো ভালো লাগলো মেয়েটিকে যে বলতে পারি না। বয়েস হয়েছে

কিন্তু অবিবাহিত। দেখতে ভারি সুন্দর। গানের গলাও খুব মিষ্টি। ঐ আসরে গানও করলো সে। একা সে-ই করলো না, কোনো কোনো গানে সকলেই গলা মিলোচ্ছিলো, সেই সমবেত গানে গম গম করছিলো বন্ধ ঘর। একটা অনাবিল ফূর্তির ঢেউ বয়ে যাচ্ছিলো সকলের মনে। তারই মধ্যে দাসীরা ছোট ছোট বাটিতে দু'তিন রকমের মিষ্টি পরিবেশন করে গেল।

সভা ভাঙতে ভাঙতে অনেক রাত। তখনো মনে হলো কারোই তেমন ফেরার গরজ নেই।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো হায়াসির ফোনের শব্দে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিচে এসে দেখি সস্ত্রীক এঁসেছেন। খুব ভালো লাগলো। একটু পরে সেই মেয়েটিও এলো, যার নাম মাৎসুমোতো। একসঙ্গে চা খেয়ে একসঙ্গে জেন মঠ দেখতে বেরুলাম ওদের সঙ্গে। মঠের দরজায় এসে জুতো খুলতে হলো। এখানেও দেখলাম চামড়ার জুতো পরে প্রবেশ নিষেধ। একজন ভিক্ষু এসে আমাদের পথ প্রদর্শক হলেন। মাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেই মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। মোটা মোটা তেলতেলে পাথরের দেয়াল, পাথরের বেদী, দেয়ালে দণ্ড ঝোলানো, অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক একটা কুঠুরি। দণ্ডগুলো দণ্ডেরই জন্য। ধর্মের এই শিক্ষায়তনে এর দ্বারা গুরু-শিষ্য পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করেন। জেনতন্ত্রের এটি একটি অঙ্গ। এই শীতল মঠের শীতলতম একটি প্রকোষ্ঠে একজন গুরু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। বসলেন, বসালেন, অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেন, আর তা থেকে এই প্রতীতি জন্মালো যে, আচার বিচার মন্ত্র শাস্ত্র অনুশাসন ইত্যাদি যে সবের সমন্বয়ে আমাদের ধর্ম গড়ে ওঠে এঁরা তার কোনোটাই গ্রহণ করেন না। কোনো অর্থেই এঁরা গুরুভজা নন। এঁদের আশ্রয় এঁদের স্বজ্ঞা, এঁদের পদ্ধতি এঁদের ধ্যান এবং সেই ধ্যান গীতার ধ্যান নয়, জগৎ সংসারের যে কোনো বস্তুই তার আধার হতে পারে। কিছুই অবহেলার যোগ্য নয়। একনিষ্ঠ আবেগে মনঃসংযোগ ক'রে বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যাওয়াটাই আসল মোক্ষ। সেটাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। আচার্যের কাজ হলো শিষ্যকে অনবরত চমকিত রাখা, তার জন্যে প্রহারই হোক ধমকই হোক অতর্কিত আক্রমণই হোক যা কিছুই হোক না কেন সবই বিধেয়। এই আঘাত থেকেই তারা ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির মোহজাল ছিঁড়ে আসল স্বজ্ঞায় গিয়ে পেঁছুবে। এই শূন্যবাদে জ্ঞানের স্থান নেই, প্রেমের স্থান নেই, হৃদয় মন

বিশ্বাস সবই পরিত্যজ্য। অরূপ সাধনার এই শ্বাসরোধকারী চর্চা থেকে কী করে জাপানীরা এমন সৌন্দর্যপ্রিয় জাতে পরিণত হলো কে জানে। হয়তো এটাই ঐ শুষ্কতার প্রতিক্রিয়া।

শেষ হলো মঠ দেখা। এবার রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হলুম। টানা লম্বা বারান্দা সামনে রেখে কয়েকটি ঘর। খাবার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক ছিলো। একজন প্রায়-বৃদ্ধ ভিক্ষু যত্ন ক'রে বসতে দিলেন। মেয়েরা খাবার নিয়ে এলো। নিরিমিষ খাদ্য।

রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে সেই খাদ্য আমাদের কাছে অমৃততুল্য মনে হলো এবং সেইখানে বসেই বিকেলের প্রোগ্রাম ঠিক হলো মাৎসুমোতোর সঙ্গে। সে আমাকে দোকানে বাজার করতে নিয়ে যাবে।

একটু বেশী রাত্তিরে হোটেল থেকেই একটি ভ্রমণবাস ছাড়ে যাত্রীদের সব দর্শনীয় স্থান দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য। সেই ভ্রমণে আমরাও যাত্রী হলুম। প্রথমেই ওরা আমাদের একটা সরু গলির মধ্যে একটা কাঠের বাড়িতে নিয়ে এলো। গলি ছাড়িয়ে একটুখানি উঠোন, উঠোন পেরিয়ে বারান্দা দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে দেখলাম আরো অনেক লোক বসে আছে মেঝেতে। সবাই হাঁটু মুড়ে বসেছে। আমরাও বসলাম। তারপরেই একটি মেয়ে পূজোর সরঞ্জাম নিয়ে আসার মতো পবিত্রভাবে একটি গালার ট্রে ভর্তি চায়ের বাসন এনে রেখে গেল। সে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে অতি ধীরে ধীরে যে মেয়েটি এসে দাঁড়ালো তাকে দেখে আমি হাঁ হয়ে গেলাম। তাকে আমার মর্ত্য-লোকের মানবী বলে মনে হলো না। একটা পুতুল। পোশাক এতো বিস্তৃত, এতো ঘন আচ্ছাদিত এবং এতো লম্বা যে তার তলায় মানুষটা যে কোথায় খুঁজে বের করতে হয়। মাথার পিছনে তার নিজের মাথার চেয়ে দ্বিগুণ বড়ো এমন এক কুচকুচে খোঁপা বেঁধেছে যে যার ওজন শোনা গেল পাঁচ সের। মুখে গাঢ় ক'রে প্রসাধনের প্রলেপ। আঁকা ভুরু আঁকা চোখ কান পর্যন্ত টানা।

সে এসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রথমে নিজেকে দেখলো, তারপর চা তৈরি করার প্রণালী দেখাতে শুরু করলো। একেবারে উনুন ধরানো থেকে কাপে কাপে ঢালা পর্যন্ত। মনে হচ্ছিলো একটা মূক অভিনয় দেখছি। এদের চা-পর্ব একটা অনুষ্ঠান, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে এই অনুষ্ঠান সাঙ্গ করলো যে মনে হলো পুরোহিত পূজা সমাপ্ত ক'রে উঠলো।

মেয়েটি গেঁইসা। সবাই বললো গেঁইসাকুলে এঁর মর্যাদা অপরিসীম। জাপানের বিখ্যাত 'টি সেরিমনি' ইনি যতো নিখুঁতভাবে দেখাতে পারেন, বর্তমানে আর কেউ তা পারেন না। তার পায়ে একটা কাঠের জুতো ছিলো, জুতোটার উচ্চতা পাঁচ ইঞ্চির কম নয়। কী ক'রে যে ঐ জুতো পরে অমন নাচের ভঙ্গিতে মৃদু লয়ে চলাফেরা করছিলেন কে জানে।

এরপরে একটা বাগানবাড়িতে এলাম। অতীতে কোনো এক সম্রাটের বিলাসভবন ছিলো হয়তো, বর্তমানে এইভাবে তার ব্যবহার হচ্ছে। আলোয় আলোময়। কতো যে পাহাড়-পর্বত, গিরি-গুহা-কন্দর, প্রপাত-প্রস্রবন হ্রদ তার ঠিক নেই। বিভিন্ন রঙের আলোর কারসাজিতে সব সত্যি বলে ভ্রম হচ্ছে। সমস্ত দক্ষ মালীরা সাজিয়েছে এই বাগান। জাপানী বাগানের উৎকৃষ্ট নমুনা।

ঢুকতে ঢুকতেই দেখলুম নদীর ধারে সূর্যাস্তের রক্তাভায় (আলোর কৌশলে) কুঞ্জতলে বসে দুটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বীণা বাজাচ্ছে। স্বর্গের দৃশ্য কল্পনা করলেও অধিক বলা হয় না এই দৃশ্যকে। আমাদের এনে একটি মণ্ডপে বসিয়ে দিল। সেখান থেকে দেখলাম, যন্ত্রটা বীণা নয়, তারই অনুকরণে অনেকগুলো তার দিয়ে তৈরি, নাম কোটো। সেই যুগলবন্দী কোটোর অনুরণন সমস্ত বাগানময় ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু আওয়াজ অতিশয় মৃদু। মৃদু সৌরভের মতো মধুর বিধুর।

শুনেছিলাম গেঁইসারা জাপানে বারবণিতা হিসেবেই পরিগণিত এবং ইদানীং প্রায় লুপ্ত। যাঁরা আছেন তাঁরা জাপানের অন্যান্য দর্শনীয় কিছুর মতোই দ্রষ্টব্যের তালিকায় স্থান নিয়েছেন। পুরাকালে বোধহয় রাজন্যদের মনোরঞ্জনার্থেই উৎসর্গীকৃত ছিলেন। এখন নাচগানই এদের জীবিকা। তাছাড়া পুরাতন জাপানকে দেখতে হলে বা জানতে হলে এঁদের কাছেই শুধু তার নমুনা পাওয়া যাবে। এঁরা এখানে সেই ভাবেই থাকেন, সেই সভ্যতাতেই অভ্যস্ত। আচার-আচরণে-পোশাকে-আসাকে-চলনে-বলনে থাকার ধরনে সর্ব রকমেই এঁরা জাপানী উপকথার জীবন্ত ছবি।

উদ্যান শোভা সন্দর্শন ক'রে এবং যন্ত্রসঙ্গীতে শ্রবণ ধন্য করে আমরা সর্বশেষে সেই গেঁইসা ভবনে এসে পেঁছুলাম। প্যাগোডা ধরনের গোল বারান্দা পেরিয়ে মস্ত একটি নিরাভরণ মাদুর পাতা হল ঘরে এসে ঢুকতেই, কিমোনো-পরা লম্বা চুলের সুসজ্জিত সুন্দরী কয়েকটি তরুণী এগিয়ে এলেন হাসিমুখে,

অভ্যর্থনা করলেন নীলডাউনের ভঙ্গিতে, বসতে বললেন। লম্বা পোশাক ধরে ধরে রাণীর মতো হেঁটে গিয়ে আমাদের জন্য চা নিয়ে এলেন। চায়ের সঙ্গে নানা খাদ্যও পরিবেশন করলেন। তারপর নাচগান। দর্শক আমরা দু'জন ছাড়া আর সবাই শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা বেশ মাতোয়ারা হ'য়ে উঠলো। গানের সঙ্গে তাল দিতে দিতে দু'জন মহিলা উঠে গিয়ে নাচে যোগ দিলেন। পুরুষেরাও উঠলেন আস্তে আস্তে। সহসা একটি মেয়ে এসে আমার হাত ধ'রে টানতে লাগলো, নাচবার জন্য। আমি বঙ্গললনা, লজ্জায় ঘেমে নেয়ে লাল হ'য়ে অনেক কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করলাম।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ছিলো, ভোজন ছিলো। তার আগে সারা বিকেল কাটলো হায়াসির সঙ্গে। বক্তৃতার শেষেও হোটেল পর্যন্ত এলেন। আরো একটি উপহার দিলেন তিনি। একটি জাপানী বড়ো সাইজের পুতুল। হেসে বললেন, 'আশা করি ভুলে যাবেন না।' অভিভূত হ'য়ে বললাম, 'কখনো ভুলবো না। কোনোদিন ভুলবো না।'

মাৎসুমোতো এলো। একটি দামী ব্রোকেডের ব্যাগ এনেছে, আর একটি সোনালী কলম। হাতের কড়ে আঙুলে কড়ে আঙুল জড়িয়ে বললো, 'আজন্মের বন্ধুতা রইলো তোমার সঙ্গে। আশা করি ভুলবে না।' এবারও অভিভূত হ'য়ে বললাম, 'ভুলবো না, কোনোদিন ভুলবো না।'

সত্যের অপলাপ করিনি। ওঁদের আমি ভুলিনি। কিন্তু আর তো কোনোদিন তাঁদের আমি দেখবো না? সে দুঃখ রাখি কোথায়?

শান্ত স্নিগ্ধ সুমিত কিয়োটোর পরে টোকিয়ো যেন নদীর কল্লোলের পরে সমুদ্রের গর্জন। বিশাল নগর তার অগণিত লোকসংখ্যা, অসংখ্য বিপণি, আর যানবাহনের বিস্ময়কর প্রাচুর্য একেবারে হকচকিয়ে দিল।

টোকিয়ো পৃথিবীর মধ্যেই বৃহত্তম শহর, এর লোকসংখ্যাও নিউইয়র্ক লণ্ডনের চেয়ে বেশী। নীল আলোর সংকেতে ঝপ্ করে পাশাপাশি সব গাড়িগুলো যখন দাঁড়িয়ে যায়, প্রশস্ত রাস্তার এ-পার ও-পারের দূরত্ব দেখেও যেমন চমক লাগে, তেমনি পথিকেরা নির্দিষ্ট দাগ দেখে রাস্তা পার হতে থাকলে মনুষ্যসংখ্যার বিপুলতা দেখেও তেমনি থমকে যেতে হয়।

কিয়োটো থেকে টোকিও মাত্রই এক ঘণ্টার পথ। আসতে আসতে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি ফুজিয়ামা দেখা গেল। চূড়াগুলো তুষারে

আবৃত, রোদে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। এয়ারপোর্টে সস্ত্রীক যে ভদ্রলোক আমাদের নিতে এসেছিলেন, তিনি ইংরিজির অধ্যাপক, সেই সঙ্গে তুলনামূলক সাহিত্যের কর্মসচিবও বটে। আমাদের দেখে পরমাত্মীয়ের মতো হাসলেন, হাতে হাত জড়িয়ে খুশি জানালেন, চেরা চোখ প্রায় বুজে গেল। মহিলাটি যেমন শান্ত তেমন তাঁর লাজুক ভঙ্গি। অধ্যাপকটির নাম সাবুরো ওটা। জাপানীদের তুলনায় একটু লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুল খুব ঘন আর কালো। আর খুব পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসতে আসতে অনেক কথা বলছিলেন, ভালো ইংরিজি জানেন, সুতরাং ভাববাচ্যের সাহায্য খুব একটা দরকার হচ্ছিলো না। ঠাট্টা তামাসা রসিকতা, খবর সরবরাহ, কার্যক্রমের তালিকা সবই চলছিলো। মাঝে মাঝে উচ্চহাস্যও শোনা যাচ্ছিলো। তাঁর স্ত্রী এই ভাষা কিছু কিছু বোঝেন কিন্তু বলতে পারেন না, সেই কারণে তিনি কেবল হাসছিলেন আর মাথা নাড়ছিলেন, কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার অদ্ভুত একটা আত্মিক যোগাযোগ ঘটলো। ভদ্রমহিলাকে আমার ভীষণ ভালো লাগলো। টান টান চুল পেটেপাতা করে আঁচড়িয়ে ভিতরে কাঠের চিরুনি দিয়ে খোঁপা বেঁধেছেন একটা, কালো হলুদ আর গোলাপী ছোপকা ছোপকা পা পর্যন্ত লম্বা জাপানী সিলকের পোশাক, উপরে ভারি খয়েরী কোট। দেখতে সুন্দর নন, তবু ভারি মিষ্টি। বয়স্ক। হঠাৎ আমার হাতে চাপ দিয়ে আঙুল তুলে টোকিও স্তম্ভ দেখালেন, মাতৃ ভাষায় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যা বললেন তা হলো এই যে, এই স্তম্ভ ইফেল স্তম্ভের চেয়ে উঁচু।

বুদ্ধদেব সাবুরো ওটার সঙ্গে খুব গল্পে মেতে গিয়েছিলেন, তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের মতামতে খুব মিল হচ্ছিলো। সারা বিশ্বেই তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগ খুব কম। আর তখন, ঐ একষট্টি সালে তো বটেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিভাগ তখনও নাবালক, তখনো অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকদের কাছে পরিহাসের বিষয়, ছাত্রছাত্রীদের বত্রিশভাজা বলে টিটকিরি শুনতে হয়। বোধ হয় সেই কারণেই যাঁরা এ বিষয়টাকে বোধগম্যের অন্তর্গত করতে পেরেছেন, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং ভালোবেসেছেন, তাঁরা প্রায় সমাজ সংস্কারকের মতো লাভ-লোকসান ঠাট্টা টিটকিরির ঊর্ধ্বে উঠে বিদ্রোহীর মতো নিযুক্ত রেখেছেন নিজেকে, আমি দেখেছি দেশে-বিদেশে তাঁরা সবাই একজোট।

এই সাবুরো ওটার সঙ্গে বুদ্ধদেবের সেই জোটের সম্পর্কই স্থাপিত হচ্ছিলো বোধহয়।

কিছুটা সস্তার জন্য আমাদের প্রথমে যে হোটেলটায় এনে তোলা হলো, ভিতরে গিয়ে একটুও পছন্দ হলো না। তখন সাবুরো ওটা গিন্‌জা টৌকিও হোটেলে নিয়ে এলেন। চমৎকার হোটেলটি। একেবারে গিন্‌জা স্ট্রীটের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঢোকবার মুখে বিরাট বিরাট দুই কাঁচের পাল্লা মুখে মুখে আটকানো। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই 'আসুন' বলার মতো করে দুপাশে সরে খুলে গেল, ভিতরে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল আবার।

এই শহরে এই রাস্তাটিআমাদের চৌরঙ্গীর মতো সম্ভ্রান্ত, বড়ো বড়ো দোকান-পাট সব এখানে। বিভাগীয় দোকানগুলোর বিশালত্ব আয়তনে যেন প্রায় নিউ ইয়র্কের গিম্বেলস্‌ মেসির সমান। আর কত তার হৃদয় মন হরণ করা জিনিসের আকর্ষণ।

হোটেলটিতে ঢুকেই বেশ ভালো লাগলো। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট যে কক্ষের চাবি আমাদের হাতে পৌঁছোলো, সে ঘরটি দেখে প্রত্যয় হলো, আরামের কোনো অভাব হবার সম্ভাবনা নেই। লাল টুকটুকে কার্পেটমোড়া ঘরে তুঁতে রংয়ের অতি উজ্জ্বল লতাপাতা আঁকা বেডকভার ঢাকা বিছানাটি একটি ছবি তৈরি করেছে। বোধ হয় লাল কার্পেট দিয়েছে বলেই বেডকভারে তুঁতে রং। পাশে হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে বসার জন্য নরম সোফা, লেখার টেবিলের উপর ল্যাকারে রঞ্জিত যে টেবল-ল্যাম্পটি শোভা পাচ্ছে, তাতে ইচ্ছেমতো তিন রকমের আলো বিচ্ছুরিত হয়। উজ্জ্বল, অতি উজ্জ্বল এবং মৃদু। দেরাজে চার পাঁচ রকমের লেখার প্যাড আর খাম। জানালায় গাঢ় হলুদ রংয়ের সিলকের ডবল পর্দা, সিলিং থেকে মাটি পর্যন্ত শীতের পথ রুদ্ধকরে ঝুলে আছে। কোণে আলমারিতে নৈশ পোশাক ও ঘাসের চটি। বাথরুমে বাথসল্ট থেকে শুরু করে গায়ে মাখা পাউডার পর্যন্ত সবই থরে থরে সাজানো। তোয়ালেরই বা কতো বাহার আর কতো সাইজ। তবু তো এটা তিন তারার হোটেল নয়।

লম্বা করাইডোর পার হয়ে নেমে আসার জন্য লিফটের কাছে এলাম। সুন্দরী সুসজ্জিত জাপানী মেয়ে নরম করে হেসে মাথা নুইয়ে তার আধো আধো ইংরিজীতে বলে উঠলো, May I help you? লিফটের দরজা খুলে গেল। লিফটগুলো খুব বড়ো বড়ো, এবং স্বয়ংচালিত। এই মেয়েরা আছে অভ্যর্থনার জন্য। দরজা খোলে, সঙ্গে যায়, ফিরে আসে। ধন্যবাদ দিলে হাসি মুখে আবার মিষ্টি মিষ্টি ইংরিজি

বুলিতে বলে, 'You are welcome'। দশবার নামো দশবার ওঠো, কোনো বিরক্তির চিহ্ন নেই মুখে।

যে ক'দিন ছিলাম, লক্ষ করে দেখলাম, সারাদিনে তিনবার এরা পোশাক বদলায়। সকালে দুপুরে স্কার্ট, সন্ধ্যাবেলা কিমোনো।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে ভোজনালয়ে গিয়ে বসতে হলো, দেরি হলে কিয়োটোর মতো খুঁজেপেতে রান্নাঘরে গিয়ে খেতে বসা যাবে না। এখানে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অনেকটাই বেশী।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর বছর, তাঁর বিষয়ে বক্তৃতার জন্যই আমন্ত্রিত হয়ে আসা। বুদ্ধদেবকে এঁরা খুব বলিয়ে নিচ্ছিলেন। সেই বলা তাঁর পক্ষে খুব সুখের হচ্ছিলো। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এঁদের শ্রদ্ধা, জানবার আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, সবই অত্যন্ত খাঁটি ছিলো। যেন অধ্যাপকের কাছে পাঠ নিচ্ছে এমন অভিনিবেশের সঙ্গে শুনছিলো সবাই। সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করলে সমস্ত জগতেই যে এমন একজন বিরাট পুরুষ অনন্য এই সত্যটা তারা অনুভব করছিলো মনে মনে।

এখানে প্রত্যেক সভায় অনেক মেয়েকেও দেখা যাচ্ছিলো, কমবয়সী এবং বেশী বয়সীর সংখ্যা সমান সমান। অনেকে নোট নিচ্ছিলেন। প্রত্যেকটি মেয়ে এবং মহিলাই কেমন লাজুক লাজুক, নম্র এবং বিনীত। কিন্তু সপ্রতিভ। অন্তঃপুরচারিণীদের মতো আড়ষ্ট নন। ভাবতে ভালো লাগলো এই জাপানের মেয়েরাই একমাত্র যাঁরা মধ্যযুগেও শিক্ষায় সংস্কৃতিতে গণ্য ছিলেন। সে সময়ে এশিয়া তো বটেই, ইয়োরোপের ইতিহাসেও মেয়েদের অস্তিত্বের কোনো বালাই ছিলো না। আমাদের যেমন সতীদাহ হচ্ছিলো, শিক্ষায় দীক্ষায় গৌরবান্বিত অহংকৃত ইয়োরোপেও তেমনি আঠেরো শতকে ডাইনী পোড়ানো হতো। আজকের কথা নয়, আঠেরো শতক তো বহু দূরে, এগারো শতকেই যাঁরা জাপানী সাহিত্যের মুকুটমণি তাঁরা প্রায় সকলেই মেয়ে। মুরাসাকির 'গেঞ্জি কাহিনী', 'শোনাগনের ডায়েরি', 'শিকিবুর কবিতা', এই সবই জাপানের চিরন্তন সাহিত্য বলে স্বীকৃত এবং এঁরা সবাই মেয়ে। এঁরা তিনজনই সমসাময়িক। কোনো সম্রাজ্ঞীর সখীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

শুধু এঁরা তিনজনই নন, সেই সময়ে আরো অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক মহিলার নাম জাপানে মুখে মুখে উচ্চারিত। ডায়েরী লেখার প্রবর্তনও যে প্রথম তাঁদের দ্বারাই সাধিত হয়, একথা জেনে আমি চমৎকৃত হই, সংক্রমিত হই,

এবং শোনা মাত্রই একটি ডায়েরী কিনে, টোকিও থেকে ডায়েরী লিখতে শুরু করি। মহিলাদের এই কৃতিত্ব আমার নিজের কৃতিত্ব বলে বোধ হ'তে থাকে। আমাকে বুদ্ধদেব খুব 'ফেমিনিস্ট' বলে ঠাট্টা করেন, ছেলেমেয়েরাও করে, কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে মেয়েরা শুধু মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই আজকের দিনের ভারতবর্ষেও যে অনাদর অবহেলা এবং অকথ্য অসম্মানের জীবন (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই) যাপন করতে হয় তার কোনো তুলনা নেই। একজন মেয়েকে—তাঁর যতো বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভাই থাক না কেন, বিচারের ভার তো সেই পুরুষের হাতেই, সুতরাং নিজের উপরে স্থান দিতে তারা সদাই নারাজ বলে একটা সম্মানের আসনে উত্তীর্ণ হতে যে যুদ্ধ করতে হয় সেটা অমানুষিক। সমান শিক্ষা নিয়ে একজন পুরুষের যে মহিমা একজন মেয়ের পক্ষে তা অসম্ভব।

একই সঙ্গে পাশ করা ছেলেমেয়ে বিবাহিত হয়ে সংসার পাতা মাত্রই ছেলেটি স্বামীত্বের অধিকারে তাকে তার নিজের জৈবিক সুখের সঙ্গিনী ছাড়া আর কোনো অস্তিত্বের দাম দেয় বলে আমার মনে হয় না। সে যেখানে চাকরি করবে, স্ত্রী সেখানে অন্তরীণ থাকবে এটাই বিধি। কিন্তু স্ত্রী যেখানে চাকরি করবে সেখানে সে যাবে না, সেটা তার অপমান। যদি তার চেয়ে স্ত্রীর বেতন দ্বিগুণও হয় তবুও নয়। একজন মানুষের পক্ষে যা অপমান তা অপমানই। তিনি স্ত্রীই হোন আর পুরুষই হোন। স্বামীর উপার্জনে, তাঁর অধীনস্থ হয়ে খেতে পরতে একজন মেয়ের যদি অপমান না হয় তবে পুরুষের পক্ষেও সে কথা প্রযোজ্য নয় কেন?

উপরন্তু তোমার বিদ্যাবুদ্ধি যোগ্যতা যাই থাক না, মেয়ে হয়ে জন্মালে প্রথমে তোমার স্বামীর সুখ সাচ্ছন্দ্য সেবা তারপর তার অনুকূল মতো অন্য কিছু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অবস্থা কিছুটা বদলেছে বটে কিন্তু কাঠামো ঐ একই, কেবল আস্তরণ চাপানো হচ্ছে এইমাত্র। তা বলে মেয়েদের প্রতি তাচ্ছিল্য অতীত হয়ে গেছে তা নয়। কিন্তু এই তাচ্ছিল্য কেন? স্বোপার্জিত অর্থে অন্নগ্রহণ করে না বলেই তো? অথচ স্বোপার্জিত অর্থ সংগ্রহেও সমাজের প্রভূত আপত্তি। সমাজই আমাদের পুরুষ শাসিত, মেয়েরা সমকক্ষ হলে হায় হায় করে ওঠা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। সেবাদাসী করে রাখা আর সম্ভব হবে কী করে! নির্বিচার আনুগত্যে আর মেয়েরা তখন রাজী হবে কেন?

মুরাসাকির 'গেঞ্জি কাহিনীকে' যে ইতিহাস পৃথিবীর প্রথম উপন্যাস বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তার কারণই এই যে, সেটা অলৌকিক কাহিনী নয়, রক্তমাংসের

মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ছবি। উপন্যাসটি আমি পড়িনি; বুদ্ধদেবের কাছে শুনেছি, বইখানা এতোই আধুনিক যে, কোনো কোনো অংশ পড়তে পড়তে উনিশশতকী ফরাসী উপন্যাসের অংশ বলে ভ্রম হয়।

প্রাচীন ভারতেও মেয়েরা অনেকটাই স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু 'আর্য সমাজ' সাহিত্যে এমন পারঙ্গম মহিলা একজনও সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য আর্যরা ভারতের রঙ্গমঞ্চে নেমেই যেরকম একনায়কতন্ত্র সংবিধান রচনা করলেন, তাতে ব্রাহ্মণ ছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য কোনো মানুষেরই কোনো দাবী ছিলো না। জাতিভেদের প্রবল স্রোতে ব্রাহ্মণ ছাড়া সবাই শ্যাওলা। কেবল রাজাদের কিঞ্চিৎ মর্যাদা দেওয়া হতো, নেহাৎ রাজা বলেই হয়তো। আমার মনে হয় দ্রাবিড় সভ্যতাকে ধ্বংস করবার এটাও একটা ফন্দি।

আমরা জাপান যাবো শুনে কলকাতায় আমাদের এক বন্ধুপ্রতিম ভদ্রলোক একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন দেখতে পাবেন সেখানে। আর তার প্রতিষ্ঠাতাকে দেখলেও আপনাদের ভালো লাগবে। চিঠিতে চিঠিতে সব বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো সেই মতো।

জায়গাটা টোকিওর বাইরে। প্রফেসর ওটাকে বলতেই বললেন, 'সবাই জানে তাঁর কথা। তিনি এক ঋষিতুল্য মানুষ, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় দেখার মতো। কিন্তু আমি কোনোদিন সেখানে যাইনি। আপনারা যদি যান, আমি সঙ্গে যাবো।'

নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনে চাপা হলো। টোকিও থেকে ওকোহামা পেরিয়ে অন্য ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেন অবশ্য মিনিটে মিনিটে। কিন্তু ওকোহামা পর্যন্ত সাংঘাতিক ভিড় ছিলো। আপিসের সময় বলেই বোধ হয়। ওকোহামা ছাড়িয়ে অন্য যে ট্রেনে উঠলাম, তখন বেশ ফাঁকা। তারপরে আর বিশেষ কোনো জরুরী কর্মস্থল নেই বলেই এই সুবিধে।

সেই ট্রেন থেকে মাচিদা সিটি বলে আর একটা স্টেশনে নেমেই কাছে 'টামাগাওয়াগাকোয়েন' এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতেই আমাদের গন্তব্যস্থান। দেখলাম, স্টেশনে আমাদের নিতে গাড়ি পাঠানো হয়েছে। গাড়িতে উঠতে না উঠতেই পথ শেষ হয়ে আশ্রমের ভিতরে ঢুকে পড়ল। উঁচু নিচু ছোটো একটি পাহাড়ের ধাপে ধাপে অবস্থিত ক্যাম্পাসটির দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। প্রতিষ্ঠাতাই এখানকার আচার্য, নাম কুনিয়োশি ওবারা।

আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ওবারার স্ত্রী অর্ধেক পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন

পাকা চুলের এইটুকু এক ছোট্ট মহিলা। হেসে 'ইনদিয়া, ইনদিয়া' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আপাদমস্তক তাকিয়ে বললেন, 'বিউতিফুল', 'বিউতিফুল।'

পাহাড়ের চূড়ায় ঘন সবুজ গাছপালার মধ্যে বিদ্যালয়ের চ্যাপেলটি দেখা গেল। সেখানে উঠে গিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখতে পেলুম আসল মানুষটিকে। বেদীতে দাঁড়িয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদের বাইবেল পড়ে শোনাচ্ছিলেন। দেখতে অসাধারণ সুপুরুষ, গায়ের রং গোলাপ ফুলের মতো, চেহারা সুগঠিত, বৃদ্ধ, কিন্তু যুবকের মতো সতেজ।

বাইবেল পড়া থামিয়ে চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন, প্রশান্ত হাসিতে মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। নিজের ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের কী বললেন, বোধ হয় আমাদের বিষয়ে। তারপরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন অডিটোরিয়ামে। ছাত্র-ছাত্রীরা তৎক্ষণাৎ সংবদ্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' বলে গান ধরলো। হঠাৎ এখানে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেত কণ্ঠে এই গান শুনে আমাদের মন ভেজা ভেজা হয়ে গেল।

তারপরে স্টেজে উঠে বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে হলো। আমাকেও হাতে ধরে ওবারা স্টেজে নিয়ে এলেন, রবীন্দ্রনাথের গান শুনবে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা।

ওবারা কয়েকটি ইংরিজি শব্দ জানেন কিন্তু জুড়ে লাইন বলতে পারেন না। আমাকে পিঠ চাপড়ে চাপড়ে কেবল বলছিলেন, 'মাই দতার, দতার, ভেলি স্যুইত্, ভেলি স্যুইত।'

আমার তাঁকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছিলো।

তারপর ঘুরে ফিরে বিদ্যালয় দেখালেন, একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবজি ক্ষেত, মাছের পুকুর, ফলের বাগান, কিছুই বাকি নেই। এসব ছাত্রছাত্রীরাই করে। ঠিক গতানুগতিক বিদ্যালয় নয়, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজেও তাদের দক্ষ করে তোলা হয়। চিত্রশালাটি দেখার মতো। ছবি আঁকায় জাপানীদের সুনাম এখানে অক্ষুণ্ণ। একটি পাঞ্জাবী যুবককেও দেখলাম, বিজ্ঞান পড়ছে, জাপানী ভাষা প্রায় মাতৃভাষার মতো আয়ত্ত করে ফেলেছে। ওবারা বললেন, প্রত্যেক বছরই এরকম একটি বিদেশী ছাত্র নেন তাঁরা, তার খরচ এখানকার ছেলেমেয়েরাই চাঁদা করে তুলে দেয়। বললেন, তোমরা যদি কাউকে রেকমেণ্ড করে পাঠাও আমি নিশ্চয় নেবো।

প্রফেসর ওটা আমাদের দোভাষীর কাজ করছিলেন। ওবারা মধ্যে মধ্যে 'ব্যাড', 'গুড', 'গো তু হেল', 'দতার কাম কাম সিত্ হিয়ার', এই সব বলছিলেন। উনি

যতোবার আমাকে 'দতার' বলছিলেন আমি ততোবার মনে মনে ওঁকে পিতা সম্বোধন করছিলাম। তাঁর সিলকের মতো নরম সাদা ধবধবে এলোমেলো ঘন চুলের দিকে তাকিয়ে, ডালিম দানার মতো টলটলে টকটকে মুখের দিকে তাকিয়ে, হাসিমাখা বুজে যাওয়া সরু চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে যুগপৎ ভক্তি এবং ভালোবাসার আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছিলো।

বেলা গেল। মিসেস ওবারা তাঁর গৃহে নিয়ে এসে এবার চা খাওয়ালেন। লাঞ্চ চ্যাপেলেই সমাধা হয়েছিলো। সারাদিন আশ্রমেই ঘোরাঘুরি গেছে। ওবারা সর্বদাই সঙ্গী। মিসেস ওবারা বললেন, 'এবার একটু আমার কাছে বোসো।'

আমরা একটি খাঁটি জাপানী সরাইখানা দেখতে চেয়েছিলাম। ওবারা সেই বাসনাও চরিতার্থ করলেন। আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হতে হলো সেই উদ্দেশে। মিসেস ওবারা তাকিয়ে থাকলেন আমাদের অপসৃয়মান গাড়ির দিকে। ওবারা সঙ্গে এলেন।

সেই সরাইখানায় যাবার পথ গ্রামের মধ্য দিয়ে, এই পথই সোজা চলে গেছে কিয়োটোর দিকে। বললেন, এই পথটি অতি পুরোনো, পূর্বযুগের কবি শিল্পীরা এই পথের অনেক গুণগান করেছেন, অনেক ছবি এঁকেছেন। যাত্রীরা তখন এই পথে হেঁটে যেতো, নয়তো ঘোড়ায় চড়ে।

যেতে যেতে পাহাড়ের কোলে কোলে, ঘন পাইন বনের মধ্যে অথবা হ্রদের তীরে তীরে অনেক বিশ্রামাগার দেখা গেল। আমাদের গাড়ি কিছুটা পথ প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল দিয়েও চলেছিলো, তারপরে রাত প্রায় আটটা নাগাদ যথাস্থানে পৌঁছে গাড়ি একটি কাঠের দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামলো। জায়গাটির নাম হাকোনে।

এটিই জাপানের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী সরাইখানা। দেখলাম মালিকটি যুবক। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে সে বাঁশের গেট খুলে ধরলো, তারপর হাঁটু ভেঙে বসে অভ্যর্থনা জানালো। ওবারা তার হাত ধরলেন। তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র।

বারান্দার কাছে আসতেই সারি সারি সব ঘাসের চটি সাজানো, একটি দাসী এসে ঠিক ছাত্রটির মতো করেই হাঁটু ভেঙে বসে আমাদের জুতো খুলে দিতে উদ্যত হয়েছিলো। আমরা তা দিলাম না। নিজেরাই খুলে সেই জুতো বাইরে রেখে ঘাসের জুতো পরে নিলাম। তারপর এমন একটি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম যে-সিঁড়ির পরিচ্ছন্নতার কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। সিঁড়ির মুখে উঠেও

আবার জুতো বদলাতে হলো, এবার কোনো নরম গরম কাপড়ের জুতো। তারপর কাঠের বারান্দার বাঁ পাশের একটি ঘরের বন্ধ দরজা সরে গেল দু পাশে, আমরা ঢুকলাম। ঘরটায় ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। মনে হলো না কোনো বাস্তব জীবনে এই কক্ষে বাস সম্ভব। সত্যিই মনে হলো কোনো ছবির জগতে প্রবিষ্ট হলুম।

অথচ ঘরটি আসবাববহুল নয়। দুই দেওয়ালে দুটি লম্বা লম্বা মেঝে পর্যন্ত ছবি, কোণে ফুলের ঝাড়, সিলিংয়ে রঙিন কারুকার্য, মাঝখানে একটি অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে বানান মাদুর। সেই মাদুরের উপর প্রকান্ড একটি জলচৌকির মতো শ্বেতপাথরের চৌকো টেবিল। টেবিলের চারদিকে চারটি ঝালর দেওয়া গাঢ় নীল আসন পাতা, আসনের আধখানা ঢেকে ঢেকে চারটি লাল রংয়ের মখমল জাতীয় সিলকের লাইনিং দেওয়া কম্বল।

সেই জুতো পায়েই গিয়ে আসনে বসতে হলো, আর বসেই অবাক হয়ে দেখলাম, টেবিলের তলায় টেবিলের সাইজেরই একটি চৌবাচ্চা, সেখানেই কম্বল ঢেকে পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। জানুয়ারী মাস, দুঃসহ ঠাণ্ডা, ঘরে ঢুকেও হাত পায়ের সাড়া ফিরছিলো না, ঐ চৌবাচ্চায় পা দিয়ে সারা শরীরে আরাম ছড়িয়ে পড়লো। চৌবাচ্চাটি বৈদ্যুতিক উপায়ে গরম করে রাখা। সঙ্গে সঙ্গে চা এলো, হাঁটু ভেঙে বসাই ওদের নম্রতার ভঙ্গি, হাঁটু ভেঙে বসেই জাপানী মেয়ে যত্নের সঙ্গে চা পরিবেশন করলো। চায়ের সঙ্গে ছোটো ছোটো গালার ছবি আঁকা প্লেটে নোনতা জাতীয় কোনো গৃহনির্মিত খাদ্য দিয়েছিলো, আমি অবশ্য খাইনি।

চা খেয়ে সামান্য চাঙা হতেই ওটা বললেন, 'এবার একটু স্নান ক'রে নিন মিসেস বোস, আরাম লাগবে।'

আমি সভয়ে বলে উঠলাম, 'এই ভয়ংকর শীতে স্নান! না না।'

'জল তো গরম।'

'হোক্।'

'উঠুন, উঠুন, দেখবেন, খুব ভালো লাগবে।'

ওবারা বললেন, 'ইয়েস ইয়েস, ভেরি গুড্, গো দতার, ফীল বেতার—'

অনুরোধে মানুষ ঢেঁকিও গেলে, সেই ভাবেই উঠতে হলো। আমাকে না হয় ওঠালেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তো অনুরোধে ঢেঁকি গেলার পাত্র নন, দেখলাম তিনিও উঠলেন। তবে স্বভাবতই শীতকালে স্নানে আমার যতো আপত্তি, ওঁর তা নয়। শীত গ্রীষ্ম বারোমাস সকালে উঠে স্নান তাঁর অভ্যাস। বিকেলেও শীতের কামড়

যথেষ্ট কড়া না হওয়া পর্যন্ত গরম জলে স্নান চলে না। ভাবলাম, গরম জল শুনেই সেই অভ্যাসে উঠে পড়েছেন।

আসলে তা নয়। এখন আর ফুজিয়ামা অগ্নি উদ্গার করে না বটে, কিন্তু সেই আগ্নেয়গিরি তার স্বভাব বদলাতে পারেনি। ফুটন্ত জলের স্রোত গড়িয়ে আসে তার গা বেয়ে, প্রস্রবণ হয়ে দূর-দূরান্তরে বয়ে যায় গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে। এই আগুনের নদী বয়ে যাচ্ছিলো। এই সরাইখানার পিছন দিয়ে, এরা তার ধারে ধারে খোপ কেটে কেটে বাথরুম বানিয়েছে।

নিচে পিছনের টানা বারান্দার ধারে ধারে সেই খোপ। খোপ বললে অবশ্য অপমান করা হয়। ভিতরটা যে কী সুন্দর। দেয়ালগুলো সব আয়নার, তারই মধ্যে একটি আয়না আলমারি, ভিতরে সাবান তোয়ালে। মেঝেতে সাদা চকচকে টালি। খোপের মধ্যে আবার খোপ কাটা। একটি কাপড় বদলাবার, একটি স্নান করবার। আয়নাগুলো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ঘরে ঢুকেই শরীর গরম। আর স্নানের জায়গাটুকুতে গিয়ে হতবাক। বাঁধিয়ে গোল গোল করে দিয়েছে তীরের কতোটুকু নির্দিষ্ট জায়গা। সেই বাঁধানো জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে গরম জল। উপরে গোল মাটির গামলায় ঠাণ্ডা জল। মিশিয়ে স্নান করার জন্য। গন্ধকের গন্ধে জায়গাটা ভরপুর।

বুঝলাম এজন্যই বুদ্ধদেব স্নান করতে গররাজি হননি, এজন্যেই প্রফেসর ওটা আমাকে জোর করেছেন। ওবারা 'গো দতার গো দতার' করেছেন। আমি কিন্তু বুঝিনি। এরকম ভাবিনি। স্নানের আগে অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলাম।

সেই রাতটা সেই সরাইখানাতেই কাটলো। গল্পে-গল্পেই মধ্য রাত, তারপর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া। আমাদের ঘরটিকেও খোপ বলা উচিত। একটি মাচার উপরে খড়-তুলো-ছোবড়া বিছিয়ে এমন উঁচু করা হয়েছে যে বুক দিয়ে ঝুলে ছাড়া ওঠা যায় না। তার উপরে আবার ভারি ভারি খান তিনেক তোশক। স্প্রীংয়ের চেয়ে বেশী নরম, শুয়েই এতোখানি ডুবে যেতে হয়। সেই মাচানটাতেই ঘর জোড়া, তবু আসবাব আছে। বেড সাইড টেবিলে আলো আছে, নিচের তাকে বই আছে, ছবির বই। আবার পায়ের তলার দেয়ালে দেয়াল-টেবিল। এখন চেন দিয়ে হুক দিয়ে গোটানো। প্রয়োজনে খুলে লেখাপড়া করা যায়। পাশে কুলুঙ্গিতে চিঠি লেখার ছবি-আঁকা কাগজ।

আর যা আছে, নিচেই সেই উষ্ণ নদী উপলখণ্ডের উপর দিয়ে ঘুমপাড়ানি গানের মতো বয়ে যাচ্ছে কুলকুল শব্দে। মাথার কাছে নিচু সিলিং থেকে পা পর্যন্ত মোটা কাচের জানালা, জানালায় মোটা পর্দা, পর্দা সরালে সেই প্রবহমান নদীর দৃশ্য। ওপারে ঘন বন।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সেরেই ফেরার সময় হলো। ওবারা তাঁর ঘন পাকা চুলে ঢেউ তুলে তুলে মাথা নাড়াচ্ছিলেন, 'কম এগেন, কম এগেন'। তুলোর মত নরম ফোলা ফোলা হাতে হাত ধরলেন। 'আই রিমেমবার ইয়ু, আই রিমেমবার ইয়ু', 'দক্তর বোস, আই রিমেমবার ইয়ু', 'দতার আই রিমেমবার ইয়ু', 'রাইত লেতার।'

দাঁড়িয়ে রইলেন দরজায়, হাত নাড়াতে লাগলেন, আমাদের গাড়ি গলি ছাড়িয়ে বড়ো সড়কে এলো।

হোটেলে ফিরে বিশ্রাম ছিলো সেই দিনটা। বুদ্ধদেব বললেন, 'চলো 'নো' নাটক দেখি।'

ইচ্ছেটা ওটাকে জানাতেই তিনি বললেন, 'এই সপ্তাহে কোনো 'নো' নাটক নেই, তার চেয়ে বরং 'কাবুকি' দেখুন। এই কাছেই থিয়েটার হল, হেঁটে যাওয়া হেঁটে আসা, কোনো অসুবিধে নেই।'

'তাই ভালো।' তক্ষুণি ফোনে চারখানা টিকিট বুক করা হলো, ওটা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আবার আমাদের জন্য টিকিট কেনা কেন?'

আমি বললাম, 'টিকিট কিনিনি, সুখ কিনেছি—'। এ কথায় তাঁর হাসি আর থামে না। প্রতিদিন প্রায় সমস্ত সময়টাই একসঙ্গে কাটছে, বন্ধু হয়ে গেছেন খুব, মিসেস ওটাও ঘর সংসার ফেলে মোটামুটি আমাদের সঙ্গেই কাটান। বাড়ি শহর থেকে অনেক দূরে, একবার বেরিয়ে এলে ফেরেন একেবারে সন্ধ্যায়। খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে নেই, যে কোনো ভোজনালয়ে গিয়ে বসলেই হলো। সস্তা চাও সস্তা, দামী চাও দামী, সব খাবারই সমান খাঁটি।

মিসেস ওটাকে ফোন করে দেওয়া হলো, সময় মতো চলে এলেন তিনি। চারজন একসঙ্গে হয়ে তারপর যাওয়া হলো থিয়েটারে। খুব ভালো আসন পাওয়া গেল সামনের দিকে। বিশাল স্টেজ, আলোয় আলোময়। পিছনে একটি কুটির দেখা যাচ্ছে, ঢালু চাল, সামনে বাগান। অদূরে বাঁশ ঝোপ। কোণের দিকে নিচু পর্দা ঘিরে গোল হয়ে বাজনাদাররা বসেছে, উঁচুতে, বক্সের মতো একটা খোপে দুজন গাইয়ে।

প্রেক্ষাগৃহটি বোধ হয় অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ছিলো, মনে নেই। লোকে লোকারণ্য, একটি আসনও খালি নেই। বোঝা গেল, খুব জনপ্রিয় নাটক। ওটা বললেন, 'কাবুকিই এখানে বেশী চলে। রোজ হয়।' মিসেস ওটা বললেন, 'অনেক দিন বাদে আসা, তোমাদের জন্যই হলো, আর তোমাদের সঙ্গে বসে দেখা তার কি কোনো তুলনা আছে?'

ওটা স্ত্রীর কথাগুলো গুছিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, উচ্ছ্বাস এবং আন্তরিকতার ছবি আমরা চোখে দেখলাম। দর্শকরা স্রোতের মতো এসে এসে নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করছিলেন।

যবনিকা উঠে আছে, পাদপ্রদীপের আলো জ্বলে রয়েছে, বাজনাদারেরা বাজনা শুরু করেছে, এমন সময় প্রেক্ষাগৃহের মধ্য দিয়েই পাশের তক্তা ফেলা রাস্তা বেয়ে কয়েকজন রং মাখা মানুষ পোশাক লুটোতে লুটোতে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। গিয়ে স্টেজে উঠেই অভিনয় শুরু করে দিল। প্রায় সকল জাপানী মেয়ের চেহারাই কোমল, চোখ হাসি আর লজ্জার মিশ্রণে বাঙ্ময়, কিন্তু স্টেজে যে মেয়েরা অভিনয় করছিলো সকলকেই যেন কেমন চোয়াড়ে চোয়াড়ে দেখাচ্ছিলো। ঢং-ঢাং সবই মেয়েদের মতো বটে, গলাও সরু, মাটিতে লুটোনো বিভিন্ন ধরনের দামী দামী সব ওবি পরেছে, তবু তেমন খুলছে না।

প্রফেসর ওটা হাসলেন। বললেন, 'এরা তো সব পুরুষ। তবে নাটকের পুরুষ।'

'ও মা পুরুষ? নাটকের পুরুষ মানে?'

'এদের আলাদা এক শিক্ষালয়ে রাখা হয়, সেখানে সমস্তক্ষণ এরা মেয়েদের ভঙ্গি করে, কথা বলে, গলা সরু করে, মেয়েদের পোশাক পরে থাকে, এই করতে করতে মনে প্রাণে এরা মেয়ে হয়ে যায়। কিন্তু দাড়ি তো ওঠে, আর হাড়ও চওড়া, সেজন্যই যা মুশকিল।'

আমি তো অবাক!

আরো শুনলাম, এই নাটকের যিনি প্রধান নায়িকা তিনি নাকি এখন জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী অভিনেতা। তাঁর অভিনয় দেখে দর্শকরা একেবারে মুগ্ধ। দেখতে দেখতে কখনো হরষিত, কখনো দুঃখিত, কখনো উত্তেজিত হ'য়ে উঠছে। ভগবান জানেন, কী হচ্ছিলো আর না হচ্ছিলো। আমার কেমন ভয় ভয় করছিলো। তার মধ্যে হঠাৎ ঐ উঁচু খোপ থেকে যখন একজন প্রচণ্ড গলায় গান গেয়ে উঠলো, প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি! তবু ওটা আর মিসের ওটার চোখে চোখে চেয়ে হাসতে হলো, কেননা, ও'রা চোখ দিয়েই বলছিলেন, 'কী চমৎকার, না?'

আমরা এইভাবে বসেছিলাম, প্রথমে প্রফেসর ওটা, তারপর আমি, তারপর মিসেস ওটা, তারপর বুদ্ধদেব। তাকিয়ে দেখি বুদ্ধদেবের গভীর ঘুমে অচেতন মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, আর কিছুক্ষণ ধরে যে একটা একটানা ছোট আওয়াজ শুনছিলাম সেটা তাঁরই নাসিকা নিঃসৃত। আমি তাড়াতাড়ি মিসেস ওটার পিছন দিয়ে হাত বাড়িয়ে লুকিয়ে ধাক্কা দিলুম।

গল্পটা আবার সাংঘাতিক বড়ো, শেষই হয় না। বুদ্ধদেবও যেমন তার দুর্দমনীয় ঘুমকে রুখতে পারছিলেন না, আমিও আমার অস্বস্তিকর অনুভূতিকে কিছুতেই দূর করতে পারছিলাম না। আর গান যখন ভয়ানক ঘন ঘন হতে লাগলো তখন আমার একেবারে হার্টফেইল করার দশা। শেষ পর্যন্ত লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে অর্ধেক দেখেই উঠে পড়লাম শরীর খারাপের অজুহাতে।

পরের দিন বুদ্ধদেবের রেডিওতে বক্তৃতা ছিলো, সেটাই জাপানে সেবারকার মতো শেষ বক্তৃতা। অনেক আদর আপ্যায়ন করলেন তাঁরা, তাঁদের প্রযুক্তি বিদ্যার চরম প্রকাশের অনেক নমুনা দেখালেন নিচে যন্ত্রপাতির ঘরে নিয়ে গিয়ে, বক্তৃতার সম্মান মূল্য হিসেবে ইয়েন (জাপানি মুদ্রা) না দিয়ে একটি উচ্চ মূল্যের সোনি ট্র্যানজিস্টার উপহার দিলেন।

টোকিও হোটেলের নিচে, বেসমেণ্টে মস্ত বড়ো শপিং সেণ্টার, আমি সুযোগ পেলেই সেখানে গিয়ে ঘোরাঘুরি করতাম, তার আগেই সেখান থেকে টুকটুকে লাল আর কালো বর্ডারের একটি দেশলাইয়ের সাইজ থেকে সামান্য বড়ো ট্র্যানজিস্টার কিনে ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রেখেছিলাম। এখন তাড়াতাড়ি আবার নিচে গিয়ে ওটা বদলে একটা ট্র্যাভলিং ওয়াচ কিনলাম, ঐ সাইজেরই—ঐ রকমই টুকটুকে লাল। বুদ্ধদেব অবাক হয়ে বললেন, 'ওরা দিল ?' দিল মানে ? শুধু গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু কিন্তু হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বদলানো সম্ভব কিনা, অমনি ছেলেটি আমাকে দশটা ঘড়ি দেখালো। কী দিয়ে যে কী করবে তা যেন ভেবেই পায় না। এদের ভদ্রতার তুলনা নেই।

কেটে গেল দশটা দিন, বলা যায় একেবারে দেখতে দেখতে। যাবার দিন প্রফেসর ওটা ফোন করলেন, সেই সময়ে তাঁর ক্লাস, এয়ার পোর্টে যেতে পারছেন না, খুব দুঃখ। যেন চিঠি লিখি, যেন মনে রাখি। এয়ার পোর্টে গিয়ে দেখি শহরের কোন্ সুদূর প্রান্ত থেকে তাঁর স্ত্রী এসে বসে আছেন লাউঞ্জে। পোশাক

পরিপাটি নয়, চুল বাঁধা নেই, বললেন, 'রান্না করতে করতে চলে এলাম। মনে হ'লো আবার কবে দেখা হবে অথবা হবে না কে জানে। তবে ঠিক করেছি, আমরা একবার ভারতবর্ষে যাবো। যাবোই।'

ঠেকে ঠেকে থেমে থেমে শব্দ দিয়ে দিয়ে না জুড়েও এই কথাগুলো তিনি আমাদের ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে আলিঙ্গন করলেন।

পরের বছর তাঁর স্বামী সত্যিই ভারতবর্ষে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি আসেননি। আমরা খুব অভিযোগের সুরে বললাম, 'মিসেস ওটাকে কেন নিয়ে এলেন না!' প্রফেসর ওটা চুপ করে থেকে চোখ নিচু করলেন, বললেন, 'উপায় ছিলো না।' তারপর উপর দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'উনি এখন ঐখানে।'

সৌন্দর্য ও সুরুচির প্রতিযোগিতায় জাপান বোধ হয় সারা জগতকেই টেক্কা দিয়েছে। অবশ্য সমস্ত কাজেই তাদের পটুত্ব অপরিসীম। শুধু তো শিল্পকলাতেই পারদর্শী নয়, সৌন্দর্যপ্রিয়তাই একমাত্র নয়, প্রযুক্তি-বিদ্যায়ও তারা ভুবন বিখ্যাত। তাদের বিমানে উঠে সেই ধারণা আরো বদ্ধমূল হলো।

টোকিও থেকে যাচ্ছি হাওয়াই দ্বীপে, হনলুলুতে, জাপান এয়ার-লাইনস্-এ। বিমানটি সর্বরকম সুখের সম্ভারে পরিপূর্ণ। আসনে বসে সামনের চিত্রবিচিত্রিত সাটিনের খোপে হাত দিলে অজস্র পত্রিকা। তার নানা ধরন, নানা চেহারা, নানা চরিত্র এবং নানা ভাষাও। শু্য খুলে পদযুগলকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেবার জন্য, মসৃণ ঘাসের চটি আছে, প্রয়োজনবোধে হাওয়া খাবার জন্য ছবি আঁকা হাতপাখা আছে, ন্যাপকিন আছে, আরো কি টুকিটাকি আছে অন্ত নেই। আসনের গদি অতিশয় আরামদায়ক। এবং ঘন রং নতুন সিলকের আবরণে সুসজ্জিত, মিলিয়ে জানলায় কুচিদার পর্দা। ঢুকেই সুগন্ধ, চলতে গেলে অ্যালির কার্পেটে পা ডুবে যায়।

বসতেই ট্রে-ভর্তি স্টীমে গরম করা ধোঁয়া-ওঠা ছোটো ছোটো নিংড়োনো তোয়ালে নিয়ে এলো হাত-মুখ মুছে টাটকা হ'য়ে নেবার জন্য। তারপরেই ছবির চেহারায় জাপানি মেয়ে ফলের ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে এলো লতিয়ে লতিয়ে। ফোলা ফোলা চোখে মিষ্টি হেসে সাধাসাধি করলো। তারপরেই অন্য মেয়ে এলো পানীয় নিয়ে। পানীয়ের অসংখ্য রকমভেদ। তারপরে টফি চকোলেট বিস্কুট ইত্যাদি আরো যে কতো কিছু আনলো ঠিক নেই।

ছেলেবেলায় মুখ ভার করলেই আমার ঠাকুমা হেসে বলতেন, 'যাও, রাগ ক'রে এখন হনলুলুতে গিয়ে বসে থাকো।' হনলুলুতে কেন গিয়ে বসে থাকবো, এবং সে স্থান কোথায় এ আমার বোধের অগম্য ছিলো। আমি নিজেকে হনুমানের সঙ্গে একাত্ম ক'রে ভাবতাম, আমাকে বোধ হয় গাছের ডালে গিয়ে বসে থাকতে বলছে। তখন আমার ভারি মুখ অপমানের আঘাতে অশ্রুজলে সিক্ত হতো। দাদা জাতীয় কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ বালক আমাকে প্রবোধ দিয়ে বলতো, 'দূর বোকা, হনলুলু একটা দ্বীপ। তার চারদিকে মহাসমুদ্র। সেই দ্বীপে কেউ কখনো যেতে পারে না। শুধু পরীরা জ্যোৎস্না রাত্রে খেলতে আসে।' বালকটি বোধ হয় কল্পনাপ্রবণ ছিলো, কাজেই পরীদের খেলতে এনেই সে নিবৃত্ত হতো না। বাড়াতে বাড়াতে গল্প এমন জায়গায় নিয়ে আসতো যে সত্যিই সেই স্বর্গের দ্বীপে যাবার জন্য আমার মন কেমন করতো।

এমন অনেক কিছু আছে যা বাস্তবে অসত্য হলেও কল্পনার স্বপ্ন, স্বপ্ন হয়েই থাকতে চায় মনের মধ্যে। হাওয়াই দ্বীপের এই হনলুলু শব্দটাও আমার মধ্যে ঠিক সেই অনুভূতি নিয়েই বেঁচেছিলো। প্রশান্ত মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে দিতে কতোকাল বাদে মনে পড়লো সে কথা।

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ দেখি ঝকঝকে চোখ ধাঁধানো বেলা তিনটের প্রচণ্ড সূর্য সহসা অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল। আলো জ্বলে উঠলো ভিতরে, ঘোষণা করা হ'লো, এখন রাত দশটা। আমরা ন্যাশনাল ডেটলাইন পার হচ্ছি। কী কাণ্ড! আমি একেবারে তাজ্জব।

যখন গিয়ে হনলুলুতে পেঁছুলাম, তখন মধ্যরাত নেমেছে সেখানে। আমার ঘড়ি আমি মিলিয়ে নিইনি, তাই জাপানের সময়ে রাত আটটা, বুদ্ধদেব মিলিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর ঘড়িতে দুটো বেজে কয়েক মিনিট।

যিনি আমাদের এয়ারপোর্টে নিতে এসেছিলেন, হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। আমাদের চিনতে যে কারোরই কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো না, তার কারণ বোধ হয় শাড়িপরা আমি। আমার পোশাক দেখেই ওঁরা বুঝে ফেলেন কোন্ দেশ থেকে আসছি।

অত রাত্রে বন্দরটা থমথম করছিলো। ঘন রাতের একটা আলাদা সুর আছে। কেমন যেন ছেয়ে থাকে চারিদিক অব্যক্ত অনির্দেশ্য এক গভীর বেদনায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে যতোদূর চোখ চলে আলোর মালা দেখতে দেখতে সেই স্বর্গীয় মর্তভূমিতে পা দেয়া মাত্রই প্রস্তুত ভদ্রলোক দুটি সুগন্ধি ফুলের মোটা

মালা গলায় পরিয়ে দিলেন। নতমস্তকে ঠিক জাপানী প্রথাতেই অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'আমি ইয়ুনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আসছি, মিসেস ওয়াটুমল আমাকে পাঠিয়েছেন।'

ওয়াটুমল ফাউণ্ডেশন এখানে বিখ্যাত। তাদের দ্বারাই এখানকার প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত।

অত রাত্রে আমরা ছাড়া আর দু-একজনই নামলেন। চটপট পার হ'য়ে গেলেন চত্বর। দেখলাম, কয়েকজন মহিলা ঘোরাফেরা করছেন, তাঁরা সবাই স্থুলাঙ্গী, ঘন রং ছোপকা ছোপকা ঢোলা পোশাক পা পর্যন্ত লম্বা, গলায় ফুলের মালা। সে মালা গাঁদা ফুলের। বোঝা গেল, এই মেয়েরা এই দ্বীপেরই বাসিন্দা, গায়ের রং শ্যাম, ত্বক কোমল, মাংসল মুখ সারল্যে ভরা। সবাই খুব হাসিমুখে চলাফেরা করছিলো। বন্দরকর্মী হবে হয়তো। আমাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলো, তারপর পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়লো হাসিতে। পরে দেখেছি এরা সব কিছুতেই এরকম হাসে, সাঁওতাল মেয়েদের মতো। এদের মনে খুব সুখ।

টোকিওর ঐ ভীষণ শীতের পরে এখানে নেমে চমৎকার দক্ষিণের হাওয়া। না-শীত না-গরম, ফুরফুরে বসন্তে শরীর মন জুড়িয়ে যাচ্ছিলো।

আমাদের ভারি স্যুটকেস দুটি ভদ্রলোক অকাতরে দু' হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলতে চলতে বললেন, 'আসুন।'

উনি মালবহন করাতে আমরা ভয়ানক সংকুচিত বোধ করছিলাম। কিন্তু দু'টো তো দূরের কথা একটা স্যুটকেস বহন করার মতো শক্তিও আমাদের ছিলো না। আমাদের এই অর্থে বলছি, ভ্রমণে বেরিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দু'জনে দু'দিকে ধরাধরি করে অনেক মালপত্র টানাটানি করেছি, কিন্তু এ দুটো এতো ভারি হ'য়ে গেছে যে তা-ও পারবো বলে মনে হচ্ছিলো না। একজন পোর্টারের জন্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম, উনি মুখ ফিরিয়ে হেসে বললেন, 'লাভ নেই, এতো রাত্রে কোনো পোর্টার পাওয়া যাবে না। আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।' বলে অবলীলাক্রমে হনহন ক'রে চলতে লাগলেন। অগত্যা আমরা পিছনে।

বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। সোনার মতো উজ্জ্বল পিতলের তকমা আঁটা ড্রাইভার নত হ'য়ে সম্ভাষণ জানিয়ে হাসিমুখে দরজা খুলে ধরলো, আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম। গাড়ি বিমানবন্দরের সীমানা ছাড়ালো।

শহরটি যদিও তখন প্রায় শেষ রাত্রির নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন, পথে কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন ছিলো না, কিন্তু আলোয় আলোময়। মনে হয় যেন কোনো

উৎসবের রাত। চলতে-চলতেই পার্ক বাগান গাছের সারি সেই ঔজ্জ্বল্যে দৃশ্যমান হয়ে দৃষ্টিকে নন্দিত করছিলো।

আমরা নিদ্রাকাতর ছিলুম না, কেননা আমাদের আইন মতো তখন তো মাত্র সন্ধ্যা। কিন্তু ভদ্রলোকটি ঘুম ছেড়ে উঠে এসেছেন, লুকিয়ে হাই তুললেন। সেই লজ্জা ঢাকতেই আলাপ করলেন টুকটাক, 'এই প্রথম?'

'এই প্রথম।'

'মিসেস ওয়াটুমল আপনাদের সম্ভাষণ জানিয়েছেন।'

'অনেক ধন্যবাদ। আশা করি কাল ওঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই। আজ এতো রাত বলে—'

'না না, আজ তো কোনো কথাই ওঠে না।'

'ইনটারন্যাশনাল ডেটলাইন পার হওয়াটা খুব অদ্ভুত লাগে, তাই না? ঐ দেশ যখন রাত্তিরে পেঁছুবে ওখানে তখন মাত্রই সকাল। তা একটা দিন বেশী পাবেন ক্যালেণ্ডারে।'

'এ বয়সে একটা দিন বেশী পাওয়াও মন্দ পাওয়া নয়।'

এরপর একটু সম্মিলিত হাসি। জরুরী কথায় এলেন শেষে। অর্থাৎ কখন কী প্রোগ্রাম সব জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'টেগোর বিষয়ে আপনার বক্তৃতার জন্য, ভারতবর্ষ বিষয়ে কিছু শোনবার জন্য আমরা ছাত্র মাস্টার দেশবাসী সকলেই খুব উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি, উত্তেজিত হ'য়ে আছি। কাল মিসেস ওয়াটুমল নিজে এসে আপনাদের ডিনারে নিয়ে যাবেন।'

এখানকার লোকেরা বোধ হয় খুব ঘন রংয়ের ভক্ত, ভদ্রলোকের সার্টটিও লাল-নীল-সবুজ-হলুদ সব রংয়ের সমাবেশে সমৃদ্ধ। গলায়ও একটি রঙিন রুমাল বাঁধা। দেখতে ভারি সুন্দর। এখন এটাই দেশ, আসলে জাপানী বংশোদ্ভূত। আর গায়ের শক্তি দেখে ভাবলাম নিশ্চয়ই যুযুৎসু-টুযুৎসু করা অভ্যাস আছে।

আমরা ওয়াটুমল ফাউণ্ডেশনেরই অতিথি। এখন মিসেস ওয়াটুমলই এই ফাউণ্ডেশনের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। মিসেস ওয়াটুমল আমেরিকান, কিন্তু তাঁর স্বামীর আদি পুরুষ ভারতীয়।

রাত্রিবেলার নির্জন হনলুলু দেখতে দেখতে, অথবা একটি বৃহৎ স্বর্গোদ্যান দেখতে দেখতে একসময়ে গন্তব্যে পেঁছে গেলাম। একটি দোতলার ফ্ল্যাটে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে লাল গালার পালিশ করা মস্ত দরজা চাবি ঘুরিয়ে খুললেন ভদ্রলোক। ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিলো,

এমাথা ওমাথা বিশাল একটি হলঘর, তারই মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে বসবার ঘর শোবার ঘর রান্নাঘর সব ভাগ করা হয়েছে। সাজাবার পদ্ধতিতে, মূল্যবান পর্দার স্বচ্ছ পার্টিশনে বিভক্ত বৃহৎ কক্ষটি প্রায় চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

ক্লসেটে স্যুটকেস দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন। এখানে স্বচ্ছ নেটের পর্দার ব্যবধানে খাবার টেবিল পাতা আছে বটে কিন্তু তারপরেই সূক্ষ্ম চিকের পর্দা সরিয়ে এক আশ্চর্য জগৎ। সমস্ত রান্নাঘরটি একটি দেয়ালের খাঁজের মধ্যে অবস্থিত। ফ্রীজ এবং গরম জল ঠাণ্ডা জলের সিঙ্ক থেকে শুরু ক'রে উনুন, তাক, মিটসেফ, বৈদ্যুতিক গার্বেজ; সব আছে সেখানে। আমি চমৎকৃত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলুম। ফ্রীজ খুলে উনি থরে থরে সাজানো খাদ্যদ্রব্য প্রদর্শন করলেন। মাছ মাংস ডিম দুধ ফল সবজি—না আছে এমন ভোজ্যবস্তু বাকী নেই। বললেন, 'সবই রান্না করা, শুধু চা বা কফি যদি খান, তাহলে গ্যাসের চাবি খুলে করে নেবেন। এইখানে সব বাসন রাখা আছে।' দেয়ালের আর একটি দরজা উন্মোচিত করতে করতে বললেন, 'অ্যাপার্টমেণ্টটা বড্ড ছোটো, মিসেস ওয়াটুমল সেজন্য খুব দুঃখিত, তবে হনলুলুর এই অঞ্চলটাই সবচেয়ে ভালো, এবং একেবারেই ডাউনটাউনের কাছে বলে উনি এখানেই বন্দোবস্ত করতে বললেন। সকালে মেইড আসবে, এই রাতটুকু একটু কষ্ট করে কাটান, ভোর তো হয়ে এলো। সকাল ন'টা নাগাদ গাড়ি আসবে, থাকবে সারাদিন, যেখানে যেতে চান নিয়ে যাবে ড্রাইভার। ছ'টার সময় মিসেস ওয়াটুমল নিজে এসে ডিনারে নিয়ে যাবেন।'

ভদ্রলোক যখন চলে গেলেন, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে তখন। সত্যিই রাত আর বাকী নেই। দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচিতই ছিলো, কিন্তু ঘুমুনো গেল না, আমার ঘড়িতে তো মাত্র নটা। ন'টায় কেউ শুতে পারে? একটু চা খাওয়া যাক। এটা বুদ্ধদেবের প্রস্তাব। বাড়িতে আটটার সময় তাঁর একটা চায়ের বরাদ্দ আছে, একটু সময় সরেছে বটে, কিন্তু তাতে কী? আমিও তাই ভাবছিলাম। অমন সুন্দর রান্নাঘরে কিছু করার জন্য আমার মন আনচান করছিলো।

শুধু চা-ই করলাম না, বেশ ভালো হাতে একটি ডিনার সাজালাম। পলিথিনের লম্বা লম্বা বাক্সে তিন রকমের দুধ সাজানো ছিলো, পাৎলা, ঘন, অতি ঘন। অতি ঘন দুধে ফল দিয়ে চমৎকার ফ্রুট-স্যালাড করলাম। তারপর খাওয়া।

প্লেনে আমাদের ডিনার দিয়েছিলো, খাইনি। খাব কী? ওদের না হয়

দশটা রাত, আমাদের তো তিনটের দুপুর? চা আর স্যান্ডুইচ চেয়ে নিয়েছিলাম। এখন এখানকার ভোর চারটেতে এবং আমাদের রাত দশটাতে ঠিক বাড়ির মতো খাওয়াদাওয়া সেরে তারপর শুতে গেলাম।

পরের দিন সকালে একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠে সামনের দেয়ালে মস্ত ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তেই যুগপৎ কৌতুক এবং উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, কাল টোকিওতে রোববার ছিলো, আজ এখানে রোববার। আরো লক্ষ করলাম ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি দরজা আছে। পর্দায় ঢাকা ছিলো বলে রাত্রিবেলা দেখিনি। তার মানে, হয় ওপিঠে অন্য কোনো ঘর আছে, নয়তো বারান্দা। দরজাটি কৌতূহলবশত তখুনি খুলে দেখি ঠিকই অনুমান করেছি। ঘর নয়, অর্ধেক ঢাকা অর্ধেক খোলা প্রশস্ত এক ঝুল-বারান্দা। ঢাকা অংশে চমৎকার বসবার ব্যবস্থা সাজানো, খোলা জায়গায় আসতেই প্রচণ্ড হাওয়া ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো শরীরে। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই এই হাওয়া অনুভব করেছিলাম, কিন্তু এতো বেগে নয়। নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠলো শাড়ি, চুল উড়লো, তারপরেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সমুদ্র সমুদ্র।'

'কোথায়?' বুদ্ধদেবও উঠে এলেন, তারপর আর কারো মুখেই কোনো কথা নেই। কে জানতো মাত্র এক ব্লক দু' ব্লকের ব্যবধানেই এই মহান দৃশ্য অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের জন্য। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগর দর্শন যেন ঈশ্বর দর্শনের অনুভূতিতে নিয়ে গেল।

মেইড এলো। কালকে বিমানবন্দরে দেখা মহিলাদের মতোই মস্ত ঘেরের লম্বা পোশাক, যে পোশাকের নাম মুমু, সে রকমই বড়োসরো থলথলে চেহারা, চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। আমাকে দেখে যেন খুশি ধরে না, যেন কতোকালের চেনা। আয়াস করে ধীরে আস্তে সিগেরেট টানছিলো, বুরবুর করে নিজের ভাষায় সে অনেক কথা বললো, তারপর কাজে লেগে গেল।

ন'টা বাজে, গাড়ি আসবে, আমরাও তৈরি হয়ে নিচ্ছিলুম।

বেরুতে বেরুতে প্রায় দশটা বাজলো। প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলুম। খুব সুন্দর ঢালু তীর, সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে বালি, রঙিন রঙিন ছাতার তলায় রঙিন রঙিন শিশুরা খেলাধুলা করছে, মা-বাবারা উন্মুক্ত হ'য়ে শুয়ে আছে সূর্যের তলায়। সবাই আমেরিকান। কেউ কেউ বোটে করে মাছ ধরতে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রে, কেউ জলে ঝাঁপাচ্ছে, কেউ বেড়াচ্ছে, দু'তলা তিনতলা সমান উঁচু উঁচু বিশাল তরঙ্গ গড়িয়ে এসে ভেঙে

পড়ছে তীরে, জল ছিটকে যাচ্ছে চারিদিকে, মস্ত মস্ত উপলখণ্ডের মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ফেটে যাচ্ছে ক্রুদ্ধ গর্জনে।

তীরের উপরে যেখানে বড়ো রাস্তা, সেখানে ঘন সন্নিবিষ্ট নারকেল গাছের সারি, তার ফাঁকে ফাঁকে বাগানঘেরা ছোটো ছোটো রেস্তোরাঁ, সবই প্রায় বাঁশের তৈরি, মাথায় রঙিন চাল ; তার নানা ধরন। ভিতরে ঢুকলে মনে হয় সাজানো খেলাঘর। সিলিংয়ের ছবি, দেয়ালের রং, ঝাঁপের মতো জানালা, গালা দিয়ে ছোপানো কাঠের রেলিং, সবই যেন এক কল্পনারাজ্যের প্রতিবিম্ব।

অনেক ঘোরা হলো। ফুলের বাগান সর্বত্র। এবং সব বাগানই মনুষ্য নির্মিত নয়, প্রকৃতিদত্ত বাগানও যত্রতত্র, এরা সংরক্ষণকারী। বোগানভেলিয়া আলো করে আছে সারা শহর। ফুলে ছাওয়া গাছে-গাছে পাখির মেলা। মাঝে মাঝে যখন ঝাঁক বেঁধে ওড়ে, মনে হয় রাশি রাশি ফুল ছড়িয়ে গেল বাতাসে। ড্রাইভারটি বললো, পাখি এখানে অপর্যাপ্ত, এবং অনেক রকম। এবং এদের গানও ভারি মধুর।

আর একটি জিনিস ভারি সুন্দর। ওখানকার ঘাস। কী যে সরু আর কী যে সবুজ বলা যায় না। কী ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা স্পর্শ, কী মদির গন্ধ। শহরের যে-কোনো জায়গার ঘাসই ঐরকম। সব ঘাসই মনে হয় কল দিয়ে ছেঁটেকেটে লন করে রাখা হয়েছে। কিন্তু না। নিজে থেকেই ওরা ওরকম।

একটু দূরে দূরেই জাপানের মতো সপিং সেণ্টার। ঘাসের কাজ, কাঠের কাজ আর বাঁশের কাজে এঁরা দক্ষ। এখানকার চিত্রশালা ক'টিও দর্শনযোগ্য। 'হনলুলু অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস' এবং 'বিশপ মিউজিয়াম হাউস' দুটিই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। পুরোনোকালের রানীর বাড়িতে 'রানী এমা মিউজিয়াম'টি খুব ইনটারেস্টিং। বাড়িটিই দেখার মতো। তাছাড়া রানীর জীবনযাপনের নিয়মকানুনের অনেক স্মৃতি সেখানে বর্তমান। ব্যক্তিগত অনেক জিনিসপত্র আছে এবং সেসব যেন জীবন্ত ইতিহাস।

চীনে জিনিসের খুব প্রচলন দেখলাম। পাওয়াও যায় অজস্র। ওয়াটুমল স্টোর বিখ্যাত, সেখানে থরে-থরে চীনে জিনিস সাজানো। বেচা-কেনা সবই ডলারে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা হ'লো অনেক। পথেই লাঞ্চ সেরে নিয়েছিলাম, এবার একটু হাত-পা ছড়িয়ে নেয়া।

ছ'টার কিছু আগেই মিসেস ওয়াটুমল এসে গেলেন। বাইরে গাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন, আমরা নেমে গেলাম। বললেন, 'আগেই এলাম, আমাকে একটু আমার ছেলের বাড়ি ঘুরে যেতে হবে।'

মহিলাটি বয়স্কা, দেখতে খুব ভালো না হলেও চলনে-বলনে অভ্যস্ত রাজকীয় ছাপ। হাল ফ্যাশানের দামী পোশাক পরেছেন, গলায় বড়ো বড়ো খাঁটি মুক্তোর মালা। সাদা মুক্তো নয়, জাপানের কালো মুক্তো, যার নাম 'ব্ল্যাকপার্ল'।' দারুণ আলাপী। ছেলের বাড়ি যাবার পথটুকুতেই যে কতো কথা বললেন তার ঠিক নেই। হাতে একটা বড়ো কেকের বাক্স, নাতির জন্মদিন, এই উপহারটি দিতে যাচ্ছেন সেখানে। আমার দরিদ্র ভারতীয় হৃদয় একটু দোল খেলো কোটিপতি সম্রাজ্ঞী ঠাকুমার এই উপহার দর্শনে। আমি তো ইতিমধ্যেই আমার দেড় বছরের খুদে নাতনীর জন্য কতো যে কিছু সংগ্রহ করেছি তার ঠিক নেই।

ছেলের বাড়িতে ওটা পেঁাছে দিয়ে একবারের জন্য নিজের বাড়িতে এলেন। আমাদের নিয়ে আসার জন্যই এলেন। বললেন, 'এতো কম সময়ের জন্য এসেছো যে আর তো এখানে আসার সময়ই হবে না তোমাদের। একটু এসো, এক কাপ কফি খেয়ে নাও।'

বাড়িটি একেবারে পাহাড়ের চূড়োয়, বারান্দায় বসে সমস্ত দ্বীপটি চোখে পড়ে, সমুদ্র সুদ্ধু। লনে বাগানে জল দিচ্ছিলো মালি, দেখলাম শাড়িপরা ছিপছিপে লম্বা একটি মেয়ে ঘুরছে সেখানে। কাজ করাচ্ছে মালিকে দিয়ে। মিসেস ওয়াটুমল পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার স্বামীর নিস্' হয় সম্পর্কে, এখানে এসেছে আমার কাছে থাকতে, নাম রুক্মিণী।'

কথা বলতে বলতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি আমার সাজ পোশাক অলংকার এইসব দেখছিলেন। আপসোস করছিলেন কখনো স্বামীর দেশে যাননি বলে। ভারতবর্ষ বিষয়ে তাঁর অলৌকিক ধারণা।

আমি বললাম, 'গেলে তো হয়।'

উনি বললেন, 'কোথায় আর হলো? আমার স্বামী বলতেন, আধ্যাত্মিকতায় সে দেশ মহান। গেহানন্দকে চেনো? তাঁর নাম জানো? উনি অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন, যোগ শিখে এসেছেন। মস্ত বড়ো সন্ন্যাসী।'

ঘড়ি দেখে উঠে পড়লেন, 'চলো চলো, সময় হয়ে গেছে।'

ওয়াটুমলের বাড়ি বাঁশ কাঠের নয়, পাথরের প্রাসাদ। সেখান থেকে নিচে

নামতে নামতে পিছন ফিরে তাকিয়ে যতোদূর চোখ চলে তাঁর বাড়ির চৌহদ্দিই দেখতে পেলাম।

যেখানে খাওয়াতে নিয়ে এলেন, ঝোপ ঝাড় বাঁশবাগান ডোবা ইত্যাদি নিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ। আসলে এটা একটা জঙ্গলই। সেটাকেই বিন্যস্ত করে এক মহামূল্য রেস্তোরাঁতে পরিণত করেছে। বুনোফুলের গাছগুলোকে পাথরে ঘিরিয়ে রোপিত ফুলের 'বেডে' পরিণত করেছে, আগাছাগুলো না উপড়ে কেটে ছেঁটে এমন সুন্দর সুন্দর সব জন্তু জানোয়ারের চেহারা তৈরি করেছে যে মনে হয় গৃহপালিত জীবেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়ো বড়ো নাম-না-জানা গজিয়ে ওঠা গাছেদের ছোট বড়ো মাঝারি সাইজ করে কৃষিবিদ্যার দৌলতে ঠিক পাহারাদারদের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছে, খানাখন্দগুলোকে পর্যন্ত ভরাট করেনি, তেমনিই রেখে জল ভরে ভরে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে খাল বিলের মতো একটার সঙ্গে আর একটার যোগাযোগ ঘটিয়ে কোণের দিকের বড়ো এঁদো এক ডোবায় নিয়ে মিলিয়ে দিয়ে চমৎকার হ্রদের চেহারা করেছে। সেখানে রঙিন ডিঙি আছে, চালাতে পারো, লাল সাদা শাপলা আর জলপথের বনে হারিয়ে যেতে পারো, আবার গাছের গুঁড়ি ফেলা ধাপ ধাপ সিঁড়িতে বসে শোভাও দেখতে পারো। গাছের ছায়ায় বসারও বন্দোবস্ত আছে, প্রণয়ী-যুগলের আড়াল হবার জন্য মাটির কুটির পর্যন্ত আছে। রেস্তোরাঁটি একটি নিচু টালির ছাদের বাঁশের বাড়ি। চারদিক ঘিরে রেলিং দেয়া প্রশস্ত বারান্দা, সেই বারান্দায় বসেও প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে খাওয়া যায়। ভিতরে তো আছেই।

হনলুলু থেকে বেলা সাড়ে বারোটায় বিমান ছাড়লো। তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সানফ্রানসিসকোতে পেঁছিতে পেঁছিতে রাত দশটা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই প্রথম বন্দর যেখানে আমাদের কেউ নিতে আসেনি। আসার প্রশ্নও নেই। এখানে কোনো কাজে আসেননি বুদ্ধদেব, নিউইয়র্কে যাবার পথে একদিন বেড়িয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

হোটেল আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো, বাইরে এসে একটা ক্যাব ধরে সহজেই সেখানে পেঁছোনো গেল। অন্যান্য বন্দরে যেমন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, বলাই বাহুল্য, এখানে সেটা সম্ভব হলো না। হবার কথা নয়, এখানে আমাদের নিজেদের দায় নিজেদের। স্যুটকেস দুটি নিয়ে একেবারে গলদঘর্ম। টেনে-হেঁচড়ে দু-বারের চেষ্টায় মাল নিয়ে যখন কাসটমস-এর

বিধিনির্দেশ পেরিয়ে ট্যাকসিতে এসে উঠে বসলাম, যেন যুদ্ধ জয় করার আনন্দ হলো।

এই রাত্রিবেলা এই অচেনা শহরে পেঁছে কোনো তৃতীয় সঙ্গীকে অভ্যর্থনায় এগিয়ে আসতে না দেখে আমাদের দু-জনেরই বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। খারাপ যে হবে এটা কিন্তু আগে ভাবিনি। আগাগোড়াই যদি এভাবে দেশ ভ্রমণ করতুম তা হলে নিশ্চয়ই এই অভাববোধ হতো না। দেখা যাচ্ছে অভ্যাস বড়ো চরিত্রনাশক। স্বজনদের জন্য ভুলে থাকা বিরহবেদনা তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে দাঁড়ালো। ভাবলাম হোটেলে পেঁছেই লম্বা লম্বা চিঠি লিখবো তাদের।

হোটেলটি জাঁদরেল। তার জাঁকজমক খাদ্য মদ্য আলো সবই প্রায় 'আমাকে দ্যাখো' গোছের। নাম 'মার্ক-হবকীন'। ক্যাব থেকে নামতেই পোর্টার ছুটে এলো, পাপোষে পা দিতেই দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকে এই বিলাসী আবহাওয়ায় শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষীণ দুটি বঙ্গদেহ বেশ চাঙা হয়ে উঠলো। খানিক দূর হেঁটে গিয়ে কাউণ্টারে দাঁড়াতেই 'ইনচার্জ' ভদ্রলোকটি চোখে চোখে হেসে সম্ভাষণ করলেন, গমগমে গলায় ফুর্তি মিশিয়ে বললেন, 'তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, এবার আমার আজ রাতের জন্য ডিউটি শেষ।'

আমার দিকে আপাদমস্তক তাকালেন, 'কোন দেশ থেকে?'

'ভারতবর্ষ।'

'ভালো। খুব ভালো।' মুখ তুলে নাকি সুরে একটু ঢেউ দিয়ে ডাকলেন, 'জিইম—'

ভারি সুন্দর একটি কিশোর ছুটে এলো, উনি ঘরের চাবি দিয়ে বললেন, 'যাও, পেঁছে দিয়ে এসো।'

আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবার কাল সকালে দেখা হবে, কেমন?' মুখে হাসির বিরাম নেই। হাত ঝাঁকালেন জোরে জোরে। বেশ লাগলো।

জিমের মুখেও হাসি। ওরা অতিথিদের দিকে তাকিয়ে ওরকমই হাসে, এই হাসি ওদের চর্চার ফল, শিক্ষার অঙ্গ। মুখে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন, বিরক্তির চিহ্ন কিছুতেই ফুটতে দেয় না। অন্যের চোখের পক্ষে সেটা অত্যন্তই প্রীতিপদ।

মস্ত লবি পেরিয়ে অনেক এলিভেটরের কোনো একটার কাছে জিম নিয়ে এলো আমাদের। আরো অনেকের সঙ্গে ঢুকে, সোঁ করে ষোলোতলায় উঠে এলাম। ছেলেটি জিনিসপত্র সব ক্লোসেটে ঢুকিয়ে তেমনিই হাসিমুখে বিদায় নিল।

খাওয়া-দাওয়া তো প্লেনেই সারা হয়েছে, ক্লান্তিও লাগছিলো, রাতও হয়েছে বেশ, এবার শুয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু এখানে মাত্রই এক রাতের অবস্থান বিবেচনা করে সামান্য হাত-পা ছড়িয়ে নিয়েই আবার নিচে নেমে এলুম। উদ্দেশ্য কোথাও যাওয়া। হোটেল থেকেই কোনো বাস রাতের শহর দেখাতে নিয়ে যায় কি-না, অথবা নিজেরাই যদি যাই, কোথায় কোন্ ক্লাবে যাওয়া যায় এসব খবর নেবার জন্য আবার কাউন্টারে এলাম। এবার অন্য লোক বসে বসে একটি গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ছে দেখলাম।

জিজ্ঞেস করতেই প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললো, 'না না, আমাদের এখান থেকে এখন কোনো বাস ছাড়ে না রাত্তিরে। কদিন যা বৃষ্টি, দেখছেন তো শহরের হাল। আর নিজেরা একা যাবেন? প্রশ্নই ওঠে না। নাইট ক্লাবে কী দেখবেন? স্ট্রীপটীজ! সানফ্রানসিসকো থেকে পুলিশ সে পাপ দূর করেছে।' বলেই বড়ো বড়ো গলায় হাসতে লাগলো। খুব পরিতৃপ্তির হাসি। যেন বেশ এক হাত নিলেন।

অগত্যা এক কাপ চা বা কফি পাওয়া যেতে পারে কিনা তাই জিজ্ঞেস করা হলো। তখন উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমাদের বার সারাদিন সারারাত খোলা থাকে, সেখানে এসব পানীয়েরও বন্দোবস্ত আছে। একি একটা যেমন তেমন হোটেল? জানেন তো ক্রুশ্চেভ এসেও এই হোটেলেই উঠেছিলেন।'

আগের ভদ্রলোকের মতোই নাকি সুরে ঢেউ তুলে সেই জিমকেই ডাকলেন। ছুটে এলো জিম। নির্দেশমতো নিয়ে গেল আমাদের একেবারে সর্বোচ্চতলে। এসে দেখি একেবারে কিন্নর-কিন্নরীদের লীলাখেলা! আমোদের অব্যাহত স্রোত তরল বেগে বয়ে যাচ্ছে। রাত বারোটা কী! মনে হয় সবে সন্ধে।

বাজনা বাজছে, নাচ হচ্ছে, খাবার খাচ্ছে, প্রেম করছে। মহা হুল্লোড়। কোণের দিকে একটু নিরিবিলিতে একটা টেবিলে বসে এইসব দেখতে দেখতে দু কাপ চা খেয়ে চলে এলাম খানিকক্ষণ বাদে।

ভাগ্য প্রসন্ন ছিলো, পরের দিন সকালে সুন্দর রোদ উঠলো। মেইড এসে ঘরদোর ফিটফাট করে দিল, পর্দা সরিয়ে দিতেই আলোয় ভেসে গেল ঘর। কাঁচের বাইরে তাকিয়ে দেখি ষোলোতলার উপর থেকে ছড়ানো ছিটোনো খই মুড়ির মতো সারা শহরটা ঝক ঝক করছে পাহাড়ের ধাপে ধাপে। দূরে সমুদ্র ঘিরে আছে চারদিক। সমুদ্রের মাঝে মাঝে দ্বীপ, দ্বীপের মধ্যে অস্পষ্ট সব ছোটো

ছোটো শহরের আভাস। জলের বুক থেকে দৈত্যাকৃতি লালচে রং পাহাড় উঁচিয়ে আছে যেখানে সেখানে। যে দ্বীপটির বাড়িঘর অপেক্ষাকৃত একটু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যেখানে কড়ে আঙুলের মতো ছোট্ট কোনো অবয়বকে নড়তে চড়তে দেখে মনে হচ্ছে মানুষ, পরে জানলাম সেটি একটি কয়েদখানা এবং ওরা কয়েদী।

কয়েদীরা সব ছাড়া আছে সেখানে। পালাবার কোনোই উপায় নেই, চতুর্দিক ঘিরে শুধু জল আর জল আর জল। সেই জল এমন নয় যে কেউ অতিক্রম করতে পারে। সেখানকার জলের ঘূর্ণি এমনিই প্রবল যে নামলেই অতলে টেনে নেয়। দু-একজন যে পালাবার চেষ্টা না করে তা নয়, কিন্তু সেটা সম্ভাবনার পরপারে।

দ্বীপটি খুব ছোটো, ঘর বাড়িও অল্প দু একটি। অতি কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধীদেরই সেখানে নির্বাসিত করা হয়। মেইডটি বললো, জল দেখতে দেখতে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ জনমনুষ্যহীন বৃক্ষলতাহীন বালুবেলায় পরস্পর পরস্পরকে কামড়াতে চায়, কেউ কেউ ঘোর উন্মাদে পরিণত হয়।

কী ভয়ংকর শাস্তি। পরিণতির এই নিষ্ঠুর চিন্তাটাও আমার অসহ্য মনে হলো। মানুষ কী হৃদয়হীন।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে দূর থেকে দ্বীপটিকে একটি শান্তির আশ্রম বলে ভ্রম হচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো, ঈশ্বর সাধনার যজ্ঞভূমি।

মাত্রই কয়েক ঘণ্টার জন্য আসা, বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। ট্যাকসিওলাই পথপ্রদর্শক হলো। অনেক ঘোরালো সে। শহরের কোনো কোনো রাস্তা এমন খাড়া যে যখন উঠছিলো মনে হচ্ছিলো পিছন থেকে পতন অনিবার্য। আবার যখন নামছিলো ভাবছিলাম এক্ষুণি হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে যাবো। অবশেষে বহু বিখ্যাত বহুশ্রুত গোল্ডেন গেটের উপর সে নিয়ে এলো। এই গোল্ডেন গেটটি লম্বায় প্রায় দু'মাইল। সেতুর মধ্যিখানে দুটি চূড়োর উচ্চতা সাড়ে সাতশো ফুট। শোনা গেল এটি তৈরি করতে খরচ পড়েছিলো প্রায় আশি কোটি ডলার। কারিগরি শিল্পে এক বিস্ময় বটে। এপার ওপার করে যখন ফিরে এলাম রওনা হবার সময় হয়ে গেছে প্রায়।

হোক। এখন নিউইয়র্কে গিয়ে পেঁছিতে পারলেই বাঁচি। এই মুহূর্তে সেটাই গন্তব্য, সেখানেই কিছুকালের জন্য স্থায়ী বাস। এক মাস যাবত ঘোরাঘুরি করে দেহ-মন এবার একটু বিশ্রাম চাইছিলো। হোটেলের নিবাস থেকে স্বাধীনভাবে নিজেরা সংসার পেতে বসতে ইচ্ছে করছিলো।

শুনেছি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জন্য ছ-তলার উপরে বেশ ভালো একটি অ্যাপার্টমেণ্ট ঠিক করে রেখেছে, সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব মাত্রই কয়েক ব্লক। অর্থাৎ বুদ্ধদেব হেঁটেই যাতায়াত করতে পারবেন। নিজের বাড়ি দশ হাজার মাইল দূরে, কাছের এই ক্ষণিক বাড়ির জন্যই ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম।

আমি নতুন, বুদ্ধদেব কিন্তু সেখানে আগেও এসে গেছেন, থেকে গেছেন। আমেরিকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বদান্যতা বন্ধুতা সব কিছুতেই তিনি মুগ্ধ। সেই মুগ্ধতা আমার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিলো। আমি দুশো দুই নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে বসে একদিন অন্তর একদিন একটি চিঠির মারফত সব কিছুর খুঁটিনাটিই এদেশ সম্পর্কে জেনে ফেলেছিলুম। আমি জানতাম পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই শহরটি কী পরিচ্ছন্ন, মানহাটানের ঔজ্জ্বল্য কতো চোখ ধাঁধানো, মেসি গিসবেলস নামক দুটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর কী বিশাল, ফীফথ অ্যাভিনিউর জনস্রোত কী উতরোল, গ্রীনিচ ভিলেজের রাত্রি কতো উত্তেজনাময়। লোকজনেরা কী বন্ধুতা সম্পন্ন, খাদ্যসম্ভার কী উপাদেয়—আর সংসার করার আরামের তো কোনো তুলনাই নেই। নইলে তাঁর মতো একজন নির্ভরশীল মানুষও নিজে রেঁধে-বেড়ে খেয়ে বেঁচেবর্তে ফিরে এলো দেশে!

এখন আমি সেই স্বপ্নের দেশে আরামের সংসার পেতে বসতে পারলে সত্যিই বাঁচি।

এখানকার সব এয়ারপোর্টই দেখছি সমুদ্রতীরে। প্লেন যখন নামে তাকিয়ে ভয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। একবার নিরাপদে অবতীর্ণ হতে পেরেছিলাম বলেই যে আবারো ঠিকঠাক মতো প্রাণ নিয়ে নামতে পারবো তেমন ভরসা হয় না। ভাবতেই পারি না ডুবে না গিয়ে আবার পায়ের তলায় কখনো মাটি পাবো। হাজার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করেও মনকে আশ্বস্ত করা যায় না। জানালা দিয়ে যখন জলের ঢেউ প্রায় দেখা যায়, তখন নিজের ভিতরে আর জল থাকে না। অথচ দাঁতমুখ চেপে চোখ বুজতে না বুজতেই ঠক করে শক্ত মাটিতে চাকা ঠেকিয়ে ছুটতে শুরু করে বিমান।

নিউইয়র্কের আইডেলওয়াইল্ড (এখন কেনেডি) এয়ারপোর্টেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটলো। পৌঁছলাম সন্ধ্যা ছ'টায়, রাত্রির ঘন অন্ধকার ছেয়ে গেছে ততোক্ষণে। নেমেই বরফের স্তূপে হুমড়ি খেলাম। পায়ে সৌখিন জুতো,

পরনে হালকা সিলকের লুটানো শাড়ি, হাতে পর্বতপ্রমাণ মালপত্র—ভূমিশয্যায় শয়ান তুষার পর্বতের এই অপ্রত্যাশিত মারাত্মক আদরে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে একজন শ্বেতাঙ্গের হস্তক্ষেপে উদ্ধার পেলাম।

রাস্তায় এসে দেখি অর্ধগলিত, পূর্ণগলিত, বিগলিত বরফের রাশি মানুষ আর গাড়ির চাপে যেমন নোংরা তেমনি কাদা কাদা, তেমনি পথরোধকারী, চলাই দায়। বরফ বলতেই আমাদের চোখে যে শ্বেতশুভ্র একটি ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোনোই মিল নেই। মনে হয় সারা শহর ধ্বংস করে এই ভেজা বালির ময়লা পাহাড় তৈরি হয়ে আসে ভূমিতে। কোনো কোনো জায়গায় ঢেউ খেলানো এই পাহাড় মানুষ প্রমাণ উঁচু। কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলো ঝাপসা, পথ-ঘাট ভালো নজরেও আসে না।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন মিঃ রাসেল স্মীথ আমাদের নিতে এসেছিলেন, আমার অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়ে বললেন, 'এই সময়টা নতুন আগন্তুকদের পক্ষে বড়ো অসুবিধের। আজ সাত দিন কেবল বৃষ্টি আর বরফ, এক ফোঁটা রোদের দেখা নেই, তাই গলছেও না।'

আমি মনে মনে বললাম, এরা তো শুনি সব পারে, ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া বরফ গলাতে পারে না কেন?

প্রায় মনের কথারই প্রতিধ্বনি করে রাসেল স্মীথ আবার বললেন, 'সতেরো ইঞ্চি পুরু বরফে শহর ঢাকা, এমন বরফ চল্লিশ বছরের মধ্যে পড়েনি, সারাদিন বুলডোজার চালিয়ে কোনো রকমে গাড়ি চলার মতো রাস্তাটুকু মুক্ত রাখা যাচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় এর খরচ কতো জানেন?' এই বলে এমন একটা দুঃসহ সংখ্যা বললেন যে ঐ ধনীদেশের রাজকোষও তাতে দরিদ্র হয়ে যাবে। সুতরাং এখন ভগবানই ভরসা। একদিনও যদি ভালোমতো রোদ ওঠে এবং সারাদিন থাকে তাহলেও অনেক সুরাহা হবে। বরফ নিজে থেকেই গলে গিয়ে হাডসন নদীতে গড়িয়ে জলে মিশে যাবে।

আমি সভয়ে বললাম, 'আর রোদ না উঠে যদি সমানেই বৃষ্টি আর বরফ পড়তে থাকে তাহলে?'

উনি হাসলেন, 'তাহলে তো খুবই মুশকিল। একটা উপায় অবিশ্যি ভাবা হচ্ছে, নেহাৎই যদি নিজে থেকে প্রাকৃতিক সাহায্যে গলে যাবার কোনো আশা না দেখা যায়, তাহলে সুড়ঙ্গ কেটে আগুন দেয়া হবে, সেই তাপে গলবে।'

চলতে চলতে দেখলাম, সত্যিই সারা শহর একেবারে তুষারাবৃত। খুব

সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছিলো ড্রাইভার, ভয় পাচ্ছিলো পাছে হড়কে যায়। আলোগুলোর উপরেও বরফের মোটা আস্তরণ। যে সব জায়গা শহরের হৃৎপিণ্ড, যেখানে সব দশ-তলা বিশ-তলা ত্রিশ-তলার ভিড়, খোপে খোপে দেশলাইয়ের বাকসের মতো ঘষা কাঁচের জানালা দিয়ে অজস্র আলোর ফোঁটাগুলোকে মনে হচ্ছিলো কোনো রহস্যময় গ্রহের সব জাদুকরের বাড়ি। কেবল বন্ধ দোকানের শো-কেইস-গুলোর আলোই খুব উজ্জ্বল। রাস্তা একান্তই জনবিরল। অবশ্য পরে জেনেছিলাম, এ সময়ে মাটির তলা দিয়েই লোকেরা চলাচল করে। শীতের জন্য কেউ ওঠেই না উপরে, গাড়ি নিয়েও বেরোয় না। গাড়ি পার্ক করে যেখানে যাবে চলে যায়। যদি বরফ পড়তে শুরু হয় তাহলে ফিরে এসে সে গাড়ি আর সে পাবে না, বদলে দেখবে একটি অতিকায় সাদা জন্তু শক্ত হয়ে আছে মাটিতে। আর তার ভিতর থেকে গাড়ি উদ্ধার করা যাবে না যতোদিন না সেই সাত-আট ইঞ্চি পুরু বরফের আচ্ছাদন গলে যায়।

চারদিকে তাকিয়ে এই মনমরা সন্ধ্যা আমার মনে বিষাদের ছায়া ফেললো। যা আমি কল্পনা করতে করতে এসেছিলাম তার সঙ্গে কিছুই মিললো না। তারই মধ্যে একটু আলোর রেখা এই যে আর কিছু না হোক, পেঁছেই বাড়ির চিঠিগুলো তো অন্তত পাবো! সেটা মস্ত কথা।

ক্রমাগতই দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরছিলাম বলে সব ঠিকানাই ছিলো অস্থায়ী। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ঠিকানাতেই ওদের চিঠি লেখার কথা। চিঠির কথা ভাবামাত্রই নিরানন্দ বিমর্ষ শহর অনেকটা সহনীয় মনে হলো। এই সময়ে সামনে বসে থাকা স্মীথ সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে সহাস্যে বললেন—'আপনাদের অনেক টাকা আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'কী উপায়ে?'

'আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টটা এই এক মাসের জন্য অন্য এক দম্পতিকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।'

'আর আমরা!' আমাদের চোখ খাড়া।

'মাত্র তো আর তিন দিন আছে মাসের, এ তিনদিনের জন্য একটা হোটেল ঠিক করেছি। বাড়িওলাটি একেবারে গলাকাটা, ঐ তিনদিনের জন্য পুরো মাসের ভাড়া চায়।'

আমরা ধন্যবাদ দিয়ে চুপ। এতোগুলো টাকা বাঁচিয়ে দেবার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ছিলো। কিন্তু মুখে এলো না।

ভদ্রলোক তারপরে আর একটি সুসংবাদ পরিবেশন করলেন, 'ভারি একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'কী?'

'ইউনিভার্সিটির ডাকবাকসে কাঁচের ফাঁকে দেখলাম অনেক চিঠি এসেছে আপনাদের। বাকস খুলে আমার নিয়ে আসা উচিত ছিলো। একদম ভুলে গেলাম। আজ শনিবার, তার মানে কাল বন্ধ, সোমবারের আগে আর পাচ্ছেন না।'

এর পরে যে হোটেলটিতে এনে আমাদের তোলা হলো, ওয়াশিংটন স্কোয়ারের এক অতি মধ্যবিত্ত হোটেল। ভ্রমণে বেরিয়ে এতোদিন যে সব হোটেলের নবাবী উপভোগ করে এসেছি, তারপরে এই বাসস্থান যে কী দীন মনে হলো বলা যায় না। ঢোকবার মুখটা বরফজলে চ্যাপ চ্যাপ করছে, সস্তা কার্পেট ভেজা ভেজা, আলোর জৌলুষ নেই, আসবাবপত্র সাধারণ, স্থান অপরিসর, বিমর্ষ মন আরো বিমর্ষ হলো।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে অবিশ্যি একটু ভালো লাগলো। বেশ সাজানো গুছোনো পরিচ্ছন্ন ঘর, সামনে রাস্তার ধারে টানা জানালায় হালকা নেটের টানা পর্দা, আসবাব-পত্রও মন্দ নয়।

যাকগে, মাত্রই তো তিনটে দিন, কেটে যাবে কোনোরকমে।

পরের দিন সকালে উঠে কিন্তু মনে হলো, কোনো রকমে কাটানোও বেশ কঠিন। হোটেলটিতে কোনো খাবার বন্দোবস্ত নেই, সংলগ্ন কোনো রেস্তোঁরা নেই, এক কাপ চা খেতে হলেও বাইরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

পেঁছেছিলাম শনিবার সন্ধ্যায়, পরের দিন সকালে রবিবার। রোববারের মতো নিষ্ফলাবার যে এ রাজ্যে আর কিছু নেই, আমি তা জানতাম না। সকালে চোখ মেলেই বুদ্ধদেবের চায়ের অভ্যেস, আধো ঘুমে এই আমেজ তাঁর অতি প্রিয় ব্যসন।

না বেরুলে আর কোথায় তা পাওয়া যাবে? সুতরাং ঘুম ভেঙেই মন খারাপ। মন খারাপের আরো কারণ, আকাশ একেবারে ধোয়া মোছা শ্লেটের মতো বিবর্ণ। এক ছিটে রোদের আভাস নেই। সকাল না দুপুর না বিকেল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

উঠে পড়তে হলো। একেবারে স্নানটান সেরে নিয়ে তারপর বেরুনো। আমি চায়ের উপাসক নই, বুদ্ধদেবেরই কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু বেরিয়ে আমাকেই

হাসিমুখে আশ্বাস দিলেন, 'ভেবো না, কাল আসতে আসতে কাছেই একটা 'ডেলিকেটেসিন' দেখে এসেছি, চলো, তোমাকে চমৎকার একটা ব্রেকফাস্ট খাওয়াবো।'

আমিও একটু হাসলাম। এদেশে এসে বুদ্ধদেব আমাকে তাঁর অতিথি করেছেন। স্বদেশে স্বস্থানে হলে এই ব্যতিক্রমে কতো যে হাঁক ডাক হতো প্রায় কানে শুনতে পাচ্ছিলাম। আমিও এ সুযোগ ছাড়ি কেন, সঙ্গে সঙ্গে আতিথ্যের ত্রুটিতে অতিথির গাম্ভীর্য ভাব এনে ফেললাম চেহারায়।

'ডেলিকেটেসিন' কাকে বলে আমি জানি না, এ শব্দ আমার কাছে নতুন। পরে বুঝেছিলাম, যেখানে কাঁচা পাকা সব রকম খাবারের বন্দোবস্ত থাকে তাকেই এরা ডেলিকেটেসিন বলে।

স্ট্রীট ছাড়িয়ে অ্যাভিনিউতে পেঁছুলাম, কোথায় ডেলিকেটেসিন। যেদিকে তাকাই কেবল উঁচু নিচু উঁইয়ের ঢিবির মতো বরফের স্তূপ। আর সব বন্ধ। ছ' সাতটা ব্লক পার হয়েও কোনো দরজা খোলা পাওয়া গেল না। বরফের উপর দিয়ে চলতে আমার অনভ্যস্ত পা ক্রমাগতই ঠেকে যাচ্ছিলো, ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে যাচ্ছিলো, একটি জনপ্রাণীর দেখাও মিলছিলো না, তার মধ্যে ঝুপ ঝুপ দু'বার একটু একটু ছোটো বৃষ্টিও হয়ে গেল।

'কী আশ্চর্য, একটা ড্রাগ স্টোরও কি খোলা নেই?' এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিলো, তার পরেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ হো, আজ তো রোববার।'

আমি বললাম, 'রোববার তো কী!'

'রোববার যে এখানে সব বন্ধ। ঈশ্‌শ। আমার একদম মনে ছিলো না। চলো তো ও দিকটায় যাই।'

ওয়াল্টডিজনির ইঁদুরের ছবির মতো খাবার খুঁজতে আমরা ক্রমাগত বিশ্ব-বিদ্যালয় পাড়ার মধ্যেই চক্কর দিচ্ছিলাম, এবার উল্টোপথ ধরলাম, অর্থাৎ শহরের দিকে চলতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে একজন দু'জন পথচারীর সাক্ষাৎও মিললো, তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, কাছেই, তিনেক ব্লক হেঁটে রাস্তা পার হয়েই একটা হাওয়াই রেস্তোরাঁ আছে, সেটা রোববার খোলা থাকে।

ঘড়ির কাঁটা ততোক্ষণে বারোর ঘর ছুঁয়েছে, মাথা ধরেছে, বরফ ভেঙে টিপি-টিপি পায়ে হাঁটতে সময় লাগছে অনেক, রাস্তা পার হতে গিয়ে সরের মতো পাৎলা আয়নার মতো চকচকে এক রকম পিছল বরফে সোজা পড়ে গেলাম। ঐ ঘন বরফ কাটিয়ে আর উঠতে পারি না। কী দশা!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তেই হাওয়াই রেস্তোরাঁটিতে এসে পৌঁছোনো গেল। ঘরে ঢুকে নরমে-গরমে কী আরাম। কী শান্তি। দেখা গেল উৎকৃষ্ট চীনে খাবার আছে সেখানে। কিন্তু তার আগে এক পট চা। যুঁইফুলের মতো গন্ধওলা চীনে চা নিয়ে এলো, তাই স্বর্গ!

পরের দিন অবশ্য তেমন ঝামেলা হলো না, বিকেলে বক্তৃতা ছিলো বুদ্ধদেবের, বক্তৃতার পরে কলেজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে আলাপ পরিচয়ের ব্যবস্থা হয়েছিলো, দুপুরেও একজন লাঞ্চে ডেকেছিলেন।

পরের দিন বিকেলে ওয়াশিংটন থেকে ডক্টর অশোক মিত্র এলো দেখা করতে। অশোক তখন ওয়াশিংটনে কর্মরত। অশোক আসতেই বরফ-পরা রৌদ্রহীন বিরস হোটেল মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ওর স্ত্রী গৌরীও সঙ্গে ছিলো। স্বজনবিরহিত হৃদয়ে সেই সন্ধ্যায় আর কোনো স্বজনের দুঃখ রইলো না।

হোটেলবাস শেষ হলো। রোদ উঠেছে, মনটা প্রফুল্ল আকাশও প্রসন্ন। কতোদিন বাদে রোদ উঠেছে, সবাই খুব খুশি। ডক্টর স্মিথ গাড়ি নিয়ে এলেন, আমাদের পৌঁছে দেবেন নতুন ফ্ল্যাটে। বুদ্ধদেবকে বললেন, 'কেয়ারটেকারের সঙ্গে আলাপ করে জিনিসপত্র রেখে, চলুন য়ুনিভার্সিটিতে নিয়ে যাই, আমার এক্ষুণি ক্লাস, আপনারও একটু আসতে হবে অফিসে, প্রেসিডেণ্ট আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছিলেন।'

প্রেসিডেণ্ট শুনে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। পরে বুঝলাম, আমরা যাকে উপাচার্য বা রেক্টর বলি, তাঁকে এঁরা প্রেসিডেণ্ট বলেন। কলেজের প্রেসিডেণ্ট।

আমাকে বললেন, 'আপনিও চলুন। আমার মাত্রই একটা ক্লাস, ততোক্ষণ ফ্যাকাল্টি ক্লাবে বসবেন, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো, ওখানেই সবাই লাঞ্চ খাবো তারপর। মিস্টার বোস বোধহয় আমার আগেই ফিরতে পারবেন।'

তাই হলো। জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম। আমাকে ওঁরা ফ্যাকাল্টি ক্লাবে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। নতুন এসেছি, একটু দ্বিধান্বিত ভাবেই ঘরে ঢুকেছিলাম, কেউ নেই দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। মস্ত লম্বা ঘর, এ-মাথা ও-মাথা দামী কার্পেটে মোড়া, দক্ষিণটা সম্পূর্ণ খোলা, দেয়ালই নেই, সবটাই কাচ, প্রচুর আলো অকৃপণ ভাবে ঢুকে এসেছে ঘরে, রোদের জন্য আজ পর্দা সরিয়ে দেওয়ায় সম্মুখে বরফমোড়া ওয়াশিংটন স্কোয়ার উন্মুক্ত। ঘরখানার

আসবাবপত্রের প্রাচুর্য এবং গঠন-সৌষ্ঠব তাকিয়ে দেখার মতো। ছোটো ছোটো রঙিন কাঁচের স্ট্যান্ডের উপর বসানো ফুলের আকৃতির কর্নার টেবিলগুলো একাধারে অ্যাসট্রে এবং টেবিল। জালিকাটা ওক কাঠের আখরোট-রং কোমর সমান উঁচু সব বাতিদান, আলোগুলো এমন কৌশলে রাখা এবং এমন ঢাকনায় আবৃত এবং এমনভাবে দাঁড় করানো যে দেখলে কখনোই আলো বলে মনে হবে না, ঘরেরই কোনো নতুন ধরনের অলংকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ভ্রম হবে। কোণে কোণে আলোছায়া বুঝে লিখবার ডেস্ক। যেমন হালকা, তেমন ছোটো, এবং তেমনি সুবিধেজনক। সিলিং থেকে পা পর্যন্ত লম্বা কাচের আবরণ ভেদ করে সবুজ-লাল কার্পেটের উপরে সদর্পে শুয়ে আছে প্রখর সূর্য। দূরে ঘরের ঐ প্রান্তে সামোভারে জল ফুটছে, ইচ্ছেমতো দুধ কফি চা চকোলেট যা খুশি তৈরি করো। সাদা লেসের ঢাকনা ঢাকা মোড়ানো মোড়ানো পায়ের নিচু টেবিলে থরে থরে বাসন সাজানো, বেঁটে ফ্রীজে খাদ্য সম্ভার, নাও, খাও, এলিয়ে বসে আরাম করো, লেখো পড়ো যা তোমার খুশি। ভিতরের দিকে কাচঢাকা বারান্দায় হুকুমের অপেক্ষায় চুরুট মুখে বসে আছে মেইড।

গুটি গুটি পায়ে সংকোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকে সব দেখে নিলাম। তারপর জানালায় দাঁড়ালাম। খানিকক্ষণ বাদে লেখার ডেস্কটাতে বসলাম এসে। কতো কাগজ, কতো খাম, সব কিছুরই কী প্রাচুর্য। কিছু না লিখে কি থাকা যায়? বসে বসে চিঠি লিখলাম ছেলেমেয়েদের।

আজকের কথা নয়, তবু সেই বাইশ নম্বর ওয়াশিংটন স্কোয়ার নর্থের ফ্যাকাল্টি ক্লাবটি এখনো আমার চোখে একেবারে স্পষ্ট।

দেখতে দেখতে স্মিথ এসে গেলেন। বুদ্ধদেবও এলেন, হাত ভর্তি চিঠি।

ক্লাবটি রাস্তা থেকে কিছু উপরে, ক্লাবের রেস্তোরাঁটি কিছুটা মাটির তলায়। সিঁড়ি বেয়ে নামতেই একটা নরম মধুর সুরের রেশ মন প্রাণ বিমোহিত করলো। সামনেই মস্ত টেলিভিশনে বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটি নাটক হচ্ছে, পিয়ানো বাজাচ্ছে নায়িকা, কাচের জানালায় রাস্তার ছায়া!

আসন ঠিক করাই ছিলো, নাম দেখে বসালেন ডঃ স্মিথ। হেসে বললেন, 'আমাদের ওয়াশিংটন পার্কের দশা দেখুন।'

দেখলাম। বরফের উপর সূর্য ঠিকরোচ্ছে, সাদা তুষার খণ্ড খণ্ড হীরের মতো জ্বলছে। গাছ থেকে ঝুলে পড়া জমে যাওয়া লম্বা লম্বা বরফের দাঁড়ি গলছে ধীরে ধীরে, পড়ে যাচ্ছে ধুপ করে, পার্কের আসন ধুয়ে মুছে ফিটফাট।

এই সুযোগে মায়েরা গাড়ি ঠেলে ঠেলে রোদ খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদের, লাল নীল হলদে পোশাকে সব ফুলের মতো বাচ্চা।

চিঠি এসেছে, রোদ উঠেছে, হোটেলের পালা ফুরিয়েছে, তার উপরে এই সব অপরিচিত অলৌকিক দৃশ্য আর স্বাদু আহার্য—সুখের আর সীমা কী? আরো ভালো এই, অশোক রাত্তিরের জন্য থিয়েটারের টিকিট কিনেছে, খাওয়াও বাইরে একসঙ্গে।

জিনিসপত্র সব লবিতে রেখে এসেছিলাম, তখনো ফ্ল্যাটটা দেখিনি। কেয়ারটেকার বলেছিলো, চাবি এই মুহূর্তে তার কাছে নেই, আনতে গেলে দেরি হবে। স্মিথের দেরি করার সময় ছিলো না। চলে গিয়েছিলাম।

এবার ঘরে যেতে গিয়েই শুনলাম, আমাদের ঠাঁই ছ'তলায় নয়, এক তলায়। কেন? যাদের থাকতে দেয়া হয়েছিলো তাঁরা নড়বেন না সেখান থেকে।

স্মিথ তো নামিয়ে দিয়ে চলে গেছেন, কাকে আর বলি! কথাবার্তা যা হবার তাতো স্মিথের সঙ্গেই হয়েছে। আমাদের সঙ্গে না। আমরা চোখ চাওয়া চাওয়ি করলাম।

আমার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিলো। কিন্তু কী করবো! তখন তো নিরুপায়। রাগ করে তো বেরিয়ে যেতে পারি না? আশ্রয় তো চাই। আর অতোগুলো টাকা আগাম দেয়া হয়েছে! তা ছাড়া নিউইয়র্ক এমন শহরও নয় যে চাইলেই তৎক্ষণাৎ বাসস্থান মিলবে।

আমাদের পক্ষে বাড়িটা খুব সুবিধেজনক জায়গায় অবস্থিত ছিলো। বড়ো রাস্তার একেবারে মুখে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় হাঁটা পথ। না হয় ছ'তলার জায়গায় এক তলাই হলো, কী আর হবে! এসব চিন্তা করে মনকে বুঝ দিয়ে চাবি নিয়ে ঢুকলাম এসে ঘরে।

সামনের ঘরটি, যেটাকে ওরা লিভিংরুম বলে, সে ঘরটা মন্দ নয়, আসবাবপত্রও যথোচিত, কিন্তু শোবার ঘরটি এতো ছোটো যে দুটি খাট পেতে আর এক ফোঁটা জায়গা নেই মেঝেতে। ঘরটি আবার বসার ঘর থেকে এক স্টেপ ওপরে, প্রায় লাফিয়ে উঠতে হয় খাটে। খাটের উপর কোনো বিছানা নেই, শুধু দুটি ম্যাট্রেস পাতা। যদিও বাইরে তখনো রোদ, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিলো। তা জ্বলতে পারে, শীতের দেশ, জানালার চারদিকে পর্দা টানা থাকে, অমনিতেই অন্ধকার হয়ে যায়।

কিন্তু সেটা কথা নয়, সারা বাড়িটা যে কী নোংরা ভাবা যায় না। বসার

আসনে, মেঝের কার্পেটে, জানালার ব্লাইণ্ডে সর্বত্র ধুলো আর ময়লার রাজত্ব। মেণ্টেল পীসের উপরে মদের বোতলের পাহাড়। রান্নাঘরে এসে দেখি এঁটো বাসনের কাঁড়ি, বেসিনটা থিক থিক করছে। আর বাথরুমে উঁকি দিয়ে তো ওয়াক থু করে বেরিয়ে এলাম।

এদেশে এরকম ব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না। আর সত্যি বলতে এমন কল্পনার অতীত কাণ্ড এ বাড়িটা ছাড়া আর দেখিওনি কোথাও। বেচারা বুদ্ধদেব। তাঁর এতো ভালোবাসার দেশ, এতো বন্ধুতার দেশ, জনসাধারণের কিঞ্চিৎ বোকামি বাদ দিয়ে চিঠির ছত্রে ছত্রে এতো প্রশংসার দেশ শেষে কিনা তাঁর স্ত্রীর কাছে তাকে এমন অপ্রস্তুত করলো ?

আমার ভীষণ রাগ হলো কেয়ারটেকারটার উপরে। ঘরটায় বসতে দাঁড়াতেই ঘেন্না করছিলো। নিজের দেশ হলে তখুনি বেরিয়ে গিয়ে হুলুস্থুল করতাম। আমরা কি ওর দয়াপ্রার্থী নাকি যে যা খুশি তা করলেই হলো ? ছ'তলা দেখিয়ে এক তলার এক অন্ধকূপে ঢুকিয়েছে, এতো অভদ্র যে বাড়িটা পর্যন্ত পরিষ্কার করিয়ে রাখেনি। কে জানে একতলা আর ছ'তলার ভাড়াও হয়তো অনেক তফাৎ আছে। ডক্টর স্মিথ আমাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের ভাগ্য ভালো যে এই জায়গায় চট করে এমন একটি বাড়ি তোমরা এই ভাড়ায় পেয়ে যাচ্ছো। খুব খোলামেলা, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।' এই নাকি তার নমুনা ?

আমাদের বিশ্বাস হলো আসলে লোকটা অসৎ। যে অ্যাপার্টমেণ্ট আমাদের নামে ছিলো, সেটা অনেক বেশী ভাড়ায় আর কাউকে দিয়ে দিয়েছে। আমরা এসে যাচ্ছি শুনে ডক্টর স্মিথকে বুঝিয়েছে, 'মিছিমিছি কেন দু দিন থেকে তিরিশ দিনের ভাড়া গুণবেন, তার চেয়ে একেবারে পয়লাতেই আসুন।' উনিও বিশ্বাস করেছেন এবং ভালোই হলো ভেবেছেন। এক তলাটা খালি হবে জানতো বোধহয় লোকটা, কোনোমতে তাদের তাড়িয়ে টারিয়ে আমাদের ঢুকিয়েছে, পরিষ্কার করবারও সময় পায়নি।

এসব সাংসারিক ঝামেলায় বুদ্ধদেব নিতান্ত অনভ্যস্ত, তাঁর স্বদেশের সংসারে এমন ঘটনার সঙ্গে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ ঘটেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেখানে আর এখানে অনেক তফাৎ, এখানে আমি নিতান্তই তাঁর উপর নির্ভরশীল। অতএব এই অশান্তির সঙ্গে তাঁকেই মোকাবিলা করতে হবে।

আমি বললুম, 'তুমি এক্ষুণি গিয়ে গোমস্তাটাকে খুব বকে দিয়ে এসো।

সে আমাদের কী ভেবেছে ? এতোগুলো টাকা আগাম নিয়ে জোচ্চুরি করার আর জায়গা পায়নি ? নাকি আমাদের কালা আদমি ভেবে গ্রাহ্য করছে না ?'

বিব্রত ভঙ্গীতে বেরিয়ে গেলেন বুদ্ধদেব, ফিরে এলেন একটি নিগ্রো ছেলেকে নিয়ে। কুড়ি বাইশ বছর বয়েস, লম্বা হ্যালহ্যালে চেহারা, মস্ত মুখে চেপ্টে যাওয়া আধ বিঘৎ চওড়া নাক, তার তলায় দুটি পুষ্ট পটলের মতো ঠোঁট, থুতনিতে সামান্য দাড়ি।

বিদ্যুতের মৃদু আলোতে তার দিকে তাকিয়ে প্রায় চমকে উঠেছিলাম। সে তার দুই চোখ ভরা হাসি নিয়ে গভীর খাদের গলায় বললো, 'গুড আফটার নুন, ম্যাম—'। সেই ভাসাভাসা হাসি আর কণ্ঠস্বরের গভীরতায় তার চেহারার অন্য সব খুঁত আমি ভুলে গেলাম।

বুদ্ধদেব বললেন, 'ম্যানেজারটিকে কোথাও দেখলুম না, এক ভদ্রলোক বললেন, লোকটি একেবারেই ভালো না, ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই, বাড়িওলা কোথায় থাকেন কেউ জানে না, এর ইচ্ছে অনিচ্ছের উপরই সব ভাড়াটেদের নির্ভর। শহরে ভীষণ বাড়ির দুর্ঘট বলে আরো পেয়ে বসেছে। এই ছেলেটির নাম হেনরি, একতলার দেখাশুনো করার ভার ওর উপরে, এখন হেনরিই পরিষ্কার করে দেবে ঘর।'

বেশ বেশী টাকা কবুল করেই হেনরিকে নিয়ে এসেছিলেন বুদ্ধদেব। হেনরি ঝাঁটপাট শুরু করলো, আমরা চাদর বালিশ কিনতে বেরুলাম।

আবার ফিরে এসেই যেতে হবে, অশোক অপেক্ষা করবে নির্দিষ্ট জায়গায়।

এ বাড়িটা পনেরো স্ট্রীটে, চোদ্দ স্ট্রীটেই সব সস্তার ঢালাও বাজার। পৃথিবীর হরেক জাত মিলে সেখানে ব্যবসা করে। তার মধ্যে স্প্যানিশই বেশী। ভারি গরীব তারা। আরব আছে, অনেক রুশ এবং জার্মান জু-তে তো ভর্তি— এবং সকলেই এতো অসম্ভব সুন্দর যে জিনিসপত্র দেখবো না তাদের দেখবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সবাই হাসিখুশি ভদ্র বিনীত এবং সুবেশ।

বিকেলের আলোয় আমি চোদ্দো স্ট্রীটের প্রেমে পড়ে গেলাম। রাস্তার দু' পাশের ফুটপাত ভর্তি বিপণি। পাশে পাশে বড়ো দোকানের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে অথবা নেমে গেছে মাটির তলায়। সবই সাজানো গুছোনো পরিপাটি। এতোটাই সাজানো এবং এতোটাই পরিচ্ছন্ন যে মনে হয় কোনো প্রদর্শনী।

হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, কিন্তু সঙ্গে তো বুদ্ধদেব আছেন, এক মিনিট দাঁড়াতে দিলে তো। বেরসিকের মতো একেবারে আক্ষরিক অর্থে কম্বল বালিশ আর

চাদর কিনে চলে এলাম তাড়াতাড়ি। এসে দেখি হেনরি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, এক গাল হাসি। 'কী, পরিষ্কার করে দিয়েছো তো সব ?' 'ইয়েস ম্যাম।'

ঘরে ঢুকে বিছানা-টিছানা পেতে স্বস্তি হলো একটু।

সেই রাত্রে যে থিয়েটারটি অশোক আমাদের দেখিয়েছিলো, বোঝা গেল সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অতি আধুনিক নাটক। মা আর মেয়ের গল্প। নাম 'এ স্টেট অব হাসি।' থিয়েটার হলটি ছোটো, কিন্তু সেটিও খুব আধুনিক। শহরের একেবারে গমগমে জায়গায়, লাইনিয়াস থিয়েটার। লরেন্স অলিভিয়ার বুড়ো বয়সে যে মেয়েটিকে বিয়ে করলেন, সেই মেয়েটিই মেয়ের পার্ট করছিলো। অভিনয়ে কোনো ত্রুটি ছিল না, কিন্তু গল্পটাই ভালো লাগলো না আমার।

যখন বেরুলাম, দেখি টিপ্ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। অশোক ব্যস্ত হয়ে আমাদের কোনো দোকানের তলায় দাঁড় করিয়ে নিজেই ট্যাকসির জন্য ছুটোছুটি করতে লাগলো। ঐ বৃষ্টির মধ্যে কেউ ধরা দিচ্ছে না। যদি বা একজন দিল তাও একটি ছাতাধারিনী মেমসাহেবকে। তখন আমি অনুপ্রাণিত হয়ে অশোকের সাহায্যার্থে নেমে পড়লাম। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। আমরা আমাদের দিকে এলাম, ওরা ওদের হোটেলে গেল। কথা থাকলো, যে কোনো সপ্তাহান্তে আমরা চলে যাবো ওদের কাছে ওয়াশিংটনে। ওরা পরের দিন সকালেই চলে যাচ্ছে।

বাড়ি এসে শুয়ে পড়তে পড়তে রাত হলো খানিকটা। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখি তখনো রাত। পাশ ফিরে আবার ঘুমের চেষ্টা করলাম। সফলও হলাম। আবার যখন ঘুম ভাঙলো, তখনো রাত ফুরোয়নি। কিন্তু ঘুম আর আসে না। শুয়ে শুয়ে শেষে উঠে পড়লাম আলো জেবলে। বসার ঘরে এসে মনে হলো শোবার ঘরটায় যতো গভীর রাত এ ঘরটায় যেন ততো নয়। ছাই ছাই আলো ছড়িয়ে আছে। পর্দা সরাতেই পাশের মস্ত উঁচু বাড়ির কোনো চোরা গলি দিয়ে এক ফালি চোখ ধাঁধানো রোদ এসে ছিটকে পড়লো মেঝেতে। ঘড়িতে দেখি বারোটা। বারোটা মানে ? বেলা বারোটা নাকি ?

তাই হতে হবে। নইলে কাল তো একটার সময়ে শুয়েছিলাম, ঘড়ি যদি বন্ধও হয়ে যায় নিশ্চয়ই পিছিয়ে গিয়ে বারোটায় দাঁড়িয়ে টিক টিক করবে না।

'ওঠো, ওঠো, এখন আর রাত নেই, সূর্য মধ্যগগনে। তোমার তো আজ প্রথম কলেজ, বারোটা বেজে গেছে।'

'অ্যাঁ, সে কী।'

দিনে রাত্রে সর্বক্ষণ ঘুটঘুটে অন্ধকার। শোবার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এ ঘরে এলেন বুদ্ধদেব। এখুনি তৈরি হতে হবে, ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রাতঃকালীন ক্রিয়া কর্মে। দাড়ি কামানো, স্নান, পোশাক, চা-পর্ব, সব শেষ হতে হতে দেড়টা বেজে গেল। উনি প্রায় দৌড়োলেন পোর্টফোলিও নিয়ে।

তারপর আমি একা। একা হয়েই আমার যেন কেমন লাগতে লাগলো। বিদেশে বেরিয়ে এই আমি প্রথম একা হলাম। সকালের দিকে যখন আমরা আমাদের জিনিসপত্র রাখতে এসেছিলাম, কেয়ারটেকারটি তখন নিউইয়র্কে যে কী রকম দিনে দুপুরে ডাকাতি হচ্ছে তার একটি লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছিলো। তার এই বাড়িটা যে সেদিক থেকে কতো নিরাপদ এবং সে নিজে যে ভাড়াটেদের স্বার্থরক্ষায় কী রকম সাবধান তাও জানিয়েছিলো এবং সর্বোপরি যা জানিয়েছিলো, তার মর্মার্থ এই যে, নিগ্রোদের জন্যই এসব অরাজকতার সৃষ্টি। লোকটা ভীষণ কালোবিদ্বেষী। নিশ্চয়ই টেকসাসের লোক। নিশ্চয়ই আমরা ভারতীয় বলে ওর অবহেলা আছে, বিরক্তি আছে।

অবশ্য বাড়িটার নিরাপত্তা বিষয়ে যা বলেছিলো, তা ঠিক। দুম করে যে কেউ ঢুকে পড়বে এই উচ্চতল বিশাল বাড়ির অন্দরে তার উপায়টিও নেই। যেটা প্রধান ফটক সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেলেই নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়। ফিরে এসে যে যার চাবি দিয়ে খোলে অথবা কেয়ারটেকার বা হেনরি থাকলে খুলে দেয়। তারপরে আর একটা দরজা। সেটাও ও-রকমই বন্ধ থাকে, কিন্তু চাবি নেই কোনো। টেলিফোন বুথের মতো সব গোলঘর আছে, সেখানে ঢুকে যার যার ঘরের নম্বর ধরে বোতাম টিপলে, তার তার ঘরে একটি আওয়াজ হয়। আওয়াজটা আসে ঘরের দেয়ালে টাঙানো একটি লাল-সোনালী বাকস থেকে। ঘরের বাসিন্দা তখন সেই বাকস খুলে জিজ্ঞাসা করে, 'কে ?' জবাব পেলে সে-ও একটি বোতাম টেপে সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় ঐ দ্বিতীয় দরজা। তারপর যে যার ফ্ল্যাটের ডোর-বেল টেপে এসে। তখন আর খুলে দিতে ভয় কী ?

সবই বুঝে নিয়েছিলাম, কিন্তু কার্যকালে অন্য রকম করে ফেললাম। বুদ্ধদেব চলে যাবার একটু পরেই ডোর-বেল শুনে দৌড়ে এসে খুলে দিলাম। মনেই নেই এভাবে খোলা বারণ। খুলতে খুলতেই বললাম, 'আবার কী ফেলে গেলে ?'

তারপরেই তাকিয়ে দেখি কালকের নাদুসনুদুস বেঁটে গোমস্তাটা হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, 'সুপ্রভাত।' চমকে গিয়ে বললাম, 'কী চাই ?'

মুচকি হেসে বললো, 'দেখতে এলাম সব ঠিক আছে কি-না ?'

আমি বললাম, 'সব কি ঠিক করে রেখেছিলে ?'

'ডক্টর স্মিথ আমাকে ঠকালেন কেন ?'

'কী রকম ?'

'আমি তো জানতাম তিনি নিজেই আসবেন, অথচ তোমাদের নিয়ে এলেন। তোমরা ভারতীয়, না ?'

'ভারতীয় জানলে ভাড়া দিতে না ?'

'না না তা কেন ? তবে দেখছো তো নিজের দেশের লোকই বাড়ি পাচ্ছে না।' হঠাৎ গলায় মধু ঝরিয়ে বললো, 'কিন্তু তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে।'

আমি গম্ভীর থেকে বললাম, 'আমার স্বামী কাল তোমাকে খুঁজেছিলেন, এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন—'

'দেখলাম।'

'তাহলে দেখেই কি আমার সুবিধে-অসুবিধের কথা জানতে এসেছো ?'

আমি দরজাটা বন্ধ করতেই উদ্যত হয়েছিলাম, লোকটা হাত রাখলো সেখানে, 'বড়ো সুন্দর ড্রেস তোমাদের! কী সুন্দর দেখাচ্ছে', চোখে ভাবের বন্যা ছোটালো, 'সকাল থেকেই ভাবছি—', প্রায় ঘরে ঢুকে আসছিলো, আমি ছিটকে গলিতে বেরিয়ে এলাম। গলিটাই নিরাপদ মনে হলো আমার। সকলেরই যাওয়া আসার পথ। যদিও সেই মুহূর্তে ভয়ানক নির্জন ছিলো।

মেজাজ তো কাল থেকেই গরম হয়ে আছে। আজকের আস্পর্ধা দেখে দেশ-কাল-পাত্র সব ভুলে গিয়ে প্রায় রণরঙ্গীনী মূর্তি ধরে বললাম, 'কী ভাবছো ? ভারতীয়দের সঙ্গে যা খুশি তাই করা যায়, না ? সে জন্যই ছ'তলার ভাড়া নিয়ে একতলার অন্ধকূপে এনে ঢোকাতে সাহস পেয়েছ ? ভারতীয় ভেবেই ঘরগুলো পরিষ্কার করে রাখার দায়িত্ব বোধ করোনি। ভেবেছ ভিক্ষুক ? আমরা তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। এই সব অভদ্রতা আর কালোবিদ্বেষ তোমার জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেব। জানো আমরা কে ? জানো, এখানে আমাদের নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে ? জানো, দরকার হলে আমরা কেনেডির কাছে পর্যন্ত নালিশ পাঠাতে পারি ?' জানো অমুক, জানো তমুক বলে তারপর আরো যে সত্যমিথ্যা কতো কিছু জানিয়েছিলাম তার ঠিক নেই।

গড়গড় করে ইংরিজি বলায় আমার অভ্যাস নেই, বলতে গেলে বর্তমান

আর অতীত সব সময়েই গুলিয়ে ফেলি, শব্দ খুঁজে পাই না, তো তো করে প্রাণ যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছু কি জ্ঞান আছে নাকি ?

লোকটা বোধহয় কল্পনাও করেনি যে অতোটুকু যন্ত্রে অত শব্দ হয়। রাগ দেখে একেবারে থ হয়ে গেল। আর জানো জানো বলে যত কিছু জানিয়েছিলাম সবই বোধহয় বিশ্বাস করলো। বোধহয় ভাবলো, অতো তেজ যখন তখন অবশ্যই পিছনে আগুন আছে। মুখটা লাল হলো, হাত মুঠো হলো, গাল-মন্দের ধাক্কায় গলার মধু, চোখের প্রেম সব ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার।

'সরি', বলে চলে গেল গটমট করে। আমিও ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপরে নিজের হৃৎকম্পে নিজেই অস্থির। কে জানে, বিদেশ বিভুঁয়ে এই ভয়ংকর বিশাল বাড়িটার এই খুদে অ্যাপার্টমেণ্টটিতে ঢুকে শেষে লোকটা কী না কী প্রতিশোধ নেবে। চাবিটাবি তো সবই ওদের কাছে থাকে।

না খাওয়া না স্নান, টান টান হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। প্রত্যেকটি শব্দেই চকিত হয়ে ভাবলাম ঐ আসছে।

ঘণ্টা দুয়েক কাটার পরে ভয়ও একটু কমলো, উত্তেজনাও কমলো।

হেনরিটা ফাঁকিবাজ। কাল যে কী জঘন্যভাবে ঘর পরিষ্কার করে গেছে। নিজেই কাজে লেগে গেলাম। কাজই লক্ষ্মী, কাজে থাকলে মন ভালো থাকে।

খানিক বাদেই চলে এলেন বুদ্ধদেব। বকাবকির বিবরণ শুনে অট্টহাস্য করে উঠলেন। ঐ গোমস্তাটাকে শিক্ষা দেবার জন্য যে আমি কেনেডি পর্যন্ত যেতে পারি এ কথা শুনে হাসি আর থামে না।

পরের দিন সকালে ঘড়ি দেখে ঘুম থেকে উঠে বসার ঘরে আসতেই বেল টিপে হেনরি এসে উপস্থিত। হাতে ঝাঁটা বালতি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, কাঁধে সেলোফেনের মোড়কে সব রংবেরংয়ের কাপড়। হেসে বললো, 'সুপ্রভাত ম্যাম। পর্দা বদলাতে এসেছি, বিছানার চাদর বালিশ এনেছি, কেয়ারটেকার জিজ্ঞেস করেছেন, এই রংটা পছন্দ হয়েছে কিনা, না হলে বদলে দেবেন। ঘর পরিষ্কার করে গিয়ে নতুন বাসনও এনে দেব।'

সুন্দর রংয়ের নিভাঁজ পর্দায় তারপর ঘর আলো করে দিল, আমার সাদা চাদর তুলে সেই রংয়ের চাদরে বালিশে বিছানা সাজিয়ে দিল। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে কার্পেট ইত্যাদির সমস্ত ধুলো উড়িয়ে দিয়ে তকতকে করে তুললো ঘর। আসবাবপত্র মুছে দিল।

তারই মধ্যে টুকটাক কথা চলছে আমার সঙ্গে। ঘরের কথা, সংসারের কথা,

ফিসফিস করে ম্যানেজারের নিন্দা, একুশ বাইশ বছরের ফুর্তিবাজ নিগ্রো ছেলে আমার মন জয় করে ফেললো। আমি ওর জন্য হৃদয়ে মমতা অনুভব করলাম। কালকে ফাঁকি দিয়েছে বলে একটু বকলামও, সে 'সরি ম্যাম' বলে হাসলো। তারপর তাকে একটা পুঁতির বটুয়া উপহার দিয়ে বললাম, 'নাও, যাকে খুশি দিও।'

সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললো, 'এমিকে দেব। আমি এমিকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি।'

বুদ্ধদেব কলেজে যেতে যেতে সহাস্যে বললেন, 'যাক, আর কোনো ভয় নেই। এখানে এসেও তা হলে একটি পুষ্যি জুটে গেল তোমার ?'

সেদিন সকাল থেকেই ঝিরঝির ঝিরঝির বরফ পড়তে শুরু হলো। আকাশ ধোঁয়াটে। আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কী। বরফ-পড়া অবস্থায় রাস্তাঘাটের দুর্দশা দেখেছি কিন্তু বরফ পড়ছে এ দৃশ্য এই প্রথম।

আমাদের অন্ধকার অ্যাপার্টমেণ্টটির একমাত্র মুক্তি রান্নাঘরের একটি জানালা। নিয়মভঙ্গ করে সেই জানালাটিই বাইরের আলো ঘরে নিয়ে আসে। আমি সব সময় জানালার পর্দা সরিয়ে রেখে কাচে প্রতিফলিত আকাশ দেখি। জাপানের মেয়ে না হই তবুও তো সূর্যের দেশের মেয়ে। ঈশ্বরের আলো না দেখলে মন ওঠে না।

ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে করতে দুটি দৃশ্য অবলোকন করেই রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটি দৃশ্য এই : পরম নিরীহ ভঙ্গির অতি নরম করে মিহি গুঁড়োয় বরফ পড়ার ছবি, যে ছবি দেখলে কখনো মনে হবে না তারাই ভূমি-স্পর্শ করে অমন দুর্দম দুর্মর শক্ত তুষারে পরিণত হয়ে অতো বড়ো একটা দানব শহরকে ঐ রকম পর্যুদস্ত করে রাখতে পারে। আর একটি দৃশ্য : মুখোমুখি জানালায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম। বিদেশে এসে এমন উন্মুক্ত প্রেমও এই আমার প্রথম দেখা।

সেটিও একটি রান্নাঘর। সে বাড়ির গৃহিণীও তখন আমার মতোই ব্রেকফাস্ট তৈরিতে নিযুক্ত। তিনি অবশ্য আমার মতন আপাদমস্তক বসনাবৃত নন, নিম্নাঙ্গে একটি জাঙ্গিয়া এবং উর্ধাঙ্গে একটি পাৎলা খাটো ব্লাউজ।

আমি বরফ-পড়া দৃশ্যেই মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেছিলুম, দৃষ্টি অবাধ্য। অন্যমনস্ক ভাবেই বারে বারে ব্যাহত হচ্ছিলো। সেই যুগল মূর্তি আমাকে যথেষ্ট আকর্ষণ করছিলো। তারা কিন্তু আমাকে দেখেও গ্রাহ্যের মধ্যে

আনছিলো না। আমিই শেষে জানালাটা বন্ধ করে দিলুম। রান্নাঘরেও ঐশ্বরিক আলোর বদলে বিদ্যুৎ জ্বালতে হলো।

দু'দিনের রোদে রাস্তাঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে আসছিলো, দৈত্যের মতো বিশাল এক যন্ত্র চালিয়ে অন্তত চলবার মতো রাস্তাগুলো বরফহীন করে ফেলতে পেরেছিলো, কে জানে আবার হয়তো তেমনি হয়ে যাবে।

আমাদের বেরুবার ছিলো। প্রস্তুত হতে হতে লিভিংরুমের কোণ থেকে একটুখানি সূর্যের উদ্ভাস দেখে আশ্বস্ত হলাম।

যাবো রকফেলার বিল্ডিংয়ে। গীল প্যাটট্রিক নামক এক আমেরিকান ভদ্রলোক তখন সেই রকফেলার ফাউণ্ডেশনের একজন কর্তাব্যক্তি। বলা যায় বৃত্তিদানের কর্ণধার। ভারতবর্ষ বিষয়ে শ্রদ্ধা এবং কৌতূহল দুই-ই আছে হৃদয়ে। বুদ্ধদেবের বিচার-বিবেচনা এবং পক্ষপাতহীনতার প্রতিও যথেষ্ট আস্থাবান। লাঞ্চে ডেকেছেন তিনি। সেটা রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর বছর, সে বিষয়েই আলাপ-আলোচনা করা এই লাঞ্চের আসল উদ্দেশ্য। তাঁর আপিস বিয়াল্লিশ তলার উপরে।

ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে যাবার পরেই প্রায় এক রাত্রির ব্যবধানে হঠাৎ কুড়ি লক্ষ মানুষের কলকাতা শহর যখন ষাট লক্ষ মানুষের জনসমুদ্রে উত্তাল হয়ে উঠেছিলো, তখন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তাঁর অনেক পরিকল্পনার মধ্যে শহরকে উঁচুর দিকে বাড়াবারও একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। একষট্টি সালে সেই কল্পনা সম্ভাব্যের আওতায় এসেছে বটে কিন্তু কর্মযজ্ঞ তখনো কাগজে কলমেই আবদ্ধ। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় বিয়াল্লিশ তলায় ওঠাটা বেশ উত্তেজক বলেই বোধ হচ্ছিলো। স্বয়ংক্রিয় এলিভেটরও আমার কাছে নতুন। আমি তাতেও উত্তেজিত।

কিন্তু এলিভেটরে দাঁড়াতেই হুস করে এমন দ্রুত তুলে দিল যে মনে হলো একটা নিমেষ। দরজা খুলে যেতে নেমেই বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। পড়ে যাচ্ছিলাম, কোনো মতে দেয়াল ধরে সামলালাম। কান দুটো বন্ধ, দুই চোখ অন্ধকার।

আমরা যে এসেছি, নিচে থেকেই ফোন করে জানিয়েছিলাম গীল প্যাটরিককে। দেখলাম তিনি এগিয়ে আসছেন লম্বা করিডোর দিয়ে। তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেন ঘরে, বসালেন যত্ন করে, জল দিলেন এক গ্লাস, বললেন, 'একবারে উঠলে প্রথম প্রথম অনেকেরই এ রকম হয়।'

আমার অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়েই বোধহয় সান্ত্বনা দিলেন এ কথা বলে। তা দিন। আমি তাতেই কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করলাম। আর তাছাড়া ভদ্রলোকটি এতো সুন্দর এবং মহিলাদের প্রতি এমন বিশেষ মনোযোগী যে মনও প্রসন্ন হয়ে উঠতে দেরি হলো না।

খেতে বসে অনেক ভালো ভালো কথার সঙ্গে ভালো ভালো পানীয়ও পরিবেশন করেছিলেন। আমার কাছে তো ভালো মন্দ সবই সমান। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতেই হায় হায় করে উঠলেন, 'এ একেবারে প্রত্যক্ষ দ্রাক্ষার রস, একশো বছরের পুরোনো, খেতেই হবে।'

খেলাম। সুমধুর সন্দেহ নেই। অস্বীকার করেও লাভ নেই, বেশ ভালোই লাগলো। দুপুরটাই ভালো কাটলো। সেই সঙ্গে শতবার্ষিকীর প্ল্যান প্রোগ্রামও তৈরি হলো সব। যখন বেরুলাম, বেলা প্রায় পাঁচটার কাঁটা ধরো ধরো।

রাত্তিরেও এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিলো। একজন বাঙালী ভদ্রলোক, নাম ক্ষিতীশ দালাল। উনি ওখানে বহুকালের প্রবাসী। ইউনাইটেড নেশন্স-এ চাকরি করেন। বুদ্ধদেব আগের বার এসে এঁর অনেক আতিথেয়তা ভোগ করে গেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিলো না। কথা ছিলো, গীল প্যাটরিকের ওখান থেকে আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জে যাবো, সেখান থেকে ওঁর সঙ্গে ওঁর বাড়িতে।

শহরের উপকণ্ঠে কুইন্স গ্রামের সুন্দর একটি পল্লীতে ওঁর বাড়ি। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে দশ মাইল রাস্তা।

বাইরে বেরিয়েই ক্ষিতিশ দালাল মাথা ঝাঁকালেন, 'এই রে সর্বনাশ হয়েছে।'

'কী।'

'দেখছেন না বরফ পড়া থামছে না। একটু কমেছিলো, এখন দেখছি আবার।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'বেশ ভালো, ভারি সুন্দর দেখতে, বৃষ্টির মতো ভেজায় না, টোকা দিলে পড়ে যায়, নোংরা হয় না, কাদা হয় না—'

উনি হাসলেন, 'ঠিক আছে, রাত্রিবেলা যখন ফিরবেন তখন দেখবেন।'

খাওয়াদাওয়া আড্ডা গান অনেক কিছুই হয়েছিলো সেদিন সেখানে। আমরা ছাড়াও আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। ক্ষিতীশবাবুর রন্ধনপটিয়সী স্ত্রী চব্যচোষ্য লেহ্য পেয়—কোনো ভোজ্য বস্তুই রাঁধতে বাকি রাখেননি।

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছিলো সময়। নৈশভোজ সাঙ্গ হতে হতে যথেষ্ট রাত। বাইরে সোঁ সোঁ

আওয়াজ শুনে সবাই বলছিলো বরফের ঝড়। যখন বেরুলাম, ঝড় কিছুটা থেমেছে বটে কিন্তু জগৎ-সংসার পেঁজা তুলোর পাহাড়। শুক্লপক্ষের রাত শুধু চাঁদের আলোতেই ভেসে যায়নি, রাস্তা ঘাট নদী নালা বাগান হ্রদ ঝোপ ঝাড় জঙ্গল বৃক্ষলতা মহীরুহ সব তুষারের সাদায় আচ্ছাদিত। পার্ক করা গাড়িগুলো সাদা ধবধবে তুলোর তৈরি প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ হয়ে।

শুধু সাদা, সাদা আর সাদা।

ক্ষিতীশবাবুর বাড়িটি কাঠের। রাস্তা থেকে কিছুটা নেমে সামনে মস্ত মাঠ দূর অবধি চলে গেছে, মাঠের পাশে পাশে বাংলো ধরনের সব বাড়ি। তারই একটি বাড়িতে ক্ষিতীশবাবুর বসবাস। মাঠ থেকে কোমর সমান উঁচু প্লীনথ। পাঁচ ছ'টি সিঁড়ি অতিক্রম করে তবে উঠতে হয়।

বেরিয়ে দেখি বারান্দা পর্যন্ত তুষারপাতে সেই সব সিঁড়ি কোথায় অন্তর্হিত।

ঘরের মধ্যে, গাড়ির মধ্যে, দোকানে, বাজারে, সর্বত্রই সেন্ট্রাল হিটিং—কিন্তু আকাশের তলায় ঈশ্বরেরই অবাধ রাজত্ব, সেখানে আর মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যা কোনো কাজে লাগেনি। অতএব ঘরের দরজা খুলতেই একযোগে শীত বরফ আর হাওয়ার উদ্দাম অত্যাচার বিপর্যস্ত করে ফেললো সকলকে। লবিতে বেগে ঢুকে গেল তুষার, বেগে দরজা বন্ধ করে দিতে হলো অধিবাসিনীকে। অধিবাসীটি এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলেন। আর যেহেতু তিনিই গৃহকর্তা, তিনিই জানেন তাঁর সিঁড়ির অবস্থানটি কোথায় হতে পারে। আস্তে আস্তে ঠুকে ঠুকে বার করলেন সেই সিঁড়ি, আস্তে আস্তে ধরে ধরে নামিয়ে দিলেন সকলকে। তারপর হাঁটু পর্যন্ত নরম তুষারে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে সেই মাঠ পার হয়ে রাস্তা পর্যন্ত আসা যে কী কঠিন ব্যাপার তার কোনো বর্ণনা নেই।

পূর্ণিমার রাত ছিলো, জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে চারদিক, আর তার মধ্যে পরিবেশের ঐ অনন্ত শুভ্রতা—শোভা যে স্বর্গীয় তাতে সন্দেহ কী? কিন্তু চলতে চলতে শীতের আক্রমণে, বরফের নিমজ্জনে, হাওয়ার তীক্ষ্ণতায় মুহুর্মুহু পথভ্রষ্ট হতে হতে নিজেকে নিজে রক্ষা করতেই সকলে এতো ব্যস্ত যে শোভা আর দেখবে কখন?

অমিয়বাবু (কবি অমিয় চক্রবর্তী) ছিলেন, তিনি বারে-বারেই বলতে লাগলেন, 'মিসেস বোসকে দেখুন, মিসেস বোসকে ধরুন—'। আমাকে দেখবে কী?

ধরবে কী ? আমার তো খুব মজা লাগছিলো ওরকম নরম নরম বরফ ভেঙে হাঁটতে। দুটো কোট ভেদ করে যতো শীত গিয়ে শরীরে বিন্ধ হচ্ছিলো, পরিতৃপ্ত আহার সমাধা করে, সকলের বন্ধুতায় আপ্লুত হয়ে, জগতের ঐ অলৌকিক সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে প্রিয় সঙ্গ উপভোগ করতে করতে সেই চলা আমার শরীর ভেদ করে অন্তরে গিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পরিবেশন করছিলো।

পরের দিন দুপুরে দুজন ভদ্রলোক এলেন আমাদের অ্যাপার্টমেণ্টে। একজন খাস ইংরেজ, অন্যজন বাঙালী। এসেছেন রেডিয়ো থেকে, আমার কাছে। কোনো বিশেষ আমির কাছে নয়, আমি নামক একজন বঙ্গমহিলার কাছে, যাঁর কাছে তাঁদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রশ্নোত্তর টেইপ করে নেবেন। আশ্বাস দিলেন, ভারতবর্ষ পর্যন্তও প্রচারিত হবে এই সাক্ষাৎকার।

আগে থেকেই নিয়োগ ছিলো, আমি প্রস্তুতই ছিলাম, দুজন ভদ্রলোকই দেখলাম খুব সপ্রতিভ এবং হাসিখুশি। আলাপ জমে উঠতে দেরি হলো না। আমি বললাম, কী প্রশ্ন করবেন জানালে জবাব দেবার আগে আমি একটু ভেবে নিতে পারি। তা নইলে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে যা তা বলবো। তাঁরা হেসে বললেন, 'ব্যস্ত কী। আপনার আতিথেয়তা ভোগ করি তো খানিকক্ষণ তারপর দেখা যাবে।'

আমার আর কী আতিথেয়তা। কফি করে দিলাম, সঙ্গে কাজু ও কুকি। মিষ্টি নির্মাকি করে রেখেছিলাম, সসংকোচে তাও দিলাম। ইংরেজ ভদ্রলোকটি মহা আহ্লাদিত। রেসিপি জানবার জন্য ডটপেন আর নোটবুক নিয়ে প্রস্তুত। 'আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালো রান্না করেন, নিশ্চয়ই রান্না করতে খুব ভালোবাসেন, নিশ্চয়ই খুব ভালো হাউসওয়াইফ, আর তা তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি।' কতো যে বলতে লাগলেন !

আমি সত্যের অপলাপ না করে এই তিনটি প্রশংসার জন্যই এ দেশের রান্নাঘরের উৎকর্ষকে প্রাধান্য দিলাম। এ রকম রান্নাঘর দেখলে অতি অনিচ্ছুক রাঁধুনিও যে পারদর্শিনী হয়ে উঠতে পারেন সে বিষয়ে অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই সেটা বোঝাতে সক্ষম হলাম।

ওরা সকৌতুকে সব শুনতে শুনতে সহাস্যে ঠাট্টা করলেন, 'এতো কিছু থাকতে শেষে এদের রান্নাঘরটাই আপনাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করলো নাকি ?'

আমি একবাক্যে রাজি।

আমাদের রান্নাঘরের তুলনায় ওদের রান্নাঘর সত্যিই অনেক বেশী সুবিধেজনক এবং আরামপ্রদ। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ অথবা গ্যাস। সেই সময়ে, অর্থাৎ একষট্টি সালে আমাদের দেশে দুটোই মহার্ঘ। বিদ্যুৎ তো বটেই, গ্যাসও সেই ওরিয়েণ্টেল গ্যাস, যা বিশেষ বিশেষ বাড়িতে বিশেষ বিশেষ পাড়ায় অবস্থিত। তার অনতিকাল পরেই অবশ্য ইনডেন গ্যাস শুরু হলো, তা-ও ক'টা বাড়িতে? প্রকৃতপক্ষে এই সাতাত্তর সাল পর্যন্তও সেই কয়লার উনুনই বেশীর ভাগ বাড়িতে জ্বলে। বিদ্যুতের ইউনিট নাগালের বাইরে। আগে তবু ডোমেস্টিক মিটার বা হোয়াইট মিটার ছিলো, এখন তো তাও নেই। সুতরাং বিদ্যুৎ পরিহার্য। আর ইনডেন গ্যাসও বা সকলের আয়ত্তে কোথায়?

নিউইয়র্কে আমাকে কখনো আগুনের দাম দিতে হয়নি, সে সব বাড়িভাড়ার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আর একবার গিয়ে একটি মফঃস্বল শহরে বছরখানেক থাকতে হয়েছিলো, সেখানে রান্নাঘরের গ্যাসের জন্য সারা মাসের বিল আমার সাড়ে তিন ডলার দিতে হতো। এক মাস আবার দু ডলার দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই টাকার অঙ্কের হিসেব সেখানে প্রযোজ্য নয়, লোকেরা ডলারের অঙ্কেই মাইনে পায়, সুতরাং সেই অঙ্কের হিসেবে মাসে দু তিন টাকা আগুন খরচ অবশ্যই অত্যন্ত সস্তা।

আমাদের দেশে রান্নাঘর মানেই একটি আলাদা ব্যবস্থা। সেটি আসল বাসভবন থেকে কিছু দূরে এবং আড়ালে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন গৃহস্বামীরা। এখানে আবার ঠিক তার উল্টো। দূরে বা আড়ালে তো নয়ই, একেবারে দুর্ধর্ষ সদরে, ড্রইংরুমের মধ্যে।

ম্যানহাটানের ছোটো ছোটো সব অ্যাপার্টমেণ্টে রান্নাঘর বলতে যা বোঝায়, তাকে আর ঘর বলা চলে না, বলা যায় স্পেস। লিভিংরুমের যে কোনো দিক থেকে লম্বা একটি অংশ কেটে নিয়ে তৈরি হয় সেই স্পেস। দেয়াল সংলগ্ন উনুনের ডাইনে বাঁয়ে ফ্রীজ সিঙ্ক ডিশ্‌ওয়াশার মেসিন, কুটনো কোটার জায়গা, সব মজুত। উনুনের উপরের দেয়ালে হাত বাড়ালেই সুদৃশ্য ক্যাবিনেটের সারি, থাকে থাকে রান্নার সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা। সাধারণত উনুনটিতে চারটে মুখ থাকে, কমানো বাড়ানো তো ইচ্ছে মতো। চার মুখে চার রকম রান্না একসঙ্গে হয়ে যেতে পারে।

বাজার থেকে যেসব ভোজ্য বস্তু আসবে, সবই ধোয়া মোছা বাছা। আমিষের

মধ্যে গরু শুয়োর ভেড়া মোষ মুর্গি যে মাংসই আসুক, বাড়িতে এনে আর ঝামেলা নেই কোনো। মুর্গি আস্ত চাইলে আস্ত, কাটা চাইলে কাটা। শুধু কাটাই নয়, যে অংশ দরকার তাই পাওয়া যাবে। বুক চাইলে বুক, ঠ্যাং চাইলে ঠ্যাং, পাখনা চাইলে পাখনা, সবই আলাদা আলাদা করে মেপে রাখা আছে সেলোফেনে। মিলিয়ে চাইলে তা-ও আছে। কী নেয়া হবে আর কতোটা নেয়া হবে সেটাই শুধু বিবেচ্য। কিমা চাইলে কিমাও আছে, মেটেও আছে। সব জন্তুর মাংসই এরকম পরিষ্কার ভাগ ভাগ করা ওজন করা এবং দাম লেখা। ঠকাঠকির পালা নেই। লম্বা এ-মাথা ও-মাথা আলোয় উদ্ভাসিত ঝকঝকে কাচের বরফ ভরা বাকসে সাজানো। শো-কেস খুলে পছন্দ করে নিলেই হলো।

বাড়ি এনে ঝাল ঝোল করতে হলে চাপলো প্রেশারকুকার উনুনের মুখে, আর রোস্ট টোস্ট স্টেক করতে হলে এনামেলের ট্রেতে করে ঢুকলো চেমবারে।

তারপর বসার ঘরে বসে গোয়েন্দা গল্পই পড়ুন অথবা সিরিয়াস উপন্যাস, কবিতাই পড়ুন বা প্রবন্ধ, টি. ভি. ই দেখুন বা কাউকে নিমন্ত্রণ করলে তাঁদের সঙ্গে পানীয় হাতে আড্ডাই দিন, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, কখন গিয়ে নামাতে হবে, বা নাড়তে হবে বা আগুন বাড়াতে কমাতে হবে অথবা নেবাতে হবে।

যদি নিরিমিষ চান তারও ঐ একই পদ্ধতি। কোন্ সবজি কাটার জন্য কোন্ যন্ত্র প্রযোজ্য তা-ও সাজানো আছে দেরাজে। চাঁছা, ছোলা, কাটা, কোটা কিছুতেই কোনো অসুবিধে নেই। গাজর বীট বীম আলু পেঁয়াজ মটরসুঁটি শশা কুমড়ো—সব ট্রেতে সাজিয়ে ড্রয়িংরুমেই নিয়ে আসা যায়, রাখা যায় সেন্টার টেবিলে, একা হাতে অথবা হাতে হাতে কখন যে সব কাটা হয়ে যাবে টেরও পাওয়া যাবে না। অতিথিই হোন আর বাড়ির মানুষই হোন এই পরিবেশে সাহায্যদানে সকলেই উৎসুক। তখন আর কাজটা কাজ মনে হয় না। রান্না করাটা পরিশ্রমের ঘটনা বলে গণ্য হয় না।

ভদ্রলোক দুজন আমার এইসব সংসার-উচ্ছ্বাস চুপচাপ শুনছিলেন, সায় দিচ্ছিলেন মাথা নেড়ে নেড়ে।

তারপর কিছুক্ষণ বাদে উঠলেন। সহাস্যে বললেন, 'খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে।'

আমি ঈষৎ বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, 'কই আমাকে তো কোনো প্রশ্ন করলেন না, কোনো জবাব নিলেন না। অথচ সেই উদ্দেশ্যেই তো আসা। তবে কি গল্প

করতে করতে ভুলে গেলেন ? না কি আমাকে দেখে আমার কাছে কারো কোনো কিছু জানবার থাকতে পারে বলে বোধ হলো না ?'

কিছু না বলে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ইংরেজ ভদ্রলোকটি নিচু হয়ে তাঁদের নিয়ে আসা ছোট্ট মেসিনটি গোটাতে গোটাতে বললেন, 'একবার শুনবেন নাকি আপনার বক্তৃতাটা।'

আমার বক্তৃতা !

হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। কখন এরা তুললো এসব। এতো সূক্ষ্ম এদের যন্ত্র ? বাঙালী ভদ্রলোকটি বললেন, 'এরকম স্বতঃস্ফূর্ত ইনটারভিউই আমরা নিয়ে থাকি। এটাই আমাদের একটা প্রোগ্রাম। খুব ভালো হয়েছে।' টেপ শেষ করে ইংরেজ ভদ্রলোকটি হেসে বললেন, 'স্পেননিডড।'

হায়রে, এই নাকি স্পেননিডড! আমি কতো কথা ভেবে রেখেছিলাম, সবই ব্যর্থ হলো।

জানি না সেই দুঃখেই কিনা, রাত্রিবেলা এমন দাঁত ব্যথা হলো যে কান ফেটে যাবার দশা। অথচ এর আগে দাঁত ব্যথা কাকে বলে তার আমি কিছুই জানতাম না। দাঁত নিয়ে বুদ্ধদেব কষ্ট পান খুব। চৌরঙ্গীর ডক্টর মজুমদার (ডক্টর এস. কে. মজুমদার, লেখিকা লীলা মজুমদারের স্বামী) তাঁর প্রিয় ডাক্তার, উপশমের জন্য মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে যান। দাঁত তুলে আসেন। আর আমারই কিনা এই বিদেশ বিভুঁয়ে এসে এ দশা। আমেরিকায় ডাক্তারদের খুব বদনাম। শুনেছি তাঁরা নির্দয়, অসুখ করলে এখানে উপায় নেই। একেবারে সর্বস্বান্ত হতে হয়। আমি মাত্রই একজন মাস্টারের স্ত্রী, আমার যে কী হবে তাই ভেবে আর কূল পাই না।

বুদ্ধদেব জানলে অস্থির তো হবেনই, নিশ্চয় বিপন্নও হবেন। সেই ভেবে সারা রাত আর তাঁকে জানালাম না। নিঃশব্দে ছটফট করে কেটে গেল এক বিভীষিকাময় রাত্রি। সকালটাও চুপচাপ কাটানো গেল। কিন্তু দুপুরে খেতে বসে চোখে জল।

একটা দাঁত অনেক আগে অনেক অল্প বয়সে ফীল-আপ করা হয়েছিলো। আবার কবে যেন ফীল-আপটা পড়েও গিয়েছিলো। সেই থেকে গর্তটা গর্তই আছে, আর ভরা হয়নি। বলিওনি কাউকে। কোনো অসুবিধেও বোধ করিনি। হঠাৎ সেই ফোকরেই এই ব্যথা। এখন কী করা যায় ? কোথায় পাওয়া যায় ডাক্তার ? অথচ এতো অসহ্য যন্ত্রণা, ডাক্তারের কাছে তো না গেলেই নয়।

ওখানে হাতের কাছে কোনো বইটই না থাকায় আমি মাঝে-মাঝেই টেলিফোন গাইডটা নিয়েই নাড়াচাড়া করতাম নির্জন সময়ে। ওটা আমার বেশ সঙ্গী হয়ে উঠেছিলো। ওটা দেখে দেখে অচেনা শহরের অনেক কিছু চিনে ফেলেছিলাম আমি। কতো যে দোকানের বিজ্ঞাপন থাকতো ঠিক নেই। কতো জিনিসেরই বা নাম মুখস্ত হয়ে গিয়েছিলো! ম্যাথর চাইলে ম্যাথরের নম্বরও পাওয়া যেতো সেখানে, চাবি চাইলে চাবিওলার ঠিকানা। সবারই ফোন আছে, নম্বর আছে, অতএব ডাকলেই হলো। নিশ্চয় ডাক্তারদেরও আছে।

আমি তখন গাইডটা নিয়েই খোঁজাখুঁজি করতে লাগলাম। ওব্ বাবা, একজন নাকি? সারিবদ্ধভাবে কতো ডেণ্টিস্টের নাম! বুদ্ধদেব অভিজাত মানুষ। মূল্যবান না হলে স্তার মন ওঠে না। সুতরাং দেখে শুনে ভালোপাড়ার ভালো ডিগ্রীর একজন ডাক্তারকেই ফোন করা গেলো। সাড়াও মিললো, সময়ও স্থির হলো। সেদিন নয়, পরের দিন সকালে, বারোটার সময়। অ্যাসপিরিন খেয়ে খেয়ে কোনো মতে সময় কাটিয়ে পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলেম সেখানে! একই বিল্ডিংয়ে একই ফ্ল্যোরে পাশাপাশি সব ডাক্তার। যাঁকে ফোন করেছিলাম সামান্য ঘোরাঘুরিতেই পেয়ে গেলাম তার দরজা। বেল দিতেই খুলে গেল, অভ্যর্থনাকারিণী অপেক্ষা-গৃহে বসিয়ে নিয়ে গেলেন নাম। ডাক পড়লো অচিরেই।

সুসজ্জিত ঘর, সুগন্ধে ভরপুর। ঢুকতেই উল্টোদিকের দেয়ালে রেমব্রাণ্টের মস্ত একটি ছবি চোখে পড়ে, তার পাশে লাল মোটা পর্দার আড়াল, সম্ভবত ভিতরে ঘর। এদিকে স্টীমে অনবরত যন্ত্রপাতি ফুটছে, বেসিনে পিছন ফিরে হাত ধুচ্ছেন ডাক্তার। নার্স আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। ডাক্তার মুখ ফেরালেন, 'এই যে, কেমন আছেন?' এগিয়ে এলেন, 'দিনটা ভারি সুন্দর না?'

আলাপ।

ডাক্তারটি মধ্যবয়সী সুদর্শন এবং চঞ্চল।

'খুব ব্যথা?'

'খুব।'

'ভারতবর্ষ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁত ফীল-আপ করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টা ?'

'একটা।'

ঠিক আছে, এক্ষুণি সব সারিয়ে দিচ্ছি। 'আয়্যাম সেলিং টু নাইট, সেলিং টু নাইট'। বোধ হয় সিনেমার কোনো চলতি গানে টান দিলেন, আবার গিয়ে গরম জলে হাত ধুয়ে এলেন, ফুটফুটে সাদা ন্যাপকিনে হাত মুছে ন্যাপকিনটা ছুড়ে দিলেন ওয়াশিং মেশিনে, তারপর আমার দাঁত দেখলেন। মাথা নাড়লেন, 'উঁহু' এটি আর ভরাট হবে না, ঈশ, কতো রুট বেরিয়ে গেছে, খুব যন্ত্রণা হয়েছে নিশ্চয়ই—'

'অসহ্য।'

'খাবারগুলো ঢুকে যাচ্ছে তো সব। অনেক দিন এভাবে থেকে অনেক বড়ো হয়ে গেছে গর্ত, ভরে দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই পড়ে যাবে।'

'তবে ?'

'তবে আর কী ? দাঁতটা ফেলে দিচ্ছি।'

'ফেলতে হবে ? এতো শক্ত দাঁত আমার।'

'উপায় কী ?'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে সান্ত্বনা দিলেন, 'এতো দাঁতের মধ্যে একটা দাঁত গেলে কী হয় ? আমার তো চারটে দাঁত নেই। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার, টেরও পাবেন না।'

আবার 'সেলিং টু নাইটের' সুর টানতে টানতে ইনজেকশন নিয়ে প্রস্তুত হলেন। মহিলাটি হাতে হাতে এগিয়ে দিচ্ছেন সব, দাঁতের গোড়ায় দুটি ইনজেকশন দিয়ে দিলেন চট করে। মহিলা আমাকে খাঁজে মাথা রেখে ঠিক করে বসিয়ে দিলেন। দাঁতের গোড়া অবশ হতে দেবার জন্য সামান্য অপেক্ষা, তারপরেই যন্ত্র হাতে নিয়ে বললেন, 'হাঁ করুন।'

ডাক্তার বুঝতে পারেননি তাঁর সেই ইনজেকশনে আমার শুধু দাঁতের গোড়াই নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অবশ হয়ে গেছে। শ্রবণ এবং দৃষ্টি দু-ই-ই ঝাপসা। কোন্ সুদূর থেকে ইংরিজি ভাষায় কয়েকটি শব্দ ভেসে এলো, 'কী হলো ? কী হলো ? চোখ খোলো, চোখ খোলো—ও গড—', আমাকে ধরলেন তিনি, তারপর আর মনে নেই।

যখন তাকালাম দেখি সেই লাল পর্দার এ পারে শুয়ে আছি। বুদ্ধদেব, ডাক্তার এবং সেই মহিলাটি—তিনজন দাঁড়িয়ে।

সহজেই সুস্থ হয়ে উঠে বসলাম। ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'কী কাণ্ডটাই হলো বলুন তো। এ রকম ঘুমিয়ে পড়লেন! ছি!'

তখুনি ইনভ্যালিড চেয়ার এলো, তেরো তলা থেকে নামিয়ে আনলো নার্স, ক্যাব ডেকে তুলে দিল যত্ন করে।

বাড়ি এসে মুখটা একেবারে অবশ হয়ে রইলো, কথা বলাই সমস্যা। রাত্রিবেলা ফোন এলো একটি। ডাক্তার ফোন করে খবর নিচ্ছেন কেমন আছি। বললেন, 'সারাদিন কাজ, এই বাড়ি ফিরে এলাম। একটা কথা বলে দেয়া দরকার, মুখ খুলতে না পারলে ভয় পাবেন না। ওটা ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কেটে গেলেই আবার প্রচণ্ড ব্যথা হবে, এই ওষুধটা লিখে নিন।'

ডাক্তারের এই দায়িত্বজ্ঞানে আমরা উভয়েই অবাক হলাম। কৃতজ্ঞ হলাম।

পরের দিন দুপুরে আবার ফোন করলেন। বললেন, 'আজকের দিনটা বাদ দিয়ে ব্যথা কমলে কাল দাঁত তোলার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবে আমার কাছে নয়, আমি আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছি, উনিই তুলবেন। এখন আমরা যে ইনজেকশন দিয়ে দাঁত অবশ করি, দেখা যাচ্ছে সেটা ওঁর সহ্য হচ্ছে না। অথচ এটা ব্যবহারেই আমরা অভ্যস্ত। যাকে ঠিক করেছি তিনি খুব অভিজ্ঞ ডাক্তার, বছর দশেক আগে যে ইনজেকশনের প্রচলন ছিলো, প্রয়োজনে সেটার ব্যবহারও উনি মধ্যে মধ্যে করে থাকেন, সেটা এর চেয়ে অনেক মাইল্ড। মনে হয় তাতেই কাজ হবে।'

নির্দিষ্ট দিনে গেলাম সেই ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এবং ওষুধের প্রতি বুদ্ধদেবের অগাধ আকর্ষণ। বেশ ঘনঘটা করে চিকিৎসা হচ্ছে ভেবে মহা খুশি। আমি কিন্তু এর ফলাফলের কথা চিন্তা করে প্রমাদ গুণছি। কালকের ডাক্তারকেও তখনো কিছু দেয়া হয়নি। কম তো করেন নি। দেখেছেন, ইনজেকশন দিয়েছেন, ঘুমিয়ে পড়লে শুশ্রূষা করেছেন, তার উপরে ইনভ্যালিড চেয়ার, নার্স, অন্য ডাক্তার ঠিক করে দেয়া, ফোন করা—এই এলাহি কাণ্ডের নিশ্চয়ই এলাহি বিল তৈরি হয়ে আছে। এখন আজকের ডাক্তার কেমন গলা কাটবেন কে জানে।

এই ডাক্তার আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সিগেরেট খাও?'

'না।'

'মদ খাও?'

'না।'

'ঘুমের ওষুধ খাও?'

'না।'

'সর্দিটর্দি হলে কোনো কড়া ওষুধ খাবার অভ্যেস আছে ?'

'না।'

'আজকাল ছেলেমেয়েরা এমন সব নানা রকম কড়া ওষুধ আর নেশা অভ্যাস করেছে যে কোনো সহজ উপায়েই তাঁদের কাজ হয় না। সেই তুলনায় রবার্ট তো তোমাকে খুব মাইল্ড ইনজেকশনই দিয়েছিলো। দেখি আজ আমার ইনজেকশনে তোমার কেমন রিঅ্যাকসন হয়—'। পুট করে ছুঁচ বিঁধিয়ে দিলেন দু'বার। তারপর অপেক্ষা। তারপর দাঁত তোলা। কাঁচা দাঁত, তুলতে একেবারে গলদঘর্ম। প্রবীণ ডাক্তার দুঃখ করতে লাগলেন এমন শক্ত দাঁতটা তুলে ফেলতে হচ্ছে বলে।

শেষ হলো কাজ, অতি যত্নের সঙ্গে শেষ হলো। দাঁত তোলার পরেও খানিকক্ষণ বসিয়ে রেখে দেখে তবে ছাড়লেন। এবং বিনিময়ে যা নিলেন তার অঙ্ক এই মুহূর্তে আমার মনে নেই বটে তবে এটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, কলকাতা শহরে একটি বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসককে যা দিতে হয় তার চেয়ে অনেক কম।

আর অন্য ডাক্তারটি কিছু নিলেন না। বললেন, 'আমি তো দাঁত তুলতে পারিনি, উপরন্তু কতো হাঙ্গামা হলো তোমাদের। আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম, আমার খুব খারাপ লেগেছিলো সেদিন।'

হাত ঝাঁকাঝাঁকি করে অনেক শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দিলেন।

আমি একটু মিনমিন করে বলেছিলাম, 'কিন্তু নার্স, ইনভ্যালিড চেয়ার— এ সবের জন্য—'। সশব্দে হেসে উনি পিঠ চাপড়ালেন, 'ও হানি, তুমি সেদিন আমাকে যা জব্দ করেছো, আমার চল্লিশ বছরের প্র্যাকটিসে আর কখনো এমন হয়নি।'

আমরা এই ভদ্রতায় এবং সততায় অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

এই প্রসঙ্গে আরো দু'জন ডাক্তারের কথা আমার মনে পড়ছে। দেশে থাকতেই আমি বহুকাল যাবৎ একটি কষ্টকর পুরোনো অসুখে ভুগছিলাম। এর থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি। অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করে অনেক খ্যাতনামা ডাক্তারের দ্বারস্থও হয়েছি। একমাত্র ডাক্তার সুবোধ মিত্র কথঞ্চিৎ উপশম করেছিলেন বটে, কিন্তু রোগ নির্মূল করা তাঁরও সাধ্যায়ত্ত ছিলো না।

ডক্টর রোডেরিক মার্শেল নামে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট

ও বিদগ্ধ অধ্যাপক আমাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়েই পড়াতেন। এই দম্পতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে এসে এক বছর পড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই থেকেই এই বন্ধুতা অটুট। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই যেমন বন্ধুবৎসল তেমনি ছাত্রবৎসল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা যখনই যে এ দেশে এসেছে তাঁদের আতিথেয়তা ভোগ করেনি এমন কেউ নেই। নিউইয়র্কে এসে পৌঁছলে অবধারিতভাবেই সবাই তাঁদের বাড়িতে উঠেছে, থেকেছে, আদর-যত্ন ভোগ করেছে।

কথা প্রসঙ্গে এই অসুস্থতার কথাটা আমি ওঁদের বলেছিলাম। নিউইয়র্কে সেই সময়ে একটি বিশ্ব-সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছিলো, সারা জগতের সব মনীষীরা সমাগত হয়েছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধদেবও সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত। এসে পৌঁছুবার দু-একদিনের মধ্যেই মার্শেলদম্পতি একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের নিয়োগ করিয়ে দিলেন।

রোগী আমি একা, যাচ্ছিলাম চারজনে মিলে। মার্শেল বললেন, 'চলো হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে চলে যাই, খুব দূর না এখান থেকে।'

শরৎকালের প্রথম দিন, শীত তখনো মর্মান্তিক হয়ে ওঠেনি, তখনো মানুষজন বসন্তের আমেজকে প্রাণপণে ধরে রেখেছে, প্রকৃতি সম্ভোগের শেষ হুল্লোড়ে সব মাতোয়ারা।

কয়েকটা ব্লক পার হতে হতে বিকেল পড়ে এলো, যাচ্ছি পশ্চিমে, আকাশের লাল আগুন এতক্ষণও খেলা করছিলো, উঁচু উঁচু বাড়ির মাথা ছাপিয়ে কখন যেন ঝপ করে কোথায় লুকিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠলো অজস্র বিদ্যুৎ।

আমি বললাম, 'আর কতো দূর?'

মার্শেল বললেন, 'দ্যাখো রাণু তুমি বড়ো অলস, কখনো হাঁটতে চাও না। আমি রোজ তোমাকে নিয়ে হাঁটতে বেরুবো, বুঝবে তখন মজা।'

মজাই বুঝছিলাম। ওঁদের শীত না করলে কী হবে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো, কী জঘন্য হাওয়া।

একটু পরেই অবশ্য পৌঁছুলাম গিয়ে। খবর দিতেই ভিতরের পর্দা সরিয়ে সাদা ধবধবে অ্যাপ্রোন পরিহিত যিনি এসে দরজার ফ্রেমে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখে মদিলিয়ানীর একটি জীবন্ত ছবি ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না।

রোগা, ছোটোখাটো হলদে রংয়ের এক পঞ্চাশোত্তীর্ণা মহিলা। আমি জানতাম না আমি একজন মহিলা ডাক্তারের কাছে এসেছি।

মৃদুহাস্যে পরিচয় গ্রহণ করলেন তিনি, তারপর আমাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেলেন। যে কণ্টকর অসুখে পাঁচ বছর যাবৎ ভুগছিলাম, তা শুনলেন মন দিয়ে। আমেরিকায় এসে পেঁাছোবার মাস তিনেক আগে ডিপথেরিয়া সন্দেহে, আমাকে একটি ইনজেকশনও দেওয়া হয়েছিলো এবং সেই ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়ায় সারা দেহ চুলকে চুলকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ফুলে আমি প্রায় একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক অর্থবৃষ্টির পরে তা থেকে মুক্তি পেলেও তখনো শরীরে তার নানা রকম চিহ্ন বর্তমান ছিলো। জায়গায় জায়গায় ফেটেফেটে এক ধরনের ঘা হয়ে যাচ্ছিলো, এটাকেই ডাক্তাররা কোনো মতে তাঁদের আয়ত্তে আনতে পারছিলেন না। সেজন্য আবারও অন্য কোনো ইনজেকশন দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং আমি সবেগে তার প্রতিবাদ করছিলাম। কেননা ইনজেকশন বিষয়ে আমার মনে ভীষণ ভয় ঢুকে গেছে।

বস্তুত ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়াই আমার ভবিতব্য। এই বয়সে, এই মুহূর্তে এই বর্তমানের আমিও অন্য এক ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়ার ক্রীতদাস। তারই দয়ায় আজ আমার স্বাভাবিক চলৎশক্তি ব্যাহত।

সেই ঘা-ও ভদ্রমহিলা দেখলেন, তারপর একটি তিন সপ্তাহের 'ট্রিটমেন্ট' দিলেন। প্রথম সাত দিন ঔষধ লেপন, দ্বিতীয় সাতদিন চিকিৎসা বাদ, তৃতীয় সাতদিন দু-বেলা দুটি করে ক্যাপসুল গলাধঃকরণ।

অসুখ সত্যিই আমার সেরে গেল। চিরতরেই সেরে গেল। তার জন্য দর্শনী দিতে হলো দশ ডলার। কলকাতায় এই অসুখের জন্য আমার খরচ হয়েছিলো নশো টাকা!

আমেরিকায় অনেকগুলো অসুখ একেবারেই নেই। তার মধ্যে একটি ডিসেন্ট্রি, যা আমাদের দেশে শতকরা সাড়ে নিরানব্বুই জনেরই আছে। তার পেটেন্ট ওষুধও আছে অনেক। এনটারোকুইনল, এনটারোভায়াফর্ম, ফালাজল, মেকসাফর্ম ইত্যাদি তো সবাই কিনে এনে মুঠো মুঠো খাই। দেশভ্রমণে বেবুলে অ্যানাসিনের মতো এসব ওষুধও আমাদের সঙ্গে থাকে। বুদ্ধদেব এই অসুখটায় মাঝে মাঝেই খুব কণ্ট পেতেন। নিউইয়র্কে এসে প্রথমেই আমরা যে ওষুধটার খোঁজ করছিলাম তা ঐ এনটারোকুইনল, এনটারোভায়াফর্ম অথবা মেকসাফর্মই। দেশ থেকে নিয়ে আসিনি, ভুল করেছিলাম। এখানে কোনো

ড্রাগ স্টোরেই পাওয়া গেল না। এরকম কোনো ওষুধের নাম তারা জানে বা শুনেছে বলেও মনে হলো না।

কথা প্রসঙ্গে ডাক্তার মহিলাটিকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওষুধটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে। তিনিও ভুরু কুঁচকোলেন; মাথা নেড়ে বললেন, 'এ ওষুধের নাম তো আমি জানি না, কী অসুখের ওষুধ?'

'ডিসেন্ট্রি।'

'ডিসেন্ট্রি! আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি—'। র‍্যাক থেকে একটা বই টেনে নিয়ে গিয়ে তিনি দাঁড়ানো আলোর তলায় দাঁড়িয়ে সূচী দেখে বার করলেন অসুখটার নাম। 'শোনো' ফিরে এলেন কাছে, 'এ অসুখ এখানে কারো হয় না, আগে হতো, নামটা আছে, আমি এর চিকিৎসা জানি না। যে ওষুধগুলোর নাম বললে সে নামও এখানে দেখছি না। তবে এটা চেষ্টা করে দেখতে পারো, লিখে দিচ্ছি, পেট সবল থাকবে, চট করে কোনো শত্রু আক্রমণ করতে পারবে না।'

সে ওষুধটাই অগত্যা কিনে নিলাম। তারপর থেকে ওখানে থাকাকালীন আর কখনো তো হয়ইনি, দেশে ফিরেও সে কষ্ট আর বুদ্ধদেবকে পীড়ন করেনি।

বহুদিন বাস করতে করতে যে-কোনো দেশেই কিছু না কিছু অসুখ-বিসুখ হতেই পারে। দেহধারণের একটা মাসুল ঈশ্বরকে দিতেই হয়। কিন্তু ওখানকার খাদ্য, পানীয় দুই-ই এমন নির্ভেজাল যে সে সবের অবকাশ খুব কম। যে দুবার আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হলো তার জন্য ঐ দেশের জল-বায়ু দায়ী ছিলো না। সেই গয়না আমি স্বদেশ থেকেই নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু একটি তৃতীয় গয়না যা ও-দেশেই আমাকে উপহার দিল সেটি একটি ফোড়া। আমরা তখন ইলিনয় স্টেটের একটি ক্ষুদ্র শহরে বাস করছিলাম। প্রায় পাশাপাশি ক্যাম্পাস। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পুত্র বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলো, কন্যা এবং বুদ্ধদেবের ছাত্র সন্তানপ্রতিম অমিয় দেব (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক বিভাগের রীডার) পি. এইচ. ডি. করছিলো। ওরা সবাই এসেছিলো। অমিয় আর ছেলে এসেছে সপ্তাহান্ত কাটাতে, আর কন্যা দময়ন্তী যাবে হিউস্টনে। তার স্বামী তখন টেক্সাসে রাইস বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছে। স্বামীর কাছে যাবার পথে তার কয়েকদিনের অবস্থান আমাদের সঙ্গে।

বাড়ি আনন্দে ভরে গেছে। আমি মনের সুখে বাজার করছি, রান্না করছি, সঙ্গে দেবার জন্য ঘি তৈরি করছি বোতল ভর্তি, কিন্তু হাত তো নাড়তে পারি না। নরম জায়গায় ফোড়া, ফুলে এতোখানি হয়ে গেছে। সামান্য এ-পাশ ও-পাশ হলেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। স্বভাবতই বুদ্ধদেব সংসারের যে-কোনো গরমিলের খবরে এমন বিচলিত হয়ে পড়েন যে সহসা কোনো বিপদ-আপদ-ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার কথা আমি তাঁর কর্ণগোচর করতে চাই না। আমার নিজস্ব পদ্ধতিতেই প্রথম সাধ্যমতো এবং বুদ্ধিমতো নিরসন করবার চেষ্টা করি, একান্ত অপারগ হলে আর ব্যস্ত না করে উপায় থাকে না। লুকিয়ে লুকিয়ে কলের ধারে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে গরম জলের সেক দেয়া, অ্যাসপিরিন খাওয়া, এসব করেও দেখলাম কমছে না। ওরা চলে গেলে মেয়ে কিন্তু ঠিক ধরে ফেললো। আর ফোড়ার চেহারা দেখে তো চোখ ছানা-বড়া। গায়ে সর্বদাই একটা কার্ডিগান থাকে, হাত ফুলে লাল হয়ে যে এমন ভয়াবহ চেহারা হয়েছে সবাই জানবে কী করে? বলাই বাহুল্য বুদ্ধদেবও জানলেন, তারপর রাগারাগি, তারপর ডাক্তারের কাছে যাওয়া।

ডাক্তার আমার ফোড়া দেখার চেয়ে পোশাক দেখলেন বেশী, অসুখের বৃত্তান্ত শোনার চেয়ে, সাপ-বাঘ সংকুল ভারতবর্ষের বৃত্তান্তেই বেশী উৎসাহ দেখালেন। বলা যায় একেবারে আলাপের বন্যা বইয়ে দিলেন। তারপর ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, 'কিছু ভাববার নেই, দুদিনেই সেরে যাবে। তবে এতোটা বেড়ে ওঠার আগেই আসা উচিত ছিলো।'

বাড়ি এসে ডাক্তারের নির্দেশ মতো শুয়ে থাকতে হলো। জ্বর হচ্ছিলো, না শুয়ে পারাও যাচ্ছিলো না। কন্যার যত্নে ঔষধ পথ্য সবই ঠিক মতো চলছিলো, কিন্তু উপশম হচ্ছিলো না কিছুই।

কাটলো দু-দিন। তৃতীয় দিন গভীর রাত্রে জ্বরের ঘোরে আর ব্যথার প্রাবল্যে প্রায় অচৈতন্য। বুদ্ধদেব দিনে পঞ্চাশটা সিগারেট ধরান, সকালে উঠে সেটা আরো বেড়ে গেল; দিন-রাত লেখার টেবিলে বসে থাকেন, সেদিন সমানে এ-ঘর ও-ঘর আর বারান্দা-বাগানে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন। সেদিন রোববার, ডাক্তার পাবেন কোথায়?

তবুও ফোন করা হলো চেম্বারে। একটি লোক ধরলো, বলল, 'আজ বন্ধ, আজ আসবেন না।' বাড়ির ফোন নম্বর জিজ্ঞেস করা হলো, দিল নম্বরটা, কিন্তু বললো, 'লাভ নেই, রোববার উনি শহরে থাকেন না।'

আবার বাড়িতে ফোন। একজন মহিলা বললেন, 'এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে গ্রামের বাড়িতে মাছ ধরতে গেছেন।'

'সেখানে কি কোনো ফোন আছে?'

'আছে, কিন্তু পাবেন না।'

'তবু যদি একটু দয়া করে দেন।'

দয়া করেই দিলেন মহিলা।

আবার ফোন করা হলো সেখানে। কেউ একজন বললো, 'উনি ব্যাক-ওয়াটারে মাছ ধরছেন।'

'একটু কি খবর দেয়া যায় না?'

'কী দরকার?'

'একটু ডেকে দিন দয়া করে ভীষণ জরুরী।'

'ধরুন।'

খানিক বাদেই হাঁড়ির ভিতর থেকে গলা এলো, 'হ্যালো।'

'ডক্টর অমুক?'

'হ্যাঁ।'

'খুব বিপদ।'

'কী?'

ফোনের ভিতরেই আমরা কে, কী ব্যাপার সব বলা হলো বুঝিয়ে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আসছি।' কেটে দিল ফোন। তারপর অপেক্ষা।

কুড়ি মাইল রাস্তা কম রাস্তা নয়, সেই তুলনায় তাড়াতাড়িই এলেন। বোধহয় খুব স্পীডে চালিয়ে এসেছেন। 'কী হয়েছে, বলো' ঘরে ঢুকলেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে, এক পলক দেখলেন আমাকে 'কী কাণ্ড' নাড়ি টিপলেন, 'এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে' বলে দুহাতে প্রায় ছোটো মেয়ের মতো তুলে ধরে নিজের গাড়ির পিছনের সীটে শুইয়ে দিলেন। 'আপনি সঙ্গে চলুন।' এটা বললেন বুদ্ধদেবকে, 'মার জন্য কিছু জামকাপড় নিয়ে তুমিও একটা ক্যাবে চলে এসো।' এটা বললেন দময়ন্তীকে।

এসে দেখে গেল হাসপাতালে খালি নেই বেড। ডাক্তার নিজে নিয়ে এসেছেন, খালি নেই তো তৈরি হতে কতক্ষণ। ঐ তো এক খুদে ভুট্টাখেতের শহর, তার মধ্যে ডাক্তারটি খ্যাতিমান, বোধহয় হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্টও

ছিলেন, ঠিক জানি না। কোনো একটি ঘরে অন্য ছজন রোগীর সঙ্গে আর একটি খাট পড়লো।

কাতরভাবে বুদ্ধদেব বললেন, 'একা একটা ঘর পাওয়া যায় না ?'

ডাক্তার ছটফট করছিলেন, সে কথায় কান না দিয়ে ব্যস্তভাবে আর একজন ডাক্তার নিয়ে এলেন, তৎক্ষণাৎ ইনজেকশন পড়লো দুটি, তারপরেই নিবিড় নিদ্রা।

ঘুম ভাঙতে ভাঙতে প্রায় সন্ধে। জেগে উঠে দেখলাম, একা ঘরেই রেখেছে আমাকে। কখন নিয়ে এসেছে কে জানে। ঘরের মাঝখানে ডবল স্প্রীংয়ের খাট, অদূরে জানালার তলায় নরম কৌচ পাতা, মাথার কাছে বেড সাইড টেবিলে টেলিফোন, আলো, নীচের তাকে খানকয়েক বই, পায়ের দিকে মস্ত আয়নাওলা সাজের টেবিল, পাশে ডেস্ক, সংলগ্ন সুসজ্জিত বাথরুম। গায়ে একটি হাল্কা কম্বলের আবরণ, বিছানার তলায় স্যুইচ আছে, টিপলে সেটি প্রয়োজন মতো উষ্ণ ঈষদুষ্ণ গরম অতিগরম যখন যেমন চাই তাই হয়ে ওঠে। আরো স্যুইচ আছে, সেটি টিপলে নিঃশব্দে নার্স এসে দাঁড়ায় মাথার কাছে। অন্য একটি স্যুইচের সাহায্যে খাটটিকে কখনো খাট, কখনো ইজিচেয়ার, কখনো খাড়া চেয়ার, যা যখন ইচ্ছে করে, ক'রে নিতে পারা যায়।

নরমে গরমে আরামে জাজিমে তোশকে সুখে শয়ান নিজেকে দেখে আমি অবাক বিস্ময়ে চারদিকে তাকালাম। হাসপাতালে প্রবেশ আমার জীবনে সেই প্রথম। অবশ্য অদ্যাবধি সেই শেষ।

চোদ্দদিন ছিলাম সেই হাসপাতালে। সেটাও আমার সুখস্মৃতি। দিনে দুবার বিছানা পাল্টে দিত, সকালে বিকেলে সুগন্ধ ছড়াতো। বারে বারে এসে খোঁজ নিত কিছু দরকার আছে কিনা। দাঁড়াতো দুদণ্ড, হেসে গল্প করতো একটু। নার্সরা বেশীর ভাগই অল্পবয়সী। জানি না এটাও একটা নিয়ম কিনা— প্রত্যেকটি মেয়েই এতো হাসিখুশি এবং সুন্দরী যে দেখলেই প্রাণ ঠাণ্ডা।

মনে হতো তারা বিরক্ত হতে শেখেনি। সারাক্ষণ যে দুটি পায়ের উপরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে উপায় নেই বোঝবার। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, সারা হাসপাতালটিতে একটি ভৃত্যা বা ভৃত্য নেই। আজ যে মেয়ে রোগীকে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে, কালকেই দেখি সে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করছে। যে মেয়ে সকালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছে সেই মেয়েই বিকেলে কিচেনে গিয়ে ঢুকে রান্না চাপিয়েছে রোগীদের জন্য। একজন বয়স্ক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা সারারাত

একটি টর্চ হাতে হাসপাতালের অলি গলি বারান্দা ঘুরে নাইট ওয়াচের কাজ করতেন। দুদিন দেখলাম দিনের বেলায় ঘরে ঘরে ঢুকে তিনি রোগীদের উচ্ছিষ্ট বাসন কুড়িয়ে নিচ্ছেন। কাজ যেন ধর্ম, তার যেন কোনো জাত-বিচার নেই, অপমান অসম্মানের প্রশ্ন নেই। সবাই সব করে, করতে পারে, সব কাজেই সম্মানের আসন সমান অটুট।

দৈনন্দিন গৃহস্থালি থেকে শুরু করে এই হাসপাতালটি পর্যন্ত তার ব্যাতিক্রম নয়।

ভোর ছটায় ওখানে বেশ অন্ধকার থাকে। তখন থেকেই হাসপাতালের দিন সুরু হয়। একজন জার্মান মহিলা এসে হেসে ঢলে গানের কলি ভেঁজে আমাকে ডেকে তুলে ব্রেকফাস্ট দিয়ে যেতেন। বেশ রাজসিক ব্রেকফাস্ট। আটটা বাজতেই স্নানের তাড়া, সাড়ে এগারোটায় লাঞ্চ। কে কী খাবে সেটা সকালে এসেই জেনে নিয়ে যায়। যিনি জেনে নিতে আসেন তিনি ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের স্ত্রী। মেনুর মধ্যে অনেক রকমের খাদ্য থাকে, যে যেরকম পছন্দ করে। তাই বলে, কেউ যদি সব রকমই চায় তাতেও আপত্তি নেই। তিন রকম পরিমাণ আছে, লার্জ মিডিয়াম স্মল। নিজের আন্দাজ অনুযায়ী খাদ্য ভেবে নেয় সকলে, দিচ্ছে বলেই মিছিমিছি নিয়ে একফোঁটা কেউ ফেলে না।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় এদের ডিনার। দিন সেখানেই শেষ। ভিজিটার্স আসার নির্দিষ্ট সময় আছে বটে, কিন্তু তা নিয়ে খুব কড়াকড় নেই। ব্যক্তিগত ভাবে ভিজিটার্সরা নিজেরাই সবাই সাবধান সতর্ক, সচেতন। আর যে রোগী একা ঘরের বাসিন্দা তার ভিজিটার তো যে কোনো সময়েই আসতে পারে, যতক্ষণ খুশি থাকতে পারে। তবে ঘরের চার্জ, এখানকার অন্যান্য সব কিছুর তুলনায়, বেশ বেশী। আমাকে দিনে তেইশ ডলার করে দিতে হতো। আমি মধ্যে মধ্যে এই ডলারকে টাকার অঙ্কে হিসেব করে একটু খুঁত খুঁত করতাম। বুদ্ধদেব বলতেন 'মাইনেটাও তাহলে সেই অঙ্কেই হিসেব করনা কেন, তা হলেই দুঃখ থাকবে না।'

কথাটা খুবই সত্য। মাইনেটা টাকার হিসেবে গণ্য করলে তেইশ ডলার আর কতোটুকু? তবে খাদ্য বস্ত্রের তুলনায় হাসপাতালের চার্জ বেশীই বলা যায়।

হাসপাতালে থাকতে থাকতে একটা কারণে কিন্তু প্রায়ই আমি মনে মনে ভীষণ চটে যেতাম। নির্দিষ্ট সময়ে নার্সরা ঘুরে ঘুরে এসে দেখে যায় বটে কিন্তু তার বাইরে দরকার হলে যখন স্যুইচটি টেপা হয়, কিছুতেই আসে না।

বলাই বাহুল্য আমার ফোড়াটা মোটেও বিনীত জাতের ছিলো না। কাটা ছেঁড়া হয়ে গেলেও যথেষ্ট সাবধানে রাখা হতো। শুকোবার জন্য সর্বক্ষণই একটা সেক চলতো। সেটা চলতো বিদ্যুতের সাহায্যে। হাতটা যাতে না নড়ে তার একটা ব্যবস্থা ছিলো বটে, তবুও হঠাৎ হঠাৎ কী ভাবে যেন প্লাগটা খুলে যেতো। তখন আমি আবার সেটা লাগিয়ে দেবার জন্য ক্রমাগত স্যুইচ টিপতে থাকতাম। স্যুইচটা বাইরে কোনো আওয়াজ করতো না, কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় একটি আলোর সংকেতে জানিয়ে দিত কোন্ রোগী কোন ঘর থেকে ডাকছে।

ওরা আসতো না। নিজেদের সময় মতো এসে একগাল হেসে 'রাগ করেছো ডার্লিং? কেন ডেকেছো বলো তো?' এইসব ন্যাকামি করে মন মজাতো। না আসা পর্যন্ত ভাবতাম, ভীষণ রাগারাগি করবো, কিন্তু এলে মুখটা গোমড়া করে রাখতাম বটে কিন্তু অত মধুর ব্যবহারের পরে আর বলা যেতো না কিছু। আমার পাশের ঘরে এক ভদ্রমহিলা বাচ্চা হতে এসেছিলেন। পর পর তিনটি বাচ্চা হয়েই মারা গেছে তাঁর, এটি চতুর্থ। অতি যত্নে অতি সাবধানে রাখা হয়েছে তাঁকে। এবারেও সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তবু বাচ্চা নিচের দিকে নামছে না। বাচ্চাটা আড় হয়ে আছে সারা পেট জুড়ে। বড়ো ডাক্তার এলেন, কেটেকুটে সে ভাবেই বার করা হলো বাচ্চা, মস্ত সেলাই পড়লো, অসহ্য যন্ত্রণা। একদিন ব্যথায় অস্থির হয়ে একটা ওষুধের জন্য স্যুইচ টিপে টিপে হয়রান হয়ে ছেড়ে দিলেন। এবং যথারীতি কেউ এলো না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যখন এলো, এক ফোটা রাগ করলেন না মহিলা। যেমন ওদের মিষ্টি করে কথা বলা অভ্যাস তেমনি ভাবেই ওষুধটা চাইলেন।

এই ধৈর্য দেখে আমি হতবাক। আমার এতো রাগ হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো মহিলাটির দেহে রক্ত নেই, চরিত্রে কোনো দার্ঢ্য নেই, একটা বরফের ডেলা। কিন্তু পরে দেখলাম, এ-ই এদের স্বভাব। এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বলে, 'আমরা রোগী, আমরা অধীর হয়ে অকারণেই কেবল ডাকাডাকি করি, ওরা তা জানে। আমরাও জানি সময় হলে ঠিকই আসবে।'

একথা শুনে আমি চমৎকৃত হলাম এবং বুঝতে পারলাম এই পারস্পরিক বোঝাপড়াটাই এদের আসল সম্পদ। এরা সবাই সকলকে বিশ্বাস করে, সেই বিশ্বাসই সমস্ত ধৈর্যের প্রধান বুনিয়াদ।

আমাদের সে বিশ্বাস নেই। সে বিশ্বাসের প্রশ্নও নেই, কেননা বিশ্বাস

করলে সর্বত্রই আমরা ঠিক। রুদ্ধ কণ্ঠে দলবদ্ধ হয়ে 'চলবে না চলবে না'-র ধ্বজা না উড়োলে কোনো প্রাপ্তিই আমাদের ঘটে না। আমাদের দেশে প্রত্যেকটি লোকেরই বিবেকের দাঁত পোকায় খেয়েছে। তা তিনি রাজাই হন আর প্রজাই হন, ধনকুবেরই হন বা ফুটপাথের ভিক্ষুকই হন।

'আর জানো'—ভদ্রমহিলা আরো কথা যোগ করেছিলেন, 'এখানে নার্সের বড়ো অভাব, অথচ কতো যত্ন করে কতোবার আসে, কতো ভালোভাবে চালায় সমস্ত কাজ। ঐ জন্যই অনেক মহিলা এমনি-এমনিই এসে খানিকটা সময় হাসপাতালে কাটিয়ে এদের সাহায্য করে যায়।'

আমি যে ডাক্তারের রোগী তিনি দিনে একবার রোজই আমাকে দেখতে আসেন। ভদ্রলোকটির মুখখানা একটা ঝুড়ি, গলার আওয়াজে প্রচণ্ড বজ্রের গর্জন, রং তামাটে, বড়ো বড়ো গুবালু চোখ, হাসিটি অম্লান। যখন ঘরে ঢোকেন পদপাতে কাঠের মেঝে থর থর করে। ব্যবহার করেন আত্মীয়ের মতো। ঐ নির্বান্ধব দেশে এমন অসুস্থ হয়ে এই মানুষটির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করতাম। সেদিন ঠিক করেছিলাম 'সব ঠিক মতো হচ্ছে তো, পাচ্ছো তো?' জিজ্ঞেস করা মাত্রই রাগ রাগ ভাব করে বলবো, 'না, তোমাদের নার্সরা ভারি অবাধ্য, কখনো ডাকলে আসে না।'

এইসব মহিলাদের কথা শুনে জিব কাটলুম মনে মনে।

কেটে গেল দুটি সপ্তাহ। ছাড়া পেয়ে বাড়ি এলুম। এইবার বিল মিটোবার পালা। তখন আমাদের হেলথ ইনসিওর করা ছিলো, সুতরাং অন্যান্য সব কিছুর তুলনায় হাসপাতালের চার্জ যথেষ্ট বেশি থাকা সত্ত্বেও সেটা প্রায় অর্ধেকটা হয়ে গেল, আর ডাক্তার? বলা যায় প্রায় কিছুই নিলেন না। এতো কম নিলেন যে অঙ্কটা মনেও রইলো না। কিন্তু যত্নটা তো ভোলা যাবে না বাকি জীবন?

ঐ অন্ধকার অ্যাপার্টমেণ্টেই প্রায় তিনটে সপ্তাহ কেটে গেলো। ভেবেছিলাম অভ্যেস হয়ে যাবে, হচ্ছিলো না। সকালে ওঠার জন্য ঘড়িতে দম দিয়ে রাখতে হয়, নইলে তো বুঝতেই পারবো না রাত ফুরোলো কিনা।

বুদ্ধদেব কাজে চলে গেলে দিনের বেলাতেও ঐ আলোজ্বলা ঘরে আমার মন টেঁকে না। তবু যে একটু রাস্তার ধারে গিয়ে কাঁচের ফাঁকে সূর্য দেখবো তারও উপায় নেই। সব সময়েই ঐ পেট মোটা গোমস্তা বসে আছে চেয়ার পেতে। ওকে যে আমি কী কুনজরে দেখেছিলাম বলা যায় না, আমার চোখের কাঁটা।

দেখলেই রাগ হয়। অথচ লোকটা অবিরত একটা আপোসের চেষ্টায় গদ-গদ ভাব করে। তাতে তো আমার আরো রাগ ধরে যায়।

দুটো উপন্যাস লেখার কাজ নিয়ে এসেছিলাম দেশ থেকে, আরম্ভ করতে পারলে হতো, তাতেও মন বসছে কই? দিনের বেলা আলো জেবলে লিখছি ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগে। অথচ এই চিরনিশার হাত থেকে অন্য বাসস্থানে গিয়ে নিস্তার পাবো সে আশা দুরাশা।

বুদ্ধদেব কোনো কিছুর বদলই পছন্দ করেন না। সে খাদ্য বস্ত্র আসবাব যাই হোক না কেন? তার মধ্যে বাড়ি বদল তো একটা সাংঘাতিক ঘটনা। আমাদের বিবাহের পূর্বে তিনি রমেশ মিত্র রোডের একটি দেড়-দু'ঘরের বাসিন্দা ছিলেন, বিবাহ স্থির হবার পরে বাড়ি তাঁকে বদলাতেই হয়েছিলো। ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি খোঁজাখুঁজির একটা অন্য স্বাদ ছিলো বলে সেটা বোধহয় ততো কষ্টকর হয়নি। শেষ বাড়িটার খোঁজ অবশ্য আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু ছিলেন সেখানে, জানতাম তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়িটা খুব সুন্দর ছিলো, তেতলার উপরে পুব-দক্ষিণ খোলা বড়ো ঘর, আলো-হাওয়ার প্রাচুর্য উপভোগ্য। আর তখনকার দিনের পক্ষে বাথরুমের বিলাসিতা তো উল্লেখযোগ্য। পোর্সেলিনের বাথটব, বেসিন, মোজেইক করা মেঝে, রোদ, সবই মনোহর। এক নজরেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিলো।

যেতে আসতে এখনো দেখি বাড়িটা, কী পুরোনো জরাজীর্ণ চেহারা হয়েছে, কষ্ট হয় ভাবতে এ বাড়ির যৌবন তখন কী সুঠাম ছিলো। রাসবিহারী আর রসা রোডের মোড়ে গোলাম মহম্মদ ম্যানসন। বাড়িটাতে আমরা সর্বতোভাবেই সুখী ছিলাম, তবু এক বছরের মধ্যেই ছাড়তে হলো।

যতো মৃতদেহ সব ঐ বাড়ির সম্মুখ দিয়েই মোড় ঘুরে কেওড়াতলা যেতো। আমি ভূতের ভয়ে কাতর মানুষ, সারারাত সারাদিন হরিধ্বনির শব্দে কম্পিত ত্রাসিত হৃদয়ে আধমরা হয়ে থাকতাম। অবশ্য দিনের বেলা ততো কিছু মনে হতো না, কিন্তু রাত্রে ঠিক ঘুম ভেঙে যেতো। তার উপরে বাড়িতে বুদ্ধদেবেরই এক আত্মীয় বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে তো সোনায় সোহাগা। নতুন উৎপাত জুটলো পাশের ফ্ল্যাটে এক মাতাল। লোকটির চেহারা চমৎকার, বয়সে যুবা, প্রথম দিন এসেই সকালবেলা 'গুড মর্নিং' বলে সাহেবি কায়দায় ইংরেজিতে আলাপ করে গেল। আমরা মুগ্ধ।

দু' একদিনের মধ্যেই অধিক রাত্রে মাতাল হয়ে ফিরে বিষম চ্যাঁচামেচি শুরু

দক্ষিণমুখো কতো কতো ছোটো বড়ো মাঝারি ফ্ল্যাট তৈরি হলো, আর 'টু-লেট'ও ঝুলতে লাগলো। নগরবাসীরা তখন বালিগঞ্জকেই সবচেয়ে দূরস্থান বলে বর্জনীয় ভাবতেন, তাঁদের পক্ষে ভবানীপুরই যথেষ্ট উপকণ্ঠ। কিছু ধনীলোক, সস্তায় জমি কিনে সুদৃশ্য বাড়ি বানিয়ে মশার কামড় খাচ্ছিলেন। সুতরাং সেই উপকণ্ঠের ভাড়াও আমাদের আয়ত্তের বাইরে ছিলো না। কিন্তু বাড়িটা বদলাবে কে? বুদ্ধদেব? তার চেয়ে তাঁকে কেটে দুটুকরো করে ফ্যালো না।

একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন, 'রাণু, এসো এসো, দেখে যাও তোমার জন্য একটা 'টু-লেট' ঝুলছে।'

এটা ঠাট্টা।

আমি বললুম, 'ঝুলুক।'

তখন বললেন, 'না, না, সত্যি, বাড়িটা ভারি সুন্দর। দেখেছ সামনের গাড়ি-বারান্দাটা কতো বড়ো? চমৎকার সান্ধ্য আড্ডা জমবে বন্ধুদের নিয়ে।'

আমি নিস্পৃহ। অত সুন্দর বাড়িটা দেখতে আমার বাকি আছে নাকি? আর শুধুই কি 'টু-লেট' দেখেছি? ভিতরে গিয়েও তো ঘুরে এসেছি একদিন। দুশো দুই নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িটা সে সময়ে আমাদের পক্ষে বেশ ছোটোও হয়ে উঠেছিলো। জিনিস বেড়েছে, বই বেড়েছে, দেড় বছরের বাচ্চা প্রায় পাঁচ বছরের বালিকা হয়েছে, একটি খুদে সহোদরাও এসেছে তার, বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ি আরো বৃদ্ধা হয়ে আরো খুঁতখুঁতে হয়েছেন, এমত অবস্থায় সেই অবিরত বন্ধুসঙ্কুল তিনটি ঘরের ফ্ল্যাট গুছিয়ে সংসার করতে আমার কষ্ট হতো। আর নিজের প্রাইভেসি বলে তো কিছুই ছিলো না।

তার পরিপ্রেক্ষিতে, শুধু পূব-দক্ষিণ খোলাই নয়, রীতিমতো ভালো সাইজের চারটি ঘরের ফ্ল্যাট লোভনীয় বই কি। ফুটপাতের উপর পিলার তুলে মাথার উপর ঐরকম খোলা ছাতের মতো গাড়িবারান্দাটার তো তুলনাই নেই। আর ভাড়া? ... জেনে এসেছি। পঁয়ষট্টি। আমরা দিচ্ছিলাম পঞ্চান্ন। বললে কইলে আর গৃহস্বামী মাস্টার জানলে (তখন মাস্টারদের খুব বিশ্বাস করতেন বাড়িওলারা) কি আর পাঁচটা টাকা কমিয়ে দেবে না?

আমাকে গম্ভীর দেখে একটু খোশামোদ করলেন, 'না, সত্যি বলছি, সুন্দর বাড়িটা, ভাড়া নিশ্চয়ই বেশী, নইলে চেষ্টা করা যেতো।'

কথার সুরে বুঝতে পারলাম, সবটাই খোশামোদ নয়, বাড়িটা পছন্দই হয়েছে। অমনিই আমার দার্শনিক মুখভাব নিমেষে উধাও। রাগ আমি এমনিতেই

রাখতে পারি না, তার মধ্যে সামান্য মান-অভিমানের জন্য এই সুযোগ হারাবো নাকি? অনিচ্ছাতেও মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল, বললাম, 'চলো না, দেখিয়ে আনি। দারোয়ান আছে, গেলেই খুলে দেবে।'

'আমার দেখতে হবে না, তুমি দেখলেই হবে।'

'আমি দেখেছি।'

'দেখেছো! কী সাংঘাতিক। টু-লেট দেখলে আর স্থির থাকতে পার না, না?'

'না।'

'কী দেখলে?'

'চারটে ঘর, কী রোদ হাওয়া—'

'আর বাথরুম?'

'বাথরুমও ভালোই।'

'এরকম নিশ্চয়ই নয়।'

'বাথটব নেই তবে বেসিন আছে।'

'ভাড়া? ভাড়াটা নিশ্চয়ই তোমার এই অধম স্বামী যোগাতে পারবে না।'

'তা-ও পারবে।'

'যথা?'

'আমরা দিচ্ছি পঞ্চান্ন, ও বাড়ির ভাড়া পঁয়ষট্টি।'

এই শুনেই মেজাজটা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেল। বাড়িটা যে তাঁর সঙ্গে এমন একটা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা কল্পনাও করেননি।

'বাজে কথা।' কোমল কণ্ঠ রুষ্ট হতে এক সেকেন্ডও লাগলো না। আমি বললাম, 'মোটেও বাজে কথা না, চলো, নিজে গিয়েই জিজ্ঞেস করবে।'

'জিজ্ঞেস করে কী হবে শুনি? দশ টাকা বেশী যেন খুব সোজা ব্যাপার।' বলে উত্তেজনায় প্রায় এইমাত্র ধরানো সিগেরেটটা ছুঁড়ে ফেলে চটি ফটফট করতে করতে ঘরে ঢুকে এলেন।

'কালী, চা দাও।' কালী আমাদের গৃহসেবক।

তখন আর 'রাণু, চা দাও' বলছেন না। বলা তো যায় না, যদি বা তাঁর কথা না শুনে সুবিধে মতো বাড়িটা বদলেই ফেলি। সেজন্য আগে থেকেই প্রতিরোধ ভাব নিয়ে বসলেন এসে নিজস্ব চেয়ারে। বেচারা! সেই বিকেলে আর রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের মতো পশ্চিমের পড়ন্ত সূর্যের শোভা দেখা কপালে ঘটলো না।

কিছুদিনের মধ্যেই জাপানি যুদ্ধে ফাঁক হয়ে গেল শহর। বোমার ভয়ে যে-যেখানে পারে পালালো। শূন্য রাস্তা আর শূন্য বাড়িঘর খাঁ খাঁ করতে লাগলো। বাড়িওলারা বাড়ি বেদখল হয়ে যাবার ভয়ে ভাড়া কমিয়ে অর্ধেক করে দিয়ে হাতে পায়ে ধরতে লাগলো আসবার জন্য। আমাদের পঞ্চান্ন টাকার বাড়ি পঁচিশ টাকায় দাঁড়ালো, আর সেই সুন্দর বাড়িটা কী জানি কী কারণে চব্বিশ হয়ে গেল। বোধ হয় নবনির্মিত বলে এবং ভাড়াটেও যেমন পালালো, দারোয়ানও তো পালিয়েছে তেমনি। এদিকে আমরা পুরোনো ভাড়াটে, পুরোনো সংসার, চট করে পালাবো কোথায়? পালাইওনি। অথচ ও বাড়িটা খালি।

এবার বললাম, 'তখন দশটাকা বেশী ছিলো বলে যেতে পারোনি, এখন তো একটাকা কম, আর আপত্তিকর কী আছে?'

'অসম্ভব!'

'কেন?'

'টাকাটাই সব, হাঙ্গামাটা কিছু না, না?'

'হাঙ্গামা তো তোমার কী?'

'বাড়ি বদলানো যেন সহজ ব্যাপার।'

'সেই অসহজ কাজটা তো চিবকালই আমি করি, এবারেও তাই হবে।'

'না না—'

কালী একগাল হেসে বললো, 'হ্যাঁ, বাবু আমরা ও বাড়িটাতেই যাই চলুন। কিচ্ছু কষ্ট হবে না, মদনের ঠ্যালা এনে দুই খেপেই সব নিয়ে যাবো, এই তো মাত্র উল্টোদিকে। আমিও দেখে এসেছি, লুকোবার কতো জায়গা, বোমা পড়লে আমাদের লাগবেই না।'

'আর এ বাড়িটা ছেড়ে দিলে আমাদের বাড়িওলার কী হবে সেটা ভেবেছ?'

'কী আবার হবে।'

'খালি পড়ে থাকলে তার বাড়িটা নষ্ট হবে না?'

'সে আমরা কী করবো।'

'যাও যাও নিজের কাজে যাও, যা বোঝো না তা বলতে হবে না। কেবল বৌদি যা বলেন তাই বলা স্বভাব।'

এসব তর্ক-বিতর্কের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, সোজা কথা, যে কোনো অদল-বদলই তাঁর পক্ষে মৃত্যুতুল্য। সেই বয়সের সেই মানুষ, এই বয়সে পৌঁছে

নিজের দেশেই যাঁর এই অবস্থা, বিদেশে এসে অস্থায়ী আবাসে যে তার ব্যতিক্রম সম্ভব নয়, তা তো বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ব্যতিক্রম একটু হলো। একদিন বললেন, 'বাড়িটা ভারি বিশ্রী, না?'

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'এমনিতে তো মন্দ নয়, কিন্তু তপনদেব যে একেবারেই বিমুখ সেটাই একটু—'

'আজ কলেজ থেকে আসতে আসতে ভাবছিলাম, আমার দ্বারা তো কখনোই কিছু হয় না, এই শহরটা তেমন চেনা থাকলে সত্যি একটা ভালো বাড়িতে যেতাম।'

আমি টুকটাক চা আনছিলাম, খাবার আনছিলাম—

আবার বললেন, 'কী যে সুন্দর হয়েছে আজকাল দিনগুলো, এই ঘরে বসে, তুমি তার কিছু জানতে পারছো না। আমার খুব খারাপ লাগছিলো।'

'আর কদিনের বা পালা—', আমি চেয়ারে বসে চা ঢাললাম।

'কলকাতায় তুমি সব করো, কী দিয়ে যে কী হয় তা-ও তুমিই জানো। ভেবেছিলাম এখানে এলে আমি তোমার কপালে একটা ভাঁজও পড়তে দেবো না, তা দ্যাখো, সবই উলটো হলো।'

'কেন, আমার কপালে ভাঁজ পড়েছে নাকি?' হাসলাম।

'হ্যাঁ, পড়েছে। অন্ধকার বাড়ি, ছেলেমেয়েরা কাছে নেই—'

'ধ্যেৎ। আমার খুব ভালো লাগছে এখানে। শীত কমুক, একটু বেরিয়ে শহরটা চিনি।'

'ওঃ হো', হঠাৎ কী মনে পড়ে বুদ্ধদেব লাফিয়ে উঠলেন, 'বলতে ভুলে গেছি, আজ প্রফেসার অ্যালেন আসবেন, ফোন করেছিলেন।'

'কখন?'

ঘড়ি দেখলেন, 'বলছিলেন সাড়ে ছ'টা, আমাদের বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যাবেন।'

'ওমা, পাঁচটা তো বাজে।'

'আজ এক কাজ করা যায় না?'

'কী।'

'এখানেই ওঁর ডিনারের ব্যবস্থা করো না।'

'বেশ তো!'

ভারতপ্রেমিক এই অধ্যাপক বন্ধুটির সঙ্গে বোধহয় কোনো বক্তৃতার আসরে

আলাপ হয়েছিলো ঠিক মনে নেই। সেই থেকে ঘনঘনই আমাদের ফোন করে খবর নিতেন, এর আগেও দুবার বাইরে খাইয়েছেন। আবার আমাকে কী সব ছোটোখাটো উপহারও দিয়েছেন। আবার আজও খাওয়াবেন শুনে আমার খারাপ লাগলো। চায়ের পাট সেরে তাড়াতাড়ি ডিনারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

কাঁটায় কাঁটায় এলেন ভদ্রলোক। যা ওঁদের স্বভাব। বললেন, 'চলো।'

আমি বললাম, 'আজ আমি আপনার জন্য রান্না করেছি।'

'সে কী!' এক বাক্স কেক নিয়ে এসেছিলেন, দিলেন। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে বললেন, 'তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজও আছে।'

'কী আবার?'

থলি থেকে দুটি বড়ো বেগুন, কিছু কাঁচালংকা আর এক বাণ্ডিল ছোটো ছোটো লাল মুলো বেরুলো।

'ওমা, বেগুন কোথায় পেলেন? কী চমৎকার তাজা কাঁচা লংকা—'

'এক কাপ কফি খাওয়াবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই।'

এরপরে কফি কাজু মুলো মদ চলতে লাগলো একসঙ্গে। তারপর ডিনার। আর তারপরের প্রস্তাব হলো শহর ভ্রমণ।

বুদ্ধদেব তৈরি হয়ে নিলেন, আমি একটু গাঁইগুঁই করছিলাম। নিউইয়র্কের শীত তো আমার জানা আছে? এই রাতে বেরিয়ে মরবো নাকি?

'আরে না না, এখন আবার শীত কোথায়? জানো না এটা কি মাস? এখন কেউ ঘরে থাকে? চলো চলো—'

অ্যালেন নিজেই ক্লসেট থেকে কোট বার ক'রে পরিয়ে দিলেন, প্রায় টেনে বার ক'রে লক ক'রে দিলেন দরজা। আর রাস্তায় বেরিয়ে আমি হতবাক। একেবারে গম গম করছে সব। পথে পার্কে দোকানে সর্বত্র কী উত্তেজনার ঢেউ। কে বলবে এই সেদিনও বরফাকীর্ণ জনশূন্য মৃত রাস্তায় কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে এসেছি বাজার থেকে। আইডেল-ওয়াইল্ড এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচশো প্লেন ছাড়তে পারেনি, বরফের ঝড়ে কতো লোক মরেছে।

তা হলে নিউইয়র্ক শহরে এখন সত্যিই বসন্ত সমাগত? যার আশায় এরা জলের জন্য চাতকের মতো চেয়ে থাকে?

অ্যালেন বললেন, 'কী! খুব শীত?'

ওঁর শীত লাগছিলো না। ভারি কোটটা খুলে হাতে নিলেন। কিন্তু আমার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুতে অভ্যস্ত দেহে বেশ হাড় কাঁপানোই মনে হচ্ছিলো। আস্তে আস্তে কমে গেল। সেটা যথেষ্ট জোরে হাঁটার জন্য। কমলেও আমি বা বুদ্ধদেব কেউ ওভারকোটের অন্তরাল থেকে বেরুলাম না।

'চলুন, প্রথমে বইয়ের দোকানগুলো দেখি।' এটা বুদ্ধদেবের প্রস্তাব।

আমরা বলতে গেলে প্রায় ওয়াশিংটন স্কোয়ারেরই বাসিন্দা। যার তিনদিক জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল বিশাল অট্টালিকা সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। দক্ষিণ দিকে চলে গেছে গ্রীনিচ গ্রাম। সেখানেই গায়ে গায়ে সব বইয়ের দোকান, সমস্ত বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশনার আস্তানা। সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিক এবং বিদ্রোহীদের নেহাৎই একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। এই অঞ্চলকে হেনরি জেমসই বিখ্যাত করে গেছেন। গ্যারিবাল্ডির একটি মূর্তি আছে সেখানে, সাংঘাতিক শীতের মধ্যেও দেখেছি বাচ্চারা বরফের বল নিয়ে খেলা করছে তার তলায়, ছাত্রছাত্রীরা হাসছে হাঁটছে দৌড়চ্ছে। আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে বয়স্ক মাস্টাররা চলে যাচ্ছেন গম্ভীর মুখে, একটু রোদ পেলে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন মায়েরা। কিন্তু সেগুলো সব বেলা বারোটার দৃশ্য, রাত্রিবেলা একেবারে সুনসান। কেউ কোথাও নেই। একটি জনমনিষ্যির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ওখানে নতুন গিয়ে যখন দু'চারদিন আমাদের খাবার খুঁজতে বেরুতে হতো, (এক কাপ চা বা কফির জন্য হলেও তখন না বেরিয়ে উপায় ছিলো না) আমি রোজ আমার দাঁতে দাঁত লাগা শীতকম্পিত কণ্ঠে গুন গুন করতাম, 'কুজনহীন কানন ভূমি, দুয়ার দেয়া সকল ঘরে, একেলা কোন্ পথিক তুমি, পথিকহীন পথের পরে।'

সেই রাত্রির চেহারা নাকি এই হয়েছে? এই রকম লোকে লোকারণ্য। আর আলো কী উজ্জ্বল! পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে চারদিক, দুই পাশের উঁচু উঁচু বাড়ির মাঝখানের এক ফালি লম্বা আকাশে তারার ভিড়। কী অবাক কাণ্ড। এ কি ভোজবাজি?

সে রাত্রে অবশ্য বেশী ঘুরিনি আমরা, এক-একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে একেকবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন বুদ্ধদেব। কতো নাম, কতো বই, কতো সুগন্ধ। সেই স্পর্শে গন্ধে নামে মানুষটি আত্মহারা, আবেগে সেই জগতেই ঘুরপাক খেলেন দু ঘণ্টা। তারপরে বাড়ি ফিরে এলাম। অ্যালেনের ইচ্ছে ছিলো না,

বলছিলেন, 'আরে, এখুনি ফিরবে কী?' কিন্তু রাত একটু বাড়তেই শীতের কামড় যথেষ্ট ধারালো হয়ে উঠছিলো। আমি একেবারে শক্তপোক্ত ভাবে নারাজ হয়ে উলটোপথ ধরলাম।

সেটা ছিলো মার্চ মাসের শেষ, এপ্রিল পড়তে পড়তেই অনুভব করলাম, সূর্যের তাপ বেড়েছে, সারাদিন ঝক ঝক করছে রোদ, আকাশ গভীর নীল। যদিও তারই মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে একটু, সে ক্ষণিক। মেঘহীন বৃষ্টি। বিদায় নিতে নিতে যাই যাই করে যতোটুকু লেগে থাকা যায় শুধু সেটুকু শীতই অবশিষ্ট। নতুন ঋতুর নতুন উদ্যমের সঙ্গে শীতের জরা আর পাল্লা দিতে পারছে না। আর এই নতুনকে আমন্ত্রণ জানাতে লোকেরা বাড়ি রং করছে, গৃহিণীরা মোটা পর্দার বদলে হালকা পর্দা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন দরজা জানালায়, মাথা ঘামাচ্ছেন তার ডিজাইন নিয়ে, পুরোনো আসবাবের বদলে কেনা হচ্ছে নতুনতর নমুনা। মেঝের ঘন রং কার্পেট তুলে নরম রং পাতা হয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে, বাথরুমের শাওয়ার কার্টেনটি পর্যন্ত না বদলিয়ে শান্তি নেই।

আরো বদলাচ্ছেন। আলোর ঢাকনা বদলাচ্ছেন, বালবের পাওয়ার বদলাচ্ছেন, মখমল কুশানের বদলে স্তূপ করছেন সিল্ক স্যাটিন। লিভিংরুমের জানালায় ঝুলিয়ে দিচ্ছেন বাগান।

এদিকে অ্যাভিনিউর ধারে ধারে সাজানো গাছগুলোও কখন যেন প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠেছে নিজে নিজে, আর সেখানে কে যে কোথা থেকে বোতামটি টিপে দিচ্ছে, ঠিক জলসিঞ্চন হয়ে যাচ্ছে দু' বেলা। রোদে যাবার আগে, আর রোদ থেকে ফেরার পরে দু' বেলাই জল খেয়ে তারা সবুজ, যেন ছোটো বাচ্চা হাত পা ধুয়ে ফিটফাট। আর ফিটফাট এই সেদিনের নোংরা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ফুটপাত। বরফের জল সারা শহরটিকেই ধুয়ে মুছে তকতকে করে দিয়ে মিলেছে গিয়ে হাডসন নদীর হৃদয়ে।

একদিন বেরিয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর কলেজ পর্যন্ত গেলাম। ফিরবো একা। একা চলবার মহড়া সেই প্রথম। ওঁর ক্লাস ছিলো, কিন্তু উদ্বেগে ঢুকতে পারছেন না, কেবলি সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছেন আর বলছেন, 'হারিয়ে যাবে না তো? একবার কোনো রকমে পূব-পশ্চিম গোলমাল হলে কিন্তু মরে যাবে ঘুরতে ঘুরতে। না এলেই পারতে।'

আমারও যে একটু একটু ভয় করছিলো না তা নয়। কোন্ বাসে উঠতে

কোন্ বাসে উঠবো, আর ওঠা মাত্রই তো দুম করে বন্ধ হয়ে যাবে দরজাটা, চেষ্টা করলেও আর নামতে পারবো না। তখন কী হবে?

পৃথিবীর এই বিশাল নগরটির চেহারা ঠিক অন্যান্য নগরের মতো নয়। এর পরিকল্পনা কোন্ প্রযুক্তিবিদের দ্বারা সাধিত হয়েছিলো জানি না। অন্তত আমি জগতের যতোগুলো শহর দেখেছি তাদের সকলের চেয়েই এর চেহারা অন্য রকম। উত্তরে দক্ষিণে সব অ্যাভিনিউ, পূবে পশ্চিমে স্ট্রীট। ভিতরে ভিতরে অবশ্য জট পাকানো রাস্তা আছে, কিন্তু মানহাটানের ভূগোলটা এই রকম। অ্যাভিনিউগুলো দোকান বাজার হোটেল আপিস বাণিজ্যিক সংস্থা ইত্যাদিতে ঠাসা। আর স্ট্রীটগুলো সব আবাসিক। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে, যেমন চৌন্দো স্ট্রীট, তেইশ স্ট্রীট, চৌত্রিশ বিয়াল্লিশ ইত্যাদি। এই স্ট্রীটগুলোও তাদের বিপণি দেখিয়ে আমার মতো পথিকের মন-হরণে সর্বদাই সক্ষম।

ওয়াশিংটন স্কোয়ারে গিয়ে তিনটে অ্যাভিনিউ আর অনেকগুলো স্ট্রীট এক সঙ্গে মিলেছে। তার দক্ষিণেই রাস্তা ঢুকে গেছে গ্রামে, সেখানকার পথ ঘাট সব অন্য রকম। অনেক অলিগলি, অনেক নাম না জানা পাড়া। কামিংস এখানেই ছিলেন। তাঁর রাস্তার নাম ছিলো, প্যাচিন প্লেস। একবার এই বাড়ি বার করতে বুদ্ধদেবকে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিলো। মানহাটানের অংক কষা রাস্তার যে কোন বাড়িতেই নম্বর জানলে নিয়ে যায় ট্যাকসিওলা। এখানে আর পারে না। ঘুরে ঘুরে যখন গিয়ে পেঁছোলেন, 'সময়ের জ্ঞান নেই', এই অপবাদে নিশ্চয়ই তাঁকে কলঙ্কিত করা যায়। নিমন্ত্রণ ছিলো চায়ের, চঞ্চল হয়ে উঠেছেন কামিংস, ভাবছেন কী হলো আমার বিদেশী বন্ধুর। যখন বহাল তবিয়তে গিয়ে পেঁছোলেন, তখন কী কৈফিয়ত দিয়েছিলেন তা অবশ্য আমার জানা নেই, কেননা আমি সঙ্গে ছিলাম না।

আমাকে অনেকভাবে বুঝিয়ে বাসের কাছে পেঁছে দিয়ে তারপর বুদ্ধদেব ক্লাসে গেলেন। আমি কিন্তু বাসের জন্যে অপেক্ষা করলাম না। সোজা পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। অ্যাভিনিউটা যখন ঠিক আছে, স্ট্রীটটাও নিশ্চয়ই পাবো। আর যেহেতু উত্তরে অগ্রসর হচ্ছি, এবং আমার স্ট্রীট পশ্চিমে, তখন অবশ্যই পশ্চিমটা বাঁয়ে থাকবে। অর্থাৎ অ্যাভিনিউ না বদলালে আর ভয় নেই। রওনা তো হচ্ছি এক থেকে, ব্লক গুণে গুণে গেলেই হবে।

কিন্তু ব্লক গুণে গুণে যাবো কোথায়? আসলে সেই চৌদ্দ স্ট্রীট। বিছানা বালিশ কিনতে গিয়ে তিন সপ্তাহ আগে যে বিকেলে যে স্ট্রীটের প্রেমে আমি

হাবুডুবু খেয়ে এসেছিলাম। এখন সেখানে গিয়ে মনের সুখে সব দেখবো। এক থেকে চৌদ্দ সহজ দূর নয়, বাসে উঠেও নামতে পারতাম। আসলে ঐ বন্ধ বাসে উঠতে আমার ভয়ই করছিলো, যদি নামতে না পারি। চৌদ্দ স্ট্রীটের কথা ভেবেই এই ভয় নয়, নিজের স্ট্রীট বিষয়েও খুব ভরসা হচ্ছিলো না। তা ছাড়া হাঁটতে আমার খুব ভালোও লাগছিলো। তখনকার শীত বলা যায় আমাদের মাঘ মাসের মতো। একটু হেঁটেই গা গরম হয়ে যায়। চারদিকে তাকিয়ে নয়ন মন বিমোহিত।

বসন্তের এমন স্পষ্ট আবির্ভাব আর কখনো দেখিনি। শুধু অ্যাভিনিউর সাজানো কাননই নয়, স্ট্রীটগুলোর দুপাশে সারিবন্ধ গাছের যে কঙ্কালগুলো এতোদিন একটা ভয়াবহ রিক্ততার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, অবাক হয়ে দেখি সেই সব গাছের ডালে ডালে কঁচিপাতার কলরোল। লালচে লালচে ফোঁটা ফোঁটা পাতাগুলো কী আনন্দেই না শিহরিত হয়ে তির তির করে নাচছে বাতাসে।

মহিলারা খাটো কোটে, হালকা টুপিতে ছিমছাম। বালক-বালিকারাও নেমে এসেছে রাস্তায়। চ্যাঁচাচ্ছে, দৌড়চ্ছে, স্কেট করছে, তাদের আর আনন্দের সীমা নেই। জাঁদরেল সাহেবেরা মোটা ওভারকোট ছেড়ে রেইনকোট ধরেছে, যুবকরা দুর্দান্ত হাওয়াকে উপেক্ষা করে জ্যাকেটের জীপার খুলে দিয়েছে—

হাঁটতে হাঁটতে দেখতে দেখতে কখন ভুলে গেছি চৌদ্দ স্ট্রীটের বিপণি, প্রকৃতির আকর্ষণে এতগুলো ব্লক পার হয়েও মনে হচ্ছে না কোনো পরিশ্রম হলো।

বিকেলে আরো সুন্দর। ফুটপাত ভর্তি সব রঙিন রঙিন হালকা চেয়ারে টেবিলে বাগানের ঘেরাও দিয়ে বসে গেছে রেস্তোরাঁ। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষের দল আসছে, বসছে, হাসছে, খাচ্ছে, গল্প করছে, উঠে যাচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, একটা আমোদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। আর ফুল কি ফুল। ফুলের দোকানগুলোও যে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। আর তা সাজিয়ে রাখারই বা কী বাহার। ধাপে ধাপে থরে থরে নাম লিখে লিখে রং মিলিয়ে মিলিয়ে একেবারে নন্দনকানন। দেখে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পথিক, কিছু না কিছু কিনেই নিচ্ছে সবাই। জায়গাটা একেবারে আলোয় আলো।

শুধু ফুলের রংয়েই আলো হয়ে নেই, গ্রীনিচ গ্রামের ছবি আঁকিয়েরাও রংয়ের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তারাও তাদের ছবি নিয়ে নেমে এসেছে পথে, ফুটপাতের ধার ঘেঁষে বসে গেছে প্রদর্শনী, ইজেল পেতে সেখানেই আঁকছে

তারা, বিক্রী করছে, দশ মিনিটে তৈরি করে দিচ্ছে পোট্রেইট। যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই নিজের নিজের প্রতিবিম্বের আকর্ষণে বসে যাচ্ছে আঁকাতে। কতো রকমের যে পোজ্ দিচ্ছে তার ঠিক নেই। কেউ সহাস্য, কেউ চিন্তিত, কেউ উদাসীন, কেউ বিমর্ষ। আবার কেউ চোখ টান টান করে পুস্তক পাঠে নিমগ্ন, আবার কবিতা লেখার ভানও করছে কেউ।

আকাশের তলায়, রাস্তার উপরেই যে এরকম একটা অবাধ স্বাধীন জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করা যায় এ আমাদের কাছে একেবারেই নতুন। পঁচিশ তিরিশটা ব্লক ভর্তি প্রমোদের মেলা। সকলেই সুখী, সকলেই খুশি। প্রণয়ীযুগলদের তো কথাই নেই। এরই মধ্যে আবার ঝাপটা হাওয়ায় একটা মেয়ের নকল চুলের পাজা প্রায় উড়ে যাচ্ছিলো, দু হাতে চেপে ধরে সে হেসে উঠলো জলতরঙ্গের মতো, তার প্রেমিকও জড়িয়ে ধরে সাহায্য করলো তাকে! এরই মধ্যে আবার বীট-কবিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দাড়ি নিয়ে। তারাই তখন নতুন করে দাড়ির প্রবর্তক এবং সেই সঙ্গে সরু প্যাণ্টেরও প্রবর্তক। পায়ে ইচ্ছাকৃত ছেঁড়া ময়লা ক্যানভাসের জুতো, গায় ঘন রং হাত কাটা বুক খোলা সার্ট, উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বেল দৃষ্টি। মেয়ে বীটরাও আছে সঙ্গে। তাদের গালে রং নেই, ঠোঁটে রং নেই, পিঠ ছাওয়া না-আঁচড়ানো সোনালী চুল বাতাসে উড্ডীন। পায়ে কালো মোজা।

আস্তে আস্তে সূর্য যখন হেলে যাচ্ছে পশ্চিমে, আগুনের বলটা খানিকক্ষণ থমকে থেকে অন্ধকারের সীমানায় পেঁছিতে-না-পৌঁছতেই বিদ্যুৎ জ্বলে উঠছে, আর সেই কৃত্রিম আলোর ফোয়ারায় রাত বাড়তে বাড়তে সবাই যেন আরো চঞ্চল আরো উদ্দাম। সেই উদ্দামতার স্রোতকে অনেকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে সারা রাত্রির দরজায়।

পেইভমেণ্ট ছেড়ে একটু নিচে নেমে নক্ষত্রের মতো মিটিমিটি আলো জ্বলা ছোটো নাইট ক্লাবগুলো মদ্য এবং খাদ্যের সঙ্গে জ্যাজ্ বাজিয়ে শোনাচ্ছে, বিবস্ত্রা স্ত্রীলোক দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও আবার কবিতা পাঠও চলছে সেই সঙ্গে।

আর মানহাটানের দিকে এগিয়ে গেলে তো একেবারে ধাঁধিয়ে যাবে চোখ। বিজ্ঞাপনের কী ঘটা! এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিজ্ঞাপন যে দেখলে মাথা ঘুরে যায়। স্বচ্ছ কাচের শো-কেসগুলোতে রক্ত মাংসে গড়া সজীব যুবতী মেয়ের মতো দেখতে প্রমাণ সাইজের এক একটি পুতুলকে স্প্রীংয়ের পোশাক পরিয়ে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যে, কল্পনা করা যায় না তাদের প্রাণ নেই।

এই গ্রীষ্মের পোশাক প্রদর্শনে সব বস্ত্রব্যবসায়ীরাই সমান উন্মত্ত। কার থেকে যে কে বেশী আকর্ষণ করবে ক্রেতাকে তার প্রতিযোগিতায় এক একজন দোকানদার তাদের মডেলগুলোকে আবার নানা রকম অশ্লীল ভঙ্গিতেও দেখাচ্ছে। ফীফ্‌থ্‌ অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটলে মনে হয়, বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত, এমনি তার জাঁক।

নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এর পাতাটি ওজনে এতোটাই ভারি হয়েছে যে, এখন আর রোববারের পত্রিকাটি একজনের পক্ষে বয়ে আনা সহজ নয়। অবশ্য রোববারের 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌' পত্রিকা বহন করা সব সময়েই কষ্টসাধ্য।

একদিন এক ভদ্রমহিলা গল্প করলেন, (জানি না সত্য কিনা) একটি সদ্য আগত ভারতীয় ছেলে নাকি বড্ড বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো। সে তখন নতুন এসেছে, প্রায় কিছুই চেনে না, কিছুই জানে না, এই কাগজটিরও নাম শোনা ছাড়া চোখে দেখেনি। সকাল বেলা কিনতে বেরুলো। রাস্তায় নেমেই দেখে এক হকার চলেছে কাগজ নিয়ে। তৎক্ষণাৎ সে দাঁড়িযে পড়ে মুখেব পাইপটা বাঁকা করে ধরে, (নিজেকে বিজ্ঞ দেখবার জন্য) পকেট থেকে ব্যাগ বার করতে করতে বললো, 'দাও তো একখানা।'

মোটা সাহেব কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, মাথার বিরল কেশে হাত বুলোলো, বললো, 'কী দেব ?'

ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বললো, 'কী আবার, একখানা কাগজ।'

'কাগজ ? আমি তো একখানাই কিনেছি।'

'একখানা।'

'দেখছোই তো একখানা।'

'ও। না, আমি বলছিলাম যে—'

'কাগজ কোথায় পাবে জিজ্ঞেস করছো কি ?'

'ঠিক তাই।' মুখের পাইপ ততোক্ষণে আলগা, 'কাইন্‌ডলিকে' 'খাইন্‌ডলি' বলাব চেষ্টাও ঢিলে।

সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে আঙুল তুলে অদূরেই ফুটপাতের সঙ্গে লাগানো একটি কাগজ বোঝাই চাকাওলা গাড়ি দেখিয়ে বললো, 'ঐ তো। যাও একটা কাগজ নিয়ে এসো।'

'কাউকে তো দেখছি না।'

'কে থাকবে ! পাশেই বাক্‌স আছে, দাম ফেলে দিও ভিতরে।'

পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে সাহেব চলে গেল হনহন করে। ছেলেটি লজ্জিত,

দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললো, 'সাহেবগুলোর চেহারা এতো একরকম যে বোঝাই যায় না কোন্‌টা ছোটোলোক আর কোন্‌টা ভদ্রলোক। যত্‌তো সব—'

সেই কাগজে আপনি কী চান ? সব আলাদা আলাদা বিভাগ সাজানো। খুঁজে পাবার সুবিধের জন্য লম্বা সূচিপত্র আছে। খেলাধুলো থেকে শুরু করে জগতের যাবতীয় খবরে ঠাসা। বোধহয় কেজি আটেক কাগজ তাতেই লেগে যায়। আর তার জন্য যদি আট কেজি লাগে বিজ্ঞাপনে লাগে দশ কেজি। জামা জুতো আসবাবপত্র, বাসন, ঘরসাজানো, তৈরি বাগান, তৈরি বাড়ি, বাড়ি তৈরি, বাড়ি ভাড়া, গাড়ি, দোকান, খাবার, রেস্তোরাঁ, এগুলো তো মামুলি। তার উপর রোগা থাকার উপায়, মোটা কমাবার বড়ি, যোগাভ্যাসের পদ্ধতি, ব্যায়ামের বই, মাথার নকল চুল, গালের নকল মাধুর্য, বয়স্ক নিষ্প্রভ চোখের জন্য নকল যুবতী-চোখ, চোখের পল্লব, দাঁতের পাটি, বুকের প্যাড, কোমরের টাইট, প্রেম করবার উপায়, স্বামী-পাকড়াবার কৌশল, মেয়ে ভুলোবার শিক্ষা, কী যে থাকে না তা কেউ ভেবে বল্‌তে পারে বলে আমার ধারণা হয় না। এসবে চোখ বুলোলে তাজ্জব হয়ে ভাবতে হয় এতো প্রয়োজনও তাহলে আছে জীবনে ?

আপনি নিঃসঙ্গ আছেন ? এই যে এই সংস্থায় সঙ্গী আছে। এখুনি চিঠি লিখুন কেমন সঙ্গী আপনার পছন্দ। বিয়ে ? তাও পাবেন। বিয়ে নয়, শুধু প্রেম ? হ্যাঁ, তাও আছে বইকি। মাত্র এক সপ্তাহের জন্য বাঁচে গিয়ে ফুর্তি করে আসতে চান ? বেশ তো। কী ধরনের গড়ন পছন্দ ? কী কী গুণসম্পন্ন পুরুষ বা মেয়ে পছন্দ ? রোগা ? মোটা ? মাঝারি ? বয়স্ক ? যুবতী ? তরুণী ? বালিকা ?

শুধু তাই নয়, তার উপরে কম্পিউটার মেশিনেরও বিজ্ঞাপন আছে বইকি। এখন তো এ দেশে বিবাহবিচ্ছেদের জ্বালায় অস্থির হয়ে লোকেরা সব বিয়ের পাত্রপাত্রীদের জন্য কম্পিউটার মেশিনেরই শরণাপন্ন হচ্ছে। প্রেমটেম যা করবার করে নাও, কিন্তু বিয়ের বেলায় এখানে এসো, ঠিক বউ বা বর করে দেবে মেশিন। কেননা, এ তো দেখাই যাচ্ছে বিয়ে করা এক জিনিস, প্রেম অন্য। প্রেমের দায়েই অবশ্য বিয়ে, কিন্তু টেঁকে না কেন ? কেন দেখতে দেখতে আগুন নিবে ছাই হয়ে যায় ? ঠিক মতো নির্বাচন হলে নিশ্চয়ই ধিকিধিকি অন্তত জ্বলবে, অন্তত বাচ্চাগুলোর জন্যে থাকা যাবে একত্র। প্রতিহিংসাপরায়ণ

হয়ে উঠে খুন করতে ইচ্ছে করবে না পরস্পরকে। জিনিসপত্র ভাঙচুর হবে না, ছেলেমেয়েরা জুজু হয়ে থাকবে না ভয়ে।

তাই মেশিনের কাছেই হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষের নাম ঠিকানা গুণাবলী জমা আছে। মেশিনই পরীক্ষানিরীক্ষা করে জানিয়ে দেবে কোন্ ধরনের পুরুষের সঙ্গে কোন্ ধরনের স্ত্রীলোক যুক্ত হলে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম।

বলা যায়, এ-ও এক ধরনের ঠিকুজি-কুষ্ঠি মেলানো। ভারতীয়দের ব্যাপারটা নির্ভর করে ঠাকুর পুরুত আর জ্যোতিষীর উপর, ওদেরটা মেশিন। তবে মেশিন একটা বিজ্ঞানসম্মত বস্তু, সেটা অবশ্যই কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে না।

রোববারের এ হেন কাগজে ঠিক স্প্যানের সাইজে স্প্যানের মতোই গ্লসি পেপারে নানা রংয়ের নানা রকম ছবিসম্বলিত দুটি সাপ্লিমেণ্টারি আসতো। সে বই দুটি চমৎকার। তাতে ছাঁটকাট বোনা থেকে জাপানী প্রথায় ধান চাষ মৎস চাষ, রান্নার রেসিপি, এখানে-ওখানে-সেখানে কোণে ঘুপচিতে ব্যাঙের ছাতা তৈরির নিয়ম সব থাকতো। এবং সেগুলো শুধু কথার কথা নয়, লেখার জন্য লেখা নয়। দেখে দেখে পড়ে পড়ে অন্ধের মতো এগিয়ে গেলেই হলো, ছাঁটকাট রান্না বোনা সব কিছুই ঠিক ছবির মতো হয়ে যেতো। আমি কৌতূহলবশত বসে বসে অনেক কিছুই করতাম। ঐ বই দুটির জন্য আমার অদম্য আকর্ষণ জন্মে গিয়েছিলো। কিন্তু শুধু ঐ বই দুটিই, কাগজের স্তূপে আর কিছুতেই নজর দিতাম না। বিদেশী খবরে আমার উৎসাহ কম ছিলো। কয়েকখানা সাপ্লিমেনটারি আমি দেশেও নিয়ে এসেছিলাম, মনে হয়েছিলো একটুখানি জমি পেলে জাপানী প্রথায় ধান চাষটা একবার দেখবো। সেটি হয়নি। উৎসাহের অভাবে নয়, স্থানাভাবেই সম্ভব হলো না। কিন্তু আট বাই পাঁচ একটি চৌবাচ্চা করতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। তাতে জল ভরে, তলায় কাদা মাটি বালি ঘাস দিয়ে চমৎকার তেলাপিয়া মাছের চাষ হয়েছিলো।

মাত্র পাঁচটি মাছ এনে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তা থেকে কতো অসংখ্য পাঁচ যে হলো তা আর গুণে উঠতে পারিনি। একদিন সত্যেন বসু (বৈজ্ঞানিক) এসে বললেন, 'ও কি করেছিস রে, মাছ তুলিসনি কেন? না তুললে বড়ো হবে কী করে?'

আসলে নিয়ম হলো সংখ্যা বাড়লেই তুলে ফেলতে হয়, নইলে স্থানাভাবে খেলতে পারে না, বাড়তে পারে না। কিন্তু আমি কী করে তুলি? তুলে ওদের কী করবো, কোথায় রাখবো? খেতে তো পারি না?

শুনে সত্যেনদা বললেন, 'কেন খেতে পারবি না, তবে করেছিস কেন ?'

কী মুশকিল। পোষা মাছ কেউ খায় ?

শেষে না তুলে তুলে ওরা সাংঘাতিক বেড়ে গেল, ভরে গেল চৌবাচ্চা। কী সুন্দর যে লাগতো দেখতে ! দুপুরে কোথায় ডুবে থাকতো, কিন্তু সকালে রোদ ওঠার আগে আর বিকেলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সব উঠে আসতো উপরে। আমি নেশার মতো বসে বসে দেখতাম, কেউ এলেই তার ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রতি লক্ষ্য না রেখে দেখাতে নিয়ে যেতাম। তারপর এক সকালে তারা সবাই একসঙ্গে মরে গেল। বাড়িতে মশার ওষুধ ছিটিয়ে গিয়েছিলো কর্পোরেশনের লোক, ভিতরে ঢুকে চারপাশের নর্দমায়ও ছিটিয়েছিলো, সেই পিচকিরির ওষুধ ছিটকে গিয়ে পড়েছিলো আকাশের তলাকার ঐ চৌবাচ্চার জলে, সঙ্গে সঙ্গে মরে ভেসে উঠলো সব।

নিউইয়র্ক টাইমস্-এর শুধু ঐ সাপ্লিমেণ্টারি দুটি ছাড়া আমি আর কোনো পৃষ্ঠাই উল্টোতাম না। বুদ্ধদেবও ঘাড়ে করে এনে প্রথম পৃষ্ঠার হেডিং গুলোই দেখে অভ্যাস রক্ষা করে স্নান করতে যেতেন। একদিন সকালে হঠাৎ সূচিপত্রটি নজরে পড়লো। খবরের কাগজে যে আবার সূচি থাকে এ আমি কল্পনাও করিনি। পরম কৌতূহলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চোখকে পরিভ্রমণ করাতে করাতে একটা জায়গায় এসে থেমে গেলাম। তারপরেই পৃষ্ঠার নম্বর দেখে পাতা উল্টোলাম। তারপরেই চোখের সামনে জ্যোতির্ময়রূপে প্রায় একশো বাড়ির বিজ্ঞাপন দেখে বিহ্বল। যে রাস্তায় চাও, যেমন চাও, যা চাও, সব আছে। ফোন নম্বরও আছে সব বাড়ির। অতএব খবর নিতে অসুবিধে কী ? অসুবিধে শুধু এই যে বুদ্ধদেবকে কখন কীভাবে রাজী করাই।

সাধারণত স্নান করে এসে সকালের চায়ে চুমুক দিলেই তাঁর মেজাজ খুলে যায়। কাজে যাবার বা বসবার আগে ঐ তাঁর বিনোদন। সেই সময়েই ঝপ্ করে ডুব দিলাম জলে, 'এসো, বাড়ি বদলাই।'

বুদ্ধদেব সহজভাবেই বললেন, 'পাবো কোথায় ?'

'পেলেও কি বদলাবে ?'

'বোধহয়।' একটু হাসলেন, 'এই তিমিরগর্ভে বসবাস সত্যি অসহ্য।'

আমি যোগ করলাম, 'আর কী সুন্দর বসন্ত বাইরে। চলো না আজ দুপুরে বেরিয়ে কয়েকটা বাড়ি দেখে আসি।'

অভ্যাস মতো হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'তুমি এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না—সত্যি—'

আমার তূণে তো বাণ আছে সুতরাং ঘাবড়ালাম না। ধীরে আস্তে বললাম, 'টেলিফোন করে দেখতে পারো।'

'কাকে ?'

'বাড়িওলাদের।'

'বাড়িওলারা সবাই এসে তোমাকে বুঝি টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তুমিই করো না।'

'করতাম। কিন্তু মুশকিল এই টেলিফোনে ওদের কথা আমি বুঝবো না, ওরাও আমার কথা বুঝবে না।'

'ঠিক আছে দাও নম্বর, আমি করি।'

'করো।' গোটা পাঁচেক নম্বর পেতে দিলাম চোখের তলায়, 'সব আমাদের এই অঞ্চলেরই কাছাকাছি। উত্তরে দক্ষিণে যেখানে চাও করো।'

ভুরু কুঁচকে গেল। বলাই বাহুল্য, মনটাও নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। ঈষৎ উষ্ণ হয়ে বললেন, 'এ সব আবার কোথা থেকে সংগ্রহ করেছো ?'

'রোজ তো খবরের কাগজ পড়ো, বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দ্যাখো না ?'

'ও, এখানে এসেও বুঝি ওটাই তোমার পড়বার একমাত্র বিষয় ?'

'আর কি। তোমাকে তো এই তিমিরগর্ভ থেকে উদ্ধার করতে হবে।'

'আমার জন্যই ?'

বুঝতে পারছিলাম রাগ হয়ে যাচ্ছে এই বদলাবদলির সংবাদে। আমি গরমের চেয়ে ঠাণ্ডা লড়াইতে বেশী বিশ্বাসী। সুতরাং, বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ করলাম না, রান্নাঘরে গেলাম। মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলুম, বাড়ির খোঁজ আমি করবোই এবং তা আজই।

নরমে গরমে খোশামোদে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেবকে দিয়ে কয়েকটা ফোন করানো গেল। খেয়েদেয়ে উঠে বেরিয়ে বাড়িও দেখা হলো। প্রথমটায় তাঁকে প্ররোচিত করতে বা উত্তেজিত করতে যতোই বেগ পাই না কেন, নানা স্থানে বাড়ি দেখার পরে তাঁর উৎসাহে বেশ জোয়ার লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটু ভিতরে ঢুকে বাড়িগুলো তো বেশ সস্তা। কিন্তু ঝকঝকে তকতকে নয়, আধুনিক নয়, বাথরুমগুলো জীর্ণ, দোকানপসার দূরে। সবই তো নিজেদের করতে হবে, সুতরাং সব সুবিধের দিকেই নজর রাখতে হবে। বুদ্ধদেব নিজে থেকেই বললেন, 'চলো, তার চেয়ে হোটেল অ্যাপার্টমেণ্টের খোঁজ করি।'

হোটেল অ্যাপার্টমেণ্টের মাত্র একটাই খবর জানা ছিলো। গেলাম সেখানে। তার কাউণ্টার, তার আসবাব, তার সজ্জা, চকচকে লিফট, চকচকে দেওয়াল, চকচকে মানুষ, সব কিছুর চাকচিক্যই মুগ্ধ করলো আমাদের। ব্যবহারের তো তুলনাই নেই। অত বড়ো বাড়িটায় মাত্র একটি ফ্ল্যাটই খালি ছিলো, দুর্ভাগ্যবশত সেটি আমাদের পছন্দ হলো না। পছন্দ হলো না মানে অন্য কিছু নয়, ভীষণ ছোটো। খেলাঘরের মতো। কিন্তু কী সুন্দর করে যে সাজানো, ঝলসে যায় চোখ। ঐটুকু পরিসরে আধুনিকতার উৎকৃষ্ট নমুনা।

আমাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ঐ শহরে নিতান্ত নগণ্য নয়। কতো কারণে কতো ঋণী হয়েছি তাঁদের কাছে, কতো কৃতজ্ঞ হয়েছি, দুজনের বেশী একজনকেও যদি একদিন একটা পার্টিতে ডাকি লিভিংরুমটি তাতেই উপচে পড়বে। আর রান্নাঘর খাবারঘর বলে তো কিছুই নেই। ঐ একটি লিভিংরুম আর একটি বেডরুম। রান্নাঘর দেওয়ালের খাঁজে। কিন্তু কী আলো কী রোদ! ঘরের ভিতরে এই আলো এই রোদ আমাদের মনে মোহ বিস্তার করছিলো। 'নিয়েই নিই, নিয়েই নিই', করতে করতে শেষ পর্যন্ত না নিয়েই নেমে এলাম রাস্তায়।

বাড়িটা ছিলো এইটথ্ অ্যাভিনিউর তেইশ স্ট্রীট, পশ্চিমে। পথে আসতে আসতেও বুদ্ধদেব অত ভাড়া এবং অত ছোটো সত্ত্বেও নেবার দিকেই ঝুঁকছিলেন। অ্যাভিনিউর কাছাকাছি এসে, আর একটি হোটেল অ্যাপার্টমেণ্ট চোখে পড়লো। নাম চেলসী হোটেল। সামনের দরজাটি বিশাল, সেটি সপাটে খোলা, ভিতরের প্রশস্ত কার্পেট মোড়া লবিটি রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে, ভারি ভারি মেহগনি পালিশের আসবাবপত্র, ওরা যাকে বলে অ্যাণ্টিক, ঠিক তাই। গম্ভীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত চেহারা। উপর দিকে তাকালে গ্রীল নয়, কালো মোটা পুরোনো দিনের নকশি কাটা রেলিং-ঘেরা বারান্দা—আধুনিক একেবারেই নয় কিন্তু কুলীন। আমি বললাম, 'এসো না এই হোটেলটায় ঢুকে জিজ্ঞেস করি এখানে অ্যাপার্টমেণ্ট পাওয়া যায় কিনা।'

ইতস্তত করে রাজী হলেন। লবি পেরিয়ে কাউণ্টারের কাছে যেতেই পুস্তক পাঠে নিমগ্ন সুপুরুষ ম্যানেজারটি উঠে দাঁড়ালো, 'কোন সাহায্য করতে পারি?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'এখানে কি কোনো অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া দেওয়া হয়?'

'আছে। চারতলায়।' পাশে বসা টেলিফোনের মেয়েটি একপলকে আমাকে দেখছিলো, হেসে বললো, 'খুব সুন্দর ড্রেস। কোন দেশ?'

'ভারতবর্ষ।'

'নেহরু ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো। খুব ভালো।'

তখন খুব ভারতপ্রীতি চলছিলো। নেহরু সর্বদাই সম্মানিত পুরুষ, ভারতীয়দের কদর বেড়েছিলো। উপরন্তু এতো ভারতীয়দের ভিড়ও তখন হয়নি। সস্ত্রীক ভদ্রলোকের সংখ্যা নগণ্য। শাড়ি পরা মেয়ে ছবিতেই দেখেছে, বেশীর ভাগ সাধারণ লোক। তার মধ্যে আমার মতো একটা সিঁদুরপরা, খোঁপা বাঁধা পুরো বাঙালী মেয়ে! দ্রষ্টব্য বই কি।

ম্যানেজার ভদ্রলোক কাউণ্টারের কাঠ তুলে বেরিয়ে এলেন। আলাপ জমাবার চেষ্টায় বললেন, 'এ দেশে বেড়াতে ?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'না, কাজ নিয়েই এসেছি।'

'কী কাজ ?'

'এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছি।'

'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ?' চোখে মুখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠলো, 'আর সিস্টার ? সিস্টারও কি কোনো কাজ নিয়ে এসেছেন ?'

'না, আমি সঙ্গীমাত্র।' হাসলাম।

ভদ্রলোকের নাম জানলাম, মিঃ আপেল্, আদি নিবাস জার্মানিতে ছিলো, মাত্র দুই পুরুষ এখানে। বেশ শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি। ফ্ল্যাট দেখাতে নিজেই নিয়ে গেলেন। অবশ্য দরকার ছিলো না কিছু, কেননা সে কাজের জন্য অন্য একটি ছেলে ছিলো।

ফ্ল্যাট দেখে আমাদের খুব পছন্দ হলো। মস্ত মস্ত দুটি ঘর, তিনটি ক্লসেট, বেশ বড়ো রান্নাঘর, বাথরুমটিও বড়ো। আসবাবপত্র নিচের মতোই পুরোনো ধরনের। তাতে দেখলাম মিঃ আপেলের বেশ গর্ব। বললেন, 'জানেন এই হোটেলের বয়স কতো ? নব্বুই। এই শহরে এমন পুরোনো হোটেল ক'টা ? আমরা তেমনভাবেই রেখেছি। এই হোটেলে অনেক শিল্পীসাহিত্যিক থেকে গেছেন! এডগার লী মাস্টার্স বহুকাল ছিলেন। শুনে কি রোমাঞ্চিত হবেন না টমাস উল্ফ-এর প্রথম উপন্যাস এই হোটেলে বসেই লেখা ? আর ডিলান টমাস ? তিনি তো যখনই নিউইয়র্কে আসতেন, এখানেই উঠতেন। এখনো কয়েকজন লেখক আছেন এখানে।'

এই সংবাদে আমরা সত্যিই রোমাঞ্চিত হলাম। হোটেল হিসেবে নয়, কিন্তু

আমাদের হিসেবে ভাড়াটা বেশী ছিলো, তবু দ্বিধা না করে নিয়ে নিলাম ফ্ল্যাটটা।

মিঃ আপেল বললেন, 'তোমরা আসবার আগে আমি পর্দাটর্দা সব বদলে দেব। কী রং তোমাদের পছন্দ বলো? এখন পথে পথে টিউলিপ ফুটছে, ছাপা চাও তো সেই ফুলের ছাপা পর্দাও আছে। বালিশের ওয়াড় কি রঙিন চাও? না সাদা? রান্নাঘরের দেওয়ালটা একটু পুরোনো হয়ে গেছে, বলো তো নতুন পেপার লাগিয়ে দিতে পারি। সিস্টার কী বলছো? তোমার পছন্দই তো পছন্দ।'

আমার কী পছন্দ সেটা গৌণ, আমাদের যে ভদ্রলোকের বেশ পছন্দ হয়েছে সেটা বোঝা গেল। নইলে কাউণ্টার ফেলে উঠে আসতেন না চারতলায়।

ভারি ভারি দুই প্রস্থ শীতের পর্দা সরিয়ে রাস্তায় তাকালাম। সামনে রেলিং-ঘেরা লম্বা বারান্দাটা আমাদের দেশের মতো। চারটি বড়ো বড়ো ফরাসী জানালা। যতো অন্ধকারে এই আড়াইটি সপ্তাহ কেটেছে মনে হলো এখানে এলে সে দুঃখ ভুলতে একবেলাও লাগবে না। আর এই ভদ্রলোকটি তো চমৎকার।

নিচে এসে নামধাম লিখিয়ে আগাম দিয়ে যাবার কথা ভাবলাম, যাতে কোনো রকমেই হাতছাড়া না হয়। কিন্তু সঙ্গে অর্থ ছিলো না, তাই বললাম, 'আমরা এক্ষুণি ফিরে আসছি চেক নিয়ে, এই সময়টুকু অপেক্ষা করো।'

মিঃ আপেল ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে না না তাতে কী? আগাম লাগবে না, আমি এই বুক করে রাখছি।'

যেখানে অত মহান মহান সব সাহিত্যিকেরা বাস করে গেছেন সেই বাসস্থানের আমরাও বাসিন্দা হচ্ছি, সেই সুখ আমাদের অনেকক্ষণ ঘিরে থাকলো।

বুদ্ধদেব বললেন, 'মনে হচ্ছে এক্ষুণি চলে আসি। সুন্দর ফ্ল্যাটটা। শেষ পর্যন্ত পাবো তো?' তারপর সেই লেখকের বিষয়ে, তাদের লেখা বিষয়ে এবং ফ্ল্যাট বিষয়েই আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি এসে মনে পড়লো আজ রাত্রেই আমাদের দুখানা থিয়েটারের টিকিট কেনা আছে।

নিউইয়র্কে এসে এই আমার দ্বিতীয় নাটক দেখা। এটি একটি বিখ্যাত গীতিনাট্য, ভাগনার। পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে রচিত, এই নাটকটির বিষয়বস্তু হলো এই যে, রাজার জন্যে রাজার বাগদত্তা বধূকে তার পিতার রাজ্য থেকে বিবাহের কারণে নিয়ে আসা হচ্ছে, তিনি আসছেন সমুদ্র বেয়ে একটি পালতোলা নৌকোয়। তখনকার দিনে এই একমাত্র বাহন দেশ থেকে দেশান্তরে যাবার।

সসম্মানে সালঙ্কারা কন্যাকে বরের বাড়িতে নিয়ে এসে বিবাহ করাই রাজাদের নিয়ম। সঙ্গে কতো লোকজন সেপাই শান্ত্রী।

যবনিকা উঠলে দেখতে পেলাম, সত্যিই সমুদ্রের উপর ভাসমান একটি বিশাল পালতোলা নৌকো। ঢেউয়ে দুলছে। আমার চোখ বিস্ময়ে বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো। পালটা একটু ফুলে ফুলে উঠছে বাতাসে। নৌকোর ভিতর তিনটি বিলাসবহুল কক্ষ, মাথার উপরে প্রশস্ত ছাদ।

একটি কামরায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে প্রসাধনরত রাজকন্যার বিষণ্ণ মুখ আয়নায় প্রতিফলিত। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী, ডাইনে বাঁয়েও দুজন সুন্দরী দাসী দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে মাঝিমাল্লা লোকজন, সবাই জমকালো পোশাকে সজ্জিত, কোমরবন্ধে তরবারি। রাজকীয় মর্যাদা অনুযায়ীই তো নিয়ে যেতে হবে কন্যাকে, তাই এসেছে এরা। যার যেথা স্থান সেই সেই পজিশন অনুযায়ী স্ট্যাচুর মতো সব দাঁড়িয়ে। নৌকোর রেলিংঘেরা সেই মস্ত ছাদে অন্যমনস্ক এক যুবক পায়চারি করছে মাথা নিচু করে, দূরে তীর দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে প্রায় পেঁছে গেল। এইবার যুবকটি ধীরে ধীরে নামছে সিঁড়ি বেয়ে, নিচে রাজকন্যা শুনতে পাচ্ছে সেই পদধ্বনি, সে চমকে উঠলো, মুখ ঢাকলো দু হাতে, ছেলেটি নামতে নামতে গান গেয়ে উঠলো। সে গান দুঃখের, বেদনার, কান্নার।

যুবকটি রাজার ভাইপো, ভাবী কাকিমাকে নিতে এসেছিলো। দূরপাল্লার পথ পাড়ি দিতে দিতে কখন দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলেছে বুঝতেও পারেনি। তীর যতোই এগিয়ে আসছে ততোই তাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সবই গানের মধ্য দিয়ে। বিলিতি অর্কেস্ট্রার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীত কানে ততো মধুবর্ষণ করছিলো না। করতো, যদি চপল গান হতো। কিন্তু এ গান ক্ল্যাসিকেল। উঁচুদরের যে কোনো কিছু বোঝবার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা আমার ছিলো না, কিন্তু স্টেজের উপরেই ঐ রকম সমুদ্রে ভাসমান তিন কক্ষসম্বলিত নৌকোটি দেখে বিস্ময়ের সীমা রইলো না। একবারো মনে হচ্ছিলো না ব্যাপারটা একান্তভাবেই বানানো, সাজানো, আলোর কারসাজিতে চোখের ধাঁধা। এদের মার্গসংগীতে অজ্ঞতা সত্ত্বেও স্টেজ এবং অভিনয়ের উৎকর্ষ আমাদের মুগ্ধ করে রাখলো।

দুটি অঙ্কেই নাটকটি সমাপ্ত। প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে যাবার পরে বিরতি। বিরতির পরের দৃশ্য রাজবাড়ি। এতক্ষণ জলের পরে এই দৃশ্য। আবার বিমোহিত করলো, স্টেজের মধ্যেই কতো ঘর, কতো গবাক্ষ, কতো ব্যালকনি, কতো

থাম যেখানে পাত্রপাত্রীকে দেখতে পেলাম, সেটি রাজকন্যার জন্য নির্দিষ্ট বহুমূল্য উপাদানে সুসজ্জিত একটি ঘর। রাজকন্যা উচ্চ আসনে সমাসীন, পায়ের কাছে রাজা হাঁটু ভেঙে বসে প্রণয় নিবেদন করছেন, জানতে চাইছেন, তাঁর ফুলের পাপড়ির চেয়েও নরম মধুর সুন্দরী প্রিয়তমার মুখে তিনি কী করলে হাসি ফোটাতে পারেন। প্রিয়তমার এই বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে, রাজকার্যে ব্যাঘাত হচ্ছে। এই বিষাদ তার কিসের জন্য ?

এই নিবেদনও গানের মাধ্যমে। প্রিয়তমা জবাবে একটি প্রার্থনা জানালেন, বললেন, একবার, মাত্র একবার তিনি রাজার সেই ভাইপো, যে তাঁর চলনদার হয়ে এসেছিলো, তার সঙ্গে দেখা করতে চান। শুনে রাজার মুখে ছায়া পড়লো, তিনি সটান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন। একটু বাদেই প্রবেশ করলো প্রেমিক, আর দেখা হতেই দুজনে গানের মধ্য দিয়ে এমন কান্নাকাটি শুরু করলো যে সরু মোটা আর্তনাদে কানের পর্দা ফেটে যায় আর কি !

এতো বিখ্যাত নাটক, এতো বিখ্যাত সব গান, শুধু শিক্ষার অভাবে তেমন উপভোগ করতে না পারার দরুন মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফিরতে ফিরতে রাত হলো অনেক। বাইরে তখন যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। ব্যাগে সদর দরজার চাবি ছিলো, খুঁজে পাই না। সর্বনাশ। তবে কি সারা রাত পথেই পড়ে থাকবো নাকি ?

এ বাড়িতে এটাও একটা মারাত্মক বিপদ। নিয়ম আছে, সদর দরজাটা ভিতর থেকে হেনরিই খুলে দেবে অধিবাসীরা বাড়ি ফিরে এলে। অবশ্য চাবিও আছে সকলের কাছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে ভুলবশত কেউ চাবি ফেলে গেল, কিংবা হারিয়ে ফেললো, তখন ? সেজন্য মাইনে দিয়ে রাখা আছে দরজা খোলার লোক। কিন্তু কোনো দিন হেনরি সেখানে থাকতো না। একজন ভাড়াটে গল্প করেছিলেন, একদিন কোনো শীতের রাতে একটি লোক নাকি সত্যিই চাবি হারিয়ে সারা রাত ঢুকতে পারেনি। বরফে জমে বোধহয় মরেই গিয়েছিলো। তারপরে কিছু দিন একটু হুঁশিয়ার থাকতো আবার যে কে সেই।

চাবি না পেয়ে আমার সেই গল্প মনে পড়ে গেল। ভয়ে আরো খুঁজে পাই না। বুদ্ধদেব তাঁর স্বভাবজাত অসহিষ্ণুতায় অস্থির হয়ে উঠলেন, তারপরে কী ভাগ্যে তাঁর নিজের ওভার কোটের পকেট থেকেই বেরুলো চাবিটা। মনে পড়লো, বেরিয়ে এসেও রাত বাড়লে শীত করবে ভেবে মাথার বেড়ে টুপিটা আনতে ঢুকেছিলেন। ফিরে এসে আর চাবিটা আমাকে দেননি।

ও বাড়িতে গেলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকেও বাঁচবো। তবু আরো তো চারটে দিন থাকতে হবে ? কিন্তু তা থাকলাম না। সপ্তাহান্তে সমস্ত জিনিসপত্র মিঃ আপেলের জিম্মায় রেখে আমরা ওয়াশিংটনে অশোক মিত্রের বাড়ি চলে গেলাম। ওরা বোধহয় তখন দেশে ফিরে আসছিলো, অশোক বারে বারেই তার আগে একবার যাবার কথা বলে গিয়েছিলো। এই সুযোগে যেতে পেরে দুটো দিন সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে ফিরে এসে সোজা চেলসী হোটেল।

পোস্টাফিসে ঠিকানা বদল বলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে অনেকগুলো চিঠি পেলাম। ছেলে-মেয়েদের চিঠি, বন্ধুর চিঠি, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণেরও অনেক চিঠি।

কোথাও থেকে ফিরে এসে চিঠি পেতে যে কী ভালো লাগে ! বহু পূর্বে আমার মা বাবার কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার কথা মনে পড়লো আমার। এখন যেমন ছেলে-মেয়ের চিঠির জন্য ব্যাকুল হই, তখন ঠিক এমনি করে তাঁদের চিঠির জন্যই ব্যাকুল হতাম। দিন কেমন পালটে যায়, হৃদয় কেমন উলটো পালটা কাজ করে। তবে কি এটাই সত্য যে ভালোবাসা নামের বস্তুটা চঞ্চলা লক্ষ্মীর মতো কেবলই তার পাত্র বদল করে ? তা নইলে এক সময় মানুষ যার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, আবার কালক্রমে তাকেই হনন করার ইচ্ছে জাগে কেন ? একবার আমার এক বন্ধু অনেক কাল বাদে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। আমি খুব খুশি হয়ে উঠেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে দমে গেলাম। সমস্ত চেহারায় কোথাও সাধব্যের চিহ্ন ছিলো না। সিঁদুরবিহীন অলংকারহীন তো বটেই, পরনেও ধবধবে সাদা জর্জেট, সাদা ব্লাউস। অবশ্য এটাকে ফ্যাসানের প্রতীকও বলা যায়, না-ও তো হতে পারে ? কিন্তু সে নিজে থেকে যতোক্ষণ কিছু বলছে না ততোক্ষণ জিজ্ঞাসাও করতে পারি না। একথা ওকথার পরে সে বললো, 'আচ্ছা রাণুদি, কতো লোক তো কতো ভাবে মরছে রোজ, চাপা পড়ছে, হার্টফেইল করছে, লাহিড়িকে কি দধীচির হাড় দিয়ে তৈরি করেছে যে তার কখনো মরণ হয় না ?'

একথা শুনে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠলো। আমি বললাম, 'ছি, এটা কী বলছো তুমি ?'

সে বললো, 'যা বলছি ঠিক বলছি, লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না।'

এর পরে আর আমি সে বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারলাম না। বন্ধুটি কী ভাবে পাগল হয়ে বিয়ে করেছিলো আমি জানতাম, কতো সুখী হয়েছিলো তখন তা-ও আমি দেখেছি ওদের নতুন সংসারে গিয়ে। তারপর যোগাযোগ

বিচ্ছিন্ন হয়ে এতোকাল বাদে এই ভয়ানক কথা। তখনো হিন্দুবিবাহে ডিভোর্স সিদ্ধ হয়নি, বাধ্য হয়ে একসঙ্গে থাকছে আর একে অপরের মৃত্যু কামনা করছে।

ভাইবোনে ভালোবাসার মধ্যেও এমন নিষ্ঠুরতার নজির অসংখ্য। অবশ্য সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বেশী বলে পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা শূন্য হয়ে গেছে নিশ্চয়ই তা নয়, কিন্তু আবেগ এতোটাই স্তিমিত হয়ে যায় যে মনের উপরতলায় প্রায় দেখাই যায় না তাঁদের। দেশে আমি যেমন আমার সন্তানদের রেখে এসেছি তেমনি তো আমার পিতামাতাও আছেন সেখানে। ছেলেমেয়ের কথা ছাড়া তাঁদের কথা আর কতোটুকু ভাবি। তাঁদের চিঠি আসুক না আসুক সন্তানদের চিঠি আমার চাই-ই চাই। না পেলেই সব সুখে বালি।

আমি আমার বাবা-মার একমাত্র মেয়ে, অতি আদরে মানুষ, আমার বিবাহের পরে বিচ্ছেদ সহ্য করতে তাঁদের কতোই না কষ্ট হয়েছিলো। আমিও সেই কষ্টের সঙ্গে একাত্ম ছিলাম। যতোই প্রাপ্তি ঘটুক তবুও পিতামাতার জীবন থেকে তাঁদের পদবী থেকে বিচ্যুত হবার বেদনা আমাকে যথেষ্ট অভিভূত করেছিলো। ঢাকা থেকে কলকাতা সহজ দূরে নয়, ঢাকা ছেড়ে যতোবার এসেছি, রেলিং ধরে, ষ্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে পদ্মার জলে আমার অনেক চোখের জল গিয়ে মিশেছে। তারপর শুধু চিঠির প্রত্যাশা।

বিয়ের পরেই আমরা পুরী গিয়েছিলাম, এই চিঠি নিয়ে কী হাঙ্গামা। তখন ইংরেজ আমল, ডাক চলাচলের এমন দুর্দশা ছিলো না, চিঠি ঠিক মতো ডাকে দিলে ঠিক দিনে গিয়েই পেঁছুতো। সেই ঠিক দিনে আমার কাছে ওঁদের কোনো চিঠি এলো না। সেদিনও এলো না, পরের দিনও না, তারপরের দিন আমাদের কোনারকমন্দির দেখতে যাবার কথা। ম্যানেজার গরুর গাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন সেই গাড়ি এসে বসে আছে, ম্যানেজার তাড়া দিচ্ছেন, বলছেন, 'বেরিয়ে পড়ুন, নইলে জোয়ার এসে যাবে।'

জোয়ারের সঙ্গে আমাদের বেরিয়ে পড়ার যে কী সম্পর্ক বুঝতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে যাত্রা শুভ-অশুভের কথা বিবেচনা করে কুসংস্কার বশতই নিশ্চয় একথা বলছেন। তিনি যাই বলুন, আমরা তাঁর কথা মতো কোনোমতেই বেরিয়ে পড়তে পারছিলাম না এই কারণে যে তখনো ডাক আসেনি। ডাক এলে চিঠিটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরুলে জোয়ার এলেও যাত্রা নিশ্চয়ই অনেক বেশী শুভদায়িনী হবে।

ভাগ্য মন্দ। ডাক এলো, চিঠি এলো না। বুদ্ধদেব বললেন, 'কাল ফিরে

এসে টেলিগ্রাম করবো, আজ চলো, সব ঠিক করেছি, জিনিসপত্র তোলা হয়ে গেছে, গাড়িওলা নিশ্চয়ই রেগে যাবে না গেলে। ক্ষতিপূরণও চাইবে। আমাদের জন্যেই তো অন্য ভাড়া নেয়নি বেচারা?'

তখন পুরী থেকে কোনারক যেতে হলে গরুর গাড়িতে যেতে হতো। ট্যাকসি বা বাস এসবের কোনো প্রশ্নই ছিলো না, তার পথও ছিলো না। সময় লাগতো প্রচুর। বেলায় রওনা হবার দরুন গাড়িওলা 'জোয়ারো আসি যাবু, সোনধা লাগি যাবু' এই সব বলে গজর গজর করছিলো। আমাদের উঠিয়ে সে প্রাণপনে গাড়ি হাঁকালো। আস্তে আস্তে পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি কাঁচা রাস্তায় পড়লো, 'কাঁচা রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠ। মাঠ ছাড়িয়ে জনহীন প্রান্তর। অরণ্যও বলা যায়।

এই অরণ্য পেরিয়ে একটি নদীও আমাদের পার হতে হবে। সেই নদীর নাম নিয়াকিয়া নদী। নদীতে গোড়ালি ভেজে কি ভেজেনা এমনি জলের গভীরতা। গাড়ি তার উপর দিয়েই পার হয়ে যায়। 'পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি।'

কিন্তু আমাদের গাড়ি পার হতে পারলো না। গাড়ির চালকটি তার গরুর ল্যাজে মোচড় দিয়ে যতোই হই হই করুক না কেন জঙ্গলে প্রান্তর পার হয়ে নদীর ধারে পেঁছিতে পেঁছিতে রাত দশটা বেজে গেল। আকাশে পূর্ণ শশী উদিত হলেন। আর সেই মুহূর্তে গাড়োয়ান ভয়ার্তস্বরে বলে উঠলো, 'ছরবোনাছো করুচি'।

'কী হলো?' আমরা সচকিত হয়ে উঠে বসলাম। মাঠ-ঘাটের উঁচু নিচু পথে গরুর গাড়ির ছো-নৃত্য এতোই প্রচণ্ডভাবে আমাদের আন্দোলিত করছিলো যে এই শহুরে শরীর থেকে হাড়মাংস প্রায় খসে পড়ার অবস্থা। শুয়ে বসে ঢুলে কোনো রকমেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তার মধ্যেই আমার বোধহয় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো।

লোকটি তার স্বদেশী ভাষায় যা বললো তার মূল বক্তব্যটি এই যে, তখনি বলেছিলাম তাড়াতাড়ি চলো, নইলে জোয়ার এসে যাবে, এখন ঠ্যালা বোঝো। আজ রাত্রে আর নদী পার হাওয়া যাবে না।

'কেন?'

'সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছো না? আকাশে চাঁদ উঠেছে না? এখন কি আর নিয়াকিয়া নদী সেই নিয়াকিয়া? দেখ গিয়ে কী বিশাল তার বুক, কতো তার স্রোত।'

তা হলে জোয়ারের আসল অর্থ এই? আমরা উদ্বিগ্ন হলাম। আকাশে

চাঁদ উঠলে সমুদ্র এমন উত্তাল হয়ে ওঠে এই অনুভূতিও আমাদের আবিষ্ট করল। কী মহান প্রেম, কী মহান দৃশ্য, কী মহান লীলা ঈশ্বরের। আমরা নিঃশব্দে গাড়ির পিছন দিক দিয়ে একটু এগিয়ে ছইয়ের বাইরে মুখ বাড়িয়েছিলাম, লোকটা প্রচণ্ড জোরে এমন একটা ধমক লাগালো যে কেঁপে গেলুম।

'জান জঙ্গল থেকে এখন শের বেরিয়ে আসতে পারে?'

'বাঘ! এখানে বাঘ আছে নাকি?'

'না নেই। তোমাদের জন্যে সব অন্য জঙ্গলে চলে গেছে।'

এতোক্ষণ যে বিনয়ের অবতার ছিলো, হঠাৎ তার এই চোখ রাঙানিতে আমরা হকচকিয়ে গেলাম।

বীররস কিন্তু সেখানেই শেষ হলো না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তারপরে দেখি শেরের ভয়ে সে ছইয়ের ভিতরে ঢুকতে চায়। ঐটুকু তো পরিসর, দু'জনেই ঠাসাঠাসি। আর কী শীত। দুটো কম্বল গায়ে দিয়েও ঠকঠক করে কাঁপছি অমন দশাসই তৃতীয় লোকটাকে কোথায় বসাবো গায়ে গা ঠেকিয়ে?

চোখ বড়ো বড়ো করে সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি ধরে বুদ্ধদেবকেই বেশী বকছিল। ভাষা বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু রাগটা বোঝা যাচ্ছিলো। হঠাৎ আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার হাত ভর্তি সোনার চুড়ি গলায় হার সেই মতলবেই কি ভিতরে আসতে চায়? সেজন্যই কি আমার রক্ষকটির উপরই ওর বেশী রাগ?

আসবার আগে সব অলংকারই খুলে রেখে আসার কথা ছিলো, ঐ চিঠি চিঠি করে সব কথাই ভুলে গেছি। এখন উপায়?

বুদ্ধদেবের ভয় কম। ভয়ের কথা তাঁর মনেই আসে না কখনো। বিপদের কথাও না। লোকটির আস্ফালনে যে খুব মনোযোগ দিচ্ছিলেন, তা-ও বোধহয় নয়। শীতের প্রাবল্যে ছইয়ের পিছনে যে পর্দাটি আমরা ঘিরিয়ে নিয়েছিলুম, সেটি সরিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়েছিলেন বাইরে, হাতের সিগারেটের লাল আলোটা টক-টক করছিলো। আমি ফিসফিস করলাম, 'দেখছো, লোকটা কেমন করছে।'

'ইডিয়েট। করুক। বাঘ না হাতি। তুমি আবার ভয় পাওনি তো, ওর কথায়?'

'না, আমি বাঘের ভয়ে কাতর হইনি, লোকটাকেই ভয় করছে আমার।'

'ওকে আবার ভয় কিসের? এই, তুমি এতো চ্যাঁচামেচি করছো কেন? চুপ করো।'

বুদ্ধদেব যতো জোরে ওকে একথা বললেন, সে-ও ততো জোরেই একটা কড়া জবাব দিল।

এইবার বুদ্ধদেব রেগে উঠলেন। লোকটাও সমান তেজে গলা চড়ালো। মনে হয় যেন তেড়ে আসছে। আমি সভয়ে তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হয়ে লোকটির দিকে ফিরে খুব ঠাণ্ডা অথচ কড়াভাবে বললাম, 'শোনো, বাবু পুলিশের লোক—'

'এ্যাঁ—।'

'পুলিশের লোকেদের কাছে সর্বদাই পিস্তল থাকে—বাঘই আসুক আর চোর-ডাকাতই আসুক, সকলকেই মরতে হবে গুলি খেয়ে। সেজন্য আমাদেরও কোনো ভয় নেই, তোমারও বাঘের ভয়ে অস্থির হতে হবে না।'

আমার এই মারাত্মক মিথ্যা ভাষণে বুদ্ধদেব একেবারে থ। কিন্তু লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ভেজা মুড়ির মতো মিইয়ে গেল। তারপর আর একটি কথা নয়। রাত চারটা পর্যন্ত গাড়ি নিঃশব্দে থেমে রইলো নিয়াকিয়া নদীর ধারে। আস্তে-আস্তে রাত কাটলো, সমুদ্রের গর্জন স্তম্ভিত হলো, ভাঁটার টানে ফিরে গেল জল, চাঁদ ডুবলো, দিগন্ত রঞ্জিত করে সূর্যের আগুন দেখা দিল বরাভয় নিয়ে। আমরা নিয়াকিয়া নদী পার হলাম।

ঝাউবনের মধ্যে সুন্দর একটি ডাক-বাংলো ছিলো। সাহেব-সুবোরা গিয়ে থাকতেন মাঝে মাঝে। আমরাও গিয়ে সেখানে উঠলাম। সঙ্গে সবই ছিলো। চা চিনি কণ্ডেন্সড্ মিল্ক কাপ প্লেট টিপট, রুটি ডিম কলা মাখন খেজুর—ম্যানেজার বলেছিলেন, 'চাল ডালও নিয়ে যাবেন, আজ রাত্তিরে খেতে হবে, কাল দুপুরে খেতে হবে—' আমরা আনিনি, এমনিতেই লেপ-তোশকের ভিড়ে গাড়ির ভিতরটা আকণ্ঠ, তার উপর এসব ভজকট অসম্ভব।

অসম্ভব শব্দটা অবশ্য বুদ্ধদেবের। যা নিচ্ছিলাম তাই তাঁর অসম্ভব মনে হচ্ছিলো, কিন্তু কোনারকে তখন যে কিছুই সম্ভব ছিলো না সে কথাও তাঁর অবিদিত ছিলো না। তবে একান্ত প্রত্যক্ষ বস্তু বিছানা ব্যতীতও যে এতো কিছু সঙ্গে এসেছে সেটা অবিদিত ছিলো। ডাক-বাংলোর চৌকিদার জল ফুটিয়ে দিলে যখন চায়ের সঙ্গে এই সব খাদ্যের সংযোগ হলো তখন মহা খুশী। রাত্তিরে তো অনাহার গেছে, বিকেলে একবার গরুর গাড়ি থামিয়ে পথে নেমে স্পিরিট-স্টোভ জ্বালিয়ে চা করেছিলাম, বিস্কুট সহযোগে সেই চা-পান ছাড়া আর কিছুই

জোটেনি। জুটবে কী ! যা বিশ্রী একটা রাত কাটলো। লোকটা সত্যি কেমন ভয়ানক হয়ে উঠছিলো। অথচ এখন ? আমাদের সঙ্গে সমান জলযোগ করে পান খাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতে কেমন হাসছে।

সূর্যমন্দির প্রদক্ষিণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। বুদ্ধদেব বললেন, 'এসো একটা দিন থেকে যাই।'

থাকা যেতো। আমারও খুব ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু কাল রাত্রের ভয়াবহ পরিস্থিতির পরে আর অজানা অচেনা জায়গায় রাত কাটাতে ভরসা হলো না। দিনের গাড়োয়ান রাত্রিবেলা যা হয়ে উঠেছিলো, দিনের চৌকিদারও যে সেই রাত্রিতে তার ব্যতিক্রম হবে না ঠিক কী ? আমরা ছাড়া মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে যতোদূর পর্যন্ত চোখ যায় আর একটি লোকও তো দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয় অন্য কোন গ্রহে এসে ছিটকে পড়েছি।

'তোমার বড্ড ভয়, ওরকম করলে দেশ ভ্রমণ হয় না।' তারপরেই হঠাৎ ঝাউবন কাঁপিয়ে প্রচন্ড জোরে হেসে উঠে বললেন, 'আচ্ছা, কাল কী করে তুমি ও রকম একটা কথা বানিয়ে বললে ? আমাকে একটা পুলিশ সাজিয়ে দিলে ? তার উপর পিস্তল—' হাসতে হাসতে অস্থির।

হাসুক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাল রাত্রে লোকটির মাথায় কোনো দুর্বুদ্ধি চেপেছিলো।

ম্যানেজার যা বলেছিলেন ঠিক নয়, ডাক-বাংলোর চৌকিদার আমাদের বেলা এগারোটার মধ্যেই গ্রাম থেকে মুর্গি এনে ঝোল-ভাত করে দিল। চান করার জন্য জল দিল বাথরুমে। আসলে 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' প্রবাদটা সত্য। টাকা দিলে সব হয়। এবং সেই টাকাটা সে খুব ভালো হাতেই নিল। নিলেও দিল যে সেটাকেই ভাগ্য মানলাম। তারপর রওনা হয়ে পড়লাম খুব তাড়াতাড়ি। দুপুরের রোদ থাকতে থাকতেই যাতে বন-জঙ্গল-প্রান্তর পেরিয়ে লোকালয়ে গিয়ে পেঁছুতে পারি সেটাই উদ্দেশ্য ছিলো। তা হলো এবং গরুর গাড়ির লোকটি ঠিক আগের মতোই বিনীত আনত হয়ে গাড়ি চালালো। হোটেলে পেঁছতে পেঁছতে প্রায় রাত। আর এসে পেঁছোনো মাত্রই পুরী হোটেলের ম্যানেজার পেট মোটা দুখানা চিঠির খাম এনে হাতে দিলেন। দুখানাই মা-বাবার। কী জানি কী কারণে ঠিক দিন না এসে একসঙ্গে দুখানা এসেছে। আর সেই চিঠি পেয়ে এবং পড়ে কী আনন্দ, কী আনন্দ।

বিশেষজ্ঞরা বলেন স্মৃতি দুর্মর। সত্যিই তাই। তা না হলে এতোকাল বাদে, সেই কোনারকের স্মৃতি উথলে উঠলো কেন? কবেকার কোন্ লণ্ঠন জ্বালা অতি মলিন পুরী হোটেলের বাঙালী ম্যানেজারের সঙ্গে নিউইয়র্ক শহরের এই উজ্জ্বল আলোকিত হোটেলের জর্মান সাহেবটিকে একান্ত বলে বোধ হলো কেন? আর চিঠি? চিঠি আজও সন্তানদের খবর নিয়ে যে আনন্দ বহন করে এনেছে সেদিনও মা-বাবার খবর নিয়ে সেই আনন্দই বহন করে এনেছিলো! সেই সুখেরই পুনরাবৃত্তি এই সুখ। আমার পাত্র পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু স্মৃতির যে কোনো স্থান কাল পাত্রের জ্ঞান নেই সেটা অবিসংবাদী সত্য বলে মেনে নিতে হলো। লাটাইয়ের মতো, ঘুড়ি উপরে উঠলেই হলো, সুতো সে টেনেই নেবে যতোক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয়। আমার গুটিপোকা থেকেও সব স্মৃতির সুতো বেরিয়ে আসছে। একের এর এক। একের পর এক। সব কি লিখে শেষ করা যায়? বলার ধৈর্য থাকলেও শুনবে কে?

সেই সন্ধ্যায় চেলসী হোটেলে ফিরে এসে যে ক'টি চিঠি পেয়েছিলুম, তার মধ্যে দুটি চিঠি বেশ কৌতূহল উদ্রেককারী। একটি একটা নাচের নিমন্ত্রণপত্র, আর একটি একজন যোগীপুরুষের আমন্ত্রণ।

নাচের দলটির নাম আমার ঠিক মনে নেই। যিনি দলপতি তাঁর ছবি আছে স্যুভেনিরে, মাত্র একখানাই নয়, বিভিন্ন ঢংয়ে, বারংবার। সবই নাচের ছন্দে। নাম কৃষ্ণমূর্তি, ধাম আমেরিকা, পেশা হরিনাম এবং ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন। এখন যেমন 'হরিনাম' পেশা সাহেবের অভাব নেই, তখন তা ছিলো না। এই নিমন্ত্রণ পত্রটির আগে আর কখনো এরকম শুনিনি। তখন শুধু মেকি সাজ ত্যাগ করে বীট বংশের জন্ম হয়েছে, কবি কেরুয়াক যার স্রষ্টা, কবি গীন্‌জবার্গ যার প্রবর্তক। ভিক্ষুক সেজে ছেঁড়া জামাজুতো পরে নোংরা থেকে 'হিপি'র জন্ম তার পরে।

বিদেশী হিপিরা অবশ্য প্রায় সকলেই ছদ্মবেশী রাজপুত্র। সেই চণ্ডীমঙ্গল ব্রতের গল্পের মতো সুখে ঘেন্না ধরে গেছে এদের। চণ্ডীমঙ্গল ব্রত করলে নাকি কারো কোনো দুঃখ থাকে না, অভাব থাকে না। এক বণিক-বৌ চণ্ডীমঙ্গল ব্রত করতো, তাতে তার সুখের সাগর উপচে পড়ছিলো। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, নৌকো ভরা বাণিজ্যের সম্ভার, ছেলেমেয়েরা বাধ্য, প্রজারা সাধু, দিকে দিকে খ্যাতি—এরই মধ্যে এক সকালে উঠে গিন্নীর বড়ো কাঁদতে সাধ গেল। কতোকাল যে কাঁদে না।

মনের কথা আর কাকে বলে ! সইয়ের কাছেই গেল।

'সইলো সই, আমার বড়ো কাঁদতে ইচ্ছে করে।'

সই বললো, 'সে আবার কঠিন কথা কী ? কাঁদো না। জীবনে তো কান্নাই বেশী।'

'না, এমনি এমনি কান্না নয়, একেবারে বুক ফাটিয়ে কষ্টের কান্না।'

'তা হলে এক কাজ করো, তোমার মেয়ের বাড়িতে বিষের নাড়ু তৈরি করে পাঠিয়ে দাও, তাই খেয়ে মেয়ে জামাই ছেলেপুলে সব মরুক তখন তুমি মনের সুখে মরাকান্না কাঁদো।'

'বাঃ চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছো তো। এই না হলে আমার সই ?'

বণিক-গিন্নী আহ্লাদে নাচতে নাচতে বাড়ি এসে বিষের নাড়ু তৈরি করতে বসলো। সারা দিন ধরে কতো যত্নে যে আষ্টেপৃষ্ঠে বিষ ঢোকালো সেই নাড়ুর মধ্যে তার ঠিক নেই। তারপর লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে মাঠের ধারে বটের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো কখন সকলের মরার খবরটা আসবে আর চুল এলিয়ে অমনি লুটিয়ে পড়বে কান্নায়। লোকটা এলো, কিন্তু অন্য খবর নিয়ে। বললো, 'কী নাড়ুই পাঠিয়েছেন মা, সবাই খেয়ে একেবারে ধন্য ধন্য। বললো, এ তো একেবারে অমৃত।'

'সে কী ! তুমি ঠিক সেই নাড়ুই নিয়ে গিয়েছিলে তো ?'

'সেই নাড়ুই।'

'পথে কোথাও থামোনি তো ?'

'থেমেছিলাম একবার। নাড়ুর হাঁড়ি রেখে ঘাটে জল খেতে নেমেছিলাম।'

আসলে যারা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে তাদের তো কোনো অমঙ্গল হতে পারে না, তাই লোকটি যেই ঘাটে জল খেতে নেমেছে সেই সুযোগেই দেবী এসে বিষের নাড়ুকে অমৃতের নাড়ু বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

এমনি ভাবেই দিন যায়, বণিক গিন্নী আর কাঁদতে পারে না। সুখ সৌভাগ্য আরো ফেটে পড়তে লাগলো। কর্তা বণিক ছেলেদের নিয়ে বাণিজ্যে গেল, বন্দরে বন্দরে কেবল লাভ হতে লাগল, শেষে আবার সইয়ের কাছে যেতে সই আর একটা পরামর্শ দিল। বললো, 'তুমি এক কাজ করো।'

'কী কাজ ?'

'বাড়ি গিয়ে এক লাথি মেরে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট ভেঙে দাও, তার পুজো করো বলেই তোমার এই দুর্দশা।'

শুনতে দেরি আছে তো করতে দেরি নেই। বাড়ি এসেই সাত তাড়াতাড়ি এক লাথিতে ঘট ভেঙে উল্টে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই পুকুরের মাছ মরে ভেসে উঠলো, গোয়ালে গরু মরে পড়ে গেল, গোলার ধান শুকিয়ে গেল, ঝড় উঠলো সমুদ্রে, বাণিজ্যের নৌকো ডুবলো, যে যেখানে আছে সব মরে শেষ।

এইবার কান্নার পালা। সখের কান্না নয়, সর্বনাশের কান্না। একদিন দু'দিনের কান্না নয়, চিরজীবনের কান্না। শোকে দুঃখে অভাবে অনিদ্রায় কাঁদতে কাঁদতে দেহ শীর্ণ হয়ে গেল, চোখ অন্ধ হয়ে গেল, বুকের মধ্যে প্রাণটা শুধু ধুক ধুক করতে লাগলো। ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে কোনো রকমে লজ্জা ঢেকে দোরে দোরে ভিক্ষে করে যা পায় তাই খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সন্ধ্যায় এক বাড়িতে গিয়ে দেখলো তারা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করছে। অমনি সব মনে পড়ে গেল। বুঝতে পারলো কী দোষেই আজ তার এই অবস্থা। তখন তাড়াতাড়ি চোখের জলে ভেসে দিনে ক্ষণে আবার সে পুজো করলো, মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষমা চাইলো, দেবী সন্তুষ্ট হলেন। তারপর তার বরে বেঁচে উঠলো সব। আবার ধন-দৌলতে পূর্ণ হয়ে গেল সংসার।

সাহেবদের ভিখিরি সাজাও তেমনি। যেদিন খুশি এই ব্যাঙের খোলস পুড়িয়ে আবার গিয়ে মশনদে বসবে। একবার এই রকম একটি জার্মান তরুণের সঙ্গে আমার ম্যাকস্মুলার ভবনে আলাপ হয়েছিলো। ছেলেটির বয়েস বড়ো জোর উনিশ কি কুড়ি। দেখতে অতি সুন্দর। কার কাছে পরিচয় পেয়ে এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বললো, 'আমি দু রাত ফুটপাতে ঘুমুচ্ছি, তোমার বাড়িতে আমাকে শুতে দেবে?'

প্রথম দর্শনেই এই আলাপ আশা করিনি। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। জিপার দেয়া একটি জ্যাকেট পরেছে, জ্যাকেটটির রং হালকা এবং সেটি এতো নোংরা যে চিমটি দিলে ময়লা উঠে আসে। পরনে শততালি দেয়া ঠিক তেমনি নোংরা একটি ডাঙ্গেরিজ, পায়ে ক্যানভাসের ফিতে ছেঁড়া জুতো। পিঠে থলি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ফুটপাতে শুচ্ছ কেন? তোমার থাকার জায়গা নেই?'

'না।'

'সে কী? সারাদিন কোথায় থাকো?'

'কখনো পথে পথে, কখনো কারো বারান্দায়, আবার কেউ কেউ বাড়িতেও থাকতে দেয় চেনা হলে।'

'কোথা থেকে এসেছ ?'

'হামবুর্গ। হিচ্‌হাইক করে করে এসেছি।'

'জিনিসপত্র কোথায় ?'

'এই তো।' পিঠের বোঁচকা দেখালো।

'এর মধ্যেই তোমার সব ?'

'হ্যাঁ।'

'কবে এসেছ ?'

'দু মাস।'

'কদ্দিন থাকবে ?'

'যদ্দিন ভালো লাগে।'

আমি চিন্তা করে বললাম, 'তুমি খেতে চাও, খেতে দিতে পারি দু-একদিন কিন্তু থাকতে দেব বা শুতে দেব এমন জায়গা আমার বাড়িতে নেই।'

সভা ভেঙে গিয়েছিলো, আমি চলে আসছিলাম। খানিক বাদে তাকিয়ে দেখি আমার পিছনে পিছনে সেই ছেলেও আসছে। আমি কথা না বলে এগিয়ে গেলাম, একটা রিকশ নিয়ে চলে এলাম বাড়ি। একটু পরে সেই ছেলেটিও এলো। একগাল হাসি, 'জায়গা আমি পেয়েছি।'

'পেয়েছ ? খুব ভালো।'

'একটা ক্লীনার দাও, ঝাঁট দিয়ে নিতে হবে।'

'কোথায় জায়গা পেয়েছ ? কোথায় ঝাঁট দেবে ?' আমার আতঙ্ক হলো বোধহয় আমাদের বাড়িরই কোনো আনাচ কানাচ বেছে নিয়েছে।

ঠিক তাই। যেখানে নিচে প্রবেশ পথ, পাম্প থাকে, একটু চওড়া জায়গা আছে দু স্টেপ উপরে, আমাদের গৃহসেবকদের যেটা তাস খেলার আড্ডা এবং নিভৃত বিশ্রামস্থল, তারা ঘুমোয়ও সেখানে, সেইখানটাতেই ও ঝাঁট দিয়ে বিছানা করে শোবে।

শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। সবেগে অসম্মতি জানিয়ে বললাম, 'অসম্ভব।'

সেই সময়ে বুদ্ধদেব দেশে ছিলেন না, সামার-ক্লাশ পড়াতে হাওয়াই গিয়েছিলেন, ছেলেটিকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। সে কিছুতেই যাবে না। দেখতে এতো মিষ্টি, স্বভাব এতো সরল এবং বয়েস এতো কম যে স্বভাবতই আমার মায়া পড়ে যাচ্ছিলো, শেষে একটা চিঠি দিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি

পাঠিয়ে দিলাম। তাদের গ্যারেজের উপরের ঘরটা খালি ছিলো তখন। ছেলেটা গিয়ে সেইখানে বহাল হলো। কথা ছিলো, দিনে থাকবে না, শুধু রাত্তিরে গিয়ে শোবে, সকালেই বেরিয়ে যাবে।

কয়েকদিন পরে আত্মীয়রা নালিশ করলেন, 'সকাল হতে বেরিয়ে যাবে বলেছিলো, তা যায় না, সোজা চলে আসে ব্রেকফাস্ট টেবিলে, সকলের সঙ্গে বসে সাংঘাতিক খায়, খেয়ে তারপর বেরোয়। আবার ঠিক লাঞ্চের সময় ফিরে, আসে, এসে লাঞ্চ খেয়ে আবার বেরিয়ে যায়। তারপর রাত্রে যে কখন ফেরে, ঘরটা বাইরের দিকে হাওয়ার দরুন সেটা টের পাওয়া যায় না। এখন একে নিয়ে কী করা যায় ?'

কী যে করা যায় তাঁর সমাধান করতে করতে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল, ছেলেটা থাকতেই লাগলো। চোর নয় জোচ্চোর নয়, উদ্ধত বা অসভ্য কিছুই নয়, বরং অত্যন্ত ভদ্র বিনীত মধুর স্বভাবের ছেলে, অত সুন্দর দেখতে, অসহায় বিদেশী, আত্মীয়রা মেনে নিলেন তাকে। বাড়ির ছেলেই হয়ে গেল। হঠাৎ টের পাওয়া গেল, শুধু ছেলেই নয়, জামাই হবার পথেও অগ্রসর হচ্ছে সে। বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ নাবালিকা কন্যাটি তার মনোনীতা। তখন শক্ত হাতে তাকে তাঁরা গৃহছাড়া করে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু বছর খানেক বাদে দেখা গেল গৃহ থেকেই বিতারিত করেছিলেন, প্রেম থেকে নয়।

শেষে এমন একটা সময় এলো যখন তাঁরা কন্যাকে ঐ ভিখিরির সঙ্গেই বিবাহ দিতে বাধ্য হলেন। কিছুকাল ঘর জামাই থেকে হঠাৎ সে দেশে ফেরা ঠিক করলো বউকে নিয়ে। যাবার আগে যে কতো জিনিস কিনলো তার ঠিক নেই। মনে হলো ভারতীয় ঐতিহ্যের সব চিহ্নই সে নিয়ে যাবে নিজের দেশে। হাজার হাজার টাকা বেরুতে লাগলো পুটুলি থেকে। তারপর মালপত্র জলের জাহাজে পাঠিয়ে, নিজেদের জন্যে দুখানা হাওয়াই জাহাজের টিকিট কেটে উড়লো। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়েটি দেখলো তার স্বামী একজন কোটিপতির পুত্র, শ্বশুরবাড়িটি সাধারণ বাড়ি নয়, হামবুর্গ শহরের মধ্যস্থলে একটি প্রাসাদ।

বিদেশী হিপিরা শতকরা নিরানব্বুই জনই এই। কিন্তু আমরা, ভারতীয়রাও যখন হিপি সাজি সেটা প্রহসন মাত্র। আমরা তো শতকরা নিরানব্বুই জনই ভিখিরি। সাজবার আর দরকার কী ?

যাই হোক নাচ দেখতে গিয়ে দেখি গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ গৌরাঙ্গী রাধিকাকে নিয়ে

যথেষ্ট লীলা করছে। কৃষ্ণ বাঁকা হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে কদমতলায় দাঁড়িয়ে, রাধা কলসী মাথায় ঘাগড়া পরে জল নিতে এসেছে। আবার জলকেলি হচ্ছে গোপিনীদের নিয়ে। মনে হয় কয়েক দিন কারো কাছে দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্য শিখেছিলো, তা-ও দেখালো একক নৃত্যে। সাদা চামড়ার দর্শকরা তাই দেখেই 'ব্রেভো ব্রেভো' বলে চ্যাঁচাতে লাগলো, হাততালিতে কানে তালা লাগলো, আমরা নেহাতই সময় কাটিয়ে ফিরে এলাম। মনে মনে বললাম, হুজুগে জাত আর কাকে বলে।

এদিকে যোগীপুরুষটি আবার খাঁটি বাঙালী। মধ্যবয়সী ফ্যাসনেবল শ্যামবর্ণ এক টিপটপ ভদ্রলোক। বহুকাল প্রবাসী। দেখতেও সুন্দর, কথা-বার্তা উচ্চারণ আচরণ, প্রবাসী থেকেও স্বদেশ প্রীতি, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা মমতা সবই মনোরম। ভদ্রলোককে আমাদের ভালো লাগলো। ওদেশে তিনি যোগ-ব্যায়াম শেখান। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, অসংখ্য উপার্জন। এতোটাই উপার্জন যে মানহাটানের উপর তিনি দুটি ফ্ল্যাটের ভাড়া দিতে সক্ষম। একটিতে থাকেন, অন্যটিতে আশ্রম।

আমাদের ডিনারে বলেছিলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই জমে গেল। নিমন্ত্রিত মাত্র আমরাই দুজন, আর ওঁরা দুজন। বিয়ে করবেন না করবেন না করেও করে ফেলেছেন এই বেশী বয়সে পঞ্চাশ উত্তীর্ণ করে। ভদ্রমহিলা ইয়োরোপিয়ান, কিন্তু কোন দেশের মেয়ে আমার ঠিক মনে নেই। ভীষণ বড়ো-সড়ো দেখতে, আর খুব কড়া, একটু সন্দিহান স্বামী বিষয়ে। ভদ্রলোকের নাম শচীন মজুমদার। ছাত্র বয়সে বুদ্ধদেবের খ্যাতি কর্ণগোচর হয়েছিলো, মোহ তখনো অবিচলিত। বয়েস ধরার উপায় নেই এমনই টান টান চেহারা। বোধহয় যোগ-ব্যায়াম ধ্যান করেই। আমাকে বললেন, 'আমি কিন্তু আপনার আত্মীয়।'

'আমার ?'

'আমি বিনয়ের দাদা। ওকে তো আপনি খুব চিনতেন।'

'বিনয় ?' আমি মনে আনতে পারছিলাম না, পরিচয় দিতে মনে পড়লো। এবং কী ধরনের আত্মীয় তা-ও বুঝতে পারলাম। ঘনিষ্টই বলা যায়, শুধু দেখাশুনোর অভাবে অচেনা।

এই আত্মীয়তার সুবাদেই আমার বিবাহের পূর্বে বিনয় একবার এসে মাস-দুই আমাদের বাড়িতে ছিলো। এই রকমই সুশ্রী সুন্দর যুবক। শুনলাম লেখা-পড়ায় খুব তুখোর। কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাস করে বসে আছে চাকরির আশায়।

বোধহয় বেড়াতেই এসেছিলো, সেই সঙ্গে চাকরির খোঁজা। ভীষণ লাজুক, কারো সঙ্গেই প্রায় চোখ তুলে কথা বলতে পারে না। আমার সঙ্গে তো নয়ই। শুধু আমার এক বালক ভাইয়ের হাতে আমাকে মধ্যে মধ্যে রাবীন্দ্রিক হস্তাক্ষরে চিরকুট পাঠাতো, যেমন, 'আমি থাকার জন্য আপনার কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে ?'

আসলে ছেলেটিকে আমার লেখাপড়ার ঘরটিতে থাকতে দেয়া হয়েছিলো। বোধহয় সেই অনধিকার অবস্থানের লজ্জা। আমি তৎক্ষণাৎ তলায় লিখে দিতাম, 'একটুও না।'

আবার কয়েকদিন বাদে লিখতো, 'আমার থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ, তবু যে আছি নেহাৎই যেতে ইচ্ছে করছে না বলে, আরো কয়েকদিন কি ঘরটা আটকে রাখা যায় ?' আমি তৎক্ষণাৎ তলায় লিখে দিতাম, 'নিশ্চয়ই।'

আমি তখন ঢাকার বাসিন্দা। টিকাটুলি পাড়ায় থাকি। সেখানে আমাদের বাড়িটা বেশ হাত পা ছড়ানো ছিলো। মাঝখানে মস্ত হল ঘর, সামনে গোল বারান্দা, হলঘরের দু পাশে দুখানা দুখানা চারখানা শোবার ঘর। একদিকের দুখানা ঘরে দাদু ঠাকুমার এক্তিয়ার, অন্য দিকের দুখানা ঘরে মা বাবা এবং আমি, হলঘরটি বসার ঘর। আমার সাজানো ঘরে বিনয়কে থাকতে দেয়া হয়েছিলো বলে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি, আমি আমার দিদার পাশের ঘরটা আবার গুছিয়ে নিয়েছিলাম।

উঁচু প্লীন্থ্ বাড়ি, চওড়া চওড়া সিঁড়ি, সামনে বেশ খানিকটা জমি। সেখানে আমরা ছেলেমেয়েরা মিলে ব্যাডমিনটন খেলতাম, বিনয় বসে থাকতো বারান্দায়। তার হাতে সব সময়েই একখানা বই। মাঝে মাঝে উদাস দৃষ্টিতে আমাদের খেলা দেখতো। মা বলতেন, বিনয়কে ডেকে নিস না কেন খেলায় ? কে ডাকবে ? ও যেমন আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমিও তো বলি না। আত্মীয়তার ছাপ যখন আছে তখন মেলামেশায় (তখনকার নিয়ম অনুযায়ী) বিশেষ বাধা ছিলো না, কিন্তু বিনয়ের স্বভাবেও যেমন অসঙ্গত লজ্জা, আমার স্বভাবেও তেমনি অতিরিক্ত সংকোচ। আমার এক বন্ধুর খুব পছন্দ হয়েছিলো ওকে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি ভাব, সে-ও আমাকে ঠ্যালা দিয়ে বলতো, 'এই তোমার ভাই না মামা কি হয়, ডাকো না তাকে।' আমি বলতাম, 'তুমি ডাকো। আমার সঙ্গে আলাপ নেই।' বন্ধু অবাক হয়ে বলতো, 'আত্মীয় অথচ আলাপ নেই সে কী রকম কথা ?'

একদিন একটা চিরকুট এলো, 'আপনার সেলফে দেখছি সবই আধুনিক লেখকদের লেখা বই। আপনি সবচেয়ে কার বেশী ভক্ত ?'

আমি আবার তলায় সংক্ষেপে একটি নাম লিখে দিলাম। কয়েক দিন বাদে আবার লিখলো, 'একদিন অন্তর একদিন একটি চিঠি আসে আপনার নামে, তিনি কি সেই ব্যক্তি ?' এবার আমি কোনো জবাব দিলাম না। আর তার কয়েক দিনের মধ্যেই বিনয় চলে গেল। আমাদের বাড়িটা কিন্তু বেশ ফাঁকা হয়ে গেল। মা বললেন,'কথাবার্তা না বললে কী হবে, খুব উপস্থিতি ছিলো।' দিদা বললেন, 'হ্যাঁ আমার বাপের বাড়ির দিকের লোকেদের এই লজ্জা একটা রোগ।' আমার মৃত পিসিমার পুত্র সেই চিরকুট বহনকারী সাত বছরের বালকটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'আমার বিনয়মামুর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে।' অদ্ভুত ভাবে আমারো খুব কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু তার মেয়াদ আর কতোক্ষণ ?

এর পরেই গ্রামোফোনে গান দিতে আমি কলকাতা আসি। সেই সময়েই আমরা আমাদের বিবাহ স্থির করি এবং গুরুজনদের জানাই। আমার পিতামাতা কলকাতা চলে আসেন। তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না তাঁদের একমাত্র কন্যার জীবনে এইরকম একটি পরিণতি এমন দ্রুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে আসছে। কথাটা আত্মীয়-বন্ধু মহলেও খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়েছিলো। ঠিক এই সময়ে একদিন একটি নীল রংয়ের শৌখীন খামে চার পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা চিঠি আমার হস্তগত হয়। লিখেছে বিনয়। ইংরিজিতে লিখেছে। খামের উপরে আমার নাম লেখা ছিলো, কিন্তু ভিতরে কোনো সম্বোধন ছিলো না। ঐ ইংরিজি চিঠিটির পাঠোদ্ধার করতে আমার যথেষ্ট সময় লাগলো। মনে হলো, বিবাহের বিরুদ্ধে একটি জোড়ালো প্রবন্ধ। তার ঐকান্তিক অনুরোধ আমি যেন কিছুতেই সেই ভুল রাস্তায় কক্ষনো পা না দিই। আর পা না দেবার জন্যে প্রায় পায়ে ধরে সাধার মতো আকুতি। শেষে লিখেছে, তবু যদি বিবাহ করা স্থির করি অন্তত কয়েকটা মাস যেন অপেক্ষা করি।

চিঠিটা আমি ছিঁড়ে ফেললাম। বিয়ে করলাম মাস দেড়েকের মধ্যে। তার এতো বছর বাদে এই সুদূর প্রবাসে তার যোগী-দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে আমার সত্যি বড়ো অবাক লাগলো। উৎসুক হয়ে বললাম, 'ওমা তাই নাকি ? কী আশ্চর্য ! বিনয় এখন কোথায় ? কেমন আছে ?'

উনি বললেন, 'ঐ তো কতো বছর হয়ে গেল একই অবস্থা।'

'কী হয়েছে ?'

'জানেন না ?'

'না তো।'

'ও তো বহু বছর যাবৎ পাগল হয়ে আছে।'

'পাগল ? সে কী !'

'ট্যালেনটেড ছেলে, আমরা কতো রকম আশাই করেছিলাম ওকে নিয়ে।'

'কোনো অসুখ করেছিলো ?'

'ঐ—চাকরি টাকরি পাচ্ছিলো না, পেলেও উচ্চাশার সঙ্গে মিলছিলো না, শেষের দিকে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। চুপচাপ অবশ্য চিরকালই। হঠাৎ একেবারেই সকলের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেললো।'

'ঈশ্‌শ্‌—', খাওয়া থেকে আমার হাত থামলো।

'আমার মা বাবা খুব কষ্ট পেয়েছেন তা নিয়ে।'

'হুঁ।'

'এর চেয়ে ওর মৃত্যু ভালো ছিলো।'

'হুঁ।'

এর পরে ভদ্রলোক প্রসঙ্গ বদলালেন। কবে এ দেশে কী ভাবে এসেছিলেন, সবিস্তারে সব বললেন। এই যোগ-ব্যায়ামের দীক্ষা তাঁর কোথায় এবং সেই শিক্ষা তাঁকে শরীরে মনে আর্থিক পরমার্থিকভাবে কতো সমৃদ্ধ করেছে তাও বললেন। আমি কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলাম না, ধরতে পারছিলাম না, কেবলি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে গিয়ে অনেক কাল আগের ক্ষণিক দেখা বিনয়ের চেহারার সঙ্গে এই ভদ্রলোকটিকে গুলিয়ে ফেলছিলাম। এত মিল যে কেবলি মনে হচ্ছিলো বিনয়ই বয়েস বেড়ে এই পরিণতি লাভ করেছে।

এক সময়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী বললো, 'সাচিন, সাচিন, (শচীন, শচীন) মিসেস বোসের তোমাকে খুব ভালো লেগেছে, কেবল তোমার দিকে তাকিয়ে দেখছে।'

আমি চকিত হয়ে বললাম, 'বিনয়ের সঙ্গে আপনার খুব মিল। আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনাকে দেখেই আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছিলো।'

'আমারও অচেনা লাগছিলো না। বোধহয় বিনয়ের কাছেই ছবি দেখেছি।'

'আমার ছবি বিনয়ের কাছে ?'

'ছোট্টো ছবি, কিন্তু বেশ পরিষ্কার।'

বিনয় আমার ঘরে ছিলো, হয়তো টেবিলের দেরাজে বা তাকের অ্যালবাম থেকে নিয়েছে।

বাংলায় কথা বলছিলাম বলে ভদ্রমহিলা হঠাৎ খুব রেগে গেলেন স্বামীর

উপর। মাতৃভাষায় কী যেন বললেন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গম্ভীর হয়ে ভদ্রলোকও সেই ভাষাতেই কী জবাব দিলেন রাগী ভঙ্গিতে। এর পরে মহিলা দুপদাপ পা ফেলে শোবার ঘরে চলে গেলেন। আমি আর বুদ্ধদেব অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম। ভদ্রলোক সেই অপ্রীতিকর আবহাওয়া হালকা করতেই বোধ হয় ভিতরে গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এলেন ছবি তুলবেন বলে। বললেন, 'আর যদি কখনো দেখা না হয়, ছবিটা দেখলে মনে পড়বে। আপনি মাঝখানে বসুন মিসেস বোস, আমি আর মিস্টার বোস দু পাশে।'

ক্যামেরা ঠিক করে দৌড়ে এসে বসতে না বসতেই তাঁর স্ত্রী ততোধিক দ্রুত পায়ে এসে বসে পড়লেন আমার আর বুদ্ধদেবের মধ্যে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বামীকে টেনে নিজের আর বুদ্ধদেবের মাঝখানে বসিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলেন। ক্যামেরার শব্দ হলো ক্লিক। শচীনের মুখ আগুনের মতো লাল।

এর পরে ভদ্রলোক আরো দু'বার চেষ্টা করলেন আমাদের দু পাশে নিয়ে বসতে, স্ত্রী দুবারই তা বিফল করে একবার আমাকে চুমু খেতে খেতে ছবি তুললো, একবার স্বামীর গালে গাল ঠেকিয়ে।

হোটেলে ফিরতে রাত হলো বেশ। শুয়ে পড়তে পড়তে বুদ্ধদেব মহিলাকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করলেন। আমিও যোগ দিলাম। কিন্তু মনটা থেকে থেকে বিনয়ের উপর গিয়ে স্থির হচ্ছিলো। বালিশে মাথা দিলেই বুদ্ধদেবের ঘুমিয়ে পড়া অভ্যেস, আমি একা অন্ধকারে জেগে রইলাম। ভারাক্রান্ত হৃদয় আরো ভারি মনে হলো, ঘুম আর এলো না সেই রাত্রে।

চেলসী হোটেলে এসে আমার কাজ অনেক কমে গেছে। সকালে সিগার মুখে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার-হাতে একটি নিগ্রো মেয়ে এক মুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢোকে, 'হাই ম্যাম' বলে সম্ভাষণ করে ঝপাঝপ কাজে লেগে যায়। দেখতে দেখতে সব ফিটফাট। ঝকঝক করতে থাকে জানালার কাঁচ, মেণ্টেলপীসের তাক, বইয়ের সেলফ, সোফার ঢাকনা, মেঝের কার্পেট, রান্নাঘরের উনুন, ক্যাবিনেটের খোপ, বেসিন, বাথরুম—বিছানায় টান টান হয়ে থাকে সুদৃশ্য দামী আচ্ছাদন, পর্দাগুলো পর্যন্ত টেনে-টুনে ঠিক করে দিয়ে যায়। তারই মধ্যে আমি যদি কিছু এনে দিতে বলি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে। অথচ প্রতিদিন তার অ্যাপ্রোন অকলঙ্ক। সাদা ধব ধব করে। খুব ফুর্তি, কাজ করতে করতে গান টানে। আমি তার ঘরের খবর নি, সে আমার।

নিগ্রোদের মধ্যে অবৈধ সন্তান বলে কিছু নেই। ওর বয়ান হলো, ভালো-

বাসার মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে জন্ম তো হবেই বাচ্চার, সে তো স্বাভাবিক। আর ভালোবাসা জিনিসটা তো কেউ ইচ্ছে ক'রে করে না, ভগবানই করান, তা নিয়ে মানুষের বলবার কী আছে? এই রকম অনেক বড়ো বড়ো কথা অনেক সহজ বুদ্ধিতে বুঝে নিয়ে সে বলে আমাকে। 'প্রথম যৌবনে এরকম দুটো একটা বাচ্চা হয়েই যায়।' একথা বলেই সে চোখ টেপে, 'হোয়াইটদের বুঝি হয় না? হতে দেয় না তাই। মেয়েরা যখন 'ম্যানের' সঙ্গে বেরোয় মায়েরা ব্যবহারের জিনিস দিয়ে দেয়। আমাদের মধ্যেও এসবের চলন হয়েছে এখন, কিন্তু আমার "গ্র্যাণ্ডি" বলে, সেটা অন্যায়। যে আসবে তাকে আসতে দিতে হবে। আমারও ওরকম একটা ছেলে আছে। সেটা আমার চৌদ্দ বছর বয়সে হয়েছিলো। লোকটা এতো পাজী! তখনি আর একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে লাগলো। ঘুরুক। আমার বেশী কষ্ট হয়নি। বাচ্চাটাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু আর বাচ্চা আমি করবো না। করবো, যদি কোনো 'হোয়াইট' পাই। কী সুন্দর হবে দেখতে।'

'এখনো বিয়ে করোনি?'

'করেছিলাম, বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।'

'আর করবে না?'

'পছন্দমতো পাচ্ছি কই। কতো ছেলের সঙ্গে কতো ডেইট করলাম, একটাকেও বেশিদিন ভালো লাগে না।'

'আসলে তুমি হোয়াইট না পেলে বিয়ে করবে না এই হচ্ছে কথা।'

'না, তা নয়।'

'বাচ্চা তো তুমি হোয়াইটেরই চাও।'

'বাচ্চা চাই, তার সঙ্গে বিয়ের কিছু যোগ নেই।'

ও থাকতে থাকতে যদি বুদ্ধদেব কলেজে চলে যান, তা হলেই এইসব আলাপ-আলোচনা চলে। পায়ের উপর পা তুলে সোফায় বসে, এক কাপ কফি খায় আর এইসব বলে। আমার একবার হার্লেম দেখার ইচ্ছে আছে শুনে নাক কুঁচকোয়, 'ন্যুইসেন্স। যেয়ো না, যেয়ো না।'

এর মধ্যে আমি একটা কাজ করে ফেললাম। আমি ফেললাম বলাটা ঠিক হলো না, বলা যায় বুদ্ধদেবই করে ফেললেন। আমাকে ভর্তি করে দিলেন ইউনি-ভারসিটিতে। বললেন, 'এখন তো তোমাকে মেইডই সব করে দেয়, শুধু দুটি রান্না। এদিকে চিঠি লেখা ছাড়া তো আর কোনো লেখাতেই হাত দিচ্ছ না।

বেকার বসে না থেকে দেখো না কেমন লাগে ছাত্রজীবন।' ভাবলাম মন্দ কী, সত্যিই তো ভীষণ একা একা থাকি, কলেজে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটবে। কিন্তু বয়েস ? আমার মতো বয়সে আবার কেউ ছাত্র হয় নাকি ?

কিন্তু ক্লাশে গিয়ে দেখলাম, হয়। আমার চেয়েও বেশী বয়সের ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোক অনেক আছে। কিন্তু মোটামুটি সবাই বিদেশী। জাপান জর্মান চীন ফরাসী রুশ—আসলে এটা একটা স্পেশ্যাল ক্লাশ। ভারতীয় ছিলো না, আমি যুক্ত হলাম। মাস্টারমশাই ঢুলে ঢুলে 'ক্যাথারিন ম্যানসফিলড' পড়াচ্ছিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, সম্ভাষণ করলেন, আমি দেরির জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইতে ঠাট্টা করে বললেন, 'তোমার দোষ না, ঘড়ির দোষ। বোসো।'

আমি যেন কোনো অভিনব বস্তু এইভাবে সবাই তাকিয়ে দেখছিলো আমাকে। আসলে পোশাক, সর্বত্রই এই লম্বা পোশাকের জন্য আমি প্রায় দর্শনীয়। সামনে কোনো আসন ছিলো না, পিছনের দিকে যাচ্ছিলাম, এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা জায়গা করে দিলেন তাঁর পাশে। পাশে বসা ছেলেটি চলে গেল পিছনে। মাস্টারমশাই বললেন, 'দ্যাটস রাইট।'

পড়াতে পড়াতে তাঁর হাসি হাসি চোখ সকলের দিকেই সমানভাবে পরিভ্রমণ করছিলো। মাঝে মাঝে রসিকতা করছিলেন, সিগেরেট খেতে খেতে ছাত্রছাত্রীরাও তার জবাব দিচ্ছিলো, লেখিকাকে নিয়ে নানান জিজ্ঞাসা এবং লেখা নিয়ে নানান উত্তর প্রত্যুত্তর ইত্যাদিতে ক্লাশটি ক্লাশের চেয়ে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র বলেই বেশী বোধ হচ্ছিলো। সবাই প্রফুল্ল, সবাই সপ্রতিভ। মাস্টারটি সরস।

ক্লাশের শেষে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। বললেন, 'তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, শুনেছি তুমি একজন লেখিকা। আজকে ক্লাশে তো কিছু বললে না।'

ক্যাথারিন ম্যানসফিলডের এই গল্পটা আমার পড়া ছিলো, প্রিয় গল্প। বললাম সে কথা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আরো দু-চারটে কথার পরে তিনি তাঁর পথে, আমি আমার পথে। প্রথম দিনের এই অভিজ্ঞতা আমার সুখকর শেষ দিন পর্যন্তও তা অটুটই ছিলো। তবে শেষ দিনটা বড়ো তাড়াতাড়িই এগিয়ে এলো।

বুদ্ধদেবের খুব কম ক্লাশ থাকতো, বোধহয় সপ্তাহে তিনদিন। ঠিক মনে নেই। বাদবাকি সময়গুলো আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ আর বক্তৃতায় ঠাসা। আমিও সর্বদাই সঙ্গী, ফলত কামাই। শহর থেকে বেরিয়ে গেলে তো কামাই বেশ

ভালোমতোই হতো, শহরে থাকলেও গরজের অভাবে অনেক সময় যেতে পারলেও যেতাম না। আসলে বাধ্যবাধকতা না থাকার দরুণ, গেলে গেলাম না গেলে না গেলাম ভাব। বেশী কামাইয়ের সম্ভবত ঐটাই মূল উৎস। এই বয়সে কি ঐসব ভালো লাগে? কিন্তু ঐ মাস্টারটির আমি সুনজরে পড়ে গিয়েছিলাম, তিনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করে 'রেগুলার' হতে বললেন। কেন সুনজরে পড়েছিলাম জানি না। ক্লাশে আমিই সবচেয়ে বোকা ছাত্রী ছিলাম। কোনো জিজ্ঞাসা বা কোনো উত্তর কিছুই সময়মতো আমার মুখে যোগাতো না। অথচ অন্যরা কতো চালাক-চতুর, মাস্টারমশায়ের কাছে তারা কতো সহজ, উত্তর প্রত্যুত্তরে কতো প্রত্যুৎপন্নমতি। ক্লাশে আমার সেটাও একটা শেখার বিষয় ছিলো। বাঙালী মেয়েদের অকারণ লজ্জা অহেতুক সংকোচ একটা রোগ। আমি সর্বতো-ভাবেই সেই রোগে ভুগছিলাম। উনি কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে আমি উঠে দাঁড়াতাম, সেটাও ঠিক রেওয়াজ নয় বোধহয়। অন্য ছাত্রছাত্রীরা বসে বসেই কথা বলতো। কিন্তু আমাদের অভ্যেস অন্যরকম। মাস্টারমশায় এই দাঁড়ানোর জন্য সব সময়েই আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতেন, 'তুমি বসেই বলো।' তবু বসা হতো না, না জেনে না বুঝেই দাঁড়িয়ে পড়তাম।

ক্লাশের বাইরে দেখা হলে তৎক্ষণাৎ থামতেন ভদ্রলোক। পিঠে চাপড় দিয়ে বলতেন, 'তুমি বড্ড লাজুক। কেন, আমি কি বাঘ ভালুক? না কি খুব রাগী রাগী?'

কামাইয়ের দিন সংখ্যায় বেশী হলে উনি বাড়িতেও ফোন করতেন, তখনো লাগসই জবাব দিতে না পেরে বিব্রত হয়ে পড়তাম। সংকোচ আর লজ্জা। কৈফিয়ত দিতে একেবারে প্রাণান্ত। শেষে একদিন ছেড়ে দিয়ে এই যন্ত্রণার অবসান ঘটালাম।

এই অবসানের জন্য অবশ্য আরো একটি কারণ সংযোজিত হলো। উপলক্ষ এক উকিল ভদ্রলোক। নাম ফ্রান্স জোসেফ। ইনি উকিলও বটে, একটি টেলি-ভিশন কোম্পানীরও অধিকর্তা। ব্যবসাটা এঁরই। আমাদের দেশে যেমন এই ধরনের বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবেই সরকারের অধীনে, ওখানে তা নয়। ব্যক্তিগতভাবে [illegible]ই সব কিছু করবার অধিকার অব্যাহত। অতএব এই রেডিও-টেলি-[illegible]যে-কোনো লোকের মালিকানায় সম্ভব হতে পারে যদি তার ক্ষমতা [illegible] ভদ্রলোকটি যে ক্ষমতাবান পুরুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। [illegible]র ইনি প্রথম শ্রেণীর কয়েকজনের একজন, বড়ো মহলে একবাক্যে

সকলেই তাঁকে চেনে জানে মান্য করে। মাননীয় হবার আরও একটি কারণ আছে। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ফিটজিরেল্ড কেনেডির আইন বিষয়ে তিনি একজন অন্যতম পরামর্শদাতা। মাসের মধ্যে পনেরো দিন ওয়াশিংটনে দৌড়োন। সময়ের অভাবে হাঁশফাঁশ করেন।

যথোচিত সম্মান মূল্যে বুদ্ধদেবকে তিনি তাঁর টেলিভিশনে দুদিনের জন্য দুটি প্রোগ্রাম দিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি বক্তৃতা, অন্যদিন একজন লেখক হিসেবে তাঁর সঙ্গে অন্য একজনের সাক্ষাৎকার। সেজন্য দুদিন একটু রিহার্সেলের জন্যও অনুরোধ। দুদিন নয়, রিহার্সেলের জন্য দিন তিনচারই যেতে হলো। সব মিলিয়ে ছেড়ে ছেড়ে ছদিন গেলেন, এই ছ'দিনই ভদ্রলোক বুদ্ধদেবকে নিজের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ালেন। নানা বিষয়ে উৎসাহ, ঔৎসুক্য, শিক্ষা, সবই আছে, পড়াশুনোও করেছেন। সাহিত্যপাঠেও দক্ষ। বুদ্ধদেবের খুব ভালো লেগেছিলো কথা বলে। আমি অবশ্য একদিনও যাইনি, ডাকেননি বলেই যাইনি। তা নইলে টেলিভিশনে কীভাবে কী করে সেটা দেখা বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো আমার। যেদিন বক্তৃতা সেদিন বুদ্ধদেব নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'তাতে কী? তুমি তোমার লাঞ্চ সেরে নাও, তা হলেই হবে।'

আমি বললাম, 'তা হয় নাকি? উনি তো জানেন আমিও আছি এখানে, ওঁদের রীতি অনুযায়ী মিস্টার আর মিসেসকেই তো ডাকা উচিত, যখন ডাকেননি তখন যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'কিন্তু ভদ্রলোক এমনিতে চমৎকার!'

আমি বললাম, 'তা হতে আর বাধা কী?' আমাকে নিমন্ত্রণ না করলেই কি অচমৎকার হবেন নাকি?'

কাজ-টাজ হয়ে যাবার পরে একদিন বুদ্ধদেব ওঁকে ডিনারে ডাকতে চাইলেন। বললেন, 'এতোদিন খাইয়েছেন, আমারও একদিন খাওয়ানো উচিত, কী বলো?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

'আলাপ হলে দেখো খারাপ লাগবে না।'

'তা কেন লাগবে?' আমি হাসলাম।

ভদ্রলোক আমাকে একদিনও নিমন্ত্রণ না করাতে যেন বুদ্ধদেবেরই লজ্জা।

ভদ্রলোককে ধরাই মুশকিল। কোথায় যে কখন থাকেন। অবশেষে পাওয়া গেল। নিমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশি হলেন। বাড়িতে শুনে আরো খুশি।

নির্দিষ্ট দিনে এলেন। আমার খুব কৌতূহল ছিলো দেখার। কেনেডির সঙ্গে সম্পর্ক শুনেই অবশ্য বেশী। এই ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষও জার্মানি থেকে আগত। সেই রকমই মস্ত বলশালী চেহারা। আমার সঙ্গে আলাপ হতে নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে হ্যাণ্ডসেক করলেন। বোসকে বোঁজে বলেন, ডকটরকে দকতর। জিবের এই দেশজ অক্ষমতা এতোদিনেও শোধন হয়নি।

বুদ্ধদেবের যদিও ডকটরেট ডিগ্রী নেই, কিন্তু ওদেশে সবাই ডকটর বোস বলে। বুদ্ধদেব সবিনয়ে এই অধিকার সর্বত্রই অস্বীকার করেন, এরা শোনে না। এই ভদ্রলোকও দেখলাম, তাঁর ব্যতিক্রম নন। নিদারুণ গম্ভীর চেহারা, কণ্ঠস্বর আরো খাদে, দৃষ্টি নিষ্কম্প। ঢুকেই বললেন, খুব তাড়া আছে, এমন সব দুর্দান্ত কাজ ঘাড়ে জোটে যে বন্ধুতা করার সময়টুকুও শূন্যের অংকে।

আমি তাড়াতাড়ি পানীয়ের সঙ্গে খুচরো খাবার এনে দিতে দিতে একটু ভয়ে ভয়েই বললাম, 'আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, আসা নিজের ইচ্ছে যাওয়া পরের ইচ্ছে।'

ভদ্রলোক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তার মানে আপনি যতোক্ষণে অনুমতি দেবেন আমি তখন যাবো?'

শুনেছি জার্মানদের রসিকতা জ্ঞান কম, ফ্রান্স জোসেফের মুখ দেখে আমার মনে হলো, এটা উনি নিয়ম অর্থাৎ 'কাস্টম' হিসেবেই বোধহয় ধরে নিলেন। ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'না না এটা কথার কথা।'

ভারি মুখে এবার একটু হাসলেন, বুদ্ধদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন দকতর বোঁজে, আপনার স্ত্রী কী রকম ভয় পেয়েছেন। ভাবছেন না বলা পর্যন্ত সত্যিই বুঝি যাবো না।'

দেখলাম একান্ত বেরসিক নন। এর পরে কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি, আমার স্ত্রীও একজন বিখ্যাত লেখিকা আমার চেয়ে ওর বইয়ের বিক্রি বেশী, পাঁচটা বই ফিল্ম হয়েছে, আমার একটাও হয়নি।' এই বলে খুব হাসলেন।

'সত্যি!' শুনে ভদ্রলোক এমনভাবে তাকালেন যেন এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার আর কিছু নেই জগতে।

খাওয়া-দাওয়া হলো, আমি কফি করে এনে দিলাম। যাবার জন্য তাড়া আছে ভেবে সবই ছুটোছুটি করে করতে হচ্ছিলো। কিন্তু ওঁকে বেশ নিশ্চিন্ত বলেই মনে হলো, কোট খুলে আয়াস করে বসলেন। ইংরেজরা কফি খায় ছোটো

চুমুকে ছোটো ছোটো কাপে। আমেরিকানরা কফি খায় বড়ো বড়ো মগে, খুব তাড়াতাড়ি। চুমুক দিতে গিয়ে একটু ছলকেছিলো প্লেটে, পাছে মূল্যবান জামা কাপড়ে দাগ লেগে যায়, সেজন্য একটা কাগজের ন্যাপকিন ভাঁজ করে প্লেটে পেতে দিয়ে তার উপর কাপটা রেখে বললাম, 'এইবার নিন।' এই কাজটা যে একটা অসাধারণ বুদ্ধির কাজ তা আমি কল্পনাও করিনি। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে মোহিত। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, এরকম খেয়াল নাকি ভারতীয় মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। এরকম আন্তরিক যত্ন এমন মনোযোগ এ নাকি তাঁর দেশে তাঁর জীবনে আর তিনি দেখেননি। উত্থানপতনহীন ঠান্ডা গলায় এইসব বলে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে এসে কোথায় কোথায় গিয়েছি কী দেখেছি আর দেখিনি।

বুদ্ধদেব বললেন, 'কোথাও যাওয়া হয়নি, ভাবছি এবার ধীরে ধীরে সব দেখে নেবো। আসলে ছুটির দিনগুলোতেও নানা ধরনের কাজ থাকে বলে ঘোরাঘুরির প্রোগ্রামটা পিছিয়ে যায়। অন্তত আর্ট গ্যালারিগুলো সময় করে দেখে নিতেই হবে।'

নোট বুক বার করলেন, বোধহয় কবে কোথায় কী আছে দেখলেন, বললেন, 'আমি কাল ওয়াশিংটন যাচ্ছি, ফিরে আসি, একটা মনস্টারিতে নিয়ে যাবো আপনাদের।'

'খুব ভালো।'

'এ শহরে আরো একটি অবস্কিওর মিউজিয়াম আছে, অনেকেই জানে না, কী সব সংগ্রহ। দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। আমি আপনাদের সেখানেও নিয়ে যাবো।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

উঠলেন, কোট গায়ে দিলেন, 'ভারি ভালো লাগলো আজ এখানে এসে। কতোদিন বাদে যে একটু আরাম করে বসলাম খেলাম তার ঠিক নেই।' বলতে বলতে বিদায় নিলেন।

তার দিন চারেক বাদেই কলেজে বুদ্ধদেবকে ফোন করে একদিন দ্বিপ্রাহরিক ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন আমাদের। এবং যেদিন যে সময়ে যেতে বললেন সেদিন সেই সময়টাতেই আমার ক্লাশ। আমি ভেবেছিলাম এবার থেকে ঠিকমতো যাবো। অন্তত যতোটা পারি। পরের সপ্তাহে বাইরে বক্তৃতা আছে বুদ্ধদেবের, সেখানেও একদিন কামাই হবে, আবার এখানেও হবার ব্যবস্থা হলো। একটু খুঁত খুঁত

করছিলো মনটা। আমার চেয়ে বুদ্ধদেবই শেষে অনেক বেশী দুঃখিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'ক্লাশের তারিখটা একেবারেই মনে ছিলো না নইলে অন্যদিন করা যেতো। এখন আর ফেরানোটা উচিত হবে না।'

কী আর করা! চুপচাপই থাকতে হলো। নির্দিষ্ট দিন সকালে আবার বাড়িতে ফোন করলেন ভদ্রলোক। আমিই ধরেছিলাম, গলা শুনেই বললাম, 'ফ্রান্স জোসেফ?'

গম্ভীর গলায় নিখাদে জবাব এলো, 'একসজ্যাকটলি সো। তা হলে ভোলেন নি।'

'বারে, ভুলবো কেন?'

'যদি অনেকদিন বাদে ভারতবর্ষে গিয়ে একদিন ফোন করি, এমনি করেই কি চিনতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'সেদিন আপনাদের বাড়ি গিয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিলো।'

'ওটা পারস্পরিক।'

'কাল আসছেন তো?

একটু চিন্তা করে বললাম, 'আমি ভাবছিলাম যে—'

'এটা নিশ্চয়ই খুব বেশী ভাবনার বিষয় নয়?'

'তাতো ঠিক।'

'তবে?'

'তবে কিছু নয়। উনি তো নিশ্চয়ই যাবেন। আমার বোধ হয়—'

'বোধ হয় কী?'

'যদি না যেতে পারি তাহলে কি—'

ফ্রান্স জোসেফের গলা তৎক্ষণাৎ অধৈর্য হলো, 'কেন পারবেন না? আপনি কি অসুস্থ হয়েছেন?'

'না।'

'যদি অসুস্থ না হন তাহলে অন্য কোনো কারণেই আমার নিমন্ত্রণ আপনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সে অধিকার আপনার নেই। আপনি নিশ্চয়ই আসবেন।'

আমি ফোনে এদের সঙ্গে কথা বলতে একেবারেই অভ্যস্ত নই। কান শুনতে ধান শুনি, তার মধ্যে এই গুরুগম্ভীর মাননীয় লোকটির ভারি কণ্ঠস্বর আমার

কাছে যেন অমোঘ আদেশ বলে মনে হলো। এরপরে কী বলবো ভেবে পেলাম না। বুদ্ধদেব নীচে গেছেন কী কাজে, আমি ঢোক গিলে থতোমতো খেয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তো যাবোই। আমি তো যাবোই।' তারপর ঠক করে রেখে দিলাম ফোন।

পার্টিটাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম এই নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে সত্যিই অত্যন্ত অভদ্রতা হতো। বিশেষত গ্রহণ করেছি যখন। ফ্রান্স জোসেফ খুব ভেবে-চিন্তে লোক ডেকেছেন এবং পার্টির নিয়ম অনুযায়ী যে ক'জন পুরুষ সে ক'জনই মহিলা। আমি না এলে সেই মহিলার আসনটি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করার জন্য যথাযোগ্য কারোকে তিনি পেতেন না। উপরন্তু সব ব্যবস্থাই একটি বহুমূল্য রেস্তোরাঁয়, সুতরাং একটা খাবারও নষ্ট হতো। যদি না আসতাম সে কথা ভেবে আমার লজ্জাই করছিলো।

যাঁরা এসেছেন সবাই স্বনামধন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতিমান। লেখক গায়ক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক অভিনেতা অভিনেত্রী ধনকুবের—কিছুই বাকি রাখেন নি। এমন কি একজন সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত রমণীকেও হাজির করেছেন। একে একে আলাপ করিয়ে দিলেন, 'অভিনেতা ফ্রীডেরিক মার্চ, দার্শনিক টিলিক, কবি ফলটুন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর গীমবলস্-এর কোটি কোটি ডলারের মালিক মিসেস গীমবল্, অভিনেত্রী মিসেস ফ্রীডেরিক, ডরোথী নরম্যান, একজন বিখ্যাত জাপানী কম্পোজার, একজন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক, সর্বশেষ স্প্যানিস সুন্দরী।'

দেখলাম ফ্রান্স জোসেফের অটুট গাম্ভীর্য কিছুটা টোল খেয়েছে। অতিথিদের মনোরঞ্জনার্থে নিজেকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করেছেন। বোধ হয় সেদিনের জন্যই বিশেষভাবে সুসজ্জিত লবি থেকে পরিচয় সেরে আমাদের খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমাকে ফলটুনের পাশে বসতে দিয়েছিলেন, অন্য পাশে নিজে। রসিকতা করলেন, 'তুমি না এলে এই দুই হতভাগ্যের কী হতো বলো তো ? তোমার বিকল্প আর কোন মহিলাকে আমি পেতে পারতাম ?'

ফলটুন ভুরু তুলে হেসে বললেন, 'সে-কী ! এ রকম কোনো সম্ভাবনা হয়েছিলো নাকি ?'

ফ্রান্স বললেন, 'প্রায় পনেরো আনি। আইনের মানুষ আইন দেখিয়ে জব্দ করলাম।' হাসলেন। তারপর নরম গলায় বললেন, 'সকালে আমার ব্যবহারটা খুব রুড মনে হয়েছিলো, না ?'

বুদ্ধদেবকে বসতে দিয়েছিলেন সেই সুন্দরীর পাশে। সুন্দরী জানে সে সুন্দরী এবং সে কথাটা সে এক বিন্দুও ভুলতে পারছিলো না। সেদিন সে সবুজ সুন্দরী হয়ে এসেছিলো, চুল সবুজ, চোখের পাতায় সবুজ, ঠোঁটেও সবুজ। আমি তাকাতে পারছিলাম না। খোদার উপর খোদকারী আমার ভাল লাগে না। অন্য পাশে ডরোথী। কবি ডরোথী নরম্যান বুদ্ধদেবের বিশেষ বন্ধু। সুন্দরীকে ভুলে তাঁর খেয়ালহীন স্বভাব অনুযায়ী তিনি ডরোথী নরম্যানের সঙ্গেই আলোচনায় মত্ত ছিলেন। আবার ডরোথীকে ডিঙিয়ে ফ্রীডেরিক মার্চের সঙ্গেও কথা বলছিলেন। এক সময়ে নাকি এই অভিনেতার ভীষণ ভক্ত ছিলেন তিনি। সুন্দরীর এ-পাশে বিখ্যাত শল্যচিকিৎসকটি যেমন সুশ্রী তেমনি স্মার্ট। দেখলাম, এটুকু সময়ের মধ্যেই দুজনের বেশ প্রেম প্রেম ভাব হয়ে গেল। এই নিমন্ত্রণে দম্পতির সংখ্যা কম। সকলেই প্রায় একা একা। ফলটুনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী নেই, ঐ শল্যচিকিৎসকের সঙ্গেও না, জাপানী কম্পোজারও একা। দার্শনিকও তাই, আবার ওদিকে মহিলাদের মধ্যেও ডরোথী নরম্যানের স্বামী নেই, মিসেস গীমবল্‌ও তাই, সুন্দরীও তো দেখছি একা—এতো সব একা পুরুষ, একা স্ত্রীলোক কোথা থেকে যোগাড় করেছেন ফ্রান্স জোসেফ কে জানে। নিজেও তো একা। জানতাম তিনি অবিবাহিত। ডরোথী নরম্যান বললেন, 'ও ফ্রান্স? ফ্রান্সের কোনোদিন বিয়ে হবে না। অমন একটা খুঁতখুঁতে লোক আমি জীবনে দেখিনি। কাউকেই তার পছন্দ নয়। কম্পিউটারে নামধাম দাওনা বাবা, তাতেও মান যায়।'

ফ্রান্স বললেন, 'ও আমার সুনয়না সখি ডরোথী, আপনি যা বললেন সব সত্য। ঝাঁপিয়ে পড়ার চাইতে আমি অপেক্ষায় বেশী বিশ্বাসী। তাছাড়া ভেবে দেখেছি, পেয়ে যাবার পরে বহুমূল্য সামগ্রীও একঘেয়ে লাগে, সেজন্য যা নিষিদ্ধ তার প্রতিই আমার আকর্ষণ।'

দূরে উপবিষ্ট দার্শনিক ভদ্রলোকটি পাকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে টেবিলে মৃদু চাপড় দিলেন। মিসেস গীমবলস্‌ তার আঙুল আর কানের হীরায় ঝিলিক তুলে বললেন, 'ঠিক ঠিক।'

এরপরে জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কেনেডি-নেহেরু-দ্যগল ইত্যাদি নিয়েও চর্চা চললো খানিকক্ষণ, শেষে এই লঘুগুরু চর্চার সঙ্গে যথেষ্ট গুরুভোজন সমাপ্ত করে সবাই গাত্রোত্থান করলেন।

যে পাড়ায় এই সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন ফ্রান্স জোসেফ, সে

পাড়াটিও আমাদের পক্ষে দ্রষ্টব্য। উকিলপাড়া এটা। বিরাট বিরাট সব গথিক স্টাইলের বাড়ি, সরু সরু রাস্তা। বাড়িগুলো উপরের দিকে কোনটাই চার-পাঁচতলার ঊর্ধ্বে দেখলাম না, কিন্তু কী চওড়া মজবুত ভারি চেহারা। আধুনিকতার সঙ্গে যেন চিরবিচ্ছেদ। গম্ভীর, সম্ভ্রান্ত, কর্তা-কর্তা ভাব। গলির মতো সরু রাস্তাগুলো পীচ বাঁধানো নয়, মুখে মুখে সিমেণ্ট দিয়ে পাতলা পাতলা ছোট ছোট ইঁটে গাঁথা। একশো বছরের ইঁটগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে মসৃণ মেঝের মতো হয়ে গেছে। রঙ টুকটুকে লাল। চারপাশে শুধু কোর্ট-কাছাড়ির বাড়ি, বাড়িগুলো এমনভাবে একাত্ম, অর্থাৎ একটুও ফাঁক না রেখে লাগিয়ে লাগিয়ে তৈরি যে কোথাও কোনো ফোঁকরেই আলোর প্রবেশ নেই, শুধু মাথার উপর থেকেই যেটুকু আসে, তাও এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছায়ায় আচ্ছন্ন। রাস্তাগুলো বাড়িগুলোকে শাড়ির মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ কোন একদিক দিয়ে বেরিয়ে সূর্যালোকে ঝলসে গেল চোখ। সামনেই হাডসন নদীর বিস্তার। আর কী জোর হাওয়া! কী আশ্চর্য! কী সুন্দর।

এই চৌহদ্দীর মধ্যেই সারাদিন ঘুরপাক খান ফ্রান্স জোসেফ। বিদায় দিতে রাস্তা পর্যন্ত এলেন, হাতে চুমু খেয়ে বললেন, 'ইচ্ছে করছে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি। উপায় নেই। এক্ষুণি কোর্টে ঢুকতে হবে। ফ্রেডেরিক পৌঁছে দেবে।'

সেই পার্টির দু-চারদিনের মধ্যেই ডেলামেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেবের বক্তৃতা ছিলো। নিউইয়র্ক থেকে মাত্র দুঘণ্টার পথ। একটি নেহাতই ক্যাম্পাস-সম্বলিত উপকণ্ঠ শহর। এরা এসব জায়গাকে 'ভিলেজ' বলতে ভালোবাসে। বোধহয় 'ভিলেজ' যে কী বস্তু তার কোনো সংজ্ঞা নেই বলে। আমি আমেরিকার উনকোটি চৌষট্টি আনাচ কানাচ নিশ্চয়ই দেখিনি কিন্তু পৃথিবীর এই বিশিষ্ট দেশটির বৃহৎ ভূখণ্ডের অনেক ক্ষেত্রেই ঘোরাঘুরি করার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু গ্রাম কোথাও নেই। সেখানেও ক্ষেতে খামারে ট্র্যাকটার চলে, বিদ্যুৎবিহীন রাস্তা নেই, লোকেরা গাড়ি চড়ে বেড়ায় এবং সর্বত্রই স্কুল কলেজ আছে। একবার এই রকমই একটা ছোটো শহরে বছরখানেক ছিলাম, একটি মহিলা সমিতি ছিলো সেখানে। আমাকে একদিন নিয়ে গেলেন ওঁরা, অনেক আদর-আপ্যায়নের পরে যে মহিলা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এলেন, গাড়ি চালতে চালাতে বললেন, 'আমার নিজের বাড়ি এই ক্যাম্পাস থেকে মাইল দশেক দূরে, কিন্তু আমি এখানেই থাকি, এই ইউনিভার্সিটির

কাছাকাছি থাকতেই আমার ভালো লাগে। আমার স্বামীও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক ছিলেন, বিজ্ঞানের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাই এ অঞ্চল আর ছাড়তে পারি না। তিনি মারা যাবার পরেও বাড়ি ছাড়িনি, একাই বাড়িতে আছি।'

মহিলাটি বয়স্ক, দেখতে খুব ভালো নন, কিন্তু বিদুষী, কথাবার্তা অত্যন্ত নরম কোমল। পাকা সোনা রঙের ঘন চুলে সাদার ছোপ আট আনি। সেজেছেন সুন্দর করে। গলায় মোটা মুক্তার মালা ছাড়া অবশ্য অন্যত্র গয়না নেই, কিন্তু মুখে চোখে অনেক কারুকার্য। তাতে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। এদের বেঁচে থাকার এই ভঙ্গিটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। 'কে কার, কে আমার' এই দেহতত্ত্ব আউড়ে এরা নিষ্ক্রিয় থাকতে জানে না। যতোক্ষণ বেঁচে থাকে বাঁচবার মতো করেই বাঁচতে চায়। সেই বাঁচার জন্য এরা নিত্য নব উদ্ভাবনে, উৎপাদনে অবিরাম তৎপর। তার আয়োজনে এদের ক্লান্তি নেই। দেহের লালনে পালনে যত্নে এবং সুখ-সুবিধা বিধানে একান্তই অধৈর্যহীন।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'কিন্তু রোজ একবার ঠিক চারটার সময় যেতে হয়, আমাদের কেক-পেস্ট্রির কারখানা আছে কি না সেখানে।'

আমি বললাম, 'আপনিই সব দেখাশুনো করেন ?'

'না, দেখাশুনো আর কি—'

'লোকজন তো খাটে—'

'একজনই মাত্র লোক আছে, কেয়ারটেকার মতো—'

'সে একা সব তৈরি করে ?'

'সে কী তৈরি করবে ?' ভদ্রমহিলা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আমিও অবাক হয়ে বললাম, 'তবে কে তৈরি করে ?'

তিনি আবারো বললেন, 'কী তৈরি করবে ?'

'বললেন যে কেক-পেস্ট্রির কারখানা আছে।'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে ওর কী ? ওসব তো মেশিনে হয় ?'

'মেশিনে ? কোনো লোক দরকার হয় না ?'

'জিনিসগুলো দিয়ে মেশিনটা একবার চালিয়ে দিতে হয় অবশ্য, কতোক্ষণ চলবে তার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, সে জন্য একটু সাবধানেও থাকতে হয়। সব নিজে থেকেই বেরিয়ে আসে ট্রেতে।'

'মাত্র এই ? আর কোনো লোকজন লাগে না ?'

'তোমাদের এই কলেজের সব ক্যানটিনে ঐ কেক-পেস্ট্রি। এতো সাপ্লাই মানুষের হাতে সম্ভব নাকি?'

আমি হতবাক। এই হচ্ছে নিবিড়তম গ্রাম, যেখানে রান্নার কারখানায়ও মেশিন ফিট্ করা।

'দেখবে একদিন? যাবে সেখানে?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই আমি কেক-পেস্ট্রি তৈরির মেশিনটা দেখবো।'

এরপরে ভদ্রমহিলা আমাকে আরো হতচকিত করে বললেন, 'ব্যবসাটা আমার স্বামীর, উনি অনেকদিন থেকেই এটা চালাচ্ছেন। তাছাড়া এই ইলিনয় স্টেটে ওঁর দুটো ভুট্টো ক্ষেতও আছে। তেল হয় প্রচুর—'

ভদ্রমহিলা এইমাত্র বললেন—তাঁর স্বামী এই বিশ্ববিদ্যালয়েই বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তারপর বললেন, মারা গেছেন। এখন বলছেন—

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন, হেসে বললেন, 'মিঃ হে আমার দ্বিতীয় স্বামী, এই বছরখানেক আগেই আমি তাকে বিয়ে করেছি।'

আমার পক্ষে এটাও একটা বিস্ময়। কেননা ভদ্রমহিলার বয়েস অন্তত ষাট।

'মিঃ হে আমার স্বামীর আবাল্য বন্ধু, স্কুল-কলেজে এক সঙ্গেই পড়াশুনো করেছেন। এঁর স্ত্রীও আমার খুব বন্ধু ছিলো। আমরা চারজন সব সময়েই একসঙ্গে ঘুরতাম, বেড়াতাম, পিকনিক করতাম, দেশ ভ্রমণে যেতাম। কয়েক বছর আগে যখন আমার স্বামী মারা গেলেন, আমাকে ওঁরাই একা হয়ে যেতে দেননি। এমন দুর্ভাগ্য ওঁর স্ত্রীও মারা গেলেন কিছুদিনের মধ্যে। তখন আমরা দু'জনই দু'জনের সঙ্গী, বন্ধু। বিয়ে করার কথা আমি ভাবিনি। মনে হয়নি কখনো। একবার খুব অসুখ করলো আমার, সেবা-শুশ্রূষা ডাক্তার দেখানো ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য করানো সব করতে হলো এঁকে। আর তো কেউ নেই যে দেখে? ভালো হয়ে ওঠার পরে মিঃ হে বললেন, রুটা তুমি আমাকে বিয়ে করো।'

আমি বললাম, 'কেন?'

'বয়েস অল্প থাকলে এ প্রশ্ন উঠতো না, কিন্তু আমরা দু'জনেই প্রায় বৃদ্ধ, একে অপরের সম্বল হলে কারোকে আর একা ঘরে মরে পড়ে থাকতে হবে না।'

কথাটা আমার খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। তবু বললাম, 'এই তো বেশ আছি। আপনি আমাকে দেখছেন, আমি আপনাকে দেখছি। তখন উনি

বললেন, পরের স্ত্রীকে এভাবে দেখাশুনো করার অনেক অসুবিধে, লোকেরা নিন্দে করে। তোমার পক্ষেও পরের স্বামীর সঙ্গে রাত্রিযাপন সুদৃশ্য নয়। তাছাড়া একটা অধিকারেরও প্রশ্ন আছে তো ? আমি জোর করছি না, তুমি ভেবে-চিন্তে আমাকে জবাব দিও। ছেলে-মেয়েকেও লিখে জানাতে পারো।'

'আপনার ছেলেমেয়ে আছে ?'

'একটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলে মিলিটারিতে কাজ করে, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, নিজের পরিবার নিয়েই ব্যস্ত, আমাকে কখন দেখবে, বলো ? দু বছরে একবার দেখা হয় না। মেয়ে ডেনমার্কে থাকে, স্বামী ডাক্তার, তার সঙ্গে যে কদ্দিন দেখা হয় না—', নিঃশ্বাস ছাড়লেন একটা। তারপর কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো। বাড়ির দরজায় এসে পড়েছিলাম, বিদায় নিতে হলো সেদিনের মতো।

রাত্রিবেলা খাবার টেবিলে মহিলাটির কথা বললাম বুদ্ধদেবকে। শুনে বললেন, 'এইজন্যই তো এত ভালোবাসি এই দেশটাকে। কোথাও কোনো ন্যাকামি নেই, দেখানোপনা নেই, অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে থাকা নেই। কতো রিজনেবল। আমরা তো লোকলজ্জার ভয়ে মরে যাবার অনেক আগেই মরে থাকি।'

ডিলাওয়ারে আমাদের যিনি স্টেশনে নিতে এসেছিলেন, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজির অধ্যাপক ডক্টর ডে। নামতেই দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন। অচেনা অজানা অতিথির প্রতি এই ধরনের আবেগপূর্ণ সাদর অভ্যর্থনা বোধহয় আমেরিকানদের পক্ষেই সম্ভব। আপন হয়ে উঠতে আর দেরি হয় না। গাড়ি করে নিয়ে আসতে আসতে কতো ভাবে যে কতো খুশি জানালেন তার ঠিক নেই।

স্টেশন থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব পনেরো মাইলের মতো। নদীর তলা থেকে উঠে এসে আকাশের অনন্ত বিস্তারের দিকে তাকিয়ে মন জুড়িয়ে গেল। সুন্দর শহর। ছবির মতো সাজানো। সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢালু জমি থেকে একটু উঁচুতে নিচু নিচু সব ঢালু কটেজ, পাশে পাশে ওক মেপলের বীথি। ঝকঝকে দিন। আমাদের নিয়ে তিনি একটি বাগানঘেরা বাড়িতে গাড়ি ঢোকালেন। এই বাড়িতেই আমাদের অবস্থান। বাড়িটি মস্ত, নিচের অপেক্ষা, গৃহটি আধুনিকতম পদ্ধতিতে সুসজ্জিত, দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘেঁষে

দুটি ঘরের একটি অ্যাপার্টমেণ্টে নিয়ে এলেন আমাদের। ঘড়ি দেখে বললেন, 'একটু হাতমুখ ধুয়ে নিন, তারপর আমার ওখানে চলুন, আমার মেয়ে চা নিয়ে অপেক্ষা করবে। আপনাদের দেখবার জন্য সে অস্থির হয়ে আছে। আমি নিচে বসছি।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা নেমে এলাম। ভদ্রলোকের বাড়ি এসে পেঁছুতে আর মিনিট চারেক লাগলো। বুদ্ধদেব চায়ের জন্য তৃষিত হয়ে উঠেছিলেন। দেখা গেল তৃষ্ণা মেটাবার সরঞ্জাম একান্তভাবেই প্রস্তুত। স্ত্রী অনুপস্থিত, কোনো কারণে শিকাগো গেছেন, ষোলো সতেরো বছরের তরুণী কন্যাই হস্টেস। সে একেবারে ছটফট করছে অতিথিদের জন্য। আমাদের দেখে আহ্লাদে আটখানা। পাতলা পাতলা সোনালী চুল ছেড়ে রেখেছে পিঠে, খালি পা, তালিমারা ডাঙ্গেরিজ পরনে, উপরে হানিকম করা পেট দেখানো সাদা ব্লাউজ। সদ্য সদ্য বড়ো হয়ে ওঠা শরীর সতেজ সাবলীল, চোখে মুখে খুশির শেষ নেই। কথায় পঞ্চমুখ। তার মা যে এইরকম একটা উৎকৃষ্ট টিপার্টিতে যোগ দিতে পারলো না, এই রকম আশ্চর্য পোশাক পরা একজন অপরূপ রমণীকে দেখলো না, তার জন্য অনেক চুকচুক করলো। তারপরেই বললো, মা না থেকেই ভালো হয়েছে, তা নইলে সব কথা মা-ই বলতো তার আর বলার অবকাশ ঘটতো না। তাছাড়া অতিথিদের কি এরকম সর্বতোভাবে সে পেতে পারতো?

ডক্টর ডে বনেদী বংশের ছেলে, এটা নিজেই তিনি গর্ব করে বললেন। এই সুন্দর দোতলা কটেজটি তাঁর নিজের, এর প্ল্যানও তাঁর নিজের। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। আর যেহেতু তিনি বনেদী মানুষ সুতরাং 'অ্যাণ্টিকে' বাড়ি তো বোঝাই করতেই হবে। আজকের জিনিস কালকেই 'জাংক' বলে বর্জন করলেও অ্যান্টিক বায়ুতে আমেরিকানরা তখন রীতিমতো জর্জরিত। ভারতবর্ষে যখন আসে এরকম অ্যাণ্টিকই খুঁজে বেড়ায়। তার ফলে দোকানদারেরা পরিষ্কার জিনিসে কালিঝুলি মাখিয়ে 'অ্যাণ্টিক স্যার, অ্যাণ্টিক স্যার' বলে চ্যাঁচাতে থাকে।

ডক্টর ডে-ও ঐ 'অ্যাণ্টিক' বাতিকে শোবার ঘরে পিতামহীর কারুকার্য খচিত খাট পেতে রেখেছেন, পিতামহের পিতার আমলের মোড়ানো পায়ার কর্ণার সেলফ রেখেছেন, ভারি মেহগনির আঙুরলতা আলমারি রেখেছেন, সোনার জল করা ফ্রেমে বাঁধানো প্রমাণ সাইজ আয়নাটিও শোভা পাচ্ছে কোণের দিকে। মাথার উপর কাটগ্লাসের আলো। জিনিসগুলো যে কী সুন্দর, কী মহার্ঘ! অ্যাণ্টিক বাতিক এখানে খুবই সহায়ক হয়েছে বলেই বোধ হলো।

আমেরিকার কাচের বাসন বড়ো মোটা সোটা, বড়ো কেজো চেহারার। কিন্তু আমাদের যে বাসনে চা খাওয়াচ্ছেন সব অত্যন্ত শৌখিন, রসুনের খোসার মতো পাতলা, মেইড ইন ইংল্যান্ড। আরো আছে। পারস্য গালিচা, চীনে লণ্ঠন, সিংহাসন চেয়ার, পোর্সেলিনের বাতিদান, আপাদমস্তক ছবি আঁকা কাচে মোড়া শো কেইস। সব অ্যান্টিক !

চা শেষ করে গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সঙ্গে যাবে বলে প্রস্তুত হয়ে এলো মেয়েটি। ডিনার সেরে তবে বক্তৃতা। ডিনারের ব্যবস্থা অন্যত্র ছিলো। বাইরে বেরিয়ে দেখি আকাশে একখানা সোনার থালা। ক্যাম্পাসের মাঠ ঘাট বাড়ি বন উপবন ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। চুপচাপ শান্ত শহর যেন সমর্পিত হয়ে নিথর শান্তিতে নিমজ্জমান। সিরসির হাওয়া দিল একটু, চেরি আর মেপলের শুকনো পাতাগুলো গানের সুরে উড়ে গেল এদিক-ওদিক, গাছের ডালে পাখি ডাকলো একটা, একটা গাড়ির আলো এসে চোখে লাগলো, কোথায় কোন্ কটেজ থেকে একটু পিয়ানোর টুংটাং ভেসে এলো, আবার চুপ।

বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোনো বড়ো খাবার ঘরে ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছে। অধ্যাপকরা সমবেত হয়েছেন সেখানে, সেখানেই আমাদের পারস্পরিক আলাপের ব্যবস্থা। বসলেন সবাই, টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটার মতো নিচুগলায় আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। সবই সাহিত্য ঘেঁষা, ঘুরে ফিরে বুদ্ধদেবের পক্ষে অনিবার্য উত্তরণ রবীন্দ্রনাথ, এটা সকলকে বোঝানো দরকার, সেই আশ্চর্য পুরুষই আমাদের বর্তমান ভারতীয় জীবনের জনক, আমরা তাঁর ভাষায় বলি, তাঁর শিক্ষায় চলি, আমাদের শয়ন স্বপন জাগরণ তাঁতেই আচ্ছন্ন।

এসব কথা বলতে বলতে বুদ্ধদেব চিরকালই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কলকাতায় আমাদের দুশো দুই নম্বরের বাড়িতে তরুণ কবিদের সঙ্গে এ-বিষয়ে সামান্যতম মতভেদেও তাঁর উষ্মা তাঁর কণ্ঠস্বরকে সর্বোচ্চ গ্রামে নিয়ে যেতো। এখানে মতবিরোধের প্রশ্ন নেই, কেননা তিনি বক্তা এঁরা শ্রোতা। সুতরাং গলা চড়লো না কিন্তু উত্তেজিত ঠিকই হলেন। আসল বক্তৃতা আটটায় ছিলো, গিয়ে দেখা গেল প্রেক্ষাগৃহ ছাত্রছাত্রী, মাস্টার, মাস্টারনী, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সাহিত্য অনুরাগীতে পরিপূর্ণ। নিজের সেই উত্তেজিত বিশ্বাসকে তিনি তাদের সকলের মধ্যেই সংক্রমিত করতে পেরেছেন বলে বোধ হলো। বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পরেও প্রশ্নের ঝড় এবং তার উত্তর-প্রত্যুত্তরের ক্রমবিকাশ সময়কে অনেকদূর নিয়ে গেল। তাছাড়া এই উপকণ্ঠ শহরে, এই আসরে আমাদের এমন

দু-চারজন লোকের সঙ্গেও দেখা হলো, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন। এমন লোকের সঙ্গেও দেখা হলো যাঁদের মন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সচেতন ও স্বচ্ছ। আমার খুব গর্ববোধ হলো। ঠিক মতো বোঝাতে পেরে বুদ্ধদেবও খুব খুশি।

সভা ভাঙার পরে ডক্টর অ্যালেন নামে এক অধ্যাপক আমাদের তাঁর নব-নির্মিত একটি অদ্ভুত বাড়িতে নিয়ে এলেন। নির্জন জায়গা রাত বেড়ে ওঠায় আরো নির্জন লাগছিলো, কিন্তু বাড়িটিতে দেখলাম বেশ জনসমাগম হয়েছে। এবং সকলেই অপেক্ষমান। আসলে এখানে একটি নৈশ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন ভদ্রলোক। আমাদের দেখে সবাই সমবেতভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। ঘরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। ভদ্রলোকের স্ত্রী হাসিমুখে ঠিক প্রজাপতির মতো ফুর-ফুর করে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আমি তো বক্তৃতা শেষ হতে তবে এসেছি, তারপরে এতোক্ষণ দেরি হলো তোমাদের?'

ভদ্রমহিলার গলায় দেখলাম চওড়া পাথর খচিত এক সোনার নেকলেস। দেখে আমি অবাক। এখানে তো সোনা কেউ পরে না। সোনার গয়না বলতে চোদ্দো ক্যারেট ছাড়া নেইও কিছু। তার উপরে এই বঙ্গডিজাইন!

বঙ্গডিজাইনই বটে। কলকাতা থেকেই কিনেছেন। স্বামী-স্ত্রী বেশ কয়েক বছর ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে কাটিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষ বলতে অজ্ঞান। কলকাতায় অনেকদিন ছিলেন। বললেন, 'আমার বাড়িটা দেখুন না, আপনাদের দেশ দিয়েই তো ঘেরা।'

আমাদের দেশ দিয়ে ঘেরা বাড়ি যে এমন অভিনব, এমন সুন্দর এবং স্থাপত্যের এমন উৎকৃষ্ট চেহারা নিয়ে সৃষ্ট হতে পারে সে কথা চোখে না দেখলে স্বপ্নেও ভাবা যাবে না। ঢুকতেই ঢালু ছাদ ঘর থেকে বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত নেমে এসেছে টুপির মতো। দুপাশে জাফরি কাটা দেয়াল, বাঁদিকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। কংক্রীটের সিঁড়ি নয়, গতানুগতিক কাঠেরও সিঁড়ি নয়, একেবারে আস্তো গাছ পাতা পাতা সিঁড়ি। একটি মোটা গাছকে মাঝখান দিয়ে ফেড়ে চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হয়েছে মাপ মতো। গাছের বুক যে কী সুন্দর সেটা এভাবে না দেখালে দেখা সম্ভব নয়। কতো বছরের কতো ঋতুর কত দাগ সেই বুকে ছবি এঁকেছে তার হিসেব নেই। সিঁড়ি বেশ প্রশস্ত। দুদিকের দুটি অবলম্বনও দুটি চেরা গাছে, অন্য রংয়ের। বলা যায় গাঢ় হলুদ, অনেকটা আমাদের কাঁঠাল কাঠের মতো। সিঁড়ির কাঠটা লালে হলুদে কালোয় সবুজে নানান দাগে চিত্রিত, এটা এক রঙ। আমি 'কাঁঠাল কাঠের মতো' বলায় ভদ্রলোক

একেবারে উৎসাহে টগবগ করে উঠলেন, 'ঠিক! ঠিক বলেছেন আপনি। আপনাদের দেশে কাঁঠাল কাঠ একটা আশ্চর্য সুন্দর কাঠ। এ তো সেই কাঠই। সিজন করা হয়েছে।'

'এই কাঠ কি এখানেও জন্মায়?'

'না না। কিছু লগ ভাসিয়ে আনা হয়েছিলো। সবচেয়ে শক্ত আর মসৃণ কাঠ।'

অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের দেশে কাঁঠাল কাঠের কোনো মর্যাদা নেই। কেবল পিঁড়ি বানায় তাতে। আসবাবপত্রও বানানো হয় না, দরজা জানালাও বানানো হয় না। সবাই বলে ঘুণ ধরে, ফুলে ওঠে, ফেঁপে যায়। ইনি অনেকক্ষণ কাঁঠাল কাঠের ইতিবৃত্ত বললেন। আমেরিকায় যে শীগ্গিরই এই কাঠের দারুণ কদর হবে, ব্যবসায়ীরা উঠে পড়ে লাগবে আমদানী রপ্তানির কাজে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দু-একজন বণিক নাকি আরম্ভও করে দিয়েছেন। আর এই ধরনের গাছ পাতা সিঁড়ি তো তিনি ভারতবর্ষেই প্রথম দেখেন। গরীবরা গাছ কেটে কেটে এভাবেই সিঁড়ি তৈরি করে মাটির দোতলায় উঠে যায়। তবে তারা এতো মোটা গাছ তো কাটতে পারে না, ছোটো গাছ আস্তো আস্তো পাতে, সিঁড়ি হয় গোল গোল। গোল গোল আর খাড়া খাড়া। উনি সেটাকেই সংস্কৃত করে এই চেহারা দিয়েছেন। আর এই জাফরি, এওতো ভারতীয়। মুসলমানী স্থাপত্য।

সিঁড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, বিশাল মাঠের মতো ঘরের মাঝখানে যে একটি বিশাল গোল মিনেকরা পিতলের টেবিল রয়েছে, সেটিও যথেষ্ট দ্রষ্টব্য। বললেন, 'এটা জয়পুর থেকে কিনেছি। আর এটা রাজস্থানী ঝুলা।' রঙিন ঝুলাটিতে বসে একজন তন্বী মেমসাহেব দুলছিলেন, তিনি হেসে হেসে উঠে দাঁড়ালেন। আরো কাছে, ম্যাণ্টলপীসের উপরে সোনার মতো করে মাজা মস্ত মোটা পিতলের কলসীটি প্রায় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সেই কলসীটিকে ইনি টেবিলল্যাম্পে পরিণত করেছেন। মাথার উপরে বিসকুট রঙের র-সিলকের মণ্ডলাকৃতি ঢাকনা পরানো। আসবাবপত্রও সব অন্যরকম। মোটা গাছের গোড়াগুলো পেতে হরেক রঙের কুশান শোভিত আসন হয়েছে। সেটাও নাকি ভারতীয় স্টাইল। পাঞ্জাব অথবা রাজস্থানে কোথায় নাকি দেখেছেন, মাঠের মধ্যে গাছের তলায় এই রকম গাছের গুঁড়ি পেতে পেতে বাড়ির কর্তারা আসর জমান। এর উপরে মাচিয়া মোড়া সিংহাসন চেয়ার, নিচু পায়ার

চারকোণা তক্তায় ফরাস, এসব তো আছেই। আর আছে একটি রঙিন বাগান। ঘরের মধ্যেই নানান বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রোদের বিকল্প দিয়ে ফুল ফোটানো হয়েছে, ফল ধরানো হয়েছে। লতা গাছের ফল।

ঐ একটি প্রকাণ্ড হলকেই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিভিন্ন রংয়ের পর্দায় ভাগ করে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ঘরে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন খাবার ঘর, রান্নাঘর, অতিথি কক্ষ। অতিথি কক্ষটি অবশ্য তিন সিঁড়ি উঁচুতে। মাটির খাঁজ কেটে কেটে সেই সিঁড়ি, রঙিন পাপোশ মোড়া। মেঝের কার্পেটটা কাশ্মীরী। দেয়ালের ফোকরে ফোকরে কুলুঙ্গি, কুলুঙ্গি ভর্তি সব ভারতীয় পুতুল আর বই।

মিসেস অ্যালেন কফি নিয়ে এলেন, সঙ্গে ঘরে তৈরি কেক বিস্কুট, অ্যাপেলপাই দুধ মদ আইসক্রীম। সব চলতে লাগলো একসঙ্গে। ডক্টর অ্যালেন ঘোষণা করলেন, আজকের এই আসর আমাদের কবিতা পড়বার আসর। কুলুঙ্গি থেকে গীতাঞ্জলি নিয়ে এলেন একখানা। বুদ্ধদেবকেই পড়তে দেয়া হলো। সেই সঙ্গে বাংলাটাও শুনতে চাইলেন সবাই। একজন কবিও উপস্থিত ছিলেন সেখানে, অতি নিরীহ চেহারা, অত্যন্ত শান্ত, কথা বলার সময় একটু তো-তো-করেন। তিনিও তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন, তারপরে একখানা গান, কিছু হাস্য পরিহাস এবং প্রশংসার আদান-প্রদানের পরে ভাঙলো আসর।

আমাদের হোস্ট ডক্টর ডে আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। গাড়িতে আসতে আসতে বললেন, 'এই যে কবিটি দেখলেন ইনিই কিন্তু সেই মানুষ, এজরা-পাউণ্ডের যিনি সমস্ত নিগ্রহের মূল।' আমরা চমকে উঠলাম। এজরা পাউণ্ডের এই নিগ্রহ নিয়ে তখন সারা পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন। দেশদ্রোহিতার সন্দেহে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে পাগল বলে পাগলা গারদে ঢুকিয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্কে পাগলদের সঙ্গেই বাস করতে হচ্ছে তাঁকে। অসহ্য কষ্ট, অসহ্য জীবন। তাঁর স্ত্রীর একাধিক চিঠি একাধিকবার জল এনে দিয়েছে বুদ্ধদেবের চোখে, গতবার যখন বিদেশে এসেছিলেন, সেই পাগলা গারদে গিয়েই দেখা করেছিলেন, মাঠের রোদ্দুরে কয়েক ঘণ্টা কেটেছিলো তাঁর সঙ্গে, তাঁর স্ত্রী নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই যাবার অনুমতি মিলেছিলো। অত বড়ো একজন মানুষকে ঐ ভাবে দেখে আসার স্মৃতি তখনো দগদগে ছিলো বুদ্ধদেবের মনের মধ্যে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর একটাও কথা বলতে পারলেন না। মনের ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করে ডক্টর ডে-ই অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে করতে বললেন, 'তা বলে ভাববেন না এ দেশের সকলেই এটাকে সমর্থন করে। আমরা, বিশেষভাবে আমি তো এর ঘোরতর বিপক্ষে।'

রাত বেশ বেড়ে উঠেছে, সন্ধ্যাবেলার চাঁদ প্রায় ডুবন্ত, একতলা দোতলা সব কটেজ নিয়ে উঁচু-নিচু ঢালু মাঠ ক্যাম্পাস নিশীথরাতের কোলে নিদ্রামগ্ন, আমাদের নামিয়ে দিয়ে কাল সকালে কখন আসবেন জিজ্ঞেস করে চলে গেলেন ডক্টর ডে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বুদ্ধদেব দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'যদি আগে জানতাম—'

আমি মনে মনে বললাম, 'জানলে আর কী হতো, কিছুই হতো না। এসবের বিরুদ্ধে কখনোই কিছু হয় না। আমরাও কি এই ধরনের কলাকৌশল শত্রুতার মুখোমুখি হই না অকারণে? কী করতে পারি?'

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে ক্লাশটায় ভর্তি হয়েছিলাম, সেটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা বিশেষ কোর্স। কোর্সটা শেষ করতে পারলে, পরীক্ষা হয়, পাশ করতে পারলে একটা ডিগ্রী দেয়। ভর্তি হবার সময়ে ডিগ্রী দেবার কথাটা জানতাম না, কিন্তু জানবার পরে একটু আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিলো। ঐ ছাপটা গলায় লটকাতে আমি প্রলুব্ধ হচ্ছিলাম। তার কারণ আমার একটি স্কুল, যার পরিধি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত, নাম শিশুবিতান। অনেক আদর্শ মনে রেখে শিশুদের জন্য এই বিদ্যালয়টি আমি স্থাপন করেছিলাম। স্থাপন করেই বুঝতে পেরেছিলাম, শকুনিতে ছুঁয়ে না দিলে যেমন গৃধিনীতে খায় না ঠিক তেমনি শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ছোঁয়াচ বর্জিত হলে আমরা জাতে উঠি না।

যে বছর রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন, সে বছর কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমরা ওঁর কাছাকাছি ছিলাম, উনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল কর না গো, ছোটোদের শিক্ষা মেয়েদের হাতে হওয়াই ভালো।' কথাটা আমার খুব মনে লেগেছিলো। ভেবেছিলাম করলে তো হয়। কিন্তু ভাবা আর করা নিশ্চয়ই এক নয়। তবু সেই যে একটি বীজ উনি মনের মাটিতে বপন করে গিয়েছিলেন, অনেক দিন পরে একদিন তাতে অংকুর গজালো। বিনা মূলধনেই শুধুমাত্র মনের তাগিদে একেবারে হঠাৎই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে ফেললাম স্কুলের জন্য। বাড়িভাড়াও যে পার্টটাইম হয় সেটা আমার জানা ছিলো না, জানলাম। আমার ভাড়ার সময় হলো সকাল ছ'টা থেকে বারোটা। বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত আবার অন্যরা। চারটা থেকে আটটা অন্যরা, আটটা থেকে বারোটা অন্যরা। এইভাবে নানান প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দিচ্ছে।

বন্ধু পরিজনদের মধ্য থেকে পাঁচটি বাচ্চা সংগ্রহ করে অনেকের সহৃদয়

সাহায্যে বিদ্যালয়ের উদ্বোধনও হয়ে গেল। বলাই বাহুল্য পাঁচটি শিশুর মাইনেতে স্কুল চলে না, কীভাবে কী হবে, কেমন করে নিয়মিত বাড়ি ভাড়া মেটানো হবে, দারোয়ানের মাইনে দেয়া হবে, যাঁরা পড়াবেন তাঁদের দক্ষিণার কী হবে, এসব নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। চারটি ক্লাশের জন্য বিষয় ভাগ করে বেশ কয়েকজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। শিক্ষয়িত্রীরা অবশ্য সকলেই সাহায্যের হাত বাড়ালেন। বললেন, 'এটা তো ব্যবসা না, একটা আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা। আপনি যদি কোনো রকমে বাড়িভাড়া আর দারোয়ানটিকে চালিয়ে নিতে পারেন, আমরা স্কুলটি চালিয়ে নেবো। আর স্কুল চললে তখন দেখা যাবে কে কী পাই।'

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমাদের গোড়াতেই গলদ ছিলো। প্রথমত, শিশুবিতান একটি পরিপূর্ণ বাঙালী নাম, যা শুনে শিশুদের পিতা-মাতারা তখুনি মুখ ফেরালেন। হওয়া উচিত ছিলো, লিটল ফ্লাওয়ার বা মেরিল্যান্ড, বা সেইন্ট অমুক ইত্যাদি। তার উপরে বাংলা মাধ্যম, আর তারও উপরে ভুল ইংরিজি শেখাবার জন্য কোনো ফ্রক পরা অ্যাংলো মেয়ে না রাখা। এই তিনটি মারাত্মক ভুলের জন্যে আমরা অনেক দিন ধরে টিম টিম করতে থাকলাম। যাঁরা আমার সঙ্গে প্রায় সমাজসেবার আদর্শ নিয়ে এই কর্মযজ্ঞে ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়াচ্ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত বলে চিহ্নিত। তাতে কী। সব চেয়ে মজা হলো এই, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বারোটা থেকে চারটাতে আবার যেন কারা একটা স্কুল খুলে বসলো, নাম সেইন্ট অমুক, ইংরিজি মাধ্যম, একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের দিনমান অবস্থান। যেখানে আমাদের পঁচিশটি শিশু জোটাতে এক বছর লাগলো, সেখানে ওরা ছ মাসেই পঞ্চাশটি শিশুর কলরোলে মুখর হয়ে উঠলো। হায় রবীন্দ্রনাথ।

অবশ্য হাল ছাড়িনি, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসেছিলাম সবাই। স্কুল যে একদিন দাঁড়াবেই এই বিশ্বাস আমাদের অটুট ছিলো। শেষ পর্যন্ত যখন সত্যিই উত্তীর্ণ হবার মুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়ে তরীটি প্রায় গন্তব্যের মুখে এসে দাঁড়ালো ঠিক সেই সময়েই আমার বিদেশ যাত্রা স্থির হলো। বিদ্যালয় স্থাপনের অভিযানে যে তিনজন ডান হাত বাঁ হাত ছিলো, যাদের সাহায্য এবং সহায়তা ছাড়া আমি এক পা চলতে পারতাম না, তাদের একজন জয়ন্তী সিংহ, সুসংয়ের রাজবাড়ির বধূ, আরেকজন মঞ্জু, জীবনানন্দ দাশের কন্যা, অন্যজন আমাদের কন্যা মীনাক্ষী। মীনাক্ষী দুপুরে লোরেটো কলেজে ক্লাস নিত,

সকালে আমার এখানে। আমি না থাকলেও তাদের হাতে স্কুল মসৃণগতিতেই চলবে জানতাম, তারাও জানতো। তবু তারা শেষ মুহূর্তে এই দায়িত্ব নিতে সাহস পেলো না। অনেক বুঝিয়েও একই জবাব শুনতে পেলাম, 'না, না, তুমি থাকলে অন্য রকম, আমরা পারবো না।'

ভেঙে গেল স্কুল। কিন্তু মনে মনে সংকল্প রইলো, ফিরে এসেই আবার নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়ে নতুন উদ্যমে লেগে যাবো। একজন শিক্ষয়িত্রী বুদ্ধি দিলেন, 'তাই ভালো। শিশুবিতান নামটা আর রাখবো না তখন, 'সেইন্ট জন' নাম দেব। আমরা বললাম, 'সেইন্ট জন কে?' সে বললো, 'তার আমি কি জানি। বিলিতি নাম দেয়া দরকার তাই দিলাম। আর বাংলা মাধ্যমও রাখবো না, 'ইংলিশ মিডিয়াম' বলবো। একজন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মেয়েও ভাড়া করতে হবে, পড়াক না পড়াক আসবে যাবে, অফিসরুমে বসে থাকবে। দেখতে দেখতে ইস্কুল ভর্তি হয়ে যাবে।' আর একজন হাসতে হাসতে বললো, 'আপনার শোভাবর্ধন হবে।'

শোভাবর্ধনের জন্য লাল মেয়ের কথা ভাবিনি, 'ইংলিশ মিডিয়াম'ও ভাবিনি, যা ভেবেছিলাম, শিশুবিতান শিশুবিতানই থাকবে, যে আদর্শে শিক্ষা দেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম, সেই আদর্শেই স্থির থাকবো কিন্তু সেই সঙ্গে এই গন্ধটুকু মেখে গিয়ে যদি অভিভাবকদের কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট করার সুযোগ ঘটে, না হয় সদ্ব্যবহার করা যাবে।

এতোগুলো বই লিখেও যে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারিনি, এই গয়নাটি দেখিয়ে হয়তো তা পাওয়া যাবে। লোকঠকানো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কী আর করা!

সেই কারণেই ডেলামেয়ার থেকে ফিরে পর পর বেশ কয়েক দিন নিয়মিত ক্লাশে গেলাম, মাস্টারমশাই খুব খুশি, তারপরেই আবার যে কে সেই। ফ্রান্সিস্ জোসেফ লবিতে এসে ফোন করলেন, 'কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না থাকলে চলুন আপনাদের নিয়ে আজ সেই মনস্টারিটাতে যাই।'

বুদ্ধদেবের কবে কবে কলেজে যেতে হয়, সেটা ওঁর জানা ছিলো। সেই হিসেবেই চলে এসেছেন, বললেন, 'কাজ ছেড়ে উঠে এলাম। জানি, আপনার ছুটির সঙ্গে আমার ছুটি মেলানো কঠিন, মিসেস বোসকে কথা দিয়েছিলাম, যতোটা পারি ঘুরিয়ে দেখাবো, সেই সুযোগটা হারাতে চাই না। এই সপ্তাহটা একটু হালকা আছি তাই ভাবলাম—'

আমরাও ভাবলাম, এই সুযোগ ছাড়লে মোটামুটিও কিছু দেখে ওঠা আমাদের পক্ষে একা একা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব মাটির তলাকার রাস্তা বিষয়ে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন, বাসরুটও সব চেনেন না, ভরসা ট্যাক্সি। ধনী ব্যক্তির পক্ষেও যা প্রায় অসাধ্য। তাই এই নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করলাম।

দেখা হতে ফ্রান্স জোসেফের গম্ভীর চেহারায় যথেষ্ট আবেগ ফুটে উঠলো, ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন, 'আপনাদের প্রতি আমি বড্ড বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি, বন্ধুতার জন্য কাজে ঢিল দেয়া বিষয়ে আমি খুব কড়া, কেউ করলেও বিরক্ত হই, নিজেও করি না। অথচ দেখুন কেমন চলে এলাম! শুধু তাই নয়, আপনারা সম্মত থাকলে এই অন্যায় আমি মাঝে মাঝেই করতে রাজী আছি।' বলে নিজেই খুব হাসলেন। তারপর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন হাডসন নদীর ধারে।

স্বদেশে বিদেশে যেখানেই হোক না কেন, এই ধরনের বন্ধু পাওয়া নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা। কিন্তু সেই বছর জগৎ ভরে এই ধরনেরই অকৃপণ বন্ধুতা আমাদের জীবনকে ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছিলো। এখন আমি জানি না ফ্রান্স জোসেফ কোথায় আছেন অথবা আদৌ ইহলোকে আছেন কিনা, কিন্তু তাঁর কথা লিখতে লিখতে আমার মুগ্ধ হৃদয় এখনো আমাকে কৃতজ্ঞতায় আনত করে তুলছে।

হাডসন নদীর ধার ধরে অনেকক্ষণ ঘুরলেন আমাদের নিয়ে। তারপর মনস্টারিতে এলেন। ইয়োরোপেরই কোনো একটি ঐতিহাসিক আশ্রম এটি। সেখান থেকেই আলাদা আলাদা সব পাথর তুলে নিয়ে এসে এই মধ্যযুগীয় আশ্রমটির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছে। আমি স্তম্ভিত। একটা আস্তো গগনচুম্বী বাড়ি এভাবে আনা সম্ভব? কী দুর্ধর্ষ ক্ষমতা এদের। ভিতরে খিলানে খিলানে তেমনি শ্বেতপাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য, মধ্যযুগীয় জীবনযাপনের সমস্ত লক্ষণ। আখরোট কাঠের কাজ দেখে কল্পনা করা যায় না কাঠ দিয়ে অমন হালকা লতা-পাতা ফুল পাখি তৈরি হতে পারে, মনে হয় ধরলে ভেঙে যাবে। কিন্তু শত শত বছর ধরে সব অটুট। আসবাবপত্র জাঁকজমকে পরিপূর্ণ। সব জিনিসেই হাতের কাজ, কোথাও কলের ছোঁয়া নেই। চেয়ারের পায়া, খাটের পায়া, খাটের বাজু, বসবার বেদী, কার্পেট—সব কারুকার্যখচিত।

তখনো পর্দার প্রচলন ছিলো বোঝা যায়। পর্দাগুলো সব ঘন রেশমী এমব্রয়ডারিতে ঠাসা। সেই সব রেশমের কাজের কোনো তুলনা নেই। বড়ো বড়ো গায়ের কাপড়ও ঐ রকম রেশমী কাজে সমৃদ্ধ। ভিতরের বাগান, ফোয়ারা,

আঙিনা, উপরে উঠবার অন্ধকার সরু সিঁড়ি সব আমাদের প্রাচীন ভারতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

আশ্রমটি নদীর ধারেই একটি টিলার উপরে অবস্থিত। উত্তমরূপে সংরক্ষিত ঘাস, বাগান, বন, উপবন, নদী—সব মিলিয়ে একান্তই আশ্রম। চারপাশে ঢালু বেয়ে সন্নিবদ্ধ লম্বা লম্বা গাছের সারি নেমে এসেছে নিচে, তার ফাঁকে ফাঁকেই আঁকাবাঁকা রাস্তা উঠে গেছে উপরে। গবাক্ষে গবাক্ষে নদীর দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সামনে উদাত্ত জল, স্থান অতি নির্জন, সুতরাং বাতাস অবারিত হয়ে আমার পাতলা সিল্কের শাড়ি প্রায় উড়িয়ে নিচ্ছিলো। আমি ভীষণ বিপন্ন বোধ করছিলাম। আমাদের মতোই একজন দর্শক মৃদু হেসে বললেন, 'বাতাস হিল্লোলিত করতে পারে এমন পোশাক তো আর এদেশে পায় না, তাই আজ এতো উত্তরোল। এও এক ছবি।'

শাড়ি বিষয়ে মন্তব্য আমি আরো অনেক শুনেছি এদেশে। একবার একটা 'ফাইব অ্যান্ড টেনে' গিয়ে ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথরের মতো এলোপাথারি বিপণি দেখে বেড়াচ্ছিলাম। সারা আমেরিকা ভর্তি এই 'ফাইভ অ্যাংড টেন।' অর্থাৎ সস্তার দোকান। সস্তাও যে কী সস্তা চিন্তা করা যায় না। আর জিনিসও বা কী অসংখ্য। জীবনে নিত্যব্যবহার্য যতো জিনিস সম্ভব সব আছে। পশুপ্রাণীর খাদ্য পর্যন্ত আছে। আবার প্রাণীও আছে, যেমন রঙিন ছোটবড়ো কচ্ছপ, রঙিন মাছ, টুনটুনির মতো ছোট্ট ছোট্ট পাখি। নার্সারি আছে, তাতে কতো সুন্দর সুন্দর ফুল পাতার টব।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, একটা বাচ্চা জেদ ধরে কেঁদে কেঁদে বলছে, 'ইয়েস, সি ইজ আ খ্লাউন!'

তার বাবা ফিস ফিস করে বলছে, 'ও নোন্নো, সি ইজ আ বিউটিফুল ইনডিয়ান লেডি—'

'নো নো নো, সি ইজ আ খ্লাউন।'

পিছন ফিরতেই বাবার সঙ্গে চোখাচোখি। লজ্জিত হয়ে 'ডোন্ট মাইন্ড, ডোন্ট মাইন্ড' বলতে বলতে তৎক্ষণাৎ পুত্র নিয়ে বাবার প্রস্থান।

আর একদিন আমাদেরই একশো পঁচাত্তরটি ফ্ল্যাট সম্বলিত নিচের মস্ত খেলার মাঠে যখন শিশুরা খেলছিলো, আমি আমাদের ষোলোতলা ফ্ল্যাট থেকে নেমে মাঠ থেকে একটু দূরে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ পাঁচ-ছটি পাঁচ-ছ বছরের বালক-বালিকা এগিয়ে এলো, কাছে

এলো ভয়ে ভয়ে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'আর ইউ গডেস ?'

আমি দু হাত বাড়িয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললাম, 'ঠিক। ঠিক বলেছ।'

সেই মনাস্টারিতেই প্রথম ট্যাপিসট্রির কাজ দেখলাম। কাঁথার ফোঁড় দিয়ে দিয়ে এমন সুন্দর সব পোট্রেইট এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য তৈরি করেছে যে কাছে গিয়ে হাত দিয়ে দেখলে পর্যন্ত বোঝা যায় না রঙ তুলি দিয়ে আঁকা ছবি নয়, সেলাই। শত শত বছরের পরমায়ু নিয়েও তেমনি সুন্দর রঙ তেমনি পাকা।

সেখানেই প্রায় সারাটা বেলা কাটিয়ে পথে কোথাও চা খেয়ে ফিরে এলাম বাড়ি। দুদিন বাদেই আবার গোগেনহাইম। ইনিই নিয়ে গেলেন। গোগেনহাইম নিয়ে এদের খুব গৌরব। বাড়িটির গড়ন সত্যিই অদ্ভুত। সিঁড়ির কোনো ধাপ নেই, গোল হয়ে ঢালু পথে ধীরে ধীরে উঠে গেছে পাঁচতলা পর্যন্ত। অনেকটা পাহাড়ে ওঠার মতো। ফ্রান্স বললেন, 'কেমন দেখছো ? এ রকম একটিও স্টেপ ছাড়া পাঁচতলা পর্যন্ত ওঠা যায় এমন বাড়ি কি জগতে আর আছে ?'

আছে কি নেই আমরা জানতাম না, পরে গ্রীসে গিয়ে পার্থেনানে ওঠার উপায় দেখলাম ঠিক ঐ রকম! অবশ্য সেই পথ এই রকম একতলা দোতলা তেতলা চারতলা পাঁচতলা পর্যন্ত থেমে ওঠেনি, কিন্তু রাজপথ থেকে পার্থেনানের উচ্চতা কম নয়, সেই পথটা উঠেছে ঠিক এই ভাবে। গোগেনহাইম তারই সংস্কৃত সংস্করণ বলে ধরা যায়। কৃতিত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এদের কৃতিত্ব এমনই অমানুষিক যে দেখতে দেখতে আমি যে আমি, আমিও অবাক হতে ভুলে যাচ্ছিলাম।

শুধু ঐ পাঁচতলায় সিঁড়িবিহীন পথেই ওঠা নয়, ছবিগুলোও এমন কৌশলে শূন্যে ঝোলানো যে মনে হয় গ্যাস ভরা বেলুন। সেটা যে কীভাবে ঝুলিয়েছে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। পরিষ্কার স্পষ্ট সব পেইনটিং যেন বাতাসের গায়ে দুলছে। সেখান থেকেই ফ্রীকস মিউজিয়ামে নিয়ে গেলেন। ফ্রীকস নামের এই ব্যক্তিটি একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁরই সব একার সংগ্রহ। মস্ত দোতলা বাড়ির একতলা সমস্তটা জুড়ে শুধু ছবি ছবি আর ছবি। একা একজন মানুষ যে এতো অসংখ্য বিখ্যাত ছবি কেমন করে একত্রিত করতে পেরেছিলেন ভাবা যায় না। কোটি কোটি ডলারের অরিজিনাল পেইনটিং। টাকার এমন সদ্ব্যবহার আর কী হতে পারে ?

বাড়িটা তাঁর নিজের, দোতলায় শুনলাম তাঁরই বৃদ্ধা কন্যা বাস করেন। একতলার মিউজিয়ামটি দানে দিয়েছেন। সেকালের চক্‌মেলানো বাড়ি। চারদিক ঘিরে ঘর বারান্দায় মিউজিয়াম, মাঝখানে বাগানশোভিত চৌকো আঙিনা। বাগানের ফাঁকে ফাঁকে বসবার আসন আছে। অনেক সময় বয়ে গেল সেই আসনে বসে। মন কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমাদের কলকাতার বাড়িতে নানা বিষয়ের নানান পুস্তক সংগ্রহ ভাণ্ডারে ছবির বইয়ের সংগ্রহও খুব খারাপ নয়। অনেক শিল্পীর শিল্পসম্ভারের সঙ্গেই পরিচয় ছিলো। কিন্তু সবই প্রিন্ট। অরিজিনেল ছবির এমন সংগ্রহশালা দর্শন জীবনে এই প্রথম। আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তুলনামূলক ভাবে বলা যায় 'কনেস্টবল' নামের শিল্পীটি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, কিন্তু খুব আশ্চর্যভাবে তাঁরই একটি সন্ধ্যার ছবি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আনলো। বিষয়টা কিছুই নয়। একটি মোটাসোটা চাষী মেয়ে ধানের আঁটি নিয়ে ঘরে ফিরছে। মাঝখানে নদী, ওপারে ঘন বনে ঘেরা পাহাড়ে গাঢ় সন্ধ্যা। সেই আঁধারে একটি লোক ঝাপসা হয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যার ম্লান ছায়া জলে কাঁপছে, এপারে মেয়েটির মুখে বুকেও সেই ম্লানিমা। এমন বিষণ্ন বিধুর ছবি যে, দেখলে বুকের মধ্যে কোথা থেকে যেন কতো দুঃখ উথলে ওঠে। সব ছবি ছাপিয়ে সেই ছবিটাই আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিলো। আসলে ছবি এভাবে দেখা যায় না। এতো ঐশ্চর্য এক সঙ্গে উপভোগ করা সম্ভব নয়, তারই মধ্যে এই রকমই একটা দুটো কেমন করে আটকে থাকে হৃদয়ে।

সাহিত্য মনকে টানে, গান শ্রবণকে, ছবি টানে চোখকে। পড়তে পড়তেই যোগ্য পাঠক হওয়া সম্ভব, শুনতে শুনতেই যোগ্য শ্রোতা হওয়া সম্ভব, দেখতে দেখতেই ছবির যোগ্য দর্শক হয়ে ওঠা সম্ভব। এ সব হচ্ছে একান্তভাবেই শিক্ষা আর অভ্যাসের ব্যাপার! তারপরে নেশা হয়। আমার বই পড়ার নেশা আছে, গান শোনারও নেশা আছে, কিন্তু ছবির বিষয়ে বলা যায় প্রায় অজ্ঞান তিমিরে। এই ফ্রীকস মিউজিয়াম আমাকে দীক্ষিত করলো।

এরপরে যেদিন মেট্রোপলিটন আর্ট মিউজিয়ামে গেলাম, আমার চোখ ও মন দুইই অনেক বেশী সতর্ক ছিলো। কোনো তাড়াহুড়ো যাতে না হয় সেজন্য বেশী সময় নিয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রোগ্রাম করা হলো। রোদের ভাস্কর্য দেখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তাঁর 'বিশাল চিন্তিত পুরুষ",

'চিরন্তন প্রেম', 'বিধাতার হাত', 'সমুদ্র সৈকতে', 'বৃদ্ধা বেশ্যা', 'শয্যায় প্রেমিক যুগল', 'ভাইবোন' ইত্যাদি মূর্তির ছবি ছবির বইতে দেখা ছিলো। আসল মূর্তিতে দেখে তার সজীবতায়, স্বাভাবিকতায়, বাস্তবতায় চমকে উঠলাম। ছবি দেখে অ্যাডমিরেশন হয়, অবাকও হই, কিন্তু প্রকৃত মূর্তির সঙ্গে তার একশো আর একের তফাত। মানুষের ক্ষমতার এই ভয়ংকর প্রকাশ বুকের মধ্যে ভয়ের অনুভূতি ছড়িয়ে দেয়। পা যেন গেঁথে গেল সেই সিঁড়ি বারান্দা আর ঘরে।

তারপর উঠে নেমে কতো ঘরে আরো কতো ঐশ্বরিক ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার বিকাশ দেখে যে স্তম্ভিত বিস্ময়ে আনত হলাম তার ঠিক নেই। আর একটি সন্ধ্যাবেলার ছবি দেখলাম। এল্‌গ্রেকোর সন্ধ্যাবেলার ছবি দেখলেই আমার মন কেমন করে। সন্ধ্যাবেলার সঙ্গে একটা বিদায়ের যোগ আছে। বিদায় সব সময়েই বেদনার। অবচেতন মন নিশ্চয়ই সেই বিদায়কে গ্রহণ করতে নারাজ।

শুনেছি এই ছবিটি এলগ্রেকো গ্রীসে বসে এঁকেছিলেন। এবং ছবি আঁকার সময়টুকু ছাড়া সব সময়েই চোখে রুমাল বেঁধে রাখতেন যাতে অন্য কোনো ছবি চোখে না পড়ে। এই নিষ্ঠার তো কোনো তুলনা নেই। 'ভিসান অব সেইন্ট জোন' ছবিটি দেখেও রোমাঞ্চিত হলাম। অবশ্য রোমাঞ্চ ছাড়া সেই মিউজিয়ামের আবহাওয়ায় আর কিছু অনুভূতিই কাজ করে না। কুর্বের 'গ্রামের মেয়ে', গইয়ার 'বারান্দার ছবি', 'লুইস ডেভিসের' জানলার আলোয় মেয়ে', মানের 'ওয়াটার লিলি'—এই ছবিটি বৃহৎ ঘরের চার দেয়াল জুড়ে আছে। সারাদিনের, বিভিন্ন বেলার দৃশ্য নিয়ে ছবিটি সম্পূর্ণ। তারপরে মাতিস, মদিলিয়ানি, রেমব্রান্ট, কনডেনসকি, কে নেই সেখানে? তিনজন ভারতীয় শিল্পীর ছবিও আছে একতলায়।

নিচে মস্ত আঙিনা, আঙিনা ভরে ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। একপাশে কাফে-টারিয়া। এক সময় খেতে এলাম আমরা। এই বিশাল চিত্রশালা এতোক্ষণ আমাদের সর্বতোভাবে গ্রাস করেছিলো। এইবার একটু বিরাম দরকার। তাছাড়া মানুষ সব ভুলতে পারলেও খিদে তো ভোলে না? হাত পা ছড়িয়ে সুদৃশ্য রেস্তোরাঁর আরামদায়ক চেয়ারে বসে উপলব্ধি করলাম, আমাদের জঠর আমাদের এই অন্যমনস্ক ব্যবহারে যথেষ্ট কুপিত হয়েছে। উপরে নিচে এ-ঘরে ও-ঘরে তিন ঘণ্টা ধরে হাঁটতে হাঁটতে পা-ও বিদ্রোহ করতে চাইছে। ইচ্ছের সঙ্গে সামর্থ্যের প্রতিযোগিতা কখনোই সম্ভব নয়।

এদেশের ট্রেন খুব আরামদায়ক, দ্রুতগামীও বটে। যে কোনো ট্রেনের

চেহারাই বেশ ভদ্র। অন্তত আমার যে দু-চারবার যে দু-চার জায়গায় যাবার সুযোগ ঘটেছে তাতে তাই দেখেছি। তবু লোকেরা সাধারণত বাসেই চলাফেরা করে। দু-তিন হাজার মাইল পর্যন্ত অনায়াসে চলে যায় বাসে। কেননা, ট্রেনের ভাড়া বাসের চেয়ে অনেকটাই বেশী। দু-তিন রাত কী করে লোকেরা বাসে কাটায় আমি ভেবেই পেতাম না। তখন ভারতনিবাসী যে কোনো লোকের পক্ষেই সেটা ভাবনার অতীত ছিলো। আমাদের দেশে বাস তখন এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতো না। অবশ্য এখনো কলকাতা থেকে দিল্লী বা বম্বে কখনো আমরা বাসে যাই না।

ব্রুকলীন থেকে একবার আমাকে ইণ্ডিয়ানাতে বাসে যেতে হলো। দূরত্ব বোধ হয় হাজার দেড়েক মাইল। তার উপরে যেতে হয়েছিলো একা। একা এতোটা পথ কেন, সামান্য পথও তার আগে কখনো অতিক্রম করিনি। বুদ্ধদেব ভয় পাচ্ছিলেন। আমিও অভয়ে ছিলুম না। কিন্তু প্লেনের ভাড়া দেবার মতো সাধ্য ছিলো না বলে বাসে যাওয়াই স্থির করেছিলাম। ট্রেনে যাবার প্রশ্নও উঠেছিলো, তাতে আমি আরো ভয় পাচ্ছিলাম। আমার মেয়ে ওখানে অসুস্থ, যেতেই হবে, অথচ বুদ্ধদেবের ছুটি নেই, শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে একাই রওনা হয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি বাস স্টেশনটি একটি আলাদা রাজত্ব। সেখানে দোকান বাজার রেস্তোরাঁ কাফেটারিয়া সব আছে। মনে হয় যেন সাজানো গুছানো উজ্জ্বল আলোকিত এক মনোরম প্রদর্শনী। সেই জায়গা ছাড়িয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড চাতালে অসংখ্য বাস দাঁড়িয়ে আছে। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বরের মতোই নম্বর আছে, কে কোন গেট দিয়ে কোন নম্বরে কোথায় যাবে তার নিশানা নিয়ে। খুঁজতে খুঁজতে যে কতো পথ হাঁটতে হলো তার ঠিক নেই। অবশেষে একটি দেড়তলা বাসের অভ্যন্তরে গিয়ে প্রবিষ্ট হলাম। এভাবে আমাকে পাঠিয়ে বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন বুদ্ধদেব, দরজা ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। আর বন্ধ হওয়া মাত্রই দূরপাল্লার গ্রেহাউন্ড বাস হুস করে চত্বর ছাড়লো। সেই সময় আমার মুখের চেহারা কতোটা করুণ ছিলো জানি না। একটু পরে যুগল আসনের সহযাত্রী মহিলাটি গলায় সমবেদনা ঢেলে আলাপ করলেন, তোমাকে খুব আপসেট মনে হচ্ছে—

আমি হাসলাম।

'যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তোমার স্বামী?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁকেও খুব বিমর্ষ লাগছিলো। কত দূরে যাবে ?'

'ব্লুমিংটন।'

'ও, তা হলে আজ রাতটা বাসেই কাটবে।'

'তুমি কদ্দূর যাবে ?'

'বিকেল পর্যন্ত আছি। এর আগে কি আর বাসে যাওনি কোথাও ?'

'গিয়েছি, কিন্তু একাও নয়, এতোদূরেও নয়।'

'কিছু ভেবো না, পথ খুব ভালো। কষ্ট হবে না।'

মার্কিনীরা আলাপী, বন্ধুতাসম্পন্ন, সাহায্য করতে উৎসুক। মহিলাটিকে পেয়ে আমি অনেক আশ্বস্ত বোধ করলাম। মনটা হালকা হলো। তাছাড়া পথ সত্যিই খুব ভালো। মাঝে মাঝেই শহর, শহর ছাড়িয়ে মাঠ ঘাট প্রান্তর, বন, উপবন, দিগন্তব্যাপী আকাশ। কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হু হু করে সময় কেটে যাচ্ছিলো। দুপুর দেড়টা নাগাদ বড়ো স্টেশনে গাড়ি বেশ খানিকক্ষণের জন্য থেমে যাত্রীদের নামিয়ে দিল। শুধু আমাদের বাসই সেখানে থামেনি, অগুণতি বাস এসে থামছে, থেমে রয়েছে, যাত্রীও তেমনি। সব বাসই এক রকম, কোন বাসে উঠতে শেষে কোন বাসে উঠবো, অথবা আমাকে ফেলে বাসটা ছেড়ে দিলে আমি এই নাম না জানা, না চেনা প্রান্তরে কী করবো, এইসব ভেবে আমার নামতে ভয় করছিলো, ভদ্রমহিলাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম ভিড়ে। মোটা কণ্ডাকটার বললো, বাসের নম্বর টুকে নাও, নৈলে খুঁজে পাবে না ফিরে এসে। এখানেই লাঞ্চ। এর পরের স্টেশন হবে আফটারনুন টি-র জন্য। মাত্র দশ মিনিট থামবে। বলতে বলতে চলে গেল সে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে অনুসরণ করলাম।

যতোদূর চোখ চলে ততোদূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠে এক বিশাল কাচের বাড়ি। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে সব। ডাইনে বাঁয়ে নানা ধরনের ড্রাগ স্টোর, রেস্তোরাঁ, কাফেটারিয়া। সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে প্রসাধন করে নেবার জন্যে সারি সারি আয়নাওলা ড্রেসিং টেবিল সাজানো আছে। সর্বত্রই ভিড় আর ব্যস্ততা। আমি ভেকু ভেকু এদিক ওদিক দেখছিলাম। কলের গর্তে ডাইম (আমাদের দশ পয়সার মতো) ফেলে গ্লাস ভর্তি দুধ খাচ্ছে বাচ্চারা, তেমনি ক্যাণ্ডি বেরিয়ে আসছে, কফি বেরিয়ে আসছে, কেউ কেউ ড্রাগ স্টোরের উঁচু টুলে গিয়ে বসেছে, কেউ রেস্তোরাঁয় বসে হটডগ আর কোক্ খাচ্ছে। অবশ্য ভিড় বেশী কাফেটারিয়াতেই। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ন্যাপকিন কাটা

চামচে আর প্লেট নিয়ে লাইন করে খাবার নিচ্ছে সবাই। আমিও তাদের দেখাদেখি সেখানেই লাইন দিলাম। উৎকৃষ্ট সব খাবার সাজানো, যার যা খুশি নাও, যতো খুশি নাও, দাম সব এক।

মহিলারা সেজে এসে দাঁড়ালেন। তার মধ্যে সেই মহিলাকে দেখে আমি খুশি হয়ে উঠলাম।

খাওয়া শেষ হতে হতেই লাউড স্পীকারে ডাক শুরু হলো যাত্রীদের জন্য। যার বাসের নম্বর যখন ঘোষিত হচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে তারা। আমিও কান খাড়া করে আছি, ভয়ে বুক কাঁপছে এই বুঝি খেই হারাই। যাই হোক শেষ পর্যন্ত বাস্ চিনে নিয়ে উঠতে পারলাম।

হাইওয়ে দিয়ে বাস আবার চললো হু হু করে। এ দেশের আবহাওয়া এতো ভালো যে ক্লান্তি হয় না সহজে। একটু নেমে খেয়ে-দেয়েই মনে হচ্ছিলো বুঝি এইমাত্রই রওনা হয়েছি। মহিলাটি বললেন, তোমার খুব ভাগ্য ভালো, রাত্তিরে কোনো রিজার্ভেশন হয়নি তোমার পাশে, আমি তো সাতটার স্টেশনেই নেমে যাবো, তারপর থেকে তুমি একা, ঘুমুতে একটুও কষ্ট হবে না।

ঠিকই বলেছিলেন। মহিলাটি নেমে যাবার পরে সারা রাত আর কেউ আমার পাশে বসলো না। কিন্তু উনি নেমে যাবার পরে আমার খুব ফাঁকা লাগছিলো। এতোক্ষণ সহাবস্থানের ফলশ্রুতি। বিকেলে একসঙ্গে ডিনারে নেমেছিলাম, একসঙ্গে উঠেছিলাম, পাশাপাশি বসে খেয়েছিলাম। নেমে যাবার সময় দু'জনই দু-জনের জন্য কিঞ্চিৎ বিরহ অনুভব করলাম। উনি আমাকে ঠিকানা দিলেন, ফোন নম্বর দিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরপাক খেতে খেতে আবার যে কখনো দেখা হবে না কে বলতে পারে বলে চুমু খেয়ে চলে গেলেন।

এই বাসভ্রমণ আমার পক্ষে স্মরণীয় ঘটনা। এই ভ্রমণ আমার খুব ভালো লেগেছিলো। এই ভ্রমণ আমাকে সংসারের সব ভাবনা চিন্তা থেকে একটা সময় অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিলো। কাচের জানালা দিয়ে দিনের পৃথিবী দেখেছি সারাদিন, কিন্তু রাত্রির পৃথিবী আমাকে আরো মুগ্ধ করলো। সেই সঙ্গে অবিশ্যি বাসের ভিতরে আর একটি জাগতিক দৃশ্যও আমাকে কম বিস্মিত করলো না।

কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রাত দশটায় একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে জেগে গেলাম, সেখান থেকে জনাতিনেক যাত্রী উঠেছিলো। তার মধ্যে একটি যুবতী মেয়েও উঠলো। আমার সামনের আসনে আগে থেকেই যে যুবকটি

বসেছিলো, মেয়েটি তার পাশে বসলো। এইটুকু দেখেই আমি বাইরে তাকিয়ে তারাভরা নিস্তব্ধ আকাশের চলন্ত শোভা দেখতে দেখতে আবার কখন অন্যমনস্ক ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অনেকক্ষণ বাদে যখন বাসের ভিতরে চোখ পড়লো, দেখলাম প্রায় প্রত্যেকেই ঘুমন্ত, শুধু একেবারে পিছনের লম্বা সীটটিতে দুই জোড়া নিগ্রো স্ত্রী পুরুষ তখনো জাগ্রত। দুটি যুগলই কম্বলের তলায় প্রেমাসক্ত অবস্থায় নড়াচড়া করছে। আর সামনের আসনে সদ্য আগত মেয়েটি ছেলেটিও একই অবস্থায় বিরাজমান। তফাৎ এই, পিছনের সীটের লোকেরা সীটটা লম্বা বলে শুয়েছে, সামনের আসনের ওরা বসে বসেই যতোটা সম্ভব ততোটা ঘনিষ্ঠ। পিছনের দৃশ্যটা অবশ্য চোখে পড়তো না যদি না একবার বাথরুমে যেতে হতো। কিন্তু সামনের আসন থেকে নিস্তার কোথায় ?

পরে বুঝতে পারলাম, ওরা প্রেমিক-প্রেমিকাও নয়, স্বামী-স্ত্রীও নয়। মাত্রই পথের দোসর, মাত্রই ঐটুকু সময়ের জন্য বাসনার পরিতৃপ্তি। রাত চারটায় যে স্টেশনে গাড়ি থামলো, সেই স্টেশনে মেয়েটি নেমে গেল, ছেলেটি নামলো না। বালিশ পিঠে দিয়ে এতোক্ষণে আরাম করে ঘুমোবার চেষ্টা করলো। বালিশটা পিছনে পড়ে গিয়েছিলো, আমি তুলে দিলাম। বিনীতভাবে অনেক ধন্যবাদ জানালো আমাকে। সকাল বেলায় ইণ্ডিয়ানাপোলিশে চা খাওয়ালো, ওর গন্তব্যস্থানও ব্লুমিংটনই ছিলো। ঐ পথটা যেতে যেতেই কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম মেয়েটি ওর প্রেমিকাও নয় পত্নীও নয়।

ট্রেনে না গিয়ে শহর থেকে শহরান্তরে বাসে যেতে যে শুধু পয়সারই সাশ্রয় হয় তাই নয়, আরো আছে। অন্তত আমার কাছে সেটাই সবচেয়ে বড়ো কারণ বলে মনে হয়েছিলো। বাস যে সব পথে যায় সে সব পথ যেমন সুন্দর তেমনি পরিচ্ছন্ন। ট্রেনের পথ আবার তেমনিই দৃষ্টির পক্ষে অসহ্য পীড়াদায়ক। অন্তত ডেলাওয়ারে যাবার সময় আমার সেই অভিজ্ঞতাই হয়েছিলো। প্রথমত রেল লাইনগুলো এমন সব রাস্তা দিয়ে পাতা হয়েছে যার দু-পাশে দেড়তলা দু-তলা সমান দুটি রুক্ষ পাথুরে মাটির দেয়াল সমস্ত প্রকৃতিকে সর্বক্ষণ সম্পূর্ণভাবে আড়াল করে রেখেছে। সেই অন্তহীন গলিটি দিয়ে যাবার সময় অবিরাম অবিশ্রান্ত যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে বৃক্ষলতাগুল্মহীন ঢালু জমির উপরে সারা শহরের সব আবর্জনা। বিশেষত হাজার হাজার মোটর গাড়ির পর্বতপ্রমাণ স্তূপীকৃত কংকাল দেখতে দেখতে বিবমিষা হয়।

ডেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় এই পথ দেখে গিয়ে স্থির করেছিলাম,

আর কোথাও ট্রেনে নয়। যতো আরামদায়ক আসন বা শোয়া-বসার পক্ষে যতো প্রশস্ত কক্ষই হোক না কেন, ট্রেনে এই শেষ। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ট্রেনে চড়তে বাধ্য হলাম। বুদ্ধদেবকে বক্তৃতা দিতে অনেক সময়েই এমন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় যার দূরত্ব এতটা বেশী নয় যে, আইডেলওয়াইল্ড এয়ার পোর্টে গিয়ে একটি জেট বিমানে উঠে বসা যায়। আর যেহেতু আমাদের গাড়ি নেই, ট্রেনই একমাত্র বিকল্প। বাস শুনলে নিমন্ত্রণ কর্তারা লজ্জায় জিব কাটেন। ভাড়া যে কম।

আমি বুদ্ধদেবকে বলেছিলাম, 'তবু চলো বাসে যাই, কতো শহর দেখা যায়, কতো গাছ, কতো বাগান, কতো মস্ত আকাশ—'

বুদ্ধদেব বললেন, 'এবার অন্য রকম হবে। শুনেছি চ্যাপেল হীলে যাবার রাস্তা অতি সুন্দর, ট্রেনটিও খুঁব অভিনব। আর একবার স্টেশনে আসা হলো, সেটাও মন্দ কথা নয়। স্টেশনটাও তো দেখার মতো?'

তা ঠিক। ঐ বিশাল ব্যস্ত স্টেশনের ছাদটা সম্পূর্ণ কাচে ঢাকা। আধখানা গ্লোবের মতো মাইলব্যাপী সেই কাচের ছাতার তলাতেই অবিশ্রান্ত অবিরাম কতো অসংখ্য ট্রেন এসে থামছে, চলে যাচ্ছে, আবার আসছে, আবার যাচ্ছে, পড়ে থাকছে সাইডিংয়ে, ইঞ্জিন বাঁশি বাজিয়ে রাস্তা ক্লীয়ার করছে, কতো যাত্রী উগরে দিচ্ছে, আবার তুলে নিচ্ছে, আবার নিচ্ছে, আবার দিচ্ছে. কতো জাতের কতো লোক, কতো পোর্টার, কতো বিপণি, কতো অটোমেটিক জলের মেশিন, দুধের মেশিন, ক্যান্ডি মেশিন। গর্তে ডাইম ফেললেই বেরিয়ে আসছে গ্লাস, কলের তলায় ধরলেই দুধ, জল, ফলের রস যা খুশি কতো খাবে খাও, এক এলাহি কাণ্ডকারখানা।

একজন রুশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। তিনি বলতেন, ঐ আশ্চর্য ছাদের তলায় বসে থাকা আমার একটা নেশা। গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যাই, ঢুকি, তারপর বসে থাকি। ওখানে বসেই আমি সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখেছি, ভাবতে পারো?

একটা ঢাকনার তলায় বসে বসে এই দৃশ্য অভাবনীয় তো বটেই। তবে ভাবনার অতীত কতো কীর্তিই তো এরা করে উঠছে!

মাঝে এই দেশে ভারি এক ত্রাস উপস্থিত হয়েছিলো। কিউবার সংকটের পর থেকেই এই ত্রাসের সৃষ্টি। তখন তারা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়ে মাটির তলায় এমন একটি নিরাপদ আশ্রয়ের পরিকল্পনা করেছিলো, যাতে বিপদকালে প্রয়োজন

মতো নগরবাসীরা সেখানে গিয়ে তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। প্রথমে একটা সাদাসিদে পুকুরের মতো চেহারা কল্পনা করেছিলো। টেক্সাসের একজন প্রযুক্তিবিদ অনেকদিন ধরে অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে বললেন, 'না ঐ ধরনের আশ্রয় সকলের পক্ষে যথেষ্ট নয়।' এই বলে ন-মাস বাদে তিনি যে শুধু আর একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন তাই নয়, সেই পরিকল্পনা মতো নিজে নিজের জন্য একটি বাড়িও তৈরি করলেন মাটির তলায়। দুটি কন্যাসহ স্ত্রীকে নিয়ে বাসও করতে লাগলেন সেখানে। এই চমকপ্রদ আশ্রয়-শিবিরটি বিষয়ে তিনি বললেন, মাটির উপরে বাস করার চেয়ে মাটির তলার বাড়িতে বাস করতেই তাঁর সুবিধে হচ্ছে বেশী, অনেক বেশী শান্তি পাচ্ছেন। অত্যন্ত নিরিবিলি, অবাঞ্ছিত লোকের উৎপাত নেই, ধুলো নেই, বালি নেই, ঝড়বৃষ্টি নেই, শব্দ নেই—শহরের অশ্রান্ত কোলাহল মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে এমন কোনো উপাদানই নেই সেখানে। গৃহিণীর ঝাড়াপোছার কাজও একেবারে কমে গেছে। মাসে একবার করলে যথেষ্ট। আরো বললেন, তলায় যাব জমি, উপরেও সে-ই জমির মালিক, সেই জমিতে বেড়াতে যাবার জন্য চমৎকার বাগান করতে পারে, টেনিসকোর্ট করতে পারে, সুইমিং পুল বানাতে পারে ইচ্ছে করলে, আর একটা বাড়ি বানাতেই বা বাধা কী!

একটা ডিমের খোলার মতো গড়নের মধ্যে তৈরী হবে বাড়িটা। লম্বায় একশো তিরিশ ফুট, চওড়ায় নব্বুই। বাড়ির ছাদটা উপরের জমি থেকে তিন ফিট নিচে থাকবে। আর ছাদটা যে কংক্রীটেরই হতে হবে তারও কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। সেটা অ্যালিউমিনিয়ামেরও হতে পারে, প্লাস্টিকেরও হতে পারে। একতলা, দোতলা, তিনতলা, সব রকম বাড়িই বানানো যাবে সেখানে। বিদ্যুতের কারসাজিতে সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, আকাশের তারা সবই কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হবে। বন উপবন বাগান শীত গ্রীষ্মও সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে বহির্দৃশ্যের কোনো ব্যাঘাত ঘটাবে না। অর্থাৎ, খোদার উপর খোদকারী করে আকাশ বাতাস সহ একটি আলাদা জগৎই তৈরি হবে মাটির তলায়।

এই যদি সম্ভব হয় তবে আর একটা কাচের ছাদ তৈরি হতে অসুবিধা কী? তবে কয়েক বছর আগে এক বিদেশী বন্ধু এসে খবর দিলেন, সেই ছাদ নাকি ভেঙে ফেলা হচ্ছে, এখন নতুন ছাদের পরিকপনা নিয়ে নতুন স্টেশন তৈরি হচ্ছে। এতো দুঃখ হলো।

যাই হোক, সময় মতো যখন ট্রেন এলো, ঠিক তখন না বুঝলেও প্ল্যাটফর্ম

ছাড়ানো মাত্রই বুঝতে পারলাম, কথাটা যথার্থ। এর আগেরবার যে ধরনের ট্রেনে উঠেছিলাম, এটা তার চেয়ে অনেক বেশী রাজকীয়। ডাইনিং-কারটি আপাদমস্তক কাচের চেয়েও স্বচ্ছ এবং মোটা প্লাসটিকে মোড়া, বাথরুমের পাশে সুসজ্জিত ড্রেসিংরুম, আয়নাওলা টেবিল প্রসাধনের সম্ভারে পরিপূর্ণ। কোণে মুখ মোছার জন্য চাকায় ঘোরানো তোয়ালে, টানলেই বেরিয়ে আসে, কারো ব্যবহৃত অংশ কারোকে ব্যবহার করতে হয় না। টয়লেট পেপার রাখার পদ্ধতিতে রাখা। সব তোয়ালে ব্যবহার হয়ে গেলে আবার নিগ্রো দাসী সেটা পূরণ করে দেয়।

পথ অবশ্য অনেক দূর পর্যন্ত সেই গলিপথই ছিলো, তারপরেই হুস করে বেরিয়ে এলো সমতলে। দু পাশে দিগন্তব্যাপী ক্ষেতখামার, আকাশ অবারিত। রঙিন গদির আসনের মাঝখান দিয়ে কার্পেট মোড়া গলি বেয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এলে আবার স্বচ্ছ প্লাসটিকে তৈরি এক বিশাল ড্রইংরুম। এসে বসলে বেয়ারারা চা, কফি, খাদ্য, মদ্য যে যা চায় সব পরিবেশন করে যায়। আকাশ মাথায় নিয়ে ট্রেন হু হু করে ছুটে চলে, যাত্রীরা এগিয়ে বসে চলন্ত প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত হতে হতে সূর্যাস্ত দেখে, শহর দেখে, আঁধার ঘনিয়ে এলে একটি-দুটি করে তারা গোনে উপরে তাকিয়ে। এটি এদের অতিরিক্ত ভাড়ায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর জন্য লাকসারি ট্রেন।

যাচ্ছিলাম দক্ষিণে, যতোই যাচ্ছি ততোই দেখছি ঘাস সবুজ হয়ে আসছে, আকাশের রঙ গভীর নীল। তারপর কোনো একটা জায়গায় এসে ট্রেন একেবারে শহরের মধ্যস্থল দিয়ে চলতে লাগলো বাঁশী বাজিয়ে। লোকজন আলো দোকান বাজার—হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। ডাউন টাউনের বুক ভেদ করে এ রকম ট্রেন চলা তা-ও কম অভিনব নয়।

গন্তব্যে পেঁছিতে পেঁছিতে রাত দশটা বাজলো। স্টেশনে নেমেই দেখি বন্ধু ডক্টর ওয়ারনার ফ্রীডরিখ দাঁড়িয়ে আছেন হাসি মুখে। দেখতে পেয়েই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো বটেই, সারা জগতেই তুলনামূলক সাহিত্যের একজন দিকপাল, পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত। বেশ বয়েস হয়েছে, কিন্তু হালকা ছিপছিপে চেহারা, ভঙ্গী সব সময়েই প্রফুল্ল ও চঞ্চল।

একবার কলকাতায় আমাদের অতিথি হয়ে এসেছিলেন। যাচ্ছিলেন অন্যত্র—খুব সম্ভব অস্ট্রেলিয়াতে কোনো কনফারেন্সে যোগ দিতে। বুদ্ধদেবের অনুরোধে পথে নেমে তিনদিন থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে গেলেন।

কলকাতায় আসার আগে বুদ্ধদেবের সঙ্গে পত্রালাপ ছিলো, চাক্ষুষ পরিচয় ছিলো না। মজার একটি চিঠি লিখে জানালেন, 'শোনো বুদ্ধদেব, তুমি বোধ হয় ভাবছো আমি একজন বৃদ্ধলোক, মোটেই তা নয়। এয়ারপোর্টে এসে দেখবে একটি পরিণত যুবক হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। অত ফুট অত ইঞ্চি লম্বা, চুল পাতলা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, মাথায় টেকসান টুপি, কোমরে টেকসান বেল্ট, আর নেমেই তার যাকে তুমি বলে মনে হবে তখনই সে তাকে তার ডান-হাতটা প্রচণ্ড জোরে নাড়িয়ে জানিয়ে দেবে সে কি।'

চিঠিটা পড়ে আমরা খুব হেসেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম এক পাগল লোক। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পরে এয়ারপোর্টে গিয়ে বুদ্ধদেবের পত্রালাপে সীমাবদ্ধ সেই বন্ধুটিকে চিনে নিতে একটুও কষ্ট হয়নি। তখন তিনি বিপত্নীক ছিলেন। র‍্যালে স্টেশনে নেমে দেখলাম একাই নন, পাশে দাঁড়ানো একটি মহিলাও সমান আগ্রহে তাকিয়ে আছেন আমাদের জন্য। ভেবেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্য কোনো অধ্যাপিকাও এসেছেন তাঁর সঙ্গে। তাড়াতাড়ি আলাপ করিয়ে দিলেন, 'আমার স্ত্রী, আইলীন।'

আমরা অবাক। এই বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করে নিলেন কখন?

খুশীতে ভরপুর গলায় বললেন, 'কেমন সারপ্রাইজ দিলাম? মাত্রই একমাস হয়েছে, বউ আমার চমৎকার।'

ভদ্রমহিলাটির মুখেও খুশির আলো প্রতিফলিত হলো। মনে হলো ফ্রীডরিখের কাছাকাছিই বয়েস হবে। কিন্তু প্রেমের যে বয়েস নেই একথা এই দুটি নববিবাহিত পাকা চুলের প্রৌঢ় দম্পতিকে দেখে নিঃসংশয় হওয়া গেল।

স্টেশন থেকে ভদ্রমহিলাই গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পাসে নিয়ে এলেন। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে করতে যেমন রাত আরো বেড়ে উঠলো, মহিলাটির সঙ্গে নতুন আলাপের ব্যবধানও তেমনি অনেক ঘুচে গেল। গাড়িটা খুব আস্তে আস্তে চালাচ্ছিলেন, স্পীড লিমিট একবারও ছাড়াচ্ছিলেন না নির্জন বলে। কথাবার্তাতেও মনে হচ্ছিলো, সব কাজই তিনি এই রকম নিয়মমতো ধীরে সুস্থে করেন। দেখতে একটুও ভালো নন, অত্যন্ত বেশী রোগা, অত্যন্ত বেশী লম্বা, মুখের চামড়া মসৃণ নয়, সারা মুখে নাকটাই সব চেয়ে বেশী উঁচু হয়ে ঘোষণা করছে নিজেকে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অতি নরম, কণ্ঠস্বর অতি কোমল, মুখের হাসি সব সময়েই অমলিন। ব্যবহারের মধুরতা, সমতা এবং ভদ্রতা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করলো। আমাদের না বলে আমাকে বলছি এইজন্যই যে,

দেখা হওয়া মাত্রই ডক্তর ফ্রীডরিখ এবং বুদ্ধদেব নিজেদের মধ্যেই নিজেরা মগ্ন হয়ে এমন অনর্গল বাক্যালাপে নিযুক্ত হলেন যে আমাদের অস্তিত্ব বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলেন। ফ্রীডরিখের বন্দোবস্ত মতো এ-দেশের আইন ভঙ্গ করে ওঁরা দুজন বসেছিলেন পিছনে, আমরা সামনে। সুতরাং আইলীনের সঙ্গে আমার একার পরিচয়টাই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। ওঁরা দুজন সারা রাস্তাই একই ধরনের নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য আলোচনায় সময় কাটালেন। যার নাম পরমার্থ।

এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো বড়ো সুন্দর। কী সাজানো-গুছোনো সযত্নরক্ষিত যে বলবার নয়। যতোবার যতো ক্যাম্পাসে গিয়েছি, এই একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আসলে যে যে-কাজ করে, সবই এতো মনোযোগ দিয়ে করে যে কোনো মালিন্যই জমতে পারে না। মহাভারতের ধর্মব্যাধের মতো। যদিও সে কসাই, প্রাণী-হত্যাই তার পেশা, তবু পিতামহ ভীষ্মের বিবেচনায় তার তুল্য ধার্মিক নেই। কী কারণ? না, তার যা কর্ম, সেই কর্মে সে একাগ্রচিত্ত।

মালিরা ফাঁকি দিলে তো মাঠে ঘাস শুকোবে? ঠিক মতো বপন না করলে তো ফুলের অজন্মা হবে? জলসিঞ্চন অনিয়মিত হলে তো পাতা ঝরবে? এসব তো হয় না। যিনি দেখাশুনো করেন, তিনি ঠিকই দেখাশুনো করেন, ঘুষ নিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন না। তাছাড়া অকারণে কেউ নষ্টও তো করে না। বাগানে স্নান পথে, প্রান্তরে যেখানে যে নির্দেশ লেখা আছে সকলেই তা অলঙ্ঘ্যভাবে পালন করে। সেই জন্যই সব সৌন্দর্যই লালন-পালন সম্ভব হয়ে ওঠে।

সেই রাত্রে ওঁরা আমাদের 'ক্যারোলীনা ইন' বলে একটি হোটেলে এনে তুললেন। দোতলার সামনের দিকে চমৎকার একটি সুইট, সব রকম আরামের বন্দোবস্তই সুচারুরূপে সম্পন্ন। রাত হয়েছিলো অনেক, একটু পরেই ওঁরা চলে গেলেন, আমরাও ক্লান্ত ছিলাম, শুয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। সকালেও অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়িই উঠতে হলো। ডক্টর ফ্রীডরীশ সাড়ে আটটায় আসবেন কথা ছিলো। উঠেই জানালার তলায় ফুলের সমারোহ দেখে চোখ থেমে গেল।

বেল বেজে উঠলো, এসে গেছেন ফ্রীডরীশ, নিচে থেকে ফোন করে বলছেন, 'তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো।'

রোদ চড়েছে বেশ, শহর ঘুরতে হলে এই মুহূর্তেই বেরুনো উচিত।

দেখা হতে বললেন, 'সময় এতো কম যে যতো কথা আমার বলবার আছে, তা বলাই যাবে না। ঘুরতে ঘুরতেই যতোটকু।'

যে কোনো জায়গাই হোক একটু উঁচু নিচু হলেই ছবি ছবি দেখায়।

চ্যাপেলহীলও সেই ছবিরই অন্তর্গত আর এক ছবি। পথের দু-পাশে অনেক বড়ো বড়ো গাছের ছায়া, ফাঁকে ফাঁকে লন বাগান সম্বলিত সব বাড়ি। চলতে চলতে ফ্রীডরীশ বললেন, 'ওপেন থিয়েটার দেখেছো কখনো ?'

'না তো—'

'চলো দেখাই—' লোকালয় ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা পাইন বনের মধ্যে গাড়ি ঢোকালেন। মধ্য দিয়ে হলুদ কমলা পাতা বিছোনো চলার পথ, সামনে চারিদিক ঘেরা পাহাড়। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হলো কিছুটা, গিয়ে দেখি ঘেরা পাহাড়ের মাঝখানে সুন্দর এক চৌকো সমতল ভূমি। ঠিক ছোট একটি উপত্যকা। সেই উপত্যকাটাই এদের অরণ্যমঞ্চ, মঞ্চের পিছনে গাছের লতার আস্তরণ, দু পাশে দুটি গুহার আড়াল, সে দুটি গ্রীনরুম। তিন দিক ঘিরে পাহাড় কেটে সিঁড়ির মতো খাঁজ করে বসবার গ্যালারী। বাইরে থেকে এই উপত্যকায় প্রবেশ করবার মুখে ও দুদিকে ঐ পিছনের মতোই দুটি পাথরের খোপ, সে দুটি টিকিট ঘর।

প্রকৃতির খেয়ালের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির এই সমন্বয়ে মোহিত না হয়ে উপায় থাকে না। মাথার উপরে আকাশের চৌকো আলো ঝলমল করছে, নিশ্চয়ই সেই আলোতেই এই খোলা জায়গায় দুপুরে নাটক দেখতো লোকেরা। নিশ্চয়ই আনন্দের কোনো অভাব হতো না, আমি হেঁটে হেঁটে সমস্ত জায়গাটা পরিভ্রমণ করলাম। গ্রীনরুম, টিকিট ঘর সর্বত্রই উঁকি মেরে দেখলাম। মাঝখানে একবার ডক্টর ফ্রীডরীশ চেঁচিয়ে বললেন, শোন, ভিতরে যেয়ো না, সাপ থাকতে পারে।' বলেই কর্তব্য সম্পন্ন করে দোতলা সমান গ্যালারির কোনো এক ধাপে বসে সমানে কথা বলতে লাগলেন বুদ্ধদেবের সঙ্গে। আমি জানি সে কথা অন্য যে প্রসঙ্গেই শুরু হোক না কেন, সারা হবে সেই 'কম্পারেটিভ লিটারেচারের' মহাসমুদ্রে গিয়ে।

এই অরণ্যমঞ্চ এখন স্মৃতি। এই মঞ্চ কবে কখন তৈরি হয়েছিলো, তার হিসেব করতে গেলে অনেক পিছনে সরে যেতে হয়। ধু ধু পিছনের দিকে তাকিয়ে এই প্রত্যয়ই দৃঢ় হয়, মানুষের প্রয়োজন শুধু ভাত-কাপড়েই মেটে না। খাদ্যবস্ত্রের মতো আরো অনেক অপার্থিব ক্ষুধা তাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়। সেই ক্ষ্যাপামিতেই মানুষ গান শোনে, ছবি দেখে, কবিতা পড়ে, গল্প বানায়। তাই প্রস্তর যুগেও এর বিরতি ছিলো না।

সময় নেই বিলাসী হয়ে বসে থাকবার, ভাববার, উপভোগ করবার। তাই

অল্প পরেই উঠতে হলো। ঘরে ফিরে ফ্রীডরীশের বাড়িতে এলাম, সেখানেই লাঞ্চ। মিসেস ফ্রীডরীশ দেরি দেখে বোধ হয় ঘরবার করছিলেন, আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'আমার স্বামীর কান্ড তো। ভাবলাম কোথা থেকে আবার কোথায় নিয়ে যায়। এসো, এসো—'। হাত ধরলেন আদর করে, ঘরে এনে বসালেন। একেবারে মাতৃমূর্তি।

'আইলীন, আইলীন' ডাকতে ডাকতে একটি যুবতী মেয়ে দোতলা থেকে নেমে এলো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালো। আইলীন, অর্থাৎ মিসেস ফ্রীডরীশ আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ওয়ারনারের পূর্বপক্ষের মেয়ে ; এখন আমি ওর মা।' হাসলেন মিষ্টি করে।

সাতান্ন আটান্ন বছর বয়সের একটি মহিলাকে তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের কোনো মেয়ে এ রকম নাম ধরে ডাকলে আমাদের বাঙালী কানে বড়ই শ্রুতিকটু লাগে। তার উপরে যিনি ওর বাবার বিবাহিত স্ত্রী। কিন্তু আইলীন সম্ভবত কিছু মনে করে না, মেয়ের পিঠে সস্নেহে হাত বুলোলেন তিনি।

দু জায়গায় বক্তৃতার বন্দোবস্ত হয়েছিলো। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় এবং চ্যাপেলহীল। তিনটে থেকে পাঁচটা ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাঝে ডিনার, তারপর চ্যাপেলহীল। লাঞ্চ সেরে ফিরে এলাম হোটেলে। সেই সকালে বেরিয়েছি, একটু হাত-পা ছড়াতে ইচ্ছে করছিলো। তার বদলে দ্রুতহাতে বেশ পরিবর্তন করে আবার বেরুতে হলো। গাড়ি অপেক্ষা করছিলো নিয়ে যাবার জন্য, গিয়ে দেখি হল ভর্তি হয়ে গেছে। সেই ভরা হল আমার জন্য একটি বাড়তি সুখ সংযোজন করেছিলো বেশ কয়েকটি বাঙালীর মুখদর্শন করিয়ে। তার মধ্যে একটি পাকিস্তানী মেয়েও ছিলো, সে মেয়েটিও বাঙালী।

সকলের সঙ্গে আলাপ হয়ে মাতৃভাষায় কথা বলতে পেরে আমার প্রাণমন জুড়িয়ে গেল। দেখা গেল আগে থেকেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে আমাদের নৈশ ভোজের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। যেন পরের দেশে সব ঘরের মানুষ একত্রিত হয়েছি এই রকম আমার মনে হচ্ছিলো, হওয়া স্বাভাবিক নয় জেনেও। কেননা এই পরের দেশের পরেরা আমাদের স্নেহ ভালোবাসা এবং বন্ধুতার যে উত্তাপ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তার কোনো তুলনা নেই। তবু। বোধহয় ভাষার টান।

সেখান থেকেই সোজা চ্যাপেলহীল, চ্যাপেলহীল সেরে হোটেলে ফিরতে না ফিরতেই রাত দশটায় একদল মার্কিন যুবক এসে তাদের আড্ডায় নিয়ে যাবার

জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। এরা সব নিয়ম না মানার দল, এদের বেশভূষা অগোছালো, চুল উড়ু উড়ু, দাড়ি দাড়ি মুখ। বক্তৃতা শুনে তাদের তৃষ্ণা মেটেনি, কিছুক্ষণের জন্য বুদ্ধদেবকে তারা ঘরোয়াভাবে পেতে চায়। বুদ্ধদেবের একজন ছাত্র তাদের বন্ধু ছিলো (খুব সম্ভব প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলো সে, মাস্টার মশায়ের বিষয়ে তার অগাধ ভক্তি তাদেরও সংক্রমিত করেছে। আমার কথাও অজ্ঞাত নয়। বুদ্ধদেব সানন্দেই চলে গেলেন তাদের সঙ্গে, আমি গেলাম না। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছিলো। তাছাড়া কাল সকাল হতেই ফেরার ট্রেন ধরতে হবে। গোছগাছ আছে। যতো কম সময়ের জন্যে আসি না কেন, ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্যও কম তালিকা থাকে না। দৈনন্দিন অভ্যাসের একবিন্দু ত্রুটি সহ্য করতেও বুদ্ধদেব অক্ষম। এমন কি সকালে দাড়ি কামাবার পরে যে তোয়ালে দিয়ে তিনি মুখ মোছেন ঠিক সেই তোয়ালেটিই যদি হাতে না পান, তাহলে গেল তাঁর দিবানিশা।

তার উপরে শীতের দেশ, হোক না বসন্তকাল, তবু গায়ে চাপাবার পোশাক যথেষ্ট লাগে। সব বেরিয়েছে, সব বাক্স থেকে এলোমেলো পড়ে আছে। শাড়িও কম আনিনি। এদেশে শাড়ির প্রশংসা এতো বেশী শুনেছি যে তার প্রদর্শনে আমার বড়ো লোভ জন্মেছে। দিনে চারবার বেরুতে হলেও পুনরাবৃত্তি করি না। একবার বুদ্ধদেবের এক ছাত্রীর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। ছাত্রীটির নাম মার্গোহ্যারিস, ভাস্কর, বেশ ভালো কাজ করে, প্রশংসা আছে স্বদেশে। আমার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তখন সে ডিভোর্সী ছিল। কিছুকালের মধ্যে আবার যাকে বিবাহ করলো, সে ভদ্রলোকটি খুব ধনী ব্যক্তিও বটে, খুব পণ্ডিত ব্যক্তিও বটে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেই সেদিনের সেই নিমন্ত্রণ। আমাদের সঙ্গে আলাপ করাতে আরো একজন ফরাসী মহিলাকেও নিমন্ত্রণ করেছিলো সে। মহিলাটি পেইণ্টার। বোধহয় শখের পেইণ্টার। দেখতে অপরূপ সুন্দরী। এক মিলিওনিয়ারের স্ত্রী। অবশ্য স্বামী জীবিত নেই।

প্রজাপতির মতো ফুরফুর করে লম্বা গাউনে ঢেউ তুলে ঘরে ঢুকে আলাপ হতে না হতেই মার্গোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'ওঃ ওয়ান্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল, সুপার্ব। আমারটা এনেছো?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আগে আমার জিনিসটা দেখে নিই, তারপর আসছি, কিছু মনে করো না। মার্গোকে দেখছো তো আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে? আমি আর থাকতে পারছি না।'

মার্গোকে যে আজ সত্যিই অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলি ভাবছিলাম সুখী যুগল জীবন মানুষকে কতো অন্য রকম করে দেয়। ওকে তো আমি ওর একঘরের স্টুডিয়ো অ্যাপার্টমেণ্টেও দেখেছি? সেখানেও একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলো, নিতে এসেছিলো গাড়ি করে। যে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলো, 'মিস্টার অমুক, আমার স্বামী।'

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, হেসে ফেলে বলেছিলো, 'দো উই আর সেপারেটড, বাট উই আর ফ্রেন্ড।'

তখন তো ও দেখতে এতো ভালো ছিলো না। এখন কী মসৃণ চামড়া, কী সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লালচে গালের রং। কী সুনালু চোখ।

মার্গো বললো, 'শোবার ঘরে চলো, দেবো।' মহিলাটি কী চায়, মার্গো তাকে কী দেবে আমার পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব ছিলো না। সম্ভব হতোও না যদি মার্গো আমাকেও তাদের সঙ্গে শোবার ঘরে নিয়ে যেতো। ঘরে গিয়ে সে আলমারি খুলে একটি পাথর খচিত ছোটো কৌটো বার করতে করতে বললো, 'তিন জোড়া আছে, দ্যাখো কোনটা ঠিক ফিট করে।' কৌটোর ঢাকনা তুলে দেখে মহিলাটি বললো, 'তোমারটা খোলো দেখি মিলিয়ে নিই।'

মার্গো চোখে হাত দিয়ে যা খুলে আনলো তা তার চোখের বাঁকানো লম্বা লম্বা কুচকুচে কালো পালক। চকচকে গালে যা স্বপ্নের মতো ছায়া ফেলে ফেলে ওঠে পড়ে। খোলামাত্রই তার সৌন্দর্যের অনেকখানি খসে গিয়ে আগের চেহারা বেরিয়ে এলো। তবু তার দশ বছর বয়েস কমে যাওয়া কাঁচা কাঁচা ভাবটা তেমনিই বজায় ছিলো। মার্গো বললো, 'যদিও অত্যন্ত একসপেনসিভ, তবু কিনে দেখছি রংটা সত্যিই ভালো, একটুও মেকি মনে হয় না। হয়?'

মহিলা বললেন, 'একেবারে না। এটাও আমার চাই। আচ্ছা দাঁড়াও আগে এটা দেখি।' আয়নার কাছে চলে গিয়ে নিজেরটা খুলে অন্যগুলো একটা একটা করে লাগিয়ে দেখতে লাগলো কোনটা ঠিক মানায়।

এখন আমাদের দেশেও এসবের প্রচলন হয়েছে, কিন্তু তখন অন্তত আমার কাছে স্বপ্নেরও পরপারে।

মার্গো হেসে বললো, 'তুমি নাও না একজোড়া, খুব ভালো দেখাবে।'

আমি সভয়ে বললাম, 'না, না—'

তারপরে আবার এ-ঘরে চলে এলাম সবাই। মার্গো পানীয় পরিবেশন করলো,

সঙ্গে নানা রকম খাবার। মার্গোর স্বামী মার্গোর থেকে অন্তত কুড়ি বছরের বড়ো, চেহারা ভারিক্কি এবং কাজে-কর্মে স্ত্রীকে সাহায্যদানে অনিচ্ছুক। আমাদের বাঙালী স্বামীদের মতোই। এই বদ স্বভাব কোথা থেকে পেয়েছে কে জানে, কিন্তু বুদ্ধদেব নিজের দলে লোক পেয়ে খুব খুশি। মহিলাটি সেজন্য অনেক খোঁটা দিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার, মৃদু মৃদু হাসছিলেন আর চুরুট কামড়াচ্ছিলেন। ফরাসি মহিলাটি দেখলাম মদ্যপানে খুব সিদ্ধ। বুদ্ধদেবের একরাশি বরফের মধ্যে এক কর পরিমাণ পানীয় নেওয়া দেখে হাসতে হাসতে মরে গেলেন এবং খানিকক্ষণের মধ্যেই এতো অধিক পরিমাণে খেয়ে ফেললেন যে, সেই হাসি প্রায় মাতালের হাসিতে পরিণত হলো। তারপরেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'এ রকম পোশাক তোমার কটা আছে।'

আমি কিন্তু কিন্তু হয়ে বললাম, 'আমার পোশাক তো ঠিক তোমাদের মতো নয়। আমরা শাড়ি পরি, আর সেই সঙ্গে—'

'না, সঙ্গের কথা শুনতে চাই না, শাড়ির কথা বলো। কটা শাড়ি আছে তোমার।'

'সেটা বলা মুশকিল।'

'কেন? মুশকিল কেন? মার্গো তোমার কটা পোশাক বলো তো?'

মার্গো বললো, 'তুমি হলে মিলিওনিয়ারের স্ত্রী, তোমার সঙ্গে কে পাল্লা দেবে, সুতরাং সেই প্রসঙ্গ থাক।'

'তুমিও তো মিলিওনিয়ারের স্ত্রী।'

এবার আমি সহাস্যে বললাম, 'আমি কিন্তু নেহাৎই একটি গরীব লেখক এবং অধ্যাপকের স্ত্রী।'

'বেশ, তাই হলো কটা শাড়ি।' মাথায় এটাই তার ঢুকেছে।

বললাম, তোমার কটা পোশাক?'

'কটা পোশাক মার্গো তুমি বলে দাও।'

মার্গো গলা নামিয়ে ফিসফিস করলো, 'ওর পোশাকের সংখ্যা আশে পাশে আমাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশী বলে বহু অহংকার, কিছু মনে কোরো না। মাথা তো হালকা করে ফেলেছে মদ খেয়ে, যা তা বলছে।

'কী হলো, বলছো না মার্গো?' মহিলা তার নিজের কথায় ঠিক।

'বলছি বাবা বলছি। তোমরা সবাই শোনো, মেরিলীনের একুশটা পোশাক আছে। বাস, এবার খেতে চলো।'

মার্গো সবাইকে উঠিয়ে খাবার ঘরে এলো। আমাদের বসিয়ে ছুটে ছুটে নিয়ে আসছিলো সব, রোস্ট কাটছিলো। আমি তাকে সাহায্য করার জন্য উঠেছিলাম, টেনে বসিয়ে দিয়ে মহিলা আবার বললেন, 'কটা পোশাক?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'সত্যি শুনবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'এখানে নিয়ে এসেছি বাইশ খানা, আর কলকাতায় আলমারীতে আরো চল্লিশ-পঞ্চাশ খানা আছে।'

'ইমপসিবল্।' টেবিল চাপড়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, বুদ্ধদেবকে ঠেলে বললেন, 'তোমার স্ত্রী সত্য কথা বলছে?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'বলছেন যখন নিশ্চয়ই সত্য, তবে কটা শাড়ি আমি কী করে জানবো?'

'তুমি তার স্বামী, নিশ্চয়ই তুমিই কিনে দাও।'

'ওসব কেনাকাটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, ওসব সম্পূর্ণই ওর ডিপার্টমেণ্ট।'

মার্গোও কিন্তু কাজ থেকে হাত গুটিয়ে আমার এতো শাড়ি শুনে তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে ছিলো। আমিও কম তাজ্জব হইনি ওদের এই ক'টি পোশাকই এতো উল্লেখযোগ্য শুনে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে মাথা ঠাণ্ডা হলেও মহিলা কিন্তু আমার শাড়ির সংখ্যাটি ভুললেন না। সাব্যস্ত গলায় বললেন, 'তুমি ঠাট্টা করোনি তো?'

সত্যের অপলাপ না করে বললাম, 'না, ঠাট্টা করবো কেন? ও রকম একা আমারই নয়, অনেকেরই। একজন মেয়ের যখন নতুন বিয়ে হয়, সত্তর-পঁচাত্তরখানা শাড়ি সে উপহারই পায়।'

মেরিলীন চোখ উল্টোলেন, 'দাঁড়াও আমি শীগগিরই ভারতবর্ষে নিজের জন্য পাত্র খুঁজতে যাবো—'। নিজের রসিকতায় নিজেই খুব হাসলেন, কিন্তু আবারো বললেন, 'সত্যি এতো শাড়ি তোমাদের?'

শাড়ির সংখ্যা নিয়ে ওদের এই বিস্ময় আমাকে সচেতন করে দিয়েছিলো। নিজের ধনজনগুণপনা ইত্যাদি দিয়ে অন্যকে চমকে দিতে কার না ভালো লাগে? নিশ্চয়ই সেই কারণেই কোথাও যাবার সময়ে সর্বত্র শাড়ির সংখ্যা একটু বেশীই হয়ে যেতো আমার। এখানেও তাই হয়েছে। বুদ্ধদেব ঐ ছেলেদের সঙ্গে চলে গেলে, শাড়ি ভাঁজ করতে করতে মনের এই চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল।

ছবিটা উপভোগ্য হলো না। আমরা সচেতনভাবেই এমন অনেক কাজ করি বিশ্লেষণ করলে যার এই চেহারাই দাঁড়ায়।

বুদ্ধদেব এলেন প্রায় রাত একটায়। আড্ডাপটু মানুষের এই আড্ডা বেশ ভালোই লেগেছে, ছেলেগুলো সবাই সাহিত্য-প্রেমিক, পড়ুয়া, তার মধ্যে কেউ কেউ লেখক, সুতরাং তাদের সঙ্গ অপ্রিয় হবার কথা নয়। এসে বললেন, 'তুমি গেলে খুব খুশি হতো ওরা, তোমারও ভালো লাগতো। বারে বারেই বলছিলো।'

সকাল আটটায় ট্রেন, পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তাও কম নয়, ভোর ছটাতেই মিসেস ফ্রীডরীশ এসে হর্ন দিলেন। তখনো ভোর হয়নি, আলো ফোটেনি, ঘুমই বা পাকলো কখন? তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, নেমে এলাম স্যুটকেস নিয়ে, বাইরে এসে দেখি চারদিক সূর্যোদয়ের আভাসে লাল-বেগুনি। এই দৃশ্য আর কবে দেখেছি চিন্তা করে মনে আনতে হলো। এই সময়ে আমরা বিছানা ছাড়ি না, আমাদের ঘুম ভাঙে না, সূর্যকে আমরা অপচয় করি, পিঠ ফিরিয়ে বিদায় দিই। বৈদ্যুতিক আলোর দয়ায় সূর্যের প্রয়োজন কমে গেছে জীবনে। যখন বিদ্যুৎ ছিলো না, লোকেরা ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করতো, দিনের প্রতিটি ফোঁটা সূর্যালোক কাজে লাগতো, সূর্য অস্ত গেলেই অন্ধকারে মায়ের কোলে বিশ্রাম। দিনের কাজে হেঁটে খেটে, দিনের রোদ গায়ে মেখে সুনিদ্রা হতো রাত্রে, কেউ ক্লান্তিতে ভুগতো না, আলস্যে ভুগতো না, মৃত্যুর আগে রোগ ভোগও কম ছিলো।

মিসেস ফ্রীডরীশ তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেই নিশুতি অন্ধকারে আলো জেলে ডক্টর ফ্রীডরীশ আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিলেন, ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন। তারপরেই বুদ্ধদেবকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন বসার ঘরে। বিদায়ের মুহূর্তে আরো জরুরী কথা আছে অনেক। ভারতবর্ষের শত্রুসংকুল টলোমলো 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগকে যে করেই হোক দৃঢ়তার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখার কথা, সাহিত্য পাঠে দক্ষ হতে গেলে এটাই যে সর্বোৎকৃষ্ট রাস্তা সেই কথা, প্রয়োজন মতো তিনি যে সর্বদাই বুদ্ধদেবের পাশে আছেন সেই কথা।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে হতে, বাইরে আলো ফুটলো, মস্ত আস্ত গোল লাল সূর্য দিগন্ত ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে এলো উপরে, সকালের ভুলে যাওয়া শোভা দেখতে দেখতে আবার ফ্রীডরীশ দম্পতির সঙ্গে পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে রেল স্টেশনে এসে পৌঁছোলাম। আবার সেই সুন্দর ট্রেন। কাঁচের ফাঁকে

মার্গো সবাইকে উঠিয়ে খাবার ঘরে এলো। আমাদের বসিয়ে ছুটে ছুটে নিয়ে আসছিলো সব, রোস্ট কাটছিলো। আমি তাকে সাহায্য করার জন্য উঠেছিলাম, টেনে বসিয়ে দিয়ে মহিলা আবার বললেন, 'কটা পোশাক ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'সত্যি শুনবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'এখানে নিয়ে এসেছি বাইশ খানা, আর কলকাতায় আলমারীতে আরো চল্লিশ-পঞ্চাশ খানা আছে।'

'ইমপসিবল্।' টেবিল চাপড়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, বুদ্ধদেবকে ঠেলে বললেন, 'তোমার স্ত্রী সত্য কথা বলছে ?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'বলছেন যখন নিশ্চয়ই সত্য, তবে কটা শাড়ি আমি কী করে জানবো ?'

'তুমি তার স্বামী, নিশ্চয়ই তুমিই কিনে দাও।'

'ওসব কেনাকাটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, ওসব সম্পূর্ণই ওর ডিপার্টমেণ্ট।'

মার্গোও কিন্তু কাজ থেকে হাত গুটিয়ে আমার এতো শাড়ি শুনে তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে ছিলো। আমিও কম তাজ্জব হইনি ওদের এই ক'টি পোশাকই এতো উল্লেখযোগ্য শুনে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে মাথা ঠাণ্ডা হলেও মহিলা কিন্তু আমার শাড়ির সংখ্যাটি ভুললেন না। সাব্যস্ত গলায় বললেন, 'তুমি ঠাট্টা করোনি তো ?'

সত্যের অপলাপ না করে বললাম, 'না, ঠাট্টা করবো কেন ? ও রকম একা আমারই নয়, অনেকেরই। একজন মেয়ের যখন নতুন বিয়ে হয়, সত্তর-পঁচাত্তরখানা শাড়ি সে উপহারই পায়।'

মেরিলীন চোখ উল্টোলেন, 'দাঁড়াও আমি শীগগিরই ভারতবর্ষে নিজের জন্য পাত্র খুঁজতে যাবো—'। নিজের রসিকতায় নিজেই খুব হাসলেন, কিন্তু আবারো বললেন, 'সত্যি এতো শাড়ি তোমাদের ?'

শাড়ির সংখ্যা নিয়ে ওদের এই বিস্ময় আমাকে সচেতন করে দিয়েছিলো। নিজের ধনজনগুণপনা ইত্যাদি দিয়ে অন্যকে চমকে দিতে কার না ভালো লাগে ? নিশ্চয়ই সেই কারণেই কোথাও যাবার সময়ে সর্বত্র শাড়ির সংখ্যা একটু বেশীই হয়ে যেতো আমার। এখানেও তাই হয়েছে। বুদ্ধদেব ঐ ছেলেদের সঙ্গে চলে গেলে, শাড়ি ভাঁজ করতে করতে মনের এই চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল।

ছবিটা উপভোগ্য হলো না।' আমরা সচেতনভাবেই এমন অনেক কাজ করি বিশ্লেষণ করলে যার এই চেহারাই দাঁড়ায়।

বুদ্ধদেব এলেন প্রায় রাত একটায়। আড্ডাপটু মানুষের এই আড্ডা বেশ ভালোই লেগেছে, ছেলেগুলো সবাই সাহিত্য-প্রেমিক, পড়ুয়া, তার মধ্যে কেউ কেউ লেখক, সুতরাং তাদের সঙ্গ অপ্রিয় হবার কথা নয়। এসে বললেন, 'তুমি গেলে খুব খুশি হতো ওরা, তোমারও ভালো লাগতো। বারে বারেই বলছিলো।'

সকাল আটটায় ট্রেন, পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তাও কম নয়, ভোর ছটাতেই মিসেস ফ্রীডরীশ এসে হর্ন দিলেন। তখনো ভোর হয়নি, আলো ফোটেনি, ঘুমই বা পাকলো কখন? তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, নেমে এলাম স্যুটকেস নিয়ে, বাইরে এসে দেখি চারদিক সূর্যোদয়ের আভাসে লাল-বেগুনি। এই দৃশ্য আর কবে দেখেছি চিন্তা করে মনে আনতে হলো। এই সময়ে আমরা বিছানা ছাড়ি না, আমাদের ঘুম ভাঙে না, সূর্যকে আমরা অপচয় করি, পিঠ ফিরিয়ে বিদায় দিই। বৈদ্যুতিক আলোর দয়ায় সূর্যের প্রয়োজন কমে গেছে জীবনে। যখন বিদ্যুৎ ছিলো না, লোকেরা ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করতো, দিনের প্রতিটি ফোঁটা সূর্যালোক কাজে লাগতো, সূর্য অস্ত গেলেই অন্ধকারে মায়ের কোলে বিশ্রাম। দিনের কাজে হেঁটে খেটে, দিনের রোদ গায়ে মেখে সুনিদ্রা হতো রাত্রে, কেউ ক্লান্তিতে ভুগতো না, আলস্যে ভুগতো না, মৃত্যুর আগে রোগ ভোগও কম ছিলো।

মিসেস ফ্রীডরীশ তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেই নিশুতি অন্ধকারে আলো জেবলে ডক্টর ফ্রীডরীশ আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিলেন, ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন। তারপরেই বুদ্ধদেবকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন বসার ঘরে। বিদায়ের মুহূর্তে আরো জরুরী কথা আছে অনেক। ভারতবর্ষের শত্রুসংকুল টলোমলো 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগকে যে করেই হোক দৃঢ়তার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখার কথা, সাহিত্য পাঠে দক্ষ হতে গেলে এটাই যে সর্বোৎকৃষ্ট রাস্তা সেই কথা, প্রয়োজন মতো তিনি যে সর্বদাই বুদ্ধদেবের পাশে আছেন সেই কথা।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে হতে, বাইরে আলো ফুটলো, মস্ত আস্ত গোল লাল সূর্য দিগন্ত ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে এলো উপরে, সকালের ভুলে যাওয়া শোভা দেখতে দেখতে আবার ফ্রীডরীশ দম্পতির সঙ্গে পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে রেল স্টেশনে এসে পৌঁছোলাম। আবার সেই সুন্দর ট্রেন। কাঁচের ফাঁকে

পণ্ডিত ফ্রীডরীশের মন খারাপ করা মুখশ্রী আর মিসেস ফ্রীডরীশের হাত নাড়া দেখতে দেখতে সেই ট্রেন কখন আবার এক সময়ে আমাদের নিয়ে কোথায় কতোদূর চলে এলো।

মিসেস ডরোথী নরমান নিউইয়র্ক শহরের একজন বিশেষ এবং বিশিষ্ট মহিলা। কবিতা লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, 'হিরোইক এনকাউণ্টার' নামে একটি বইও আছে, গুহাচিত্র থেকে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত তথ্য সম্বলিত পুস্তক। বেশ সুলিখিত মূল্যবান বই। বুদ্ধদেব যেবার একা এসেছিলেন সেবারই আলাপ হয়েছিলো, সেই আলাপ বন্ধুতায় পরিণত হয়। স্বামী মারা গেছেন বহু দিন যাবত, স্বামীর বিপুল সম্পত্তির একা অধিকারিণী।

একষট্টি সালে একটি জনরব শোনা গিয়েছিলো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নাকি এঁর সঙ্গে শীঘ্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। জনরব জনরবই। ডরোথী নরম্যান একথা শুনে প্রচণ্ড হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি যে এতো সম্মানিত মহিলা তা জানতাম না।' মহিলাটি অসামান্য সুন্দরী, বয়েস প্রায় পাঁচের ঘরে। আমি তাঁকে প্রথম কলকাতাতেই দেখি। অর্ধরাত্রির জন্য এসেছিলেন বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করতে। আসলে কোনো জরুরী কাজে দিল্লীতে এসেছিলেন, নেহরুর আতিথ্যই গ্রহণ করেছিলেন, সেখান থেকে ফিরে যাবার পথে কয়েক ঘণ্টার কলকাতা। এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছিলেন বুদ্ধদেবকে, বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছেন, সন্ধ্যায় এসে সেদিনই রাত দু'টোয় নিউইয়র্ক যাবার প্লেন ধরবেন। এইটুকুই অবস্থিতি আমাদের বাড়িতে। আমার সঙ্গে সেইটুকুই পরিচয়। আর ঐ ফ্রান্স জোসেফের ওখানে যতোটুকু দেখা।

তিনি একটি বিশাল পার্টি দিলেন তাঁর বাড়িতে। বললেন, 'তোমাদের অনারেই আমার এই পার্টির আয়োজন, বলো, কার কার সঙ্গে তোমাদের দেখা করার ইচ্ছে, আমি তাঁদের সবাইকেই ডাকবো।'

সিনজিনপার্স সে বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, বললেন, 'সিনজিনকে ডাকি।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমার বন্ধু হলে তুমি নিশ্চয়ই ডাকবে, তবে আমি তো ফরাসী ভাষায় দুরস্ত নই, ওঁর কবিতা আমি পড়িনি। আমার ভাষাও উনি জানেন না, কী নিয়ে আলাপ করবো?'

'তবে তুমি কাকে চাও ?'

'ইহুদি মেনুইন এই শহরে থাকলে বলো না তাঁকে। শুনেছি কয়েক দিনের জন্য রবার্ট ফ্রস্ট নিউইয়র্ক এসেছেন, আলাপ আছে তোমার সঙ্গে ?'

'নিশ্চয়ই। দু'জনকেই আমি চেষ্টা করবো। অ্যালেনের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?'

'কবি অ্যালেন গিনজবার্গ ?'

'হ্যাঁ! সে-ই তো এখন মহা হুলুস্থুল করে বেড়াচ্ছে। দেখি, কেরুয়াককে পেলে তাকেও বলবো।'

ঈস্ট নদীর ধারে ডরোথী নরম্যানের সুবিশাল অ্যাপার্টমেণ্টের লিভিং রুমটি ভারতীয় জিনিসের একটি প্রদর্শনী বললেও অত্যুক্তি হয় না। লিভিং রুমটির এ মাথায় দাঁড়ালে ও মাথা ধূ ধূ করে। ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে পেঁচিয়ে তৈরি সেই হলে কতো যে সংগ্রহ তার ঠিক নেই। হাতির দাঁতের তৈরি নানা ধরনের কারুকলা, তামা কাঁসা পিতল সব কিছুর নমুনাতেই ঠাসা ঘর। সবই ভারতীয়। নিজের পোশাকও র' সিলকে তৈরি। ককটেল পার্টি। লম্বা বার কাউণ্টারে বহুমূল্য মদের ছড়াছড়ি। বোধহয় জনা পঞ্চাশেক নরনারী সমবেত হয়েছেন সেখানে, তার মধ্যে অন্ধ লেখক ভারতীয় ভেদমেটাকেও দেখা গেল। ভেদমেটা ঐ দেশেরই বাসিন্দা, একবার এসেছিলেন কলকাতায়। আমাদের বাড়িও এসেছিলেন, অল্প বয়েস, নরম ব্যবহার, দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও চলাফেরা স্বাভাবিক।

ককটেল পার্টিতে মোটামুটি সবাই প্রায় দাঁড়িয়ে থাকে, আমি সব সময়েই বসে থাকি। আমার তো মদ খাওয়া নেই, কোকাকোলা খেতে খেতে প্রাণ যায়, ঐ বসে বসেই খাই আর দেখি। আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে জানালা দিয়ে নদীটা চোখে পড়ছিলো। আমার একপাশে একজন বয়স্ক মহিলাও বসে বসে নিঃশব্দে ফরাসী মদে চুমুক দিচ্ছিলেন। এটা স্বাভাবিক নয়, এঁরা চুপ করে থাকেন না, অনর্গল কথা বলেন। দু' একজন ব্যতিক্রমের মধ্যে দেখছি এই মহিলাও পড়েন। অন্য পাশে একটি অতি সুশ্রী পরিণত যুবক, বেশী লম্বা নয়, বেঁটেও নয়, চশমার তলায় দুটি ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখ, পার্টির অনুপযুক্ত পোশাকে এলোমেলো চুলে একটি মেয়ের সঙ্গে সমানে কুসান ছোঁড়াছুঁড়ি করছিলো, আর কী নিয়ে একটা তর্কও হচ্ছিলো। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই হাত থামলো। তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা ছেড়ে উঠে এলো

কাছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, 'এই তো পেয়েছি, আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাং কাকে বলে।'

'বাং ?'

'হ্যাঁ বাং, বাং—'

আমি তখন ভাবলাম, কী জানি আমাদের দেশ থেকে যে রকম ব্যাং চালানোর ঘটা শুরু হয়েছে, সে বিষয়েই বোধহয় কিছু বলতে চাইছে। ঘাড় কাৎ করে বললাম, 'হ্যাঁ জানি বইকি।'

'বাং কাকে বলে ?'

'বাং ? বাং তো ফ্রগ—'

হো হো করে হাসতে হাসতে ঘর ফাটিয়ে দিল, 'নো, হানি, ফ্রগ নয়, বাং বাং। বাং জানো না ? ঐ যে বাং গঞ্জা চৌরুষ—এসবই তো ভারতীয় অমৃত। কী ভাবে হয় ?'

এতোক্ষণে বাংয়ের অর্থ আমার বোধগম্য হলো। সবিনয়ে বললাম, 'এ বিদ্যায় আমি একেবারেই পারদর্শিনী নই, তুমি বরং আমার স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারো, তিনি হয়তো জানেন।'

'তোমার স্বামী ? তুমি কি—'

'আমি মিসেস বোস—'

'মিসেস বোস ? বুঝেছি, বুঝেছি—কী আশ্চর্য। তোমাদের জন্যই তো আজ আমার এখানে আসা।' হাত বাড়ালো, 'আমার নাম অ্যালেন গীনজবার্গ, আমি কবিতা লিখি।'

'অ্যালেন গীনজবার্গ ! আরে আমরাও তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভীষণ উৎসুক।'

'কোথায় ? তোমার স্বামী কোথায়, তাঁর কাছে জানবার আমার অনেক কথা আছে। মিসেস নরমানের কাণ্ডটা দ্যাখো, আলাপ করিয়ে দেবে তো ? সব রুই কাৎলা ডেকেছে, তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত—'। চোখ টিপে হেসে চলে গেল সে।

পাশের মহিলাটি বললেন, 'আমিও বুঝেছিলাম যে তুমিই মিসেস বোস। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমিও আলাপ করবো, ডরোথী আমাকে বলেছে আমার স্বামীর বইয়ের সে নাকি একজন বিশেষ অনুরাগী। আমার স্বামী বিষয়ে তার ধারণা নাকি খুব উঁচুতে।'

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'আপনি—'

'আমি মিসেস জীমার।'

'বিখ্যাত দার্শনিক হাইনরীখ জীমারের—'

'ডরোথীর লিভিংরুম তো লিভিংরুম নয়, একটা গোটা বাড়ি, এতো লোক যে কে কোথায় আছে খুঁজে বার করা শক্ত। তবে ডরোথী জানে আমি এখানে বসে আছি, ও ঠিক নিয়ে আসবে। ততোক্ষণ তোমার সঙ্গেই কথা বলি।' মহিলা আমার পিঠে হাত রাখলেন, 'তোমাকে আমি অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিলাম আর ভাবছিলাম, ভারতবর্ষের মেয়ে ছাড়া আর কোন দেশের মেয়ে এমন শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে? এরা তো হরবোলা। বিশেষত এই আমেরিকার মেয়েরা। এক দণ্ড চুপ করে থাকতে পারে না।'

'আপনাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি কক্ষণো ভাবিনি এরকম একটা দেখা হয়ে যেতে পারে। হাইনরীখ জীমারের নাম আমাদের বাড়িতে আমার স্বামীর মুখে কতোবার উচ্চারিত হয় তার ঠিক নেই। তিনি আমাদের কাছে একজন মহাপুরুষ।'

মিসেস জীমার হাসলেন, 'ডরোথী তোমার স্বামীকে একটা সারপ্রাইজ দেবার জন্যই আমাকে যে ডাকবে সেটা বলেনি। আমি তোমার আগেও আরো দুটি ভারতীয় মেয়ে দেখেছি, তা ছাড়া ডরোথীর বাড়িতে বিজয়লক্ষ্মীকে তো (বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) কতোবারই দেখেছি, সবাই কিন্তু খুব এদেশের হালচাল ভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত।'

আমি চুপ করেছিলাম, উনি আবার বললেন, 'আমি যখন প্রথম এখানে এলাম, মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুই জানতাম না। সামান্য ফরাসী ভাষা শখ করে শিখেছিলাম, সেটা কিছু নয়। ইংরিজি বলতে আমার খুব অসুবিধা হতো। সে জন্য আমি কোনোদিন লজ্জাবোধ করিনি। কিন্তু একটি ছেলে বললো, সে-ও বাঙালী, তার স্ত্রী ভালো ইংরিজি বলতে পারে না বলে লজ্জায় কারো সঙ্গে মেশে না। সত্যি কি এটা তোমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়?'

এবারও আমি কী বলবো ঠিক ভেবে পাচ্ছিলাম না, এমন সময় বুদ্ধদেবকে নিয়ে ডরোথী এসে হাজির হলেন। লিলি অথবা লিসা, কী একটা দু' অক্ষরের নামে ডেকে বললেন, 'এই যে বুদ্ধদেবকে নিয়ে এসেছি আলাপ করাতে। বাঃ রাণুর সঙ্গে তুমি নিজেই আলাপ করে নিয়েছো।'

'এর নাম রাণু? সুন্দর নাম তো।' উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে বুদ্ধদেবের হাত জড়িয়ে ধরলেন। বুদ্ধদেব অকৃত্রিম আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, 'কী আশ্চর্য! কী

আশ্চর্য! আপনি মিসেস জীমার? আমি যে আপনার স্বামীর কতো ভক্ত, তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে কতো মুগ্ধ—'

ডরোথী আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বললেন, 'বুদ্ধদেব, আমি সেকথা জানি বলেই তোমার জন্য এই সারপ্রাইজ রেখেছি।'

মহিলা সহসা একটু ম্লান হয়ে বললেন, 'আমি তো আমার স্বামী নই, তিনি বেঁচে থাকলে এমন একজন কবির সঙ্গে তাঁর মিলন অনেক সুখের হতে পারতো।' তারপরেই আবার সহজ হয়ে হেসে বললেন, 'জানো তো আমার স্বামীর ভারতপ্রেম কী গভীর ছিলো। আজ আমার একটা মস্ত লাভ হয়েছে ডরোথী!'

'কী, বলো তো?'

'একটা দেশের নিজস্ব চরিত্র আমি বুঝতে পেরেছি মিসেস বোসকে দেখে। সব দেশেরই আলাদা চরিত্র আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য, কিছু মনে করবেন না (এটা বুদ্ধদেবকে) আমি ডরোথীর এখানে যে-ক'জন ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ দেখেছি সকলেই যেন এদেশের সমস্ত কিছু অনুকরণ করে মনে প্রাণে এদেশের মানুষ হয়ে উঠতে চায়। কেন বলুন তো?'

বুদ্ধদেবও এ কথার জবাব না দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। সত্যি বলতে এ কথার কোনো জবাবও তো আমাদের নেই। শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাক না থাক পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গি ও ভাষা আয়ত্ত করাই আমাদের ধর্ম। সেই মই বেয়ে উঠেই আমরা নিজেদের সভ্য বলে প্রতিপন্ন করি। বই পড়ে কোনো দেশকে জানা আর চোখে দেখে জানার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। এরা যে কী পরিশ্রমের বিনিময়ে এমন বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছে সেটা এখানে এসে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এরা ক্লান্তি জানে না, বিশ্রাম জানে না, কাজ ফেলে রাখা জানে না, সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত আবালবৃদ্ধবণিতা, যার যে পেশাই হোক না কেন নিয়মিত আট দশ ঘণ্টা করে খাটে এবং সে খাটুনি নিষ্ঠার সঙ্গে খাটে। এদের উদ্যম, কর্মিষ্ঠতা, দার্ঢ্য সত্যিই অনুকরণযোগ্য। কিন্তু সেটা তো আমরা কেউ করি না। আমরা ওদের খোলসটাকেই পুজো করি। কেবল প্রমোদেরই উপাসক।

শুধু কি বাইরে খেটে এসেই এরা এলিয়ে পড়ে? তা নয়। বাড়ি ফিরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশভূষা বদলে দিব্যি টাটকা হয়ে লেগে গেল ঘরের কাজে। রান্না করছে, টেবিল সাজাচ্ছে, সূক্ষ্ম ফালিতে সবজি কাটছে, ঘর

পরিষ্কার হচ্ছে, থালা মাজা হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পরিচর্যা হচ্ছে, আতিথেয়তা হচ্ছে, সব করছে দুজনে একসঙ্গে। এই শ্রমবিভাগে স্ত্রী-পুরুষের কোনো অসাম্য নেই। সব সময় যে ছেলেরাই উপার্জন করবে, তারও কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। দায়িত্বে দু' পক্ষই সমান।

সেই পার্টিতেই মিসেস জিমার আমাদের নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়িতে। আরো দুটি দম্পতির সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো। একজন এশিয়া পাবলিসিংয়ের বনি ক্রাউন নামের এক উচ্চপদস্থ মহিলা ও তার স্বামী অধ্যাপক ডক্টর ক্রাউন, অন্যরা একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর ভ্যান ওয়েভারেন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস ওয়েভারেন। তাঁরাও নিমন্ত্রণের তারিখ ঠিক করলেন। একজন নিগ্রো কবির সঙ্গেও আলাপ হলো। বেশ লাগলো ভদ্রলোককে। তিনি নিমন্ত্রণ করলে খুশি হতাম। কোনো শিক্ষিত নিগ্রো পরিবারের বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার খুব বাসনা ছিলো, হলো না।

গীনজবার্গ এসে নিজেকেই নিজে নিমন্ত্রিত করে বললো, 'আমি যাবো তোমাদের হোটেলে, তুমি রান্না করবে, খাবো। বলো কবে।' বুদ্ধদেবকে বললেন, 'কথা অনেক আছে, অনেক জানবার আছে তোমার কাছে, আমাকে একটু বেশী সময় দিও।'

ভেবেচিন্তে সুবিধে মতো ওদের রাত্তিরে খেতে বললেন বুদ্ধদেব। গীনজবার্গ একা নয়, ওর একটি বন্ধু আছে, অরলভ্‌সকি, রাশান ছেলে, সে-ও আসবে।

আমেরিকায় তখন পুরুষে পুরুষে ভালোবাসার চলন দেখছিলাম খুব, তাতে তাদের লজ্জা নেই, গীনজবার্গ আর অরলভ্‌সকির ভালোবাসাও সেই জাতের।

যেদিন আমাদের অ্যাপার্টমেণ্টে এলো, প্রথমেই সগর্বে এই ঘোষণাটি করেছিলো। হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'তা বলে কি মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করি না? করি। ছেলেতে মেয়েতে আমার তফাত নেই। অরলভ্‌সকির সঙ্গে আমি থাকি।'

অরলভ্‌সকি গীনজবার্গের চেয়ে অনেকটা ছোটো, উঠে দাঁড়িয়ে বুকে টোকা দিয়ে বললো, 'আমরা কোনো ইনহিবেসনের দাস নই, যা খুশি তাই করি। যদি বলো আমি এখুনি আমার প্যাণ্ট ছেড়ে ফেলতে পারি।'

গীনজবার্গ ওকে বাঁ হাতের ঝাপটায় বসিয়ে দিল, আমার লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওকে পাত্তা দিয়ো না, ও পাগল।'

'জান তো পাগল বলে সরকার থেকে একটা ভাতা পাই?' হাসছিলো অরলভ্‌সকি, 'সেই ভাতা আনবার জন্য মাসে সত্যি আমাকে একবার পাগল সাজতে হয়।'

কথাটা সত্য। কিন্তু কীভাবে এই ভাতার অধিকারী হয়েছিলো, কেন এবং কখন তা আমার মনে নেই।

গীনজবার্গ বললো, 'আমাকেও একবার পাগল বলে আট মাস পাগলা গারদে আটকে রেখেছিলো।'

'কেন?'

'আমি ছেলেবেলায় একবার কলম্বিয়ার ছাত্র ছিলাম, বসে বসে ব্লেইকের কবিতা পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হলো ব্লেইক যেন নিজে আমাকে তাঁর কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। আমি স্পষ্ট তাঁর গলা শুনতে পেলাম। তিনটি কবিতা পড়লেন তিনি। আমি মোহমুগ্ধ হয়ে থাকলাম। পরের দিন যখন বন্ধুদের কাছে একথা বললাম, সাংঘাতিক হট্টগোল লেগে গেলো। মাস্টারমশাইরা ভাবলেন আমার মাথার দোষ হয়েছে, আর তক্ষুণি আমাকে নিয়ে গিয়ে আট মাস ধরে আটকে রাখলেন মানসিক চিকিৎসালয়ে।'

একথা শুনে আমরা হতবাক। মার্কিনীসমাজ এই এক ব্যাধিতে ভুগছে। সব চিকিৎসাই এখন মনস্তত্ত্ববিদের দরজায় ঠেলে দেয়। সুস্থ মানুষকে পাগল করে দেবার এমন অভিনব উপায় বোধহয় আর কোথাও নেই। ডরোথী নরম্যানের ককটেল পার্টিতে যে মনস্তত্ত্ববিদটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো তাঁর খ্যাতি আছে সর্বরোগহর বলে। তাঁর কথা শুনতে শুনতেও আমাদের মনে হয়েছিলো, এঁদের এই চিকিৎসা যেমন ছেলেমানুষী তেমনি মর্মান্তিক। ধরুন আপনার শিশুপুত্র বিদ্যালয়ে যেতে কাঁদে, মাকে ছেড়ে থাকতে চায় না, এটাও তাদের মতে সেই মনস্তত্ত্বের মধ্যেই পড়ে। তাতো পড়েই, এ মনস্তত্ত্ব তো গাধাও বোঝে। মাকে কোন শিশু ছেড়ে থাকতে চায়, কোন শিশুর স্বাধীন খেলাধুলো ছেড়ে আটক থাকতে ভালো লাগে? আমরা আমাদের দেশে তাদের তুষিয়ে-বুসিয়ে আদর করে বুঝিয়ে আস্তে আস্তে অভ্যেস করিয়ে দি, কিন্তু ওদের পিতা মাতা মোটা টাকা হাতে নিয়ে তক্ষুণি ছুটলেন মনস্তত্ত্ববিদের কাছে। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহুঁ, এতো ভালো লক্ষণ নয়, এতো স্বাভাবিক নয়। মাকে এমন আঁকড়ে থাকার মধ্যে অবশ্যই একটা গভীর রহস্য আছে। অতএব সিটিং। অতএব চিকিৎসা। পয়সা যে মানুষকে কতো বিকারে বিকৃত করে তার ঠিক নেই।

ভ্যান ওয়েভারেন এ-ও বলেছিলেন, 'একবার তাঁর কাছে এক রোগী এলো, সে কবিতা লিখতে চায় অথচ পারে না, এর কারণ খুঁজে বার করে দিতে হবে।' তাঁর বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়েও এরকম আরো অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনেছিলাম।

অবশ্য তাঁর বাড়ির গল্প বলতে গেলে যাঁর গল্প সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়, তিনি একজন ইংরেজ মহিলা। এককালে যে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন সেটা এক নজরেই বোঝা যায়। পুরোনো দিনের ছবির ইংরেজ মহিলাদের মতো ড্রেস। মাথার চুলে খোঁপা বাঁধা, খোঁপায় জাল। বয়েস প্রায় আশি হলেও আঁটোসাঁটো গড়ন এবং সক্ষম। আমরা আসছি শুনে তিনি নিজেই যেচে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। ভ্যান ওয়েভারেন অবশ্য তাতে খুব কৃতার্থ। বললেন, 'আমি এঁকে কতোবার আমার এখানে আসবার জন্য অনুরোধ করেছি, কখনো আসেন নি। একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী আছে নিজের বাড়িতে, সেখানেই সারাদিন কাটান। বলেন জীবন্ত মানুষের চেয়ে আমায় মৃত মানুষের সঙ্গই বেশী আনন্দ দেয়।'

কথাটা অসত্য নয়। বয়স বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় তো আসেই যখন মানুষের সব কর্তব্য শেষ হয়ে যায়, সন্তানসন্ততি বড়ো হয়ে আলাদা হয়ে যায়, মতামতের ঘাত-প্রতিঘাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার মাশুল হিসেবে আত্মীয় বিয়োগ ঘটে, তখন এই কোটি কোটি মৃত অক্ষরের মতো বন্ধু আর আমাদের কে থাকে ?

খেতে বসে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি আজ তোমাদের একটা মজার গল্প বলবো বলেই এসেছি।' বুদ্ধদেবের দিকে তাকালেন, 'তুমি যখন টেগোর বিষয়ে বলতে বলতে সেদিন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলে, আমিও তোমার সঙ্গে একাত্ম ছিলুম। তাঁর মৃত্যুদিনের কথা বলতে বলতে তুমিও যখন পকেট থেকে রুমাল বার করছিলে, আমিও আমার ব্যাগে রুমাল খুঁজছিলাম। আমি তাঁকে দু'বার দেখেছি। দু'বারই আমার কাছে তিনি ঈশ্বর হয়ে দেখা দিয়েছেন। একবার লণ্ডনে তাঁর বক্তৃতা হবে, সময় হয়ে গেছে, তিনি তাঁর সাদা লম্বা পোশাকে ধীরে ধীরে ডায়াসের দিকে এগুচ্ছেন, আমি স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে পিছনে পিছনে হাঁটছি। তিনি উঠতে গিয়ে হেসে ফিরে তাকালেন, বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।' আমি রোমাঞ্চিত হয়ে মঞ্চে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম, তারপর—।' মহিলার সুন্দর সুসজ্জিত বৃদ্ধ মুখে একটি গোলাপী হাসি ছড়িয়ে গেল, 'লোকেরা ভাবলো কি জানো ? আমি বুঝি তাঁর স্ত্রী।'

এই স্মৃতি রোমন্থন করে মহিলা খুব হেসে উঠে নিঃশব্দ হলেন। আমরাও চুপ। উদাসভাবে বললেন, 'অনেক দিন পর্যন্ত এই কথা আমার মনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিলো, তারপর কতোদিন হয়ে গেল তাঁকে আমার মনেও পড়েনি। হঠাৎ এই বক্তৃতামালার কথা শুনে, দপ করে লাফিয়ে উঠলো ছবি। আমি তিন জায়গাতে গিয়েই তোমার বক্তৃতা শুনেছি, তোমার ভক্তি ভালোবাসা আর আমার ভক্তি ভালোবাসা সর্বত্রই এক হয়ে মিশে গেছে। বাড়ি ফিরে এসে ভেবেছি মানুষ কি তা হলে কিছুই ভোলে না?'

গীনজবার্গের আট মাস মানসিক চিকিৎসালয়ে থাকার কথা শুনে আমার প্রথমে ভ্যান ওয়েভারেনদের কথা মনে পড়লো, সেই সঙ্গে এই মহিলার কথাও মনে পড়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গীনজবার্গের গভীর গলা আমার কানে পেঁাছোলো; 'শোনো, আমি তিন দিনের মধ্যেই ইয়োরোপ যাচ্ছি, সেখান থেকে যে করে হোক একদিন ভারতবর্ষে গিয়ে পেঁাছোবো। আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হবে সেখানে।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'ভালো।'

'ভালো?'

'খুব ভালো।' আমি বললাম, 'এখানে তুমি কোথায় থাকো?'

'যাবে? দেখবে সে পাড়া? খেয়ে উঠে চলো, এখুনি নিয়ে যাই।'

'ভিলেজে?'

'ভিলেজ। না। ওটা আজকাল জঘন্য হয়ে গেছে, নাম ভাঙিয়ে ব্যবসা চলছে, বাসভর্তি টুরিস্টদের ভ্রমণস্থল। আমি থাকি বাওয়ারির কাছে, নিগ্রো আর পর্টুরিকানদের পাড়া সেটা। যাকে বলে সত্যিকার গরীব পাড়া। আমার অ্যাপার্টমেণ্টের ভাড়া কতো জানো? পঞ্চাশ ডলার, মাত্র পঞ্চাশ ডলার। তাও আমরা তিন-চারজন একসঙ্গে থেকে ভাগ করে ভাড়া দিই।'

হাত বাড়িয়ে একখানা কবিতার বই টেবিলে রাখলো, তার নিজেরই বই, 'আমি কবিতা লিখি আর কবিতা পড়ি, এই আমার কর্ম। এই 'Howl' (যে বইখানা উপহার দিল) ষাট হাজার কপি বিক্রী হয়েছে। লোকে বলে আমার কবিতার কোনো মানে হয় না। একবার লস এঞ্জেলসে এক জায়গায় কবিতা পড়ছিলাম, একজন চেঁচিয়ে বলেছিলো, 'অর্থটা একবার বুঝিয়ে দিন তো'। আমি তখন আমার শরীর থেকে সমস্ত জামা কাপড় খুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, এ ছাড়া আর কোনো অর্থ নেই। তুমি কী বলো? (এটা বুদ্ধদেবকে)।

তুমি তো একজন পণ্ডিত লোক, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার প্রাণে আরাম ছড়িয়ে পড়ে। কতো তোমার জ্ঞান, কতো পড়েছ, হৃদয়ঙ্গম করেছ। তুমিই বলো, এই কি একমাত্র কথা নয় যে এ সবের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। তা ছাড়া আমার কবিতা কানে শুনতে হয়, কেরুয়াকের গদ্যও কানে শুনতে হয়।' বলতে বলতে আরো দুখানা বই থলি থেকে বার করলো, 'এই আমার দ্বিতীয় বই Kaddish। আর এই "বীট অ্যান্থলজিটা" একটু পড়ে শোনাই, কী অপূর্ব ছন্দ ওর ভাষার, কী আশ্চর্য গদ্য—'

এমন তন্ময় হয়ে এসব কথা বলছিলো, এবং এমন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে যে, আমরাও তদ্গত হয়ে শুনছিলাম।

বীটদের বিষয়ে, বিশেষত এই গীনজবার্গ নামের কবিটি বিষয়ে এতো নানা রকম উন্মাদনার কাহিনী শোনা ছিলো যে দেখবার আগে একটু আশঙ্কাই ছিলো আমার। দেখার পরে নিরুদ্বেগ হওয়া গেল। গীনজবার্গের শিষ্টাচারের কোনো অভাব ছিলো না, তা ব্যতীত তার মুখমণ্ডল রাশীকৃত দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে আবৃত ছিলো না, উপরন্তু পাতলা চুলকে বারে বারেই চিরুনি বার করে আঁচড়ে আঁচড়ে ঠিক রাখছিলো। শুনেছিলাম এরা পিতামাতাকে ঘৃণা করা কর্তব্য বলে বোধ করে, কিন্তু গীনজবার্গের Kaddish নামক বইটির কবিতা তার মৃত মায়ের স্মরণেই শোকোচ্ছ্বাস। Kaddish শব্দটির অর্থও শোকার্তের প্রার্থনা।

মার্কিনী নিয়মমতো ওরা ছ'টাতেই ডিনারে বসলো না। আমাদের সময় মতোই রাত দশটায় সাঙ্গ হলো খাওয়া। আমি কফি করে দিয়ে ভাবলাম বাসনগুলো এই ফাঁকে মেজে রাখি। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসী বাসনের গন্ধ বড়ো বিচ্ছিরি লাগে। গীনজবার্গ যখন যা বলে উপলব্ধি থেকেই বলে। সেইভাবেই সে আবার তার নেশা বিষয়ে বলতে শুরু করেছিলো। বলছিলো, 'কেন, ভাং চরস সিদ্ধি এসব ভালো না কেন বলছো? হুইস্কির মতো সাংঘাতিক বিষ খেতে কারো আপত্তি নেই, আপত্তি আছে এতে? মারিয়ুয়ানা খেয়েছো? স্বর্গ। স্বর্গের দ্বার খুলে যায়। আমি কী চাই জানো? আমি চাই প্রেরণা, আমি ঈশ্বরকে চাই। আমার Howl কবিতা আমি শুক্রবার রাত্রে শুরু করে রবিবার সকালে শেষ করি। আমি ঘষি না মাজি না বদলাই না, আমার যখন আসে নিজে থেকেই আসে—'

বাসন মাজতে মাজতে আমি ওর কথা শুনছিলাম। হঠাৎ থেমে গেল,

তারপরেই 'হাম্' বলে একটা ভীষণ শব্দে আমাকে চমকে দিয়ে বাসনগুলো কেড়ে নিয়ে মাজতে লেগে গেল।

ঠিক খেয়াল করেছে আমি অনুপস্থিত এবং অনুপস্থিতির কারণ এই বাসন মাজা। টিপে টিপে চলে এসেছে রান্নাঘরে। ওর সঙ্গে আমার পারা সম্ভব ছিলো না। যতোবার চেষ্টা করলাম ততোবার দুই ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে একটা কবিতা গুন গুন করতে করতে নিমেষের মধ্যে হাড়িকুড়ি মেজে একেবারে পরিষ্কার। তারপর নিজেই গ্যাস জেবলে আবার কফি খাবে বলে জল চাপালো।

রাত বারোটা বাজালো যেতে যেতে। যাবার সময় আবার বললো, 'পায়ে হেঁটে হলেও আমি জানি এই যাত্রাই আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে। তোমাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আমার সেখানেই হবে। হবেই হবে। হতেই হবে।'

এমনভাবে কথা বলে যেন একজন সত্য দ্রষ্টা ঋষি। আমি হাসছিলাম। আমার হাত চেপে ধরে বললো, 'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

বুদ্ধদেব ওর সব আচরণকেই অত্যন্ত সস্নেহ কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখছিলেন, আমাকে ছেড়ে সে বুদ্ধদেবের দিকে ফিরলো, 'তুমিও বিশ্বাস করছো না?'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই যাবে তুমি, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আমাদের কলকাতাতেই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হবে। আমি তোমাকে আমাদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের জামাতা জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে মনে হয় খুব বন্ধুতা হবে তোমার। মস্ত পড়ুয়া লোক সে, তুমি তার অজানা নয়, সে-ও লেখে। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলেও ভালো লাগবে তোমার।'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজেকে আমাদের মধ্যে সে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়ে চলে গেল যে কয়েক দিন পর্যন্ত আমরা অনেকবার তার কথা বলাবলি করেছি। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য তার সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আমাদের কলকাতাতেই হয়েছিলো। ততোদিনে বস্তুতই সে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধু। ছেলে মেয়েদের আপন জন। পাজামা পাঞ্জাবিতে দীক্ষিত হয়েছে, ধুতি পরার রিহার্সেলও চলছে। কাঁটা চামচ ছেড়ে ডাল ভাত খাচ্ছে হাত দিয়ে। দেখা হতেই একটা প্রণাম ঠুকে দিল বুদ্ধদেবকে।

'এ কী!' বুদ্ধদেব তো সসংকোচে তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে হাত ধরলেন।

গীনজবার্গ বিজয়ের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী রকম? বলেছিলাম না?'

অনেক দিনের মধ্যে সেদিন এমন একটি দিন, যেদিন বুদ্ধদেবের কোনো আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ কলেজ বক্তৃতা ইত্যাদি কিছুই নেই। আমার কলেজ অবশ্য চিরতরেই গত। এখন আমি পরিপূর্ণ স্বাধীন।

সকাল হতেই বৃষ্টি নামলো ঝমঝম করে। একেবারে সত্যিই ঝমঝম। যাকে বলে বাংলাদেশের বর্ষা। তার উপরে মেঘের গর্জন। এখানকার এতোদিনের বসবাসে এমন বৃষ্টি আর দেখিনি। চোখ খুলেই সেই সশব্দ বৃষ্টি মনকে বিধুর করে তুললো। দেশের জন্য, দেশে যাদের রেখে এসেছি, তাদের জন্য, আরো সব নাম না জানা কতো কিছুর জন্যই কেবল মন কেমন করতে লাগলো। উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে, দাসী টোকা দিচ্ছে দরজায়, তাছাড়া রান্নাঘরের যতো সুবিধাই থাকুক না কেন, কাজ তো কাজই। করতেই হবে। পঞ্চ ব্যঞ্জন রান্নাও করতে হয়, বাসনও মাজতে হয়, কাপড়ও কাচতে হয়, আর হাটবাজার কেনাকাটার জন্য দৌড়তেও হয়। তবু দাসী এসে ঝাড়পোঁচ করে, বিছানা সাজায়, সেটাই রক্ষে। তা না হলে তো সোনায় সোহাগা হতো। আগের রাত্রে মনস্তত্ত্ববিদ ভ্যানওয়েভারেন দম্পতি আর ফ্রান্স জোসেফকে খেতে বলেছিলাম। নিজের গুণগরিমা দেখাবার জন্য এতো বেশী ধরনের রান্না করেছিলাম যে সমস্তটা দিন তাতেই কেটেছে।

একটা কাণ্ডও হয়েছিলো। তরকারী বসিয়ে ঘর গুছোতে এসে ভুলেই গিয়েছিলাম, যখন খেয়াল হলো, দৌড়ে গিয়ে দেখি সিমারে ছিলো বলে পোড়েনি বটে কিন্তু গলে একেবারে কাদা। এতো মন খারাপ হয়ে গেল বলতে পারি না। আর সময়ও নেই যে এর বদলে অন্য কিছু করি। অথচ কতো যত্নেই না বসিয়েছিলাম একটা নতুন ধরনের তরকারী।

বুদ্ধদেব বললেন, 'তাতে কী হয়েছে, ও সব তরকারী ওরা খাবে না, অতো করেছোই বা কেন? মিছি মিছি খাটুনি। ফেলে দাও।'

ঐ ফেলে দেওয়াটাই আমার পক্ষে শোকাবহ। নিজের সামান্য একটু অমনোযোগের ফলেই তো অতগুলো দামী সবজি নষ্ট হলো? তাছাড়া আমার মনে টেবিল সাজাবারও একটা ছক কাটা ছিলো, কার পাশে কী দেবো, কোন রঙের পাশে কোন রঙ যাবে, এই তরকারীটা গলে গিয়ে সেদিক থেকেও একটা ফাঁক হলো। কী ধরনের বাসনে যাবে তা-ও তো ঠিক ছিলো! শেষ পর্যন্ত একটা বুদ্ধি করা গেল। তরকারীটা মিহি করে চটকে ফেললাম, যে প্লেটে যে ভাবে দেবার কথা ভেবেছিলাম, সেই প্লেটে সেইভাবে হালুয়ার মতো চাপড়ে

চুপড়ে ঠিক করে, মাথায় লাল টমেটো, লাল মুলো, লাল বীট দিয়ে সাজিয়ে ফাঁকে ফাঁকে সবুজ রঙের বড়ো লংকা গুঁজে দিলাম। চারপাশে বাঁধাকপির পাতা আর শশাকুচির ঘের। খেতে পারুক না পারুক, দেখতে যে খুব সুন্দর হলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর যাই হোক চোখের তৃপ্তিও তো একটা কম কথা নয়?

যথাসময়ে অতিথিরা এলেন। টেবিলে সাজানো খাদ্যসম্ভারের-সুশোভিত চেহারা দেখে লুব্ধ মুগ্ধ দুই-ই হলেন এবং সেই সম্ভারের মধ্যে এ অপাঙক্তেয় তরকারীটি এতো সমাদর লাভ করলো যে মিসেস ওয়েভারের জনান্তিকে খাতা পেনসিল বার করে তার রেসিপিটাও টুকে নিলেন। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম এই রান্নাটার?' আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, ''ম্যাশড-ভেজিটেবল।"

মিসেস ওয়েভারেন চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'আমাদের যেমন "ম্যাশডপটেটো" ঠিক সেই রকম, না?'

আমি বললাম, 'ঠিক তাই।'

উনি বললেন, 'অথচ কতো তফাত, কতো বেশী সুস্বাদু, আর নিউট্রেশাসও নিশ্চয়ই খুব।'

রাত্রিবেলা এই গল্প শুনে বুদ্ধদেব হাসতে হাসতে পাগল, 'নাম দিলে ম্যাশডভেজিটেবল? এ্যাঁ? হো হো হো হো, ম্যাশডভেজিটেবল, ওহ হো হো হো হো। আমিও খুব হাসলাম।

সেই ম্যাশডভেজিটেবল ইত্যাদির বাসনকোসন কি কম পড়েছে নাকি? পায়েস করেছিলাম, হাঁড়ি মাজতে তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে। পোড়া পোড়া মাংস রেঁধেছিলাম, প্রেসার কুকারের সেই পোড়া তোলা কি সহজ ব্যাপার? এই রকম আরো কতো বাসন। মেইডকে দরজা খুলে দিয়েই গরম জলের কল খুলে দাঁড়িয়ে গেলাম মাজতে। কাল রাত্তিরে কথার মাঝখানে মাঝখানে উঠে এসে চেষ্টা করেছিলাম দু' একবার, অতিথিদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়াতে পারিনি। একবার দেখি ফ্রান্স জোসেফ কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন, খাদের গলায় হুংকার তুলে বলছেন, 'ডিসওয়াশার মেসিন নেই?'

আমি চমকিত হয়ে বললাম, 'না তো।'

'হুঁ। আমি কি সাহায্য করতে পারি?'

এই ধনপতি মাজবেন এই বাসন? বাঙালী রান্নার তেল-কালির খবর তো

আর রাখেন না। ওঁর মূল্যবান পোশাকের দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বললাম, 'আপনাকেও মাজতে হবে না, আমাকেও মাজতে হবে না, কাল সকালে মেইড এসে মাজবে।'

'তা হলে আপনি এখানে কী করছেন?'

'কিছুই না, দু-একটা জিনিস গুছিয়ে রেখে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, সেটা পরে হবে।'

অতএব বাসন মাজায় ইতি।

এখন সেই বাসন মেজে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে খাবার টেবিলে আসতে আসতে দেখি, কখন যেন বৃষ্টি থেমে গেছে, একটু একটু রোদেরও ঝিলিক দিয়েছে।

নিউইয়র্ক শহরের আবহাওয়ার মেজাজমর্জি বোঝা দায়। এই রোদ এই বৃষ্টি, এই কুয়াশায় অন্ধকার এই ঝকঝকে আকাশ। চা খেতে খেতে বুদ্ধদেব বললেন, 'যদি এই রোদ স্থায়ী হয় তাহলে চলো আজ এখানকার ন্যাচারল হিস্ট্রি মিউজিয়ামটা দেখে আসি।'

এটা অমিয়বাবুর (কবি অমিয় চক্রবর্তী) পরামর্শ। কয়েকদিন আগে উনি এসেছিলেন, একবেলা ছিলেন, তখনই বলেছিলেন 'সুযোগ পেলেই ওটা দেখে আসুন, দেখবারই যোগ্য।' সুযোগ পাওয়া কঠিন। আজ বহুদিনের মধ্যে সেই সুযোগ যখন উপস্থিত তখন সদ্ব্যবহার করাই উচিত। বৃষ্টি আর নামলো না, বরং দুপুর হতে হতে রোদ উঠলো প্রচণ্ড। রান্নাবান্নার পাট ছিলো না, কালকের খাদ্যই অনেক মজুত আছে। অতএব তাড়াতাড়িই খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেলাম।

আসলে এই সব ব্যাপারে নির্দেশক না থাকলে গিয়ে বড়ো দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়। অত বড়ো বাড়ির বিশাল গহ্বরে কোথায় যাবো কী করবো, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। তারপর অন্যদের দেখাদেখি টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম প্ল্যানেটারিয়ামে। ঢুকেই দেখি প্রকাণ্ড হলের মাঝখানে আমাদের আলপনা ধরনে গোল জায়গা জুড়ে মোজেইকের কাজ, মাথার উপরকার নিচু সিলিংটাতেও তার মাপের গোল জায়গায় বড়ো বড়ো সার্কেল। গোল গ্যালারিতে লাল টুকটুকে গদি আঁটা চেয়ারে বসবার বন্দোবস্ত। তখন বুঝিনি পরে বুঝলাম মাথার উপরকার বর্তুল অংশটা সৌরমণ্ডল। মাঝখানের তেজী সাদা ঝাপসা অদ্ভুত ধরনের ঝুলে থাকা গোল আলোর বিচ্ছুরণটা সূর্য। চারপাশে গোল গোল

সার্কেলে গ্রহ উপগ্রহরা ঘুরছে তাকে ঘিরে। সবাই বসতেই শো আরম্ভ হলো। মৃদু মৃদু বাজনার সমবেত সুর বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলো সব। পৃথিবীটা তার চাঁদকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলো। বুধের উপগ্রহ দুটো চাঁদ, সে অনেক বেশী কাছে সূর্য থেকে। বৃহস্পতি বেশ বড়ো, পৃথিবীর চেয়েও বড়ো। তার ঘোরাটা মন্থর। মঙ্গল গ্রহটি পৃথিবীর চেয়েও দূরে, লাল টকটক করছে। শূন্যে ঘুরছে সব, কীভাবে ঘুরছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বলে বলে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলো একজন। তারপরেই আমাদের দোতলায় যেতে হলো। এতো অনেক লোকের পায়ের আওয়াজে দোতলার কাঠের সিঁড়ির গুমগুম আওয়াজে বন্ধ ঘরের হাওয়া ড্রাম পিটছিলো। সেটাও মনে হচ্ছিলো অলৌকিক। আমি ঘোরের মতো চলছিলাম। দোতলার হলে গিয়ে বসে মাথার উপর তাকিয়ে দেখি, রাত্রিবেলায় মস্ত আকাশটি শান্ত হয়ে বিছিয়ে আছে। কেবল একটা জায়গা থেকে একটি লালাভ রঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারদিকে। আস্তে আস্তে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা নিয়ে চাঁদ উঠলো আকাশে। চারপাশে মেঘ ভেসে বেড়াতে লাগলো, চাঁদও ভেসে বেড়াতে লাগলো। নরম নীলচে আলোয় ভরে গেল হল। বক্তৃতা আরম্ভ হলো! এবার অন্য একটি গলা, বাজনার সুরও অন্য ধরনের। বিষয় হলো চাঁদ ও আমরা। ভাসতে ভাসতে ডুবে গেল চাঁদ। ভয়ংকর অন্ধকারে ছেয়ে গেল কক্ষ। আকাশে তাকিয়ে বুকটা গুর গুর করে উঠলো। হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। যদি কোনো অমাবস্যার রাতে গরমে টিঁকতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে মা আমাকে নিয়ে ছাদে পাটি পেতে শুয়েছেন, আমি মাথার উপর সেই বিস্তীর্ণ অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাতে পারিনি। ভয়ে জড়িয়ে ধরেছি।

এক সময়ে একটি দুটি করে তারা ফুটলো, কালো আকাশ ভরে গেল তারার বুটিতে। কী যে সুন্দর সেই দৃশ্য কী বলবো! তারপর সরু নোখের মতো চাঁদের রেখা দেখা গেল পশ্চিমে। সেই চাঁদ আবার বড়ো হলো, আবার নীলচে আকাশে ভরে গেল হল। তারপর শো শেষ হলো।

এ যে মেকি, এর সমস্তটা যে ফাঁকি, মায়া—একবারের জন্যও মনে হচ্ছিলো না সে কথা। যেমন মৃত্যুকে জেনেও জানি না, তেমনি করেই বিজ্ঞান আমাদের এতোক্ষণ ভুলিয়ে রেখেছিলো সত্যকে।

বাইরে বেরিয়ে সেই ঘোর অমানিশা ও পূর্ণিমার পরে হঠাৎ সূর্যালোকের

তীব্রতা ধাঁধিয়ে দিল চোখ। এখন যে রাত না একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তা হলে মায়া আমাদের প্রাত্যাহিক সংসার জীবনকেও এমনি করেই আচ্ছন্ন করে আছে?

বুদ্ধদেব বললেন, 'চলো আগে কোথাও বসে চা খাই, আমার মাথা ধরে গেছে।'

সেদিন দেখলাম বহু লোক এসেছে, যথেষ্ট ভিড় হয়েছে। বোধহয় ছুটির দিন ছিলো। একটা ঘরে আমেরিকার ইতিহাস শোনানো হচ্ছিলো। দেয়াল ভর্তি সব বড়ো বড়ো ছবি, যখন যে ছবির ঘটনা বলছে, সে ছবিতেই আলো জ্বলে উঠছে, যে বলছে তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। উঁকি মেরে প্রায় রোমাঞ্চ হলো। সবই যেন ভৌতিক। আসলে আলোটাও যেমন নিজেই জ্বলে জ্বলে উঠছিলো, কথাগুলোও তেমনি কোনো অস্তিত্ববিহীন ভাবে নিজে নিজেই ভাসছিলো ঘরের মধ্যে। নির্দিষ্ট সুইচ আছে টিপে দিলেই যা যা জানতে চাও সেই সেই বক্তৃতা শুরু হয়ে যাবে। আবার একজনের বক্তৃতার বিষয় যদি অপরে শুনতে না চায়, তবে হেডফোন আছে, অন্য সুইচ টিপে সেটা লাগিয়ে নাও কানে, তোমারটা শুধু তুমিই শুনবে।

যাদের রেড-ইন্ডিয়ান বলা হয়, যাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমূলে উচ্ছিন্ন করে এই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন, তাদের ছবিতে আলো জ্বলছিলো তখন। আমার কী রকম খারাপ লাগছিলো সেই ইতিহাস শুনতে।

এই আদিবাসীদের আমি একবার দেখেছিলাম। প্রায় নেই বললেই চলে। নমুনা হিসেবে মিউজিয়ামপিসের মতো কিছু বাঁচিয়ে রেখেছে। একটা গোষ্ঠী কলোরাডোতে আছে। বুদ্ধদেব একবার সেখানে সামার ক্লাস পড়াতে গিয়েছিলেন, বড়ো সুন্দর দেশ। দার্জিলিংয়ের মতো চারদিকেই পাহাড় ঘেরা। আমরা ছিলাম বোল্ডারে, সেখান থেকেই রকি পর্বতের শুরু। কলেজ ক্যাম্পাসের একটি অতি উৎকৃষ্ট বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলো আমাদের। দুটি শোবার ঘরের একটির সমস্তটা পুর জুড়ে কাচের জানলা ছিলো, সূর্য উঠলে কি পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তার আভা ছড়িয়ে পড়তো দেখতাম। একটু পরে সেই আভাই আবার দপ করে শত সহস্র হীরকখণ্ডের দ্যুতিতে ঝলসে দিত চোখ। অন্য শোবার ঘরটিতে আবার সমস্ত পশ্চিম জুড়ে জানালা ছিলো, বিকেল পড়তেই পাহাড়ের মাথায় অন্য আলোর ঐশ্বরিক বিভা হরণ করতো হৃদয় মন।

সেই সব পাহাড়ে একটি তৃণও জন্মাতো না, লোহার লালচে পর্বত যেন আকাশের ঢেউ খেলানো রঙিন পর্দা।

বেশী উঁচুর সবগুলো চূড়াকেই এক এক ধরনের মূর্তি বলে ভ্রম হতো। বিছানায় শুয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তাকিয়ে তাকিয়ে আমি তাদের ঈশ্বরের দূত বলেই কল্পনা করতাম। প্রায় ভয়াবহ ছিলো সেই সৌন্দর্য। আমরা থাকতাম দোতলায়, চারদিক ঘিরেই সব একতলা বা দোতলা বাড়ি, মাঝখানে চৌকো সবুজ লন। লনের চারপাশে নানা রঙের চিনেমাটির টালিপাতা চওড়া নিচু বারান্দা, সবুজ ঘাসের চারপাশ ঘিরে অজস্র ফুল। বাগানে সারারাত আলো জ্বলতো, শুধু চাঁদিনি রাতে নিবিয়ে দিত সেই আলো। ফোয়ারার ছিটকে পড়া জালগুলোকে মনে হতো পরীর শরীর।

অনেকের সঙ্গেই সেখানে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিলো আমার। বুদ্ধদেবের একজন বয়স্ক ছাত্রের স্ত্রী, প্রায়ই গাড়ি চালিয়ে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতো। অবশ্য এই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যাপারে প্রতিদিনই যে দম্পতির সঙ্গে আমাদের দেখা হতো তারা ছিলো বাঙালী। ঐ সুদূর বোল্ডার শহরে গিয়ে এই রকম কোনো বাঙালী পরিবারের দেখা পাবো তা ভাবতে পারিনি। আর সত্যি বলতে সেই স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের ক্ষণিক বসবাসের দিনগুলো বড়ো ভালো কেটেছিলো। ভদ্রলোক ছিলেন বৈজ্ঞানিক, ডক্টর ভদ্র, আর তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী অতি করিৎকর্মা এক চমৎকার মেয়ে। লক্ষ্মী একদিন না এলেই আমি ছটফট করতাম, ওরও সময় কাটতো না। কতো যে খাইয়েছে ওরা, কতো যে যত্ন করেছে তার ঠিক নেই। ডক্টর ভদ্রের মতো একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি সর্বত্রই দুর্লভ। আর কী সুন্দর রান্না করতেন। ওঁর সেই রান্নার কাজে ওঁদের ছোট্ট মেয়ে শম্পাই ছিলো আসল সাহায্যকারিণী। এইটুকু টুকু হাতে কী মিষ্টি করে যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চপ গড়তো, দেখার মতো।

ওদের দেশে ওদের ধারণায় কোনো কিছু শিক্ষারই কোনো বয়স নেই। বুদ্ধদেবের সামার ক্লাসে একাধিক বয়স্ক ব্যক্তি ভর্তি হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের বয়েস সত্তর ছিলো। তিনি নিজেও একজন অধ্যাপক, ছুটিতে ভর্তি হয়েছেন এই ক্লাসে। বুদ্ধদেবের পড়াবার বিষয় ছিলো, ইন্দো-ইয়োরোপীয় এপিক। অবশ্যই তুলনামূলকভাবে। একদিকে ইলিয়াড, অদিসি, ঈনীড, অন্য দিকে মহাভারত ও রামায়ণ। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ বিষয়ে ক্লাস ছিলো। এই ক্লাস নিয়ে বুদ্ধদেব যত সুখী হতেন, মনে হয় সেই সুখ বা উত্তেজনা তাঁর অন্য কোনো ক্লাসে হতো না। ছাত্র-ছাত্রীও সেখানে কম মগ্ন হয়ে পড়তো না। তারা নানা দেশের লোক ছিলো, জার্মান, গ্রীক, ইহুদী—এবং অল্প বয়সী

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বসে অনেক কৃতবিদ্য প্রৌঢ় ব্যক্তিও শুনতেন সেই ক্লাস, নোট নিতেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। বাড়ি এসে বলতে বলতে বুদ্ধদেব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। আস্তে আস্তে তিনি নিজেও একজন ছাত্র হয়ে গেলেন।

সে বিষয়ে যেখানে যতো বই পান সব এনে জড়ো করেন টেবিলে, তারপর সারাদিন ধরে সেই পুঁথিপত্র নিয়ে ব্যাকুল হয়ে থাকা। কতো তথ্য, কতো সংকেত, কতো প্রতিসাম্য—খুদি খুদি অক্ষরে নোট বইয়ের পৃষ্ঠা ভরে ওঠে দেখতে দেখতে। বিদ্বান বিদুষী বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর ভিন্ন ভিন্ন অভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কতো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে কতো চিন্তার উদ্ভাষ খেলে যায় মনের মধ্যে।

একদা কোনো দীর্ঘ অসুস্থতার অবকাশে আমি অতি অল্প বয়সেই কালীপ্রসন্ন সিংহের চারখণ্ড মহাভারত পড়ে ফেলেছিলাম, সেই মহাকাব্য আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। সেই বই পড়ার পরে আমার এই বোধ জন্মেছিলো যে, ভালো মন্দ বিবেক বুদ্ধি সততা সভ্যতা ভদ্রতা কোনো কিছুরই কোনো মানে নেই যদি না তা সমাজরক্ষার প্রয়োজনে লাগে। একমাত্র অনৃতভাষণ এবং অতি লোভ বিষয়েই পরিপূর্ণ নিষেধ ছাড়া সবই সিদ্ধ। সুতরাং আমিও তাঁর এই আগ্রহে মেতে উঠেছিলাম, আমারও অনেক বলবার কথা ছিলো, জানবার ছিলো, বুঝবার ছিলো। কৃষ্ণ বিষয়ে মতামত নিয়ে আমাদের খুব তর্ক হতো। অর্জুনের নায়কত্ব বিষয়েও আমি খুব সমর্থক ছিলাম না। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ যে পায় তাকে ঠেকায় কে?

কলোরাডোতেও যখন সেই বিষয়েই ক্লাস নেবেন জানিয়েছিলেন, নোটিশ দেখে সামার ক্লাসে পণ্ডিত বিদ্বান এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদেরও ভিড় জমলো অনেক। তাঁদের একজনের স্ত্রীর সঙ্গেই আমার ভাব হয়েছিলো।

একদিন মহিলাটি বললেন, 'মিসেস বোস, আমার দিদি কোনোদিন কোনো ভারতীয় মহিলা দেখেন নি। তাঁর খুব শখ আপনাদের একবার তাঁর জঙ্গলে যেতে বলেন। যাবেন?'

'জঙ্গল!'

'শহর ছাড়িয়ে প্রায় চোদ্দো মাইল দূরে, সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উপরে একটি পর্বতের মাথায় তিনি একটি বহু ক্রোশ বিস্তৃত জঙ্গল কিনেছেন, আজ প্রায় দশ বছর যাবৎ সেখানেই বসবাস করছেন। কখনোই লোকালয়ে আসেন

না, দিনের পর দিন পশুপ্রাণী পাখি ছাড়া কোনো মানুষের মুখ দেখেন না। কেননা তাঁর অধিকৃত জঙ্গলের মধ্যে কোনো মনুষ্যের প্রবেশ নিষেধ।'

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

'আপনারও প্রবেশ নিষেধ ?'

'আমার একটা ব্যাপার আছে। দিদির আপনজন বলতে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমার ভগ্নিপতির সঙ্গে দিদির বিচ্ছেদ হবার পর থেকে আমি দিদির সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতাম। কেননা আমারও তো দিদি ছাড়া কেউ নেই। দিদি দশ বছর আগে যখন এই নির্বাসনে এলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন অত্যন্ত প্রয়োজন বা বাধ্য না হলে আমৃত্যু কোনোদিন কোনো মানুষের মুখ দেখবেন না, সেই শুনে আমি খুব কেঁদেছিলাম। তখন দিদি ঐ জঙ্গলের মধ্যেই এককোণে আমাকে একটি ঘর তোলবার অনুমতি দেন। যখন খুশি তখন এসে থাকার অনুমতিও আছে। কিন্তু আমার স্বামী এবং সন্তান ছাড়া আর কারোকে নিয়েই ফটক দিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ। আর গেলেই যে দিদির সঙ্গে দেখা হয় তা নয়। একই পাহাড়ের মাথার উপরে সামান্য উঁচু-নিচুতে বাড়ি হলেও দূরত্ব যথেষ্ট। দূরত্ব অতিক্রম করলেও নির্দিষ্ট দিন ছাড়া তিনি দেখা করেন না।'

'এভাবে সম্পূর্ণ একা দশ বছর যাবৎ আছেন ?'

'আর একজন বৃদ্ধা ব্যারিস্টার মহিলাও আছেন সঙ্গে, তিনিও ডিভোর্সড। তিনিও মনুষ্য সংশ্রব বর্জিত হয়ে, দিদির সঙ্গে থাকেন।'

'কী খান ?'

'এখন তো বলা যায় প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। জঙ্গলেই যব করেছেন, গম করেছেন, বার্লির ক্ষেত করেছেন, তারপর শাকসবজি তরকারি এ সবের ফলনও বেশ ভালো।'

'এ সব করতে লোক লাগে না ?'

'না না, লোক কোথায় ? সব নিজেরা। জঙ্গলটা কেনার পরে মাস ছয়েক প্রস্তুতিতে কাটে, ঐটুকুই। দুটি ঘোড়া আছে, তাদের পিঠে সওয়ার হয়েই বেড়ান সেই চৌহদ্দিতে, তবে পায়ে হেঁটেই বেশী। একটি পুরোনো গাড়িও আছে অবশ্য, সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলা সেই গাড়ি নিয়ে এসে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ঘোড়ার দানা নিয়ে যান, মাংসও নেন।'

'কে দেয় ? কী করে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সব পান ?'

'ওটা বন্দোবস্ত আছে দোকানের সঙ্গে। চিঠি লিখে দিলেই তারা জায়গা মতো রেখে যায়। না পারলে লিখে জানায়।'

'তা হলেও তো মানুষের সংশ্রব দরকার। খাম পোস্টকার্ড কিনতে হবে। চিঠি এলে তা আনতে হবে—'

'তারও বন্দোবস্ত আছে। একটা ডাকগাড়ি সপ্তাহে একদিন এই পথে যায়, এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে এসটস পার্কের দিকে। সেখানে একটি মালভূমি আছে, সেই মালভূমির উপরে সরকার একটা টুরিস্ট সেণ্টার করেছে, উঠতে উঠতে সত্যি দুটো স্বর্গোদ্যান পড়ে পথে। সেই বাগান যে কী সুন্দর সাজানো, কতো যে ফুল, কতো যে পাখি তার ঠিক নেই। বছরের যে কোনোদিন গেলেই তেমনি সজীব বাগান, তেমনি পাখির গান। কোনোদিন গাছের পাতা হলুদ হয় না। কিন্তু সেটা কোনো মনুষ্য-নির্মিত নয়, প্রকৃতিরই সাজানো বাগান। আমাদের অনেক সংস্কার আছে, কোনো মালি কখনো সেই বাগানে হাত দেয় না। সেই ডাকগাড়িই দিদির কোনো চিঠি থাকলে দিয়ে যায় নিয়ে যায়। ফটকের ধারে একটা লম্বা গাছ আছে, তার গায়ে ডাকবাক্স বাঁধা। লাল নিশেন আছে, সেটা নামানো থাকে, চিঠি দিয়ে গেলে পিয়ন সেটাকে, দড়ি টেনে গাছের মাথায় উঠিয়ে দেয়, দিদি ঘর থেকেই দেখতে পান জানালা দিয়ে। তখন এসে চিঠি নিয়ে যান, আর যদি চিঠি রেখে যান বাক্সে তবে নামিয়ে রেখে যান সেই নিশেন। ডাকগাড়ি যেদিন যায়, নামানো দেখলে থামে, বোঝে যে ডাকে দেবার চিঠি আছে। তখন নিয়ে যায়।'

'কী আশ্চর্য। নিশ্চয়ই আমরা তাঁর জঙ্গলে যাবো, তাঁকে দেখাও তো একটা পুণ্য। আর ঐ এসটস পার্কেও কিন্তু একদিন—'

'নিশ্চয়ই। তোমাদের আমি সব দেখাবো, এসটস পার্ক, সোনার খনি—জান তো এই বোল্ডার শহর সোনার খনির জন্য বিখ্যাত? এই একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে যতোগুলো খনি ছিলো, এমন নজির নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তা হলে দিদির ওখানে যাবার কথাটা পাকা করি আগে, কী বলো?'

'খুব ভালো।'

এরপরে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সময় মিলিয়ে পাকা হলো কথা। আর সেই দিনই আমরা রেড ইণ্ডিয়ান দেখলাম। মিসেস ম্যাকলিন অনেকটা আগে এলেন, বললেন, 'যদি প্রস্তুত থাকো, চলো এখুনি বেরিয়ে পড়ি পথে তোমাদের আর একটা জায়গাও দেখিয়ে নিয়ে যাই। একটা হিলটপ আছে মাইল তিনেক গেলে, ভারি সুন্দর পাহাড় ঘেরা রেড ইণ্ডিয়ান বাচ্চাদের স্যানাটোরিয়াম সেখানে। বাচ্চাগুলো এতো মিষ্টি, আমরা প্রায় যাই।'

তখুনি রওনা হলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেই হিলটপে। যতো দুর্গম স্থানই হোক, অরণ্য যতো নিবিড়ই হোক, প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে তার সব গহন সৌন্দর্য খুঁজে নিয়ে এরা নিবাস বানিয়েছে। রেড ইণ্ডিয়ান বাচ্চাদের জন্য এই নিবাসটি যেন কল্পনার জগন্নিবাস। দেবভূমি ছাড়া সত্যি জায়গাটাকে আর কিছু মনে হয় না। সামান্য উঁচু নিচু ভর্তি প্রায় সমতল পর্বতচূড়ায় ছোটো বড়ো কটেজের সারি, আঁকাবাঁকা কাঁকর ঢালা পথ, পাশে পাশে বাগান হ্রদ প্রস্রবণ গুহা খেলার মাঠ রঙিন মাছের চৌবাচ্চা—ফুরফুরে বাচ্চারা যেন তার মধ্যে সব প্রজাপতি।

নানা বয়সের নানাবিধ ধরনের টি. বি. রোগীর জন্য নানা রকম বাড়ি, নানা রকম ওয়ার্ড, নানা রকম ওষুধপথ্য। ঊর্ধ্বে পনেরো বছরের রোগী থেকে নিচে একটি আট মাসের বাচ্চা পর্যন্ত আছে।

'আট মাসের বাচ্চারও টি. বি. হয় ?' আমি একেবারে অবাক।

মিসেস ম্যাকলিন সব বাচ্চাদেরই কিছু কিছু খাবার দিচ্ছিলেন। আমি জানি না, আমি নিয়ে যাইনি, আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো কিছু দিতে না পেরে। নার্সরা আমাদের যে সব ওয়ার্ডে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন, তারা সব সারবার মুখে এবং ছোঁয়াচে নয়। ছোঁয়াচে রোগী আরো একটু উপরে থাকে, পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাদের ঘর। বাচ্চারা আমার শাড়ির পোশাক দেখে আমাকে বোধহয় মানুষ বলে চিনতে পারছিলো না। কেউ কেউ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে থমকে দাঁড়াচ্ছিলো, কেউ সভয়ে যার যার খাটে উঠে গিয়ে নিজেকে নিরাপদ করছিলো, অনেক বাচ্চা তাদের নার্সকে জড়িয়ে ধরছিলো, আবার অনেক বাচ্চা কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছিলো, 'তুমি কে ?'

এর মধ্যে একটা বাচ্চা হাঁটু বেয়ে কোলে উঠতে চাইল, 'কিস্ মি মামমি' বলে কান্না জুড়ে দিল। আর একটা বাচ্চা আমার কোমরে ঝুমঝুমি দেওয়া ঝোলানো চাবির রিংটার জন্যে বায়না ধরলো—এই সব বাচ্চারা দু থেকে পাঁচের মধ্যে।

হঠাৎ একটি বাচ্চা জেদ ধরলো আমার সঙ্গে চলে যাবে বলে। যদিও নার্স বারণ করেছিল তবু সে আঁচল ছাড়ছিলো না। আমার খুব ইচ্ছে করছিলো ওকে সত্যি সত্যি নিয়ে আসি সঙ্গে করে, তা তো হয় না। কী ভীষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো জোর করে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময়! তখন ওদের ওষুধ খাবার সময় হয়ে গিয়েছিলো। দেখলাম একটা ঘরে লম্বা এ-মাথা ও-মাথা সিমেন্টের সরু টেবিলের উপর পুরিয়া করে নাম এবং নম্বর লিখে লিখে সাজানো আছে ওষুধ। ট্যাবলেটের গুঁড়ো। বললো এই রোগটা ওদের খুব হয়। খাটে বেশী খায় কম, আর এই উঁচু নিচু পাহাড় ভেঙে খাদ্য সংগ্রহ করতে করতেই ফুসফুসের রোগে ধরে। তারি মধ্যে বাচ্চা হয়, বাচ্চা গুলোও এ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। তবে বাচ্চা ওদের খুব কম হয়। প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে এই আদিবাসী গোষ্ঠী। সবকার তাই খুব যত্ন করছে এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আর, টি বি. রোগ তো নিয়মমতো ওষুধ পথ্য পেলেই সেরে যায়, তাই বলা যায় সেণ্ট পার্সেণ্টই বাঁচে। মরেও অবশ্য।

বাচ্চাগুলো সাংঘাতিক মোটাসোটা, যাকে বলে একেবারে 'রলি পলি' ঠিক তাই। রং সাহেবদের মতো ফর্সা নয়, ঘষা মাজা উজ্জ্বল শ্যাম। আমার মনে হয় মহাভারতের দ্রৌপদীর রং ঠিক এরকম ছিলো। বোধহয় অর্জুনেরও। এ দেশেব খাঁটি মঙ্গোলিয়ান চেহারা, প্রত্যেকেরই গালের হাড় উঁচু, চোখ ছোটো ছোটো এবং ভাসা, ঠোঁট পাতলা, নাক কারো কারো চোখা, কারো কারো বোঁচা। চুল চোখ দুইই কালো। আর সকলের চেহারার মধ্যেই এমন একটা সারল্য মাখানো মনে হয় এখনো ওরা পাহাড়-পর্বতের মধ্যে জঙ্গলে ঘাসেই বড়ো হচ্ছে। সেই সারল্য আর পাঁচটা শিশুর সারল্যের মতো নয়, জাতির সারল্য।

ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে সেদিন ক্রমাগতই আমার মাথাব মধ্যে চাঁদ তারা ধূমকেতুর সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ানদের অত্যাচারিত জীবন মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছিলো।

ধূমকেতুটা দেখেছিলাম বেরুবার মুখে। দৈর্ঘ্যে প্রায় একতলা সমান উঁচু, প্রস্থে অন্তত কুড়ি বাই কুড়ি একটা ঘরের মতো। এটা নাকি ধূমকেতুর একটা ছোটো টুকরো মাত্র। সবাই খুঁজে খুঁজে পা দিয়ে বেয়ে উঠে মাথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলো, ছবি তুলছিলো। সমবেতভাবে বাচ্চারা ছুটোছুটি করছিলো। আমি হাঁ করে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, বিশ্বচরাচরে কতো কাণ্ডই ঘটাচ্ছেন ঈশ্বর।

এর পরেই মিসেস ম্যাকলিনের মারসেটিবেন ছুটলো তাঁর দিদির পাহাড়ের

মাথায়। নেমে উঠে ভয়ঙ্কর উঁচু উঁচু পথে চলতে লাগলো গাড়ি। পূর্বযুগের দুটো পুরোনো গ্রামও দেখা হয়ে গেল। ঠিক মনে হয় শিলিগুড়ি থেকে দারজিলিং যাবার পথে কোনো ভুটিয়া গ্রাম।

এখনকার গ্রাম নয়, আমি যখন আমার সতেরো বছর বয়সে প্রথম দারজিলিং যাই, সেই সময়কার গ্রাম। তখন গ্রামগুলো গ্রামের আদর্শেই প্রতিফলিত ছিলো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতীক হিসেবে প্লাস্টিকের পর্দা ঝুলতো না। বাজার পাড়ায় প্ল্যাস্টিকের বালতি বা খেলনা বা চায়ের দোকান ঘিরে বড়ো চুল বড়ো জুলপী বেলবটম পরা যুবকদের ভিড় ছিলো না। এতো পদাতিক ছিল না, হুস হুস এতো গাড়ি যেত না, ঐ এক দেশলাইয়ের বাক্সের মতো একটি ট্রেন শব্দ করে গদাইলস্করি চালে চলতে চলতে এঁকে বেঁকে সাপের মতো ঐ সব গ্রামের পাশ দিয়ে চলে যেতো। গলায় দোলাই বাঁধা বাচ্চা, কম্ফর্টার জড়ানো যুবক, কম্বল মুড়ে বয়স্ক সবাই বেরিয়ে আসতো বাইরে। মেয়েরা কাজ করতে করতে লাশা শাড়ির ঘের দেওয়া ঘাঘরা অথবা বোখো পরে অবাক নয়নে তাকিয়ে ট্রেন আর ট্রেনের লোকজনদের দেখতো। সারাদিনে ঐ তাদের একমাত্র সঙ্গীতময় কোলাহল। তারপর আবার চুপ। নিস্তব্ধ নির্জন গ্রাম, কয়েক ঘর আবালবৃদ্ধবণিতা নিয়ে আবার ডুব দিত শান্তির পাথারে। প্রকৃতিই একমাত্র সখা তাদের, প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে এক ধরনের সুখ ছিলো যে সুখ তাদের প্রত্যেকটি মুখে মাখামাখি হয়ে থাকতো। সেই গ্রামের ছবি সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল, এমন অস্থির অস্তিত্বের দাপাদাপি সেই ছবিকে পোকায় কাটেনি। বছর খানেক আগে দু'দিনের জন্য দারজিলিং গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম গাড়িতে, যখনই কোনো গ্রাম পড়েছে, নামগুলো সব আমার মুখস্থ শুধু চেহারা দেখে আর চেনা গেল না। গাড়ি থামলে আর উৎসুক জনতার ভিড় জমলো না, গাড়ি থেকে নামলে কোনো গৃহস্থ আর আহ্লাদের সঙ্গে চায়ের মগ বাড়িয়ে দিয়ে আন্তরিক সুরে বললো না, 'পিয়, পিয়, চুয়াপানি পিয়।' মেয়েরা লাশাশাড়ির ঘের দুলিয়ে ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্য থেকে আপেল, ন্যাসপাতির ডালা নিয়ে এসে এগিয়ে ধরে হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো না। তাদের আপেলের মতোই লাল গাল আরো রক্তগোলাপ হয়ে উঠলো না।

বোল্ডারের গ্রাম দুটি ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের মধ্যে বড়ো বড়ো গাছ আর পাহাড়ের ছায়ায় যেন আরামশয্যায় শুয়েছিল। মিসেস ম্যাকলিন একটি পুরোনো ধরনের 'ইন'ও দেখালেন সেখানে। একটি মেয়ে এগিয়ে এলো, একেবারে বত্তিচেলির

ছবি, ঘরের সাজসজ্জা জিনিসপত্র সেই যুগের স্বাক্ষর। দেয়ালে দেয়ালে কুলুঙ্গি, কুলুঙ্গিতে লেসের ঝালর, মাথার উপর রঙিন চাঁদোয়ার অলঙ্করণ, ছোটো ছোটো উঁচু জানলার কাচে যীশুখৃষ্টের জন্মকথার বিবরণ। কোনো চুল্লীতে জল ফুটছে, পুরুষেরা একটা টেবিলের চারদিকে চারটি চেয়ারে বসে পাশা-জাতীয় কোনো খেলায় মত্ত। তাদের পরনে ইজের, গা খোলা, রঙ কাঁচা হলুদ। জাতে স্প্যানীশ। দরজার ভিতর দিয়ে চৌকো আঙিনায় বাগান।

এর পরে পাহাড়ের উপর পেঁছুতে পেঁছুতে রোদ চলে পড়লো। ফটক দিয়ে ঢুকে খাড়া পথ বেয়ে খানিকটা নিচে নেমে গেলে তবে ম্যাকলীনদের ঘর। সেখানে আগে থেকেই মিঃ ম্যাকলীন আর তার দুটি ছেলে সকাল থেকে এসে আছে। মিসেস ম্যাকলীন বললেন, এখানে আসবার নাম হলেই ছেলে দুটি ভীষণ লাফালাফি করতে থাকে। ওদের বাবা ওদের সব আবদার সমানে পূরণ করেন। সুতরাং ছেলেদের ইচ্ছেতে এবং জেদে ওদের নিয়ে তিনি সকালেই এসে গেছেন।

বাড়ি মানে ছোট একটি কুটির। টুপির মতো ঢালু ছাদ, চারদিক ঘিরে কাঠের রেলিঙ ঘেরা বারান্দা, বারান্দা সংলগ্ন পরিচ্ছন্ন উঠোনে পাথরের চাঁই ফেলে ফেলে বসবার আসন। আসনের সঙ্গে সঙ্গে সিমেণ্টের টেবিল।

ম্যাকলীন ছুটতে ছুটতে এলেন, ঘড়ি দেখে বললেন, 'তাড়াতাড়ি চলো, তোমার দিদি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

মিসেস ম্যাকলীন তাঁর টিফিন বাসকেট নামালেন গাড়ি থেকে, দৌড়ে গিয়ে রেখে এলেন ঘরের ভিতরে। ছেলেরা থাকলো, ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আমরা আবার রওনা হলাম। ম্যাকলীন আমাদের দিকে ফিরে সহাস্যে বললেন, 'আপনাদের জন্যে ও'রা ডিনারের ব্যবস্থা করেছেন। ভীষণ উত্তেজিত।'

আমার যদ্দুর মনে পড়ে দিদি ভদ্রমহিলাটির নাম ক্লারা, বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, খুব লম্বা, খুব বলিষ্ঠ, ছাঁটা চুল। সার্ট-প্যাণ্ট পরে পিছন ফিরে কী দেখছিলেন। একদম ছেলেদের মতো লাগছিল। গাড়ি থামতেই এগিয়ে এসে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে হাত ধরলেন আর স্পর্শমাত্রই চমকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমি হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, 'ভারি অবাক কাণ্ড তো।'

'কী।'

'আপনার হাতে হাত লাগামাত্র আমার যেন শক লাগলো।'

'যাঃ।'

'আপনার কিছু মনে হয়নি ?'

'না। তবে খুব অবাক হইনি। আজ সারাদিন তোমরা আসবে বলে আমার সমস্ত নার্ভগুলো যেন ধনুকের ছিলার মতো একেবারে টান টান হয়ে আছে। তুমিও নিশ্চয়ই খুব সেন্সেটিভ।'

'আচ্ছা আবার একবার আমাকে ধরোতো।'

আমি ক্লারার মণিবন্ধে আমার হাত রেখে আবার হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, 'একই রকম।'

'কী কাণ্ড! চলো ঘরে ঢুকি, কাঠের পাটাতনে দাঁড়ালে নিশ্চয়ই পাথরে দাঁড়িয়ে যা হচ্ছে তা হবে না।'

খাড়াই বেয়ে একটু উঠলেই কাঠের ছোটো বাড়ি। দাওয়ায় পশুপ্রাণীর ভিড়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই ঘরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। প্রথমেই যেটিকে চোখে পড়লো সেটি একটি নেকড়ে বাঘ, একটু দূরেই গলা উঁচু করে সারস পাখি, তারপরেই দুটি ভাল্লুক পাশাপাশি। দূর থেকে দেখে ভীত হয়ে উঠেছিলাম। স্পষ্ট দেখতে পাবার মতো কাছে এসে বোঝা গেল এই চেহারার মধ্যে কারো বুকেই প্রাণ নেই। ক্লারা বললেন, 'এরা সব বনজঙ্গলের কুড়িয়ে পাওয়া গাছের টুকরো। দেখেছ কী আশ্চর্য সব মূর্তি। আমার অবশ্য একটি ছোট্ট কারখানা আছে, চেহারার মিল পেলেই একটু আধটু সংস্কার করি, অমনি সজীব হয়ে ওঠে। এই নাও, তোমাকে এটা দিলাম।'

কারখানার বাস্কেট থেকে ছোট্ট একটা পাখি ধরিয়ে দিলেন হাতে, বললেন, 'এটা আমি কিছুই করিনি, শুধু গাটা চেঁছে দিয়েছি, কী মিষ্টি পাখি, না ?'

সত্যিই মিষ্টি। পাখিটা এখনো আমার কাছে আছে।

ভদ্রমহিলার এই কাটুমকুটুমের দৃষ্টিতেই তাঁর বিদ্যা সমাপ্ত নয়। বইও লেখেন। বাচ্চাদের বই। তা-ও দিলেন। আর দিনরাত কবিতা পড়েন। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে জমে উঠলো আলোচনা। মত পার্থক্য না থাকায় সেই আলোচনা সুমধুর বন্ধুতায় পরিণত হতে দেরি হলো না।

হাঁটতে হাঁটতে কাঠের বাড়ি থেকে অদূরে আর একটা কাচের জানালা ঘেরা বাড়িতে নিয়ে এলেন। এই বাড়িটিতে তিনটি কক্ষ। একটি খাবার এবং বসবার, অন্য দুটি শোবার। শোবার ঘর দুটিতে দেয়াল ঘেঁষে কাঠের মাচায় বিছানা পাতা, পাথরের উপর তক্তা পেতে টেবিল, সেই রকম চেয়ার। বসবার ঘরে জানলার তলায় দেয়াল জুড়ে গোল হয়ে আসা তেমনিই কাষ্ঠাসন, কিন্তু

ডানলোপিলোর গদিতে নরম, অসংখ্য কুশানের স্পর্শে কোমল। খাবার টেবিলটি বড়ো। ঐ রকমই পাথরের উপর পাথর চাপানো পায়ার উপরে, একপাট দরজা। লাল চৌকো চৌকো ঢাকনায় শোভিত। ঘরের চার দেয়াল ভর্তি তাক, তাক ভর্তি বই।

সে বাড়িতে গিয়েই ক্লারার এই মনুষ্যবর্জিত জীবনের একমাত্র মানুষ সঙ্গী বৃদ্ধা ব্যারিস্টার মহিলাটিকে দেখলাম। চোখে চশমা এঁটে মনোযোগ দিয়ে একটি মোটা বইয়ের পাঠোদ্ধার করছিলেন, 'আসুন, আসুন' বলে উঠে দাঁড়ালেন। এই মহিলা যে বয়সকালে সুন্দরী ছিলেন তার ছাপ সর্বত্র। পোশাকও পুরোনো দিনের ফ্রক।

ক্লারা বললেন, 'আমার যেমন সব কবিতার কালেকসন, মিসেস বারবারার তেমনি সবই দর্শন। অনেক দিন রাতে বাইরে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের মুখোমুখিও শুয়ে থাকেন। এসো, খেয়ে নিই আগে,' ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠলেন, 'ও বাবা সাতটা বাজে, কী কাণ্ড।'

টেবিল সুন্দর করে সাজানোই ছিলো, দৌড়ে গিয়ে খাবার নিয়ে এলেন। ঘোড়ার দানার অঙ্কুর, আলু সেদ্ধ, মটরশুঁটি সেদ্ধ, বীন আর চিংড়ি দিয়ে ভুট্টার ডাল, চীজ রুটি মাখন আপেল শশা আঙুর আইসক্রীম।

খাবার পরে ঈশ্বরের মুখোমুখি শুয়ে আমার ঘরটাও দেখা হলো। আসলে সমস্তটাই কাচের। মাথার ছাদও কাচের। মাত্র একজন মানুষ শুয়ে থাকার মতোই তার ব্যাস। লাল নীল মাছের ট্যাংকগুলো যে রকম, সেই জিনিসই অনেক বড়ো। মিসেস বারবারা বললেন, 'শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি, সেই দুজ্ঞেয়কে জ্ঞানে আনবার চেষ্টা করি, সে কি সম্ভব? সুললিত সঙ্গীতের মতো নিয়মিত লয়ে তিনি ছড়িয়ে আছেন সারা ভুবনে, একইভাবে চলছে তাঁর প্রাত্যহিক কাজ, সেই বিরাট প্রতিভার কে কবে কূল পেয়েছে?'

ক্লারা বললেন, 'দশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনে তোমরা আমাদের পক্ষে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রইলে। তোমাদের আমরা ভুলব না।' বিদায়ের সময়ে স্বর গাঢ় হলো, গলার হারে ক্রুশ চিহ্নতে হাত ছোঁয়ালেন।

'আমরাও ভুলবো না।' আমাদের স্বরও গাঢ় হলো।

এবপর ওঁরা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন, আমরা নেমে এলাম। ঐ ভয়ানক নিস্তব্ধ নির্জন ভীষণ পাহাড়ের মাথায় ওঁদের একা ফেলে আসতে আমার মন কেমন করতে লাগলো। মনে হলো মৃত্যুর আগেই ওঁরা ইহজগতের বাইরে চলে গেছেন।

ফিরে মিঃ ম্যাকলীনের কুটিরে এলাম। ম্যাকলীন বললেন, 'এবার একটা ভালো সাপারের বন্দোবস্ত করো তো নেলী। ছেলে দুটো কই, ঘুমিয়ে পড়লো নাকি?'

সারা পাহাড় এমন ভীষণ চুপ যে এই কটি কথাই ঠাস ঠাস কোলাহল হয়ে শ্রবণকে বিব্রত করলো, তারপরেই আবার শব্দ ডুব দিল অতল নৈঃশব্দের পাথারে। নেলী ঘরে ঢুকলো। আমরা বাইরে বসলাম। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দেই চমকাতে লাগলাম নিজেরা।

ওঁদের ঘরে ওঁরা ইলেকট্রিক নেননি, দরজার ফাঁকে একটি মোমের আলোর সংকেত পরিলক্ষিত হচ্ছিলো, আকাশেও কোনো আলো ছিলো না, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পর্বত প্রান্তর এক অলৌকিক একাকীত্বে হৃদয় মন পবিত্র করে তুলছিলো। এই সময় কলরব করতে করতে বেরিয়ে এলো ছেলে দুটি, এ ওর প্রতিযোগী হয়ে বলতে লাগলো, 'ভালুক এসেছিলো, প্রথমে আমি দেখেছি।'

'নেভার। কক্ষণো না, প্রথমে আমি।'

'মিথ্যে কথা, আমি।'

'আমি।'

'আমি।'

হাতাহাতি লাগে আর কি। মা-বাবা অগ্রণী হয়ে ঝগড়া থামালেন। অন্ধকারেই আমার দিকে তাকিয়ে নেলী বললো, 'এই চলছে এদের সারাদিন।'

আমি পার্থিব জগতে ফিরে এসে বললাম, 'যাই বলো, ভাল্লুকটা যেই আগে দেখুক না কেন, ওদের যে কিছু করেনি, সেই ঢের।'

অবহেলার সঙ্গে নেলী বলল, 'না না কী করবে। ঐ খেতেটেতে আসে। কিছু দিলেই খুশি।'

'কিন্তু বুনো ভাল্লুক তো—'

'ওরা ফেরোসাস না, ভারি ভালো, ভারি ঠান্ডা। যেন পোষা। তবে অবিশ্বাসের কারণ ঘটলে ক্ষেপে যায় বই কি।'

'ওমা, এখন এলে তো বেশ হয়, একটা বুনো ভাল্লুক দেখা কি কম কথা?'

'এই পাহাড়ে হরিণের ঝাঁক ছাড়া অন্য পশু বড়ো একটা নেই। দিদিরা তো কিছু বলে না, মধ্যে মধ্যে আসে দল বেঁধে। কিছু বন-মোরগ আর ময়ূরও আছে। দিনের বেলা হলে ঝরনার ধারে নিয়ে যেতাম দেখতে পেতে।'

'বাঘ নেই?'

'বাঘ। বাঘ কোথায় ? এদেশে বাঘ আছে নাকি ?'

আমার অজ্ঞতায় অন্ধকার কাঁপিয়ে হেসে উঠলো সবাই। তারপর ম্যাকলীন উঠে উনুন ধরাতে গেলেন। নেলী একটা মোটা মোম এনে বসিয়ে দিল পাথরের ঢিবির উপর। সেই আলোর আভাসেই কোণের দিকে এক গর্তে কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন দাউ দাউ করলো। ছেলে দু'জন তখন গলায় গলায়, বাবাকে সাহায্য করছে অগ্নি সংযোগে এবং সংরক্ষণে।

বুদ্ধদেব বললেন, 'চমৎকার ছেলে দুটি। একেবারেই সমান সমান মনে হয়।'

আমি বললাম, 'যমজ বোধহয়।'

নেলী হাসলো, 'না, যমজ নয়। ছ' মাসের ছোটোবড়ো।'

'ছ মাসের ছোটোবড়ো ? ওরা দু'জনই তো—।'

'হ্যাঁ, দুজনই আমাদের, তবে একটু অন্য রকম। আমরা ওদের পুষ্যি নিয়েছি।'

'দুজনকেই ?'

'দুজনকেই। একজন হলে বড্ড একা একা হয়ে যায় না ? ঐজন্য ভাবলাম সমান বয়সী দুজন নিলে সঙ্গী হবে।'

'দুজনই এক মায়ের ?'

'না। দুই হাসপাতাল থেকে দুজনকে নিয়েছি।'

'মায়েরা দিল ?'

'দুজনই অবিবাহিত মায়ের সন্তান, অসুবিধে ছিলো মানুষ করবার।'

নেলী উঠলো, ধরানো উনুনে মস্ত কেটলিতে জল ফুটিয়ে কফি করে দিল। তারপর আগুন কিছুটা প্রশমিত হলে, উনুনের মুখে একটা শিকের চৌকো উঁচু করে পেতে তার উপরে একটা লোহার সরু জাল বিছিয়ে স্টাফ করা চারটে মুর্গি—শুইয়ে দিল। বললো, 'মিট টেণ্ডারাইজার মাখা আছে, দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

কফিতে চুমুক দিয়ে হ্যারি হাসতে হাসতে বললো, ঘোড়ার দানা খেয়ে কি মানুষের পেট ভরে ? আর সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে পাল্লা দেব এমন মুক্ত মানবও নই।'

মুর্গি পোড়াতে পোড়াতে নেলী বললো, 'দিদির সঙ্গে শেষ কবে খেয়েছি মনে করতে পার হ্যারি ? সেদিনও কিন্তু এই ঘোড়ার দানার অংকুরটা ছিলো। এটাই ওদের আসল খাদ্যপ্রাণ। ভীষণ পুষ্টিকর। কী ভাবে অংকুরটা করে বলো তো ?'

'কী করে করে আমি দেখে এসেছি কারার রান্নাঘরে গিয়ে। দানাগুলো একটা কাঠের কানা উঁচু বারকোষে ছড়িয়ে জলে ভেজায়, উপরে আবার একটা ভেজা তোয়ালে দেয়, তারপর আর একটা ঐ রকম বারকোষ দিয়ে ঢাকে, চার পাঁচ দিন বাদে অংকুর গজিয়ে যায়। আমাদের ছোলামুগ ভেজাবার মতোই প্রায়।'

শুনে ম্যাকলীন আমাকে খুব বাহবা দিলেন, বাঃ খুব ভালো গৃহিণী তো। দিব্যি এইটুকু সময়ের মধ্যে সব জেনে এসেছেন। উঠে গিয়ে স্কচ হুইস্কির বোতল নিয়ে এলেন, সঙ্গে ফরাসী ওয়াইন 'দুবনে'। নিজেরা হুইস্কি নিয়ে আমাকে ওয়াইনের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি, নিন, দেখুন অমৃত কাকে বলে। নেলী, আলু ফাটাও আলু ফাটাও। আপনি কিন্তু এটা ফেলতে পারবেন না।' আলু ফাটাবার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা গিয়ে আরেক গর্তে আগুন করতে বসলো। তাদের উৎসাহ অদম্য। অনবরত কিছু না কিছু খাচ্ছে তারা, এই সময়ে দুটি বড়ো বড়ো আপেলে দাঁত বসাচ্ছিলো। মাকে বললো, বাবা মায়ের বাড়িতে এই জঙ্গলে এই তাদের শেষ অবস্থান, কেননা সারা দুপুর ভরে পাশের টিলাতে গাছের ছায়ায় সুন্দর একটি বাড়ি বানিয়েছে তারা, এরপর থেকে দুই ভাই সেখানেই থাকবে।

ছেলেদের ধরানো উনুনে একটা লোহার চেম্বারে রাশিকৃত আলু মাখন মাখিয়ে ভরে দিয়ে চেম্বারটা আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে দিতে নেলী বললো, 'খুব ভালো, বাঁচা যায়। কেননা আজ ঘরবাড়ির যা হাল করেছে দুইভাই তার জন্য বাড়ি না বানালে ঐ জঙ্গলেই তাদের ছেড়ে দিতে হতো।'

পাহাড়ের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে জ্বলতে লাগলো আগুন, টুপটাপ গল্প, ছেলে দুটির অকারণ উদ্ভাসিত হাসি, এমন কি মদের গ্লাসে চুমুক দেয়ার শব্দটিও তরঙ্গায়িত হয়ে জনমনুষ্যবিহীন প্রান্তিক পাহাড়ের সুমহান গম্ভীর স্তব্ধতাকে ভেঙে ভেঙে দিতে লাগলো।

নেলী হ্যারি দুজনেই বললেন, ক্লারা আর বারবারা দশ বছর বাদে তাঁদের ব্রত ভঙ্গ করেছেন দুজন ভারতীয়ের জন্য। আজকে একটা দিনের মতো দিন। আমাদের খুব ভালো লাগছে আজ।

আমারও মনে হচ্ছিলো, সত্যিই, দিনের মতো দিন। আমি কোনো কথাবার্তায় বিশেষ যোগ দিতে পারছিলাম না, অনন্ত অন্ধকারে তাকিয়ে মনটা থেকে থেকেই ক্লারা আর তাঁর দার্শনিক বন্ধু বারবারার কাছেই চলে যাচ্ছিলো। ক্লারাকে ছুঁলেই যে আমার শক লাগছিলো সে কথাটা ভুলতে পারছিলাম না।

ক্লারা যতো সহজে বলতে পেরেছিলো পাথরের উপর না দাঁড়িয়ে, চলো কাঠের ঘরে যাই, তবেই আর শক লাগবে না, আমি ততো সহজে সে কথাটা মেনে নিতে পারছিলাম না। দশ বছর কীভাবে মানুষ মনুষ্যসংস্রব বর্জিত হয়ে থাকতে পারে সেটাও মগজে ঢুকছিলো না ভালো করে।

আমাদের দেশে সাধুসন্তরা সব পারে। মনুষ্যসংস্রব বর্জিত গুহার জীবন অনেক সাধুরই অভিপ্রেত। শ্রীঅরবিন্দের জীবনও তাই ছিলো। এগুলো আমরা সন্ন্যাসীদের বেলায় মেনে নিই। কিন্তু ওঁরা দুজনের একজনও সেই অর্থে সন্ন্যাসিনী নন। ক্লারা কবিতাপাগল লেখক এবং বেশীর ভাগটা মিস্ত্রী। কারখানাটি ক্লারা সবিনয়ে ছোটো বললেও খুব ছোটো নয়। যদিও একাই কাজ করেন, কিন্তু কতো কাজ যে করেন তাঁর ঠিক নেই।

ওঁদের বসবাসের খেলনাঘরের মতো বাড়ি তিনটি ওঁরই তৈরি, ওঁদের আসবাবপত্রও সব ওঁর হাতের। যন্ত্রপাতি যে কতো আছে তার ঠিক নেই। তবে কোনো দুর্গমগিরি কান্তার মরুতেও যে বিদ্যুতের অভাব নেই সেটা বোধ হয় আমেরিকাতেই সম্ভব। মহিলার সমস্ত যন্ত্রই বিদ্যুৎচালিত। প্লাগ লাগিয়ে দিয়ে কাঠও কাটেন, মূর্তিও গড়েন।

ক্লারার কোনো বিলাসিতা নেই, সেটা ঠিক। তাঁর পোশাক কেজো, মাথার চুল ছাঁটা, কোনো প্রসাধনদ্রব্যের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই দেহে, কিন্তু পঁয়ষট্টি বছরের মিসেস বারবারা সাজসজ্জায় মোটেই কার্পণ্য করেন বলে মনে হয়নি। এ জঙ্গলেও তার ঠোঁটের লাল অমলিন, গালের রুজ সুস্পষ্ট। পোশাকেরও যথেষ্ট পারিপাট্য আছে। তাছাড়া আজ নিরিমিষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এটাই দৈনন্দিন রুটিন নয়। মদ মাংস দুইই তারা গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সন্ধানে যাঁরা গৃহ ছাড়েন, তারা সব ছাড়েন, তাঁদের এক ছাড়া দুই নেই, একমেবাদ্বিতীয়ম্। শুধু তাঁর তৃষ্ণা, তিনিই ধ্যান, তিনিই জ্ঞান। কিছু যে পান সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই, তা নইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণাই বা জয় করেন কী করে।

একবার আমি হৃষিকেশে গিয়ে দৈবাৎ এক সন্ন্যাসীকে দেখেছিলাম, যাঁর কথা সেখানকার একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমাকে বলছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে এমন কোনো ঋষির দেখা পেয়েছেন কিনা যিনি সত্যিই সিদ্ধিলাভ করে সব প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন। চুপ করে থেকে অধ্যক্ষ বললেন, 'আমি ষোলো বছর এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি, আমার ছাত্ররা সবাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেই এখানে দর্শনের পাঠ নিতে

আসে। ঈশ্বর উপাসনা তাদের জীবনের একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকে। কিন্তু তবুও তারা মানুষের উপরে কিছু নয়। আমিও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, আমিও নই। একজন আছেন ঐ পাহাড়ের অভ্যন্তরে একটি গুহার মধ্যে—' তিনি অদূরের পর্বতমালায় অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, বছরে একবার কি দুবার সেই গুহা থেকে বেরোন তিনি। দূর থেকে আমি দেখেছি দু-তিনবার সেই দিগম্বর বিরাট পুরুষটিকে, সত্যি যাঁর সব প্রয়োজন মিটে গেছে ইহজগতের। তিনি সেই পুলকের অধিকারী হয়েছেন যার নাম ব্রহ্মানন্দ। নইলে শীতে গ্রীষ্মে এই রোগশোকভরা পৃথিবীতে কী করে একটা গুহার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন। খান কী? কী পান করেন? প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মই বা কোথায় সম্পন্ন করেন। আমি অনেক ভেবেছি মর্তলোকের এই সাধুটি সম্পর্কে। অনেক দিন ঐ পাহাড়ের তলায় দিনমান দাঁড়িয়ে থেকেছি যদি একবার বেরোন, বেরোননি। গভীর রাত্রেও গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে ভোর হয়ে গেছে, কখনো বেরুতে দেখিনি। কিন্তু দেখেছি, হঠাৎ দেখেছি—আরে কী আশ্চর্য! ঐ তো ঐ তো!' অধ্যক্ষের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও এক দিগম্বর বিরাটকায় পুরুষকে দেখতে পেলাম, সোজা হেঁটে যেতে যেতে একটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি নিবিষ্ট হয়ে এই সবই ভাবছিলাম, এই সময় কোন্ অন্তরাল থেকে মস্ত চাঁদ জ্যোৎস্নায় পৃথিবী প্লাবিত করে ভেসে উঠলো আকাশে। মিসেস ম্যাকলিন তৎক্ষণাৎ মোম নিবিয়ে দিলেন, ততোক্ষণে তাঁর মুর্গি পোড়া হয়ে গেছে, বড়ো লংকা টোমেটো আর বিন্ সেদ্ধ দিয়ে প্রায় আস্ত আস্ত তুলে দিলেন প্লেটে। মস্ত মস্ত একটা ফাটা আলু সঙ্গে।

বেশী রাত্তিরের বনভোজন সাঙ্গ হতে হতে দশটা বাজলো। তারপর ফেরা। মিসেস ম্যাকলিন এবার গাড়ি চালাচ্ছেন না। তাঁর স্বামী চালাচ্ছিলেন। আমরা পিছনে বসেছি। আমার চুপচাপ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার দিদিকে কেমন লাগলো?'

আমি জবাব খুঁজে পেলাম না। আমার মন এক অদ্ভুত আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলো।

ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়াম দেখে এসেই সেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত্তিরের নিমন্ত্রণ রাখতে ছুটতে হলো। ভদ্রলোকের পদবী ডেকার, নাম মনে

নেই। অথচ কতো বন্ধুতাই হয়েছিলো তখন। নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে কোনো একটা কলেজের অধ্যক্ষ। পঞ্চাশের উপরে বয়েস, দেখে কে বলবে সে কথা। একেবারে একটা তাজা টগবগে যুবক। স্ত্রীর নাম মেরী, মেরীকে বেশ বৃদ্ধা মনে হয়। বয়সেও খানিকটা বড়ো। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চমৎকার। থাকেন সেন্ট্রাল পার্কের ধারে একটা অতি সুন্দর অ্যাপার্টমেণ্টে। জানলায় তাকিয়ে সমস্ত পার্কটা চোখে পড়ে।

পার্ক তো পার্ক নয়, একটা ছোটোখাটো শহর। আগে একদিন বিকেলে চায়ে ডেকেছিলেন, সেদিন গাড়িতে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন অনেকটা। পার্কের মধ্যেই হ্রদ, বাগান, দীঘি, জঙ্গল, জলপ্রপাত, বল খেলার মাঠ, গলফ খেলার মাঠ, টেনিস খেলার লন, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বলনাচের হল—সব আছে। ঘুরতে ঘুরতে রাত হলো, আলো জ্বললো, তারপর দেখা গেল কোনো বিবাহের পার্টি নাচতে এসেছে সেই বলনাচের হল ঘরে। ডক্টর ডেকার বললেন, 'ঢুকবে নাকি ?'

আমি উৎসুক হয়ে বললাম, 'ঢুকতে দেবে ?'

'কেন দেবে না ? দাঁড়াও টিকিট কাটি।'

'নাচ দেখতে পাবো ?'

'নিশ্চয়ই। চাইলে নাচতেও পারবে।'

আমি হেসে বললাম, 'এই বলনাচ যে কী বস্তু তাই আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি, তায় আবার নিজে নাচবো !'

'বলনাচ না হয় নাই দেখেছ, এমনিতেও কি কোনোদিন কোনো নাচ নাচনি ?'

'কোনোদিন না। নাচ বিষয়ে আমার এ বি সি ডি জ্ঞানও নেই।'

'তবে চলো নাচ দেখাই তোমাকে।'

ঢুকে দেখলাম থিক-থিক করছে লোক, বিশাল হলে কতো যে মানুষ জড়ো হয়েছে তার ঠিক নেই। মাঝখানে মসৃণ চত্বর। কোণ ঘেঁষে একটু উঁচুতে বাজনাদাররা বসেছে, গম গম করছে বাদ্য। জোড়ায় জোড়ায় দুলছে সব। চারদিকে গদি-আঁটা চেয়ারে বসে কেউ দেখছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ প্রেম করছে, কেউ তাল দিচ্ছে, অবাধ এক প্রমোদের মেলা।

নাচের জুটিরা সবাই প্রায় প্রেমিক-প্রেমিকা। ডক্টর ডেকার কৌশলে ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে আমাদের নিয়ে দিব্যি সামনের টেবিলে চলে এলেন, ইশারায় কোনো বেয়ারাকে পানীয় অর্ডার দিলেন, আর কিছু খুচরো খাবার।

টেবিল ঘিরে চারটেই চেয়ার ছিলো। আমি বুদ্ধদেব আর মেরী তিনজনেই

বসে পড়েছিলাম, ডক্টর ডেকার দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন, 'এসো।' আমি বললাম, 'কোথায় ?'

'এসো না।'

উঠে গেলাম। সঙ্গে করে সেই চত্বরের কাছে গিয়ে সহসা হাত ধরে প্রায় নৌকোর পালের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন ফ্লোরে। আমি 'এ কি! এ কি!' বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠতেই বললেন, 'তোমাকে নাচ দেখাবো বলেছিলাম, দ্যাখো।'

'আমি জানি না, আমি পারি না—।'

'তোমাকে পারতে হবে না, নাচবো আমি তুমি শুধু দয়া করে স্টেপটা দিয়ে যাও। লক্ষ্মী মেয়ে শুধু স্টেপটা দাও।'

আমি লজ্জায় ঘেমে উঠলাম। কিন্তু ডেকার ওস্তাদ নাচিয়ে, সেই আনাড়ি আমাকে নিয়েই চষে বেড়াতে লাগলেন অতবড়ো জায়গাটা। সুতো ধরে যেমন পুতুল নাচায়, ঠিক তেমনিই নাচাচ্ছেন আমাকে হাতে ধরে। কখনো ঝড়ের বেগে, কখনো দোলায়মান, কখনো বিদ্যুতের মতো গমকে চমকে। মধ্যে মধ্যে খুব মৃদু স্বরে উৎসাহ দিচ্ছেন, 'অপূর্ব, চমৎকার, একসেলেণ্ট, তালে তালে এমন নিখুঁত পা ফেলা মোটেও সহজ নয়।'

এইরকম বিপদে আমি কোনোদিন পড়িনি। আমার বুকের ভিতরে যেন একটা কবুতরের বুক ধুকপুক করছে। আমার কান বন্ধ হয়ে গেছে, চোখ খুলে তাকাতে পারছি না, ডক্টর ডেকারের কিছু গ্রাহ্য নেই। আমার অবস্থা দেখে তাঁর করুণা হচ্ছে না, স্মিতহাস্যে নতুন নতুন সংযোজন দেখাচ্ছেন নাচে। হাততালি হাততালি হাততালি। পঞ্চাশ মিনিট সমানে এই করে নেমে এলেন ফ্লোর থেকে। আমি হাঁপাচ্ছিলাম। মিসেস ডেকার আমার পিঠে হাত রাখলেন, 'কী অন্যায়, কী অন্যায়'। স্বামীর দিকে রক্তচক্ষে তাকিয়ে বললেন, 'ব্রুট, স্যাভেজলি ক্রুয়েল, আমি তোমাকে বাড়ি গিয়ে শিক্ষা দেব।'

আমি মেরীর নরম-নরম হাতে হাত বুলিয়ে বললাম, 'না, না আমার কিচ্ছু হয়নি, তুমি রাগ কোরো না। আমি তো নাচ জানি না, বাচ্চা বয়সে মেয়েরা যে খেলাচ্ছলে নাচে আমি কখনো সেটুকুও নাচিনি, আমার খুব লজ্জা করছিলো, খুব অপদস্থ মনে হচ্ছিলো—'

বুদ্ধদেব বললেন, 'দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগছিলো। একবারও মনে হচ্ছিলো না তুমি কোনোদিন নাচনি।'

মিসেস ডেকার বললেন, 'তা কী করে মনে হবে, আমার স্বামী হলো গিয়ে একজন নাম্বার ওয়ান নাচিয়ে, ওর সঙ্গে নাচতে পারা মেয়েদের ভাগ্য। মেয়েদের কি আর নিজে নাচতে হয়? ওই নাচায়। সব অর্থেই নাচায়। আর পছন্দসই মেয়ে হলে কি উপায় আছে?'

এ কথায় আমরা হেসে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম ডক্টর ডেকার দূরে গিয়ে অন্য টেবিলে বসেছেন। হাসিগল্পে খুব মত্ত। ফ্লোরে বৈবাহিক পার্টির নাচিয়েরা নতুন জুটি খুঁজছে। আমার কাছে তিনটি অফার এলো, আমি সবেগে আপত্তি জানিয়ে জনান্তিকে বুদ্ধদেবকে বললাম, 'চলো এবার পালাই।'

ডক্টর ডেকার এলেন, 'কী, খুব পরিশ্রম হয়েছে?' আমি বললাম 'না, পরিশ্রম আর কি! শীতের মধ্যে শরীর গরম হলো একটু।'

'আমার স্ত্রী খুব রেগে যাচ্ছেন তোমাকে কষ্ট দিয়েছি ভেবে।'

মিসেস ডেকার বললেন, 'নিশ্চয়ই রেগেছি। তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। নিজের ইচ্ছেটাই তোমার সব।'

'এদের সঙ্গে এসো আলাপ করিয়ে দি—', আমার আর বুদ্ধদেবের দুই কাঁধে হাত রেখে অতি উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত এক মহিলা এবং তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এঁদের কাছে জিজ্ঞেস করো মিসেস বোসের নাচটা ওদের কেমন লেগেছে। আমাকে ডেকে নিয়ে তাই বলছিলেন।'

মহিলা উচ্ছ্বসিতভাবে মাথা নাড়লেন, 'কী পোশাক! ম্যাজেন্টা রং কালো বুটি, কালো হলুদ বর্ডার নিয়ে সিলকের ঘের যখন নাচের সঙ্গে সঙ্গে দোল খায়, সেটাও দেখবার। এমন পোশাক নিয়ে সেন্ট্রাল পার্কের হলে আর কে কবে ঢুকেছে। ডক্টর ডেকার তুমি ভাগ্যবান।'

বলামাত্রই ডক্টর ডেকার আমার হাত ধরে টানলেন, 'মিসেস বোস, চলো চলো, লেট্স গো এগেইন।'

'অসম্ভব। অসম্ভব।'

'একবিন্দুও অসম্ভব নয়। আর একবার, আর একবার।'

'নৃনো' মেরী ধমকে উঠলো।

ডেকার সহাস্যে বললেন, 'রাগ কোরো না ডিয়ার, তুমিও এসো না ফ্লোরে, মিস্টার বোস এসো, তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে নাচো।'

'তবেই হয়েছে।' বুদ্ধদেব হাসতে হাসতে অস্থির।

ডেকার সজোরে আমাকে টেনে নিলেন, 'শোনো মিসেস বোস, সুখ বড়ো

কৃপণ, বড়ো কম ধরা দেয় জীবনে, আমি সুযোগ ছাড়তে চাই না। অনেককাল বাদে আমি নাচতে নামলাম, মনোমত পার্টনার না পেলে কি কৃতিত্ব দেখানো যায়, এসো এসো—'

এবার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত আয়নার মতো স্বচ্ছ, চকচকে ঝকঝকে পিচ্ছিল কালো ফ্লোরটা যেন শূন্যে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। তারপর গোল হয়ে প্রদক্ষিণ করলেন দুবার, মনে হলো আমি হাঁসের মতো জলে ভেসে আছি, উনিই ভাসিয়ে রেখেছেন, আস্তে বললেন, 'আমার উপর ছেড়ে দাও শরীর, ভয় পেয়োনা, বাজনায় কান রাখো, স্টেপ ঠিক রাখো—'

সুখ সত্যিই কৃপণ।" ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়, আর আসে না। আমরা গাছের মতো পুরোনো হই না, বস্তুর মতো পুরোনো হই। গাছের আমৃত্যু প্রয়োজন ফুরোয় না, আমাদের মনুষ্যকুলের প্রয়োজন সন্তান বড়ো হলেই মিটে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই মলিন কিরণ নিয়েই আমরা প্রয়োজনের পরেও বেঁচে থাকি। তারপর শুধু স্মৃতি স্মৃতি আর স্মৃতি।

সেই রাত্রে ডক্টর ডেকারের বাড়িতে গিয়ে সেইরকমই একটি স্মৃতি সর্বস্ব মলিন কিরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। বৃদ্ধ লোকটি যেন ইতিহাসের পাতা ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন, ট্রট্স্কির সহকর্মী কনডেনসকি।

স্ট্যালিন দলে ভারী ছিলেন বলেই মতভেদ তিনি মেনে নেননি, শুনেছি ট্রট্স্কিকে অতি নিষ্ঠুরভাবেই হত্যা করা হয়েছিলো। ইনি পালাতে পেরেছিলেন। সোজা এই দেশে। তারপর থেকে এই তাঁর দেশ। বয়স এখন আশি, প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া মানুষ ঢিলে হয়ে গেছে, মুখ শত সহস্র বলিরেখায় চিত্রবিচিত্রিত। উঠে দাঁড়িয়ে রাশান উচ্চারণে ইংরিজি ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বলতেই অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সেই নাম দু-একবার উচ্চারণ করেই কাস্ত্রো কেনেডি জওহরলালে চলে এলেন। রাজনীতি তখনো তাঁর অন্তরীতন্ত্রীতে বাজনা বাজায়। উনি যে গীতাঞ্জলি পড়ে কতো মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই কবির দেশেরই আর একজন কবিকে দেখে কতো খুশি হয়েছেন ডেকারের নির্দেশমতো সেই কথা বলতে ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষের কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনা প্রকাশ করলেন। তখনো তিনি পুরো

মাত্রায় বিপ্লবী। বুদ্ধদেব মাঝখানে একবার পাস্টারনাকের কথা তুলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্টালিনের বিষয়ে একটা সাংঘাতিক কটূক্তি করে অনেকক্ষণ থমকে থেকে রাগ সামলে বললেন, 'ওর যে এই পরিণতি হবে তা আমি জানতাম। পাপিষ্ঠ। তোমাদের বলি, ট্রট্‌স্কির মতো মানুষ হয় না। তার সততা ছিলো তুলনাহীন। সে তার নিজের দেশ আর নিজের জয়কেই বড়ো বলে ভাবতো না, সে ছিলো সমস্ত মানবজাতির বন্ধু, সমস্ত জগতের প্রেমিক। তার হৃদয়ভরা শুধু ভালোবাসা ছিলো!' গলা ধরে এলো, বসে পড়লেন।

আর একজন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন কিছু বলতে। আত্মপরিচয় দিলেন। রোদ্যাঁর সময়কারই এক খ্যাতিমান ভাস্কর। এখানকার আধুনিক চিত্রশালায় রোঁদ্যার ঘরের পাশেই এঁর কাজ আমরা দেখে এসেছিলাম। এঁর বয়েসও আশি। খ্যাতির শিখরে উড্ডীন। নাম আর্চিপেঙ্কো।

অনেকক্ষণ থেকেই একটি তরুণী, দেখতে একেবারে কুমারটুলীর সরস্বতীর মতো মুখ নিয়ে, সৌন্দর্যে আমাকে মুগ্ধ করে, কালো ঝলমলে পোশাকে গা ঘেঁষে বসে ভারতবর্ষ বিষয়ে অনেক খবর নিচ্ছিলো। বলছিলো, 'আমরা যাবার প্ল্যান করছি। আমার স্বামীর আর কাজ ফুরোয় না তাই যাওয়াও হয় না।'

মেয়েটির বয়েস চব্বিশ পঁচিশ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনজন তোমার স্বামী?'

সে ভিড়ের মধ্যে কোনো একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো, 'দ্যাট এলডারলি পার্সন।'

এখানে নিমন্ত্রিতরা তো সবাই এলডারলি পার্সন। কাকে সে উদ্দেশ করেছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। যেই আর্চিপেঙ্কো উঠে দাঁড়ালেন, মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হলো। সব কথা থামিয়ে একমনে তাকিয়ে রইলো তাঁর মুখের দিকে। বার্ধক্যের জন্যই বোধহয় ভদ্রলোকের কথা খুব জড়ানো, মেয়েটি সস্নেহে বললো, 'একটু দাঁতের অসুবিধে আছে কি-না? কানেও শুনতে পান না, যন্ত্র দেখছো না? তবে আর্চিপেঙ্কো ইজ আর্চিপেঙ্কো। এর তো কোনো জবাব নেই। তাঁকে দেখতে পাওয়াই সৌভাগ্য। এরকম স্বামী পেয়েছি বলে ঈশ্বরকে আমি প্রতিদিন ধন্যবাদ জানাই।'

আমি বললাম—ঠিক বললাম না, মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'তোমার স্বামী?'

'তখন দেখালাম তোমাকে?'

হা ঈশ্বর ! এই নাকি ওর এলডারলি পার্সন ?

মেয়েটি ছাত্রী ছিলো, গুরুভক্তির প্রাবল্য শেষপর্যন্ত পতিভক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আলাপ হবার পরে এক রাত্রে আর্চিপেংকোও নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাদের। আমরা আর ডক্টর ডেকার দম্পতি। সেদিন গিয়ে 'প্রেমের বিচিত্র গতি' কাকে বলে সেটাই প্রত্যক্ষ করা গেল। আর্চিপেংকো যা করছেন যা বলছেন সবেতেই সেই আশি বছরের বৃদ্ধের পঁচিশ বছরের স্ত্রী রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। মেরী আমার হাত টিপে চুপে চুপে বললো, 'মিসেস আর্চিপেংকোর কাণ্ডটা দেখছো ? কী রকম আদেখলামি করছে স্বামীকে নিয়ে ?'

ডক্টর ডেকার স্ত্রীর কাঁধে চাপ দিলেন, 'শেখো শেখো, শিখে নাও।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিসেস ডেকার ভ্রূকুটি করলেন, 'ন্যাকামি কোরো না।'

ডেকার আমার দিকে তাকালেন, 'সম্ভাষণ শুনলে তো ? তোমরা ভারতীয় মেয়েরা নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করো না। ইস্‌স্ যৌবনে কেন যে একবার সেখানে গেলাম না।'

আর্চিপেংকোর বাড়ি থেকে তাঁর স্টুডিয়ো মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। খাওয়া দাওয়া আড্ডা সেরে রাত দশটায় রাস্তা পার হয়ে সেই স্টুডিয়োতে যাওয়া হলো। পথ নির্জন, নীরব। শুধু হুসহুস গাড়ি যাচ্ছে দু-চারটা। এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে, খুব ভালো লাগছিলো হাঁটতে। কাঁপা কাঁপা গলায় আর্চিপেংকো গান ধরলেন একটা, প্রেমের গান। মিসেস আর্চিপেংকো মনে হলো আবেশে সেইখানেই মূর্ছা যায়। মিসেস ডেকার আবার আমার হাতে চাপ দিলেন।

স্টুডিয়োতে ঢুকে আমরাও মূর্ছা গেলাম। কল্পনা করা শক্ত হলো, একজন আশি বছরের বৃদ্ধের শরীরে এতো শক্তি। বিশাল বিশাল সব মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণতা পাবার আশায়। কোনো মূর্তি ব্রোঞ্জের, কোনো মূর্তি পাথরের। বয়সের এই ভার নিয়ে এই মানুষ এই ধাতুর সঙ্গে লড়াই করে ! প্রতিভার সঙ্গে প্রেমে পড়লে যে বয়সের কোনো মানে থাকে না সেটুকু অন্তত বোঝা গেল। চব্বিশ বা পঁচিশ বছরের সুন্দরী কন্যা কেন আর্চিপেংকোর প্রতি পদক্ষেপে রোমাঞ্চিত হন তার কারণ সহজ চেহারায় দেখা দিল। সমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত, সদ্য শুরু করা সব মূর্তি যেন পিপাসার্ত হয়ে আছে তাদের সৃষ্টিকর্তার

স্পর্শের আশায়। আর্চিপেঙ্কো এক একটি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে এক একরকম আলো চোখে নিয়ে তাকাচ্ছেন তাদের দিকে। আমাদের ভুলে গেছেন তখন। নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজেই নিমগ্ন।

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল সেদিন। ডক্টর ডেকারই পেঁছে দিয়ে গেলেন। ডেসকে চাবি নিতে গিয়ে শুনলাম, কবি গলওয়ে কিনেল ফোন করেছিলেন, কাল সকাল দশটায় আসবেন। ফোনের মেয়েটি সহাস্যে চিরকুটটি এগিয়ে দিল।

এসে থেকে আর গলওয়ে কিনেলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কোথায় যে আছে সেটাও ঠিক জানা ছিলো না বলে যোগাযোগ করাও সম্ভব হয় নি। স্বভাবতই আমরা খুব খুশি হয়ে উঠলাম। এই সুদর্শন আধুনিক কবিটির অবস্থান যদিও কলকাতাতে মাত্রই কয়েক দিনের ছিলো, তথাপি সৌহার্দ্য হয়েছিলো খুব। পুনরুল্লেখ করলে বোধহয় দোষ হবে না, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব এঁর আগ্রহ এবং অনুরোধেই অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে গরঠিকানা হয়ে গিয়ে আমরা খুব মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলাম।

ঝমঝম বৃষ্টি দিয়ে শুরু হওয়া দিনটা তা হলে ভালই কাটলো। রাত্রিবেলা শুতে যাবার আগেও সুখবর।

পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটাতেই সখীসহকারে এসে দরজায় টোকা দিল গলওয়ে। নিয়মানুবর্তিতা এদের মজ্জায় মজ্জায়। গলওয়ে বেশ কবি কবি ভাব নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু এই নিয়মানুবর্তিতা থেকে সরতে পারে না। শ্বেতাঙ্গদের আসল উন্নতির উৎসই এই ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিকটি করা। তার মধ্যে মার্কিনীরা সম্ভবত এ-বিষয়ে আরো কঠোর। প্রয়োজনেই কঠোর। তাদের বিশাল ভূখণ্ডে লোকসংখ্যা এমন দুঃসহভাবে কম যে যাদের আমরা কাজের লোক বলি, সেই কাজের লোক এখানে নেই বললেই হয়। জীবনযাপনের পক্ষে যা করণীয় তা এক মিনিটের জন্যে ফেলে রাখলে চলে না। অথচ এর মধ্যেই একশোতলা বাড়িও যেমন উঠেছে তেমনি মানস-কীর্তিতেও কিছু পিছিয়ে নেই। তাই বিছানায় বসে চা খেয়ে সকালের জড়তা ভাঙা অথবা থাকগে অমুকে করবে বা অমুক সময়ে করে নেবো এই সুখ এরা জানে না। ইয়োরোপের একটা সাধারণ হোটেলেও যে সেবা মনুষ্যের দ্বারা প্রাপ্য এখানে সেটা প্রায় বিলাসিতার পর্যায়ভুক্ত। এইজন্যেই ছুটির দিনের সমস্ত

কাজকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য এমন নির্মমভাবে অবরুদ্ধ। ছুটির দিনগুলোকে এরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপভোগ করে। তবে এই লোকস্বল্পতা একদিকে যেমন আশীর্বাদ, অন্যদিকে কিছুটা ক্ষতিও করেছে। সবই মেসিনজাত। বোতাম টিপলেই চা কফি স্যান্ডুইচ, দুধ, চকোলেট সবই মেলে, মেলে না শুধু মানবিক স্পর্শ। হস্তশিল্প বলতে কিছুই নেই এ-দেশে। সময় কোথায় ?

এই দ্রুতজীবন নিয়েও এরা কিন্তু অতুলনীয়ভাবে দক্ষ এবং মসৃণ। মাটির তলার ট্রেন নির্ভুল নিয়মে চলে এবং সারারাত সচল, রোববার বন্ধ তাই রোববারের অসংখ্য সংবাদবাহী আধমণ ওজনের কাগজটি শনিবার রাত্রেই বেরিয়ে যায়, কলকাতা থেকে তিনদিনেও অনেক সময়ে চিঠি পেয়েছি।

যাই হোক গলওয়ে কিনেল এলেন, হাতে একখানা স্বরচিত নতুন কবিতার বই। হেলাফেলায় রেইন কোটটা কোনদিকে যেন রাখলেন বা রাখলেন না, সখী ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়লেন, 'কিচ্ছু যদি এর ঠিক থাকে—'

আমাকে দেখে খুব খুশি, 'তা হলে এসেছো ?' আমি কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে বললাম, 'তোমার সাহায্যই তার কারণ, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু কোথায় হঠাৎ হারিয়ে গেলে বলো তো ? কবে বিয়ে করলে ? কিচ্ছু তো জানাওনি।'

সঙ্গের মেয়েটিকে আমি স্ত্রী ভেবেছিলাম। মেয়েটির আচরণে প্রেমিকার চেয়ে স্ত্রীর ভূমিকাটাই বেশী প্রকট ছিলো।

গলওয়ে নরম করে হাসলো, 'না বন্ধু, স্ত্রী নয়, সঙ্গিনী। আমি বিবাহে বিশ্বাস করি না।'

একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম, মেয়েটি নিজেই সেটা ভেঙে দিয়ে বললো, 'ছ'মাস একসঙ্গে আছি, যদ্দিন ভালো লাগে থাকবো, আমিও বন্ধনে পড়তে চাই না।'

এরপর গলওয়ে সাংসারিক কথায় এলো, বুদ্ধদেবকে বললো, 'এরা যা দিচ্ছে তাতে তোমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'স্ত্রীকে নিয়ে এসে দেখছি খরচ অনেক কম লাগে। এর আগেরবার একা এসে অসুবিধেও যেমন হয়েছে, খরচও হয়েছে এলোমেলো। সব সময়েই তো বাইরে খেতে হয়েছে ?'

'বিলাসী হোটেলে আছ, ভাড়া নিশ্চয়ই অনেক বেশী—'

বুদ্ধদেব তাঁর নিজের লেখা এবং পড়া ছাড়া সংসারের অন্য সব কাজকেই

কৃতান্তের মতো সভয়ে বর্জন করেন। তাই হেসে বললেন, 'আরো বেশী দিতে রাজি আছি যদি দিনরাত জৈবিক প্রয়োজনে এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে না থাকতে হয়। তোমরা লেখো কী করে? দিনের অর্ধেক সময়ই তো ঘরকন্নার কাজে চলে যায়। আমি তো কোনো কিছুতেই নিবিষ্ট হতে পারছি না।'

গলওয়ে সহজভাবে বললো, 'ও এই কথা? শোনো, সম্প্রতি কয়েকটা হোম হয়েছে লেখকদের জন্য। সেখানে সবরকম আরামের ব্যবস্থা আছে। সেখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। সেই নির্জন পল্লীগৃহের সর্বসুবিধাযুক্ত ঘরে বসেই খাদ্য বস্ত্র শয্যা সেবা সব তুমি পাবে। যাবে সেখানে?'

'খরচ?'

'খরচ? খরচ কিছুই নেই। সেদিক থেকে অনেক টাকা বাঁচবে তোমার। চলো না থেকে আসবে মাস দুই। তোমার কতো সুবিধে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই লেখক দু'জনেরই খরচ ওরা দেবে। আমি এখন সেই হোমেই আছি। একটা বই লিখছি, আর'—সঙ্গিনীকে দেখালো, 'ও আমার সেক্রেটারি হিসেবে আছে। ওর জন্য সামান্য কিছু দিতে হয় বটে। আমি যে তোমাদের কোনো চিঠিপত্র লিখিনি বা ঠিকানা জানাইনি, ওই জন্যেই। এখানে কেউ আমার খোঁজ জানে না।'

এই ধরনের হোমের খবরে আমরা অবাক। খরচ আমাদের সত্যিই অনেক হয়, অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করা আমাদের ব্যাধি, হোমে গিয়ে দু'মাস থাকলেও হাতে অকাতারে দশ হাজার টাকা জমে যায়, সেটা কিছু কম কথা নয়। টাকার অঙ্কে অ্যাপার্টমেণ্টের ভাড়াই তো মাসে প্রায় আড়াই হাজার, সেখানেই তো পাঁচ হাজার বাঁচে।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে গলওয়ে বললো, 'তা হলে রাজী? আমি গিয়ে বন্দোবস্ত করবো?'

বুদ্ধদেব ইতস্তত করে বললেন, 'একটু ভেবে নিয়ে চিঠিতে জানাবো।'

গলওয়ে সেদিন সারাবেলা কাটালো আমাদের সঙ্গে। দুপুরে আমিই রান্না করে খাওয়ালাম। সন্ধ্যায় আমাদের নিয়ে গিয়ে গলওয়ে খাওয়ালো।

যাবার সময় আবার বললো, 'আসবে?' বুদ্ধদেব আবার বললেন, 'একটু ভাবি।'

রাত্রিবেলা আমাকে বললেন, 'তুমি কি বলো?'

আমি বললাম, 'আমার অত আরামে বই লেখার অভ্যাস নেই। হঠাৎ সিংহাসনে বসলেই কি আর রানী হতে পারবো?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'যা বলেছ, শেষে একটা নৈতিক দায়িত্বে দাঁড়িয়ে যাবে, কেবলি মনে হবে যে উদ্দেশ্যে যারা আমাকে পোষণ করছে তাদের ঋণ আমার শোধ করা উচিত। সে কথা ভেবে ভেবে উদ্বেগেই বিকল হয়ে আর কলম ধরতে পারবো না।'

অতএব সে আশ্রম আমাদের সেখানেই বাতিল হলো।

এইবার একটি লম্বা বক্তৃতামালা। বুদ্ধদেবকে পর পর বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। কোনো কারণে কয়েকদিন ছুটি পড়েছিলো, তার সঙ্গে শনি রবি অফ ডে মিলিয়ে আরো কয়েকদিন বাড়িয়ে সব সুদ্ধু দিন দশেক পাওয়া গেল। আগে থেকেই সাজানো ছিল সময়টা, এই সময়টার জন্য আমি আগ্রহভরে তাকিয়েছিলাম। এই ছুটিতেই আমাদের এভানস্টোনে যাবার কথা। স্ত্রী কন্যা নিয়ে কবি নরেশ গুহ আছে সেখানে। এদেশে এসেছি থেকেই ওদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমরা এবং আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ওরা দু পক্ষই সমান ব্যাকুল হয়ে আছি। সুযোগ সুবিধা আর হয়ে উঠছিলো না। ট্রাংককলে যতোবার কথা হয়েছে উভযপক্ষের দুজন মেয়ের গলাই সমান আবেগে কম্পিত হয়েছে, দুজন পুরুষের গলাই উত্তেজনায় অধীর। ট্রাংককলের বিল ভারি হয়ে উঠেছে, কথা ফুরোয়নি।

নরেশ তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে রীডার ছিলো, (বর্তমানে বিভাগীয় প্রধান) এসেছিলো ডক্টরেট করতে। এই লম্বা ছুটিটা আমি পুরোপুরিই ওদের কাছে কাটাবো, বুদ্ধদেব যেখানে যেখানে যাবার এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করেই যাবেন এবং ফিরে আসবেন।

সেই বাঞ্ছিত দিনটি সমাগত। কিন্তু সকাল থেকে আবার ছিঁচকে বৃষ্টি। এখানকার এই বৃষ্টি অসহ্য। না এদিক না ওদিক। এর চেয়ে খুব জোর কয়েক পশলা যদি হয়ে যায়, সহজে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা হবে না। এখানে পশলা বৃষ্টি ঐ একদিনই দেখেছি। নামলে এই ধরনেরই নামে। সারাটা দিন রোদ ওঠে না, হু হু হাওয়া বইতে থাকে, আবার শীতের কাপুনি শুরু হয়।

স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হলে এই রকম আবহাওয়া যে কী বিশ্রী বলা যায় না। দিব্যি ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আবার কি কোট, ছাতা বর্ষাতি ওভার শুু ভালো লাগে? মনটাই খারাপ হয়ে যায়।

আর এয়ারপোর্ট তো এখানকার রাস্তা নয়। চল্লিশ মাইল পাড়ি দিলে তবে গিয়ে পৌঁছানো যাবে। পৌঁছেই কি শান্তি আছে? মালবাহী হয়ে এক মাইল

চত্বর পাড়ি দিলে তবে প্লেন। ততোক্ষণে শীতে কেঁপে বৃষ্টিতে ভিজে দেহের যা অবস্থা দাঁড়ায়, তা আর কহতব্য নয়।

বিরক্ত বিরক্ত ভাব নিয়েই রান্নাবান্না খাওয়া ইত্যাদি সেরে রওনা হওয়া গেল। সিটি আপিসে এসে গাড়িও ধরা গেল। যাত্রীরা দেখলাম সকলেই ছাতা বর্ষাতি ওভার শ্যুতে আবৃত হয়ে ভীষণ উত্ত্যক্ত। যাদের সঙ্গে বেশী মাল আছে বা বাচ্চা আছে তাদের মুখে তো পৃথিবীর অভিযোগ। এই তো মাত্রই কয়েকটা সপ্তাহ একটু শান্তি তার মধ্যে এই বৃষ্টি বাদল এমন বাদ সাধে কেন?

এয়ারপোর্টে যেতে যেতে বৃষ্টি আরো বাড়লো, সারা আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে, হাওয়া প্রায় ঝড়ের মূর্তি ধারণ করলো। তারপর গিয়ে দেখি এক ঘণ্টা আগে এসে পৌঁচেছি। দুর্দৈব আর কাকে বলে। কী আর করা, সঙ্গের জিনিসপত্র অপেক্ষা-গৃহে রেখে একটা রেস্তোরাঁতে গিয়ে বসলাম। যা ঠাণ্ডা, গরম গরম চা কফির ধোঁয়া দেখেও সুখ হয়। কাচের ঘরের উত্তাপ আরাম ছড়িয়ে দিল দেহে। কাচের বাইরে চলন্ত জনপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিলো নাটক দেখছি, সময়ের জ্ঞান ছিলো না।

সময় বড়ো অদ্ভুত জিনিস। কখনো এক মিনিট সময়ও কী-দীর্ঘ মনে হয়, কখনো একটা দিনকেও এক মিনিটের মতো লাগে। ঝড়বৃষ্টির জন্য প্লেনের অনেক দেরী আছে শুনেই তিক্ত মনে এসে যেন হতাশায় ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু রেস্তোরাঁর আরামে গরমে বসে চা খেতে খেতে এবং কালপ্রবাহ দর্শন করতে করতে কখন যে এক ঘণ্টা কেটে গেছে টেরও পাইনি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলাম, তাড়াতাড়ি অপেক্ষা-গৃহে এসে দুজনে দুটি স্যুটকেস তুলে নিয়ে প্রায় ছুটলাম। দেখলাম অন্যান্য যাত্রীরা আমাদের অনেক আগেই রওনা হয়ে গেছে।

দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বাইরের দুর্যোগের দিকে তাকিয়ে কম্পিত বক্ষে ভাবছিলাম কী করে এর মধ্য দিয়ে প্রায় মাইলখানেক রাস্তা আকাশের তলায় পার হবো। স্যুটকেসের ভারে এমনিতেই বেঁকে আছি, পিছল চত্বরে পড়ে যেতে বাধা কী এবং সেটাই সম্ভব। একটা মস্ত লম্বা ঝুলন্ত সেতু দিয়ে যাচ্ছিলাম, মাথায় ছাদ আছে, দু ধারে মোটা প্লাস্টিকের দেয়াল। সেই প্লাস্টিক কাচের মতোই স্বচ্ছ, ঝড়বৃষ্টির দাপট বেশ বোঝা যাচ্ছে তার ভিতর দিয়ে। সামনে তাকিয়ে আন্দাজ করতে পারছিলাম না এই সেতুপথ কোথায় কতোদূরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এদের এয়ারপোর্টের বৈচিত্র্যও একটা দেখবার বিষয়, জানবার বিষয়। যেতে যেতে এতোগুলো মানুষ হঠাৎ একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। আর ঢুকেই অবাক হয়ে দেখি সেই সুড়ঙ্গটাই আমাদের প্লেনের অভ্যন্তর। উজ্জ্বল আলোকিত গহ্বরে সব সাজানো আসন অপেক্ষা করে আছে যাত্রীদের উপবেশনের জন্য।

এটা কী হলো? কেমন করে হলো? বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে শোনা গেল, যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশাল জাহাজটিই ঢুকে এসেছে এই ঝোলানো সেতুর মুখের মধ্যে। জাহাজের প্রবেশ পথে আর এই সেতুর প্রস্থানের মুখে কী কৌশলে যে সংযোগ সাধন করা হয়েছে তা অবিশ্যি আমার বোধগম্যের বাইরে।

একটা কাণ্ডকারখানাই বটে। নম্বর মিলিয়ে আসনে বসেও বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায় না।

আইডেল ওয়াইল্ড এয়ারপোর্ট থেকে (এখন কেনেডি এয়ারপোর্ট। কেনেডির মৃত্যুর পরেই এই নামকরণ হয়েছে) ওহেয়ার এয়ারপোর্ট, অর্থাৎ আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানকার দূরত্ব মাত্রই দু ঘণ্টার রাস্তা। একটি জেট প্লেনের পক্ষে এই পথ বড়ো ছোটো। উঠবার প্রস্তুতি শেষ হতে না হতেই নামবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তার উপরে সেদিন বায়ুর চাপ অত্যন্ত বেশী ছিলো, আকাশ গাঢ় মেঘে আবৃত ছিলো, ঐটুকু উঠতেই যথেষ্ট সময় লেগে গেল। আর যতোক্ষণে মেঘলোক ছাড়িয়ে অন্য এক উজ্জ্বল আকাশের আলোর প্রভায় চোখ ধাঁধালো, তারও ঊর্ধ্বে, মাটি থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট উপরে এসে অদ্ভুত এক নিষ্কলুষ রুক্ষ আকাশের বিস্তারে ঝিম ধরলো, ততোক্ষণে দেখা গেল গন্তব্যে পৌঁছতে আর মাত্র চল্লিশ মিনিট অবশিষ্ট আছে। অতএব নামো, নামো, নামো। অতএব আবার সেই দোলানি। আবার পড়তে পড়তে ওঠা আর উঠতে উঠতে পড়া। অতবড়ো বায়ুযান মনে হয় সমুদ্রের বুকে নৌকার মতো দোদুল্যমান। শূন্যতাও যেন এক অনন্ত সাগর।

কথা ছিলো, নরেশ এবং চিনু (নরেশ গুহর স্ত্রী, যার পোশাকি নাম অর্চনা গুহ, বি টি কলেজের অধ্যাপিকা) এয়ারপোর্টে আসবে। নরেশকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকেই বুদ্ধদেব উইসকনসিন এবং ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে চলে যাবেন, ফিরবেন পরের দিন। আমি চিনুর সঙ্গে ওদের এভানস্টোনের বাড়িতে চলে আসবো।

জাহাজ থেকে নেমে আর ওদের পাই না। এদিকে বুদ্ধদেব অন্য যে প্লেন ধরে চলে যাবেন তার সময় হয়ে গেছে, অথচ আমাকে একা ফেলে যেতেও পারছেন না। কী মুশকিল। এরকম হওয়া তো স্বাভাবিক নয়। প্রায় বিপন্নই বোধ করছিলাম। এমন সময় দেখি নরেশ একটি স্যুটকেস হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে। ভুল জায়গায়। খুঁজতে খুঁজতে বেচারার ফরসা রং লাল টকটকে। অনতিদূরে প্রণবেন্দুর হাত ধরে (কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের রীডার) নরেশের ফুটফুটে বালিকা কন্যা মণি দাঁড়িয়ে। চিনু খোঁজা শেষ করে কোথা থেকে দৌড়ে এলো।

বিশাল বিমানবন্দরে সবাই সকলকে হারিয়ে আমরা যতো শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, নিমেষে জুড়িয়ে গেল সব। উপরি পাওনা প্রণবেন্দু! তাকে দেখে আর খুশিতে বাঁচেন না তার মাস্টারমশাই। 'আরেঃ তুমি! তুমি এলে কোথা থেকে, কবে এলে?'

গুরুপত্নী হিসেবে আমার স্নেহও এদের প্রতি কম অদম্য নয়। প্রায় পুরাকালের গুরুপত্নীদের মতোই। সুতরাং আমারও ভীষণ ভালো লাগলো। প্রণবেন্দুর কথা আমরা এসে থেকেই ভাবছিলাম। চিঠিপত্রে লেখালেখি হচ্ছিলো কীভাবে যোগাযোগ করা যায়। নিউইয়র্ক যাওয়া যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ এবং বহু দূরের পথ। তার উপর ছুটির প্রশ্ন আছে। নরেশের কাছে খবর পেয়ে কাছাকাছি শহর এখানেই ছুটে এসেছে।

'ঈশ্! জানলে তোমাকেও নিয়ে যেতাম!' এটা বুদ্ধদেবের খেদোক্তি।

প্রণবেন্দু এই দুবছর বিদেশবাসেই বেশ পরিণত যুবকে পরিণত হয়েছে! রীতিমতো একজন পরিশিলিত ভদ্রলোক। অবশ্য পরিশিলিত চিরকালই, তারই মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবে আরো সংস্কৃত। বললো, 'আপনি তো কালই ফিরে আসছেন, আবার তো যাবেন, আমি তখন সঙ্গে যাবো।'

'খুব ভালো, খুব ভালো।'

সময় ছিলো না কথা বলবার। নরেশকে নিয়ে নির্দিষ্ট ফ্লাইটের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি ওদের সঙ্গে বাইরে এসে ট্যাকসিতে উঠলাম। এতোক্ষণে নরেশের তিনবছরের কন্যাটির মুখে বোল ফুটলো, আমার গলা জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে বললো, 'আমি আমার পুরোনো জুতোটা অং করে তোমাকে দিয়ে দেব।'

আমি তাকিয়ে দেখি তার নিজের পায়ে একজোড়া নতুন চকচকে জুতো। হাসতে হাসতে বললাম, 'কেন ? পুরোনোটা কেন ? নতুনটা বুঝি নয় ?'

ওর মা বললো, 'দেখেছেন কী পাজী ? এখন থেকেই কেমন সেয়ানা ?'

সে ঘোরতর প্রতিবাদ করে বললো, 'এ জুতোতাতো তুমি কালকেই কিনে দিলে, দিদানিকে তো ছুদু চুমুই খেতে বলেচো—'

আমি বললাম, 'ঠিক কথা। মা শুধু চুমু খেতে বলেছে, তুমি তার উপরে পুরোনো জুতোটাও দিতে চাইছো। তাও আবার অং করে। কতো ভালো মেয়ে।'

তখন সে গায়ে ঢলে পড়ে বললো, 'আমি দিদানিকে বালোবাচি।'

অচেনা দিদানিকে যে সে কখন ভালোবাসলো কে জানে। মা বাবার তালিম আর কি। তবে ভাব হয়ে গেল তক্ষুনি। দিদানির আঁচল ধরতে তার দেরি হলো না।

চিনু বললো, 'কতোক্ষণ থেকে যে খুঁজছি।'

প্রণবেন্দু বললো, 'চিনুদি তো কেঁদেই অস্থির। আর নরেশদার কী অবস্থা—'

'আর তোমার ? তোমার বুঝি কিছু না ?' চিনু ভ্রূকুটি করলো।

গাড়ি চলতে লাগলো দ্রুতগতিতে। কথার পৃষ্ঠে কথা চলতে লাগলো তার চেয়ে দ্রুত। আমি ভাবলাম পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসার গাঢ়তা যাচাই করতে হলে এই রকম তৃতীয় স্থানেই সমবেত হতে হয়।

পথে পথে গাড়ি থামিয়ে চিনু কেবলি প্রণবেন্দুকে নিয়ে নেমে গিয়ে নানা ধরনের খাদ্য সম্ভার কিনে নিয়ে আসছিলো। কেবলি বলছিলো, 'এভানস্টোনে কিচ্ছুই ভালো পাওয়া যায় না। এই দেখুন না এই আপেলগুলো কেমন ভালো। আপনি আপেল ভালোবাসেন না ?'

অথবা 'দেখেছেন এখানকার অ্যাসপারেগাসগুলো কেমন টাটকা, ওখানকার-গুলো বিশ্রী।'

অথবা 'এসো প্রণবেন্দু এই দোকান থেকে ভালো কেক কিনি।'

অথবা 'ফ্রজেন চিংড়ি মাছ'।

অথবা 'অমুক অথবা তমুক।'

বাড়ি এসে দেখি এইসব কেনার আগে আরো যা সব কিনে রেখেছে তার পরিমাণ পর্বততুল্য। 'ঈশ্। কতো ক্লান্ত হয়েছেন। একটু কিছু খেয়ে নিন'

বলে চায়ের সঙ্গে সে স্বাদে সুগন্ধে যে সব ভোজ্যবস্তু এনে উপস্থিত করলো তা ওজনে, উৎকর্ষে এবং রকমারিতায় সমান অতুলনীয়। তবু 'কিছুই নয়' নামক একটি অভিজ্ঞান চিনুর মুখে ফুটে থাকতে দেখে আমি হেসে ফেললাম।

আসলে কী দিয়ে যে কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলো না, অস্থির খুশিতে কেবল এটা করছিলো ওটা করছিলো, অকারণে এঘর ওঘর হাঁটছিলো উত্তেজিতভাবে।

সময় যে তারপর কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যেতে লাগলো জানি না। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া লাল হলো, লাল ছায়া বেগুনি হয়ে সন্ধ্যা ঘন হলো, ঘন সন্ধ্যা রাত্রির মিলনে নিবিড় হয়ে উঠলো। কথা বলতে বলতে একসময়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কখন যেন সেই রাত ভোর চারটেতে এসে পৌঁছে গেছে।

না এইসব সুখ আর কোনোদিন ফিরবে না জীবনে। এমন নির্মল আনন্দ কখনো আর আন্দোলিত করবে না হৃদয়কে।

পরের দিন সকালে চায়ের পর্ব সমাপ্ত করে ঘুরে ঘুরে বাড়িটি দেখছিলাম। ভারি সুন্দর বাড়ি। ঝকঝকে রোদ্দুরে ভরা উজ্জ্বল দিন। শীত নেই। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বারান্দা থেকে রেলিং দেওয়া সাত আট সিঁড়ি নেমে সামনে খানিকটা সবুজ ঘাসের জমি। চারদিকে আমাদের যেমন রাঙচিতার বেড়া থাকে এখানে তেমনিই নীল রংয়ের ছোটো ছোটো ফুলওলা গাছের বেড়া। কিন্তু বাড়িটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন বলেই চেহারা এবং চরিত্র দুই-ই খুব গম্ভীর। উঁচু প্লীন্‌থ, উঁচু সিলিং, উঁচু প্রশস্ত বারান্দা, মস্ত মস্ত ঘর সবই সেকালের সাক্ষী।

এই তৈরি করা আধুনিক শহরে এমন বাড়ি যেন ইতিহাসের নজির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটি একটি দোতলা বাংলো। চিনুরা থাকে একতলায়। একটি ঘরে বসবার এবং খাবার ব্যবস্থা, সংলগ্ন শোবার ঘর। সেই ঘরের জানালা মেঝে থেকে দরজার মতো জানলার পাটে রঙিন কাচ। সেই কাচে ওপিঠ থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলে ছবি ফুটে ওঠে, সেই সব ছবি পৌরাণিক গল্প সম্বলিত। তার চেয়েও যা উপভোগ্য শোবার ঘরের একটি জানালা দিয়ে দূরে মিশিগান হ্রদ চোখে পড়ে। এই অতল জলরাশির নাম যে কেন হ্রদ কে জানে। এর যে শুধু কূল তল খুঁজে পাওয়া যায়না তাই নয়, এর ঢেউও সাগরের ঢেউয়ের প্রতিযোগী হবার স্পর্ধা রাখে।

এখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়ায় এই হ্রদ একেবারে উতরোল। ছেলেবেলায় ভূগোল পাঠে যখন এই মিশিগান হ্রদ নামটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে তখন মনের চোখে সব হ্রদের মতোই এটিও আর একটি নিস্তরঙ্গ সীমাবদ্ধ জল, এই সংজ্ঞা ছাড়া আর কোনো ছবি মনে ছিলো না। মধ্যবয়সে পৌঁছে জগতের বহু বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে অনেক ধারণা পাল্টে গেছে, অনেক কিছুই অন্য রকম হয়ে ধরা দিয়েছে চোখে, কিন্তু এই হ্রদ দেখে একে কেন সমুদ্র আখ্যা না দিয়ে হ্রদ বলা হয় সেটাই আমি ভেবে পাই না। এর আরো গুণ আছে, আগ্রাসী হয়ে প্রবল তরঙ্গ তীরও ভাঙে। সেইজন্য মস্ত মস্ত উপল খণ্ড দিয়ে বাঁধ দিয়েছে। সেটা এড়িয়ে আর ভেঙেচুরে শহরের রাস্তায় উঠতে পারে না।

আমরা যখন নরেশের ওখানে গিয়েছিলাম, এই হ্রদের উত্তালতা তখন তুঙ্গে। শিকাগো শহরে প্রবেশ করবার পথে এই হ্রদ বিছুটা দূরে দিয়ে মাইলের পর মাইলব্যাপী ঘুরে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে চলে, কোনো দিগন্তরেখার সঙ্গে এই জলের কোনো সম্বন্ধ আছে বলে প্রত্যয় হয় না। সমুদ্রের মতোই এর বিস্তার। বসন্তকালের সেই তুঙ্গ অবস্থাতেই আমি সেই হ্রদ প্রথম দেখি। কিন্তু দ্বিতীয় বার দেখি শীতকালে। শিকাগোতেই আসছিলাম, হ্রদ কোথায়? বদলে এক জলহীন প্রান্তর, তার উপরে নাটমঞ্চ, কাঠের ছোটো ছোটো বাড়ি, রেস্তোরাঁ, সার্কাস। কতো কিছু। অবাক হয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, জল এখন বহুদূর পর্যন্ত শক্ত বরফে পরিণত। সেই বরফের উপরেই এখন ছ'মাস সিনেমা থিয়েটার সার্কাস স্কেটিং ইত্যাদির নানারকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা। আর কী ভিড়। অকাতরে পা ফেলে ফেলে কতোদূর পর্যন্ত হ্রদের বুকের মধ্যে চলে যাচ্ছে মানুষ। আবার ফিরে আসছে। একদিন ঋতুর পার্থক্যে আবার এই বরফ গলে জল হবে, সেই জল অথৈ হয়ে ভীষণ আকৃতি ধারণ করবে, তরঙ্গের আঘাতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব। প্রকৃতির কী তাণ্ডব খেলা।

চিনু বললো বাড়িটা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েরই সম্পত্তি। হয়তো তাই এই আধুনিকতার মধ্যেও এই বৃদ্ধ চেহারা নিয়ে টিঁকে আছে এখনো। নিউ-ইয়র্কে চেলসী হোটেলের জানালা দিয়ে আমি সব সময়েই বাড়ি ভাঙার দৃশ্য দেখি। বড়ো বড়ো সব পুরোনো বাড়ি হুশহাশ ভেঙে দেয় যন্ত্র দিয়ে, তারপরেই আবার দেখতে দেখতে গজিয়ে ওঠে আকাশছোঁয়া নতুন খেলাঘর।

পুরোনোকে ওরা আর রাখতেই চাইছে না। ভাঙে আর গড়ে। একমাত্র গ্রীনিচ ভিলেজ আর উকিল পাড়া ছাড়া মাত্রই একটি পুরোনো গ্রাম দৈবাৎ আমার চোখে পড়েছিলো নিউইয়র্ক শহরে। সেটি নিগ্রো অধ্যুষিত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অবশ্য সেই অঞ্চলটি দেখার সৌভাগ্য আমাকে যথেষ্ট বিড়ম্বিত করেছিলো। আসলে আমি একদিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

বুদ্ধদেব তখন ব্রুকলীন কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন। আমার পক্ষে সে জায়গাটা একেবারেই নতুন। ওয়াশিংটন স্কোয়ারে থাকতে ওখানকার সব আমি চিনে ফেলেছিলাম। বিশেষত চোদ্দো স্ট্রীট, তার তো কথাই নেই। একটা রুমাল কিনতে হলেও আমি তেইশ স্ট্রীট থেকে চোদ্দো স্ট্রীটে চলে যেতাম। চোদ্দো স্ট্রীট যে আমার কী প্রিয় ছিলো বলতে পারি না! ওখানকার গরীব পর্টুরিকানরা, দেখতে যারা দেবতার মতো সুন্দর, গায়ের রং যাদের অতসী ফুলের মতো, যারা ফুটপাতের তাৎক্ষণিক দোকানের দোকানদার, প্রায় সকলের মুখই আমার চেনা হয়ে গিয়েছিলো। যারা বড়ো দোকানের মালিক, তাদেরও আমি পরিচিত ছিলাম। এতো বছর বাদে এখনো চোখ বুজে চিন্তা করলে কতো মুখ যে ভেসে ওঠে চোখে। আমাকে দেখলে তারা সাদর আহ্বান জানাতো। হাত বাড়িয়ে দিয়ে নানান রকম সুললিত বাক্যে সম্ভাষণ করতো। ভারি ভালো লাগতো আমার।

ব্রুকলীনে এসে চোদ্দো স্ট্রীটের বিরহে বেশ কিছুকাল কাতর থাকার পরে আবার চিনে নিলাম মাটির তলার পথ। আমাদের হোটেল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দু পা গেলেই সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে, প্রথম স্তরের স্টেশনটিতে নামলেই দক্ষিণমুখী চোদ্দো স্ট্রীটের ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে। মনের সুখে উঠে বসলেই হলো, চোখ বুজে চলে যাবো চল্লিশ মিনিটের মধ্যে।

সেই রকমই একদিন গিয়েছিলাম। কিন্তু ফেরবার পথে ভুল ট্রেনে উঠে বসলাম। তারপর ট্রেন চলেছে তো চলেছেই, আমার স্টেশন আর আসে না। ঘড়ি দেখছি আর চঞ্চল হয়ে উঠছি। যেতে যেতে একটা সময় এমন হলো যে সঙ্গীরা সবাই প্রায় নেমে গেল, সহসা নিজেকে একটা ফাঁকা ট্রেনে বসে থাকতে দেখে আমিও নেমে যাই ভেবে সভয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং ইতস্তত করে যতোক্ষণ গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছুলাম, ততোক্ষণ দুপদাপ করে সবেগে একসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন নিগ্রো ছেলেমেয়ে ঢুকে এলো কামরায়, ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে গেল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঝপ করে।

কামরায় তখন আর একজনও শ্বেতাঙ্গ ছিলো না। ট্রেন ভর্তি সব নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষ আর তাদের তুলনায় একটা ছোটো পোকার মতো শাড়ি পরা আমি এক বাঙালী মেয়ে। আমার হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুত হয়ে উঠলো। সবাই আমাকে লক্ষ্য করে দেখছিলো! এমনভাবে দেখছিলো যেন কোনো অন্য গ্রহের মানুষ। পাশে উপবিষ্ট মধ্যবয়সী রমণীটি তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'তুমি এদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

আমি কম্পিত স্বরে বললাম, 'এই ট্রেন কোথায় যাচ্ছে?'

'এয়ারপোর্টের কাছাকাছি যাবে।'

'এয়ারপোর্ট সে তো বহুদূর।'

'এখন আর বহুদূরে নেই। আসছো কোথা থেকে?'

'চোদ্দো স্ট্রীট থেকে।'

'সে কী! কোথায় যাবে বলে উঠেছিলে?'

'ব্রুকলীন যাবো, বোরোহলে নামবার কথা।'

'বোরোহল?' মোটা গলায় হেসে উঠলো।

'তুমি এখন সেখান থেকে কতো দূরে তা কি জানো?'

আমি ঘামছিলাম, আমার মুখে আর কথা সরছিলো না।

সে ফিসফিস করলো, 'শোনো, যেখানে এসেছ, জায়গাটা ভাল নয়। তুমি সামনের স্টেশনেই নেমে যাও।'

'তারপর?'

তারপর সে অনেক কিছুই বললো যার অর্ধেক কথাই আমি বুঝতে পারলাম না। ওদের কথা বোঝা খুব কঠিন। উচ্চারণ অনেক অন্যরকম। তার উপরে অদ্ভুত একটা টান আছে আর নাকি তো বটেই।

ট্রেন হঠাৎ মাটির তলা ছাড়িয়ে হুশ্‌্স করে আকাশের তলায় উঠে এলো। জায়গাটা যেমন নোংরা, তেমন দুর্গন্ধযুক্ত। একটু পরেই থামলো। থামতেই স্ত্রী লোকটি আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে দরজার কাছে নিয়ে এসে খুব মৃদু এবং দ্রুতস্বরে বললো, 'যাও, যাও শীগ্গির নেমে যাও, সোজা ঢুকে যাও শেডের মধ্যে। একটু হাঁটলেই এসকেলেটর পাবে, গুণে গুণে একেবারে নিচে তিনতলার স্টেশনে নামবে, মনে রেখো-না জেনে খুব খারাপ জায়গায় এসে পড়েছ। যে যাই বলুক কারো কথা শুনবেনা, কারো সঙ্গে যাবে না, তিনতলা নেমে ডানদিকে গিয়ে ডানদিকের ট্রেনেই উঠবে, বাঁয়ে নয়। শীগ্গির চলে যাও, সন্ধ্যে হয়ে এলো।'

নেমে পড়লাম সেখানে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবারও অবকাশ হলো না, ছেড়ে দিল ট্রেন, তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি কয়েক সেকেন্ড কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। জায়গাটা শুধু সম্পূর্ণ একটা অচেনা জায়গাই নয়। সম্পূর্ণ অচেনা চেহারাও। এ যে কোন মান্ধাতার আমলের আমেরিকা কে জানে। রেললাইনের সীমানার বাইরেই শহরের সড়ক, ধারে ধারে সব পুরাকালের সরু সরু ইঁটের ঘিঞ্জি বাড়ি, প্রত্যেক বাড়িরই ধসে পড়ার মতো চেহারা। কোনো বাড়িতেই রং বা প্লাস্টারের চিহ্ন নেই। হঠাৎ বহুদূর-ব্যাপী এমন একটি প্রাচীন পল্লী দেখে অন্য দেশ বলে ভ্রম হচ্ছিলো। বাড়িগুলো বস্তিবাড়ি নয়, বড়ো বড়ো দোতলা তেতলা। নিশ্চয়ই প্রথম যুগের কোনো সমৃদ্ধ জনপদ এখন নিগ্রোদের উপনিবেশ হয়েছে। সেখানে নিগ্রো ছাড়া একটিও সাদা চামড়ার মানুষ দেখা যাচ্ছিলো না। অদূরের সড়কটি কালো পাথরের মতো ভারী ভারী প্রকাণ্ড চেহারার মানুষে মানুষে ভর্তি।

বেলা পড়ে এসেছে, কোন বাড়ির পিছনে ডুবে আছে সূর্য, ছাই ছাই রঙ বিকেলের সঙ্গে এই মানুষেরাও যেন ছায়া। মনে হয় কাজকর্ম থেকে ঘরে ফিরছে সবাই। আমি তাড়াতাড়ি কোথায় শেড সেই আশায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে হাঁটতে লাগলাম। স্ত্রীলোকটি আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, ভয় ধরলে আর কি ছাড়ানো যায় ?

পাওয়া গেল শেড। ঢুকে পড়লাম। এসকেলেটরও পাওয়া গেল। তিন স্তর নেমে আবার ডাইনে কিছু দূর এগিয়ে ট্রেনও পেলাম। এই ট্রেন যে আমাকে নিয়ে আবার কোথায় পৌঁছে দেবে কী করবে, কিছু না জেনেই উঠে বসলাম। এতোক্ষণে দু-চারজন শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের মুখ দেখা গেল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত-ভাবে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনেক আসন খালি ছিলো তবু গিয়ে একজন সুসজ্জিত বৃদ্ধা মহিলার পাশে বসলাম, ট্রেন ছেড়ে দিল।

মহিলাটিকে বললাম, 'আমি পথ ভুল করে এখানে এদিকে এসে পড়েছিলাম, এই ট্রেন এখন কোথায় যাবে ?'

মহিলা বললেন, 'এখানে পথ ভুল করে চলে এসেছ? সর্বনাশ। যাবে কোথায় ?'

'ব্রুকলীনে থাকি। বোরোহলে নামবো।'

'ব্যরোহলে যেতে এখানে এসেছ ?'

বিপন্ন মুখে চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলা পিঠে হাত দিয়ে আশ্বাস দিলেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে আসল ট্রেনে পাঠিয়ে দেব।'

তা দিলেন। পুরো এক ঘণ্টা চলার পরে যে স্টেশন এলো, সেখান থেকে নেমে নম্বর দেখে আমাকে অন্য ট্রেনে চাপিয়ে নিজের ট্রেনে উঠলেন।

বাড়ি ফিরতে রাত আটটা। ভাগ্যিস সেদিন বুদ্ধদেবের রাত্তিরের ক্লাস ছিলো। খেয়ে-দেয়ে তো এক সঙ্গেই বেরিয়েছিলাম। উনি এক ট্রেনে চেপে কলেজে গেলেন, আমি অন্য ট্রেনে চোদ্দো স্ট্রীট। আমার তো ছটার মধ্যেই ফিরে আসার কথা, মাঝখানে কতো কাণ্ড হয়ে গেল। সেদিন আমি সত্যি খুব ভয় পেয়েছিলাম। পুরোনো আমেরিকা দেখার সাধ জন্মের মতো ঘুচে গিয়েছিলো। বুদ্ধদেব ফিরলেন রাত ন'টায়। আগে ফিরলে ততোক্ষণে বোধ হয় পুলিসে খবর চলে যেতো।

আসলে নরেশদের এই পুরোনো আবাসটি একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস। ছাত্ররা দোতলায় থাকবে, নিচে থাকবে তাদের কেয়ারটেকার এই হচ্ছে নিয়ম। ছাত্রদের দেখাশুনো করা। ভাড়া আদায় ইত্যাদি নানান দায়-দায়িত্ব সবই কেয়ারটেকরের উপরেই ন্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে এক ধরনের অভিভাবকত্ব।

বাড়িটা ভেঙে ফেলাই কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ছিল, সেই অনুযায়ী তারা এগিয়েও ছিলো কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল এতোগুলো ছেলেমেয়েকে থাকতে দেবার মতো বাড়ি আর হাতে নেই তাদের। ছেলেমেয়েরা বললো, তবে, এই সেপ্টেম্বরের মধ্যিখানে আমরা কোথায় যাবো? অতএব তখনকার মতো স্থগিত থাকলো কাজ। এক আমেরিকান দম্পতি এলেন অভিভাবকত্ব করতে। আগে যাঁরা ছিলেন বাড়ি ভাঙা হবে শুনে অন্য বাসস্থানে চলে গিয়েছিলেন। এই দম্পতি এসে থেকেই খুঁতখুঁত করছিলেন পুরোনো বাড়ি বলে, তার মধ্যে কোনো এক রাত্রে একটি অঘটন ঘটলো। মহিলাটি বাথরুমে যাবার পথে একটি আরশুলার বাচ্চা দেখে মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা যেতে যেতে মেমসাহেবী সরু গলা আকাশে তুলে পিতা মাতা স্বামী প্রভু সকলকে এমন পরিত্রাহী রবে ডেকে বাঁচাবার আবেদন জানাতে লাগলেন যে দোতলা থেকে সব ছাত্রছাত্রী নেমে এলো দৌড়ে। জল পাখা দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় মূর্ছা ভাঙালো। ভাঙালে কী হবে? মহিলা কি আর সেখানে থাকেন। একটু সুস্থ হয়েই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে বন্ধুর বাড়ি পালালেন।

স্ত্রী পালালে স্বামী আর থাকেন কী করে? তিনিও নোটিস দিলেন। তখন ছেলেমেয়েরা দিকবিদিক খুঁজে নিয়ে এলো নরেশকে। আবার যে কোনো মানুষ

হলেই তো হবে না। বিবাহিত হওয়া চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হওয়া চাই—সব দিক থেকেই যোগ্য নরেশকে পেয়ে তারা ধন্য হলো।

নরেশের পক্ষেও এই বাসস্থান খুবই সুখের হলো। সামনে এমন সুন্দর কম্পাউন্ড—যদিও সেই ঘাস জমিতে কেউ সযত্নে ফুল ফোটায়নি তবু প্রকৃতিদত্ত কতো রঙের ফুলই না ফুটে আছে! যদিও জমির ঘাস কেউ ছাঁটে না তবু শীতের পরে বসন্তের ছোঁয়ায় কী সুন্দর সতেজ। যদিও পুরোনো বাড়ি বলে কোনোখানেই কোন আদর নেই তবু প্লাস্টার খসা দেয়ালে কী সুন্দর হলদেটে শ্যাওলা—বরং এই চেহারার জন্যই বোধ হয় নরেশের কবিপ্রাণ বেশী উৎফুল্ল হলো, একটু মিল পেলো স্বদেশের। স্বজনবিরহিত প্রান্তরে কতো কাল বাদে কয়েকটি আরশুলোর বাচ্চা দেখে ওর নিশ্চয়ই হৃদয় জুড়োলো!

এমন হাত পা ছড়ানো সুন্দর মনোমতো বাড়ি পেয়েই যে শুধু সুখী হলো তা-ই নয়, ছাত্রছাত্রীদের সাহচর্যও তাদের কম আনন্দের কারণ হলো না।

নিচেরতলার যে দুখানা ঘর আর একখানা বারান্দা নিয়ে চিনুর সংসার, সে ঘর দুখানা নামেই দুখানা, আসলে প্রায় তিনখানার সমান। গলি পেরিয়ে রান্নাঘর। রান্নাঘরটিই দেখবার। যেন এক যজ্ঞশালা। চারদিকে চারটি চার মুখওলা গ্যাসের উনুন, পাশে পাশে সিংক, ফ্রিজ ইত্যাদির সমাবেশ। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বারো, সবাই আলাদা আলাদা রান্না করে খায়। প্রত্যেকের বাজার থাকে ফ্রিজগুলোর মধ্যে ভাগ ভাগ করা। সকলের বাসনও আলাদা। রান্না করে খেয়ে-দেয়ে যার যারটা নিজেরাই মেজেঘষে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখে। চিনুরাও ওখানেই রান্না করে।

শুধু স্যারকেই নয়, স্যারের স্ত্রী চিনুকে পেয়েও ওরা মহা খুশি। এমন মমতাময়ী মধুভাষিণী নম্র মধুর বঙ্গমহিলা বঙ্গদেশেই যেখানে বিরল সেখানে ঐ আত্মকেন্দ্রিক রাজত্বে তো একটা স্বপ্ন। চিনুর প্রশ্রয়ে ছেলেগুলো কিন্তু বেশ অলস হয়ে উঠেছিলো। বারোটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে দশজনই ছিলো ছেলে। মাত্র দুজন মেয়ে। দেখলাম আন্তর্জাতিক বলতে যা বোঝায় এদের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে তা সত্য। চীনে, জাপানী, আফগানী, কেনেডিয়ান, আমেরিকান, আফ্রিকান, ভারতীয়—সকলে মিলে এক বিশ্বপ্রেমের নিদর্শন।

যেহেতু যার যার রান্না তার তার, সকালের দিকে ঘরটার মধ্যে একটা ভিড় লেগে যেতো। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ মিলিয়ে ব্রাঞ্চ তৈরি করে খেয়ে দল বেঁধে

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেলে তবে সব ঠাণ্ডা। তারপরে আসে চিনু। এসেই বলে, 'দেখেছেন কী কাণ্ড! এমন হয়েছে ওরা—'

'কী ব্যাপার ?'

'দেখুন না, নিজেরা বাসন মাজবে না, আমার মাজা বাসনগুলো নিয়ে খেয়ে-দেয়ে পালিয়ে গেছে।'

চিনুর মুখে অবশ্য এ নিয়ে কোনো অসন্তোষ দেখা যেতো না। বরং বেশ স্নেহের সঙ্গেই বলতো, 'ছেলেগুলোর সত্যিই বড়ো কষ্ট হয় বাসন মাজতে।'

মধ্যে মধ্যে মাজা বাসন চুরি করতে গিয়ে অবশ্য ধরাও পড়তো। চিনু হেই হেই করে উঠলেই সহাস্যে নিজেদের বাসন তো মাজতই একেবারে বশংবদ হয়ে চিনুর বাদ বাকি না মাজা বাসন পড়ে থাকলেও মেজে দিত ঘস ঘস করে। শুধু বাসনই নয়, লক্ষ্মী ছেলের মতো আরো অনেক কাজও করে দিত।

কোনো শিক্ষিত আফগান যুবককে ওখানেই আমি প্রথম দেখি। ছেলেটির নাম ছিলো হ্যাপিজ। আমি ওকে সাহেবই ভেবেছিলাম। শ্বেতাঙ্গ মানেই আমাদের কাছে সাহেব। কিন্তু আলাপ হতে ভালো করে তাকিয়েই কোথাকার জলবায়ুতে এমন বসরাই গোলাপের মতো রঙ, তিলফুল নাসা, কাজল কালো চোখ, আয়তলোচন সম্ভব সেটা বোঝা গেল।

ঐ ছেলেটিকে দেখার পরে আর একটি ছেলের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিলো। চল্লিশোত্তর একজন পরিণত যুবক। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে কাজ করছেন। যখন চলে আসি বিদায় দিতে গিয়ে হাসিমুখে হাত ঝাঁকাতে এসে সহসা বহিন ব'লে কেঁদে ফেললেন।

আমরা ইংরেজ আমলেই বড়ো হয়ে উঠেছি। এদের এখনো ভারতীয় ছাড়া ভাবতে দ্বিধা হয়। ভিতরের টানটাও দেখলাম হৃদয়ের তারে কম্পন তুলতে যথেষ্ট সক্ষম।

ভারতবর্ষে বসে কিন্তু আমরা ভারতীয়দের এমন ভালোবাসার সঙ্গে দেখি না। প্রদেশে প্রদেশে যেমন অমিলও প্রকট, ঈর্ষা, দ্বেষ বিতৃষ্ণাও তথৈবচ। পোশাক পরিচ্ছদ ভাষা প্রাত্যহিক জীবনযাপন খাওয়া দাওয়া সব কিছু নিয়েই একে অপরের ছিদ্রান্বেষী।

নরেশদের ওখানে আর একটি দক্ষিণ ভারতীয় ছেলে দেবকে দেখেও এই একাত্মবোধ প্রবল হয়ে উঠেছিলো। অথচ এই কলকাতা শহরে কতো অসংখ্য

দক্ষিণ ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ বাস করে, পাশাপাশি বাড়িতে থেকেও জীবনে আলাপ করি না। কোনো আগ্রহই হয় না।

একদিন বাদেই ফিরে এলো নরেশরা। আড্ডা আরো জমজমাট হলো। তবে অধিক রাত্রির আড্ডাটা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। আমার আর চিনুর এই পরবাসে এসে নির্জনে অনেক কিছু বলার ছিলো দেখলাম।

সেই সময়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব জাঁকজমক সহকারে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিলো। যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ডক্টর এডোয়ার্ড ডিমক, এশিয়া স্টাডির ডিরেকটার, ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান স্টাডিরও অধিকর্তা। কলকাতার বিদগ্ধ বাঙালী সমাজের অনেকেই ডিমককে জানেন। সেই সঙ্গে এ-ও জানেন, বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ (খণ্ড বাংলায় যার নাম দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমবাংলা)। এবং বাঙালী তাঁর প্রাণ। কলকাতা তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি।

প্রথম অতি অল্প বয়সে যখন একবার এসেছিলেন এদেশে, সম্ভবত পুরোনো বাংলা ভাষার গবেষণা করতেই এসেছিলেন। আমার সঠিক মনে নেই। আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সেই সময় থেকেই। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মস্থান। সেই স্থানকে তিনি তাঁর বাংলা এবং বাঙালীপ্রীতির নিদর্শনে অনেকভাবে অলংকৃত করে রেখেছেন। তার মধ্যে সব চেয়ে যা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে একটি বাংলা বিভাগ এবং চমৎকার একটি বাংলা বইয়ের লাইব্রেরী।

নিজেও কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের সফল অনুবাদক, যেমন 'বিদ্যাসুন্দর' 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'মঙ্গলকাব্য' ইত্যাদি।

এ হেন মানুষ যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন অতি সম্মানের সঙ্গে করবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বস্তুত আমরা সেই আমন্ত্রণে এসেই নরেশের এখানে উঠেছি। এভানস্টোন শিকাগোর একটি উপকণ্ঠ শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না, এতোটাই কাছে।

উৎসব তিনদিন ধরে পালিত হবে, মার্কিনমুলুকের নগর বন্দর থেকে বেশ কয়েকজন জ্ঞানীগুণী সমবিষ্ট হয়েছেন। অমিয় চক্রবর্তী তো আছেনই। নরেশও পেপার পড়বে। সেখানে গিয়ে কবি গলওয়ে ফিনেলের এক বান্ধবীর সঙ্গেও আলাপ হলো। ছিপছিপে হাসিখুশি লাবণ্যময়ী মহিলা, বলা যায় চোখে পড়ার মতো চেহারা। লাল টুকটুকে পোশাকে পালকের টুপিতে রাণীর মতো

দেখাচ্ছিলো। নাম শার্লি ড্রাই। সভার শেষে আলাপ করলো এসে। বললো, 'গলওয়ে চিঠি লিখেছে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।' সেই রাত্রেই দলবল সহ আমাদের ধরে নিয়ে গেল তার অ্যাপার্টমেন্টে, খাদ্য মদ্য চা কফির এলাহি বন্দোবস্ত। মস্ত ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত মিশিগান হ্রদ। দুটি ছেলে একটি মেয়ে আর একটি বুক সমান উঁচু কুকুর নিয়ে সংসার। অসম্ভব ফুর্তিবাজ, অসম্ভব ছটফটে। ছেলে দুটি আর মা গলায় গলায় বন্ধু, মেয়ে সকলের ছোটো, বয়েস চোদ্দো, সে কিছুটা গম্ভীর এবং একা থাকতে ভালো-বাসে। এক ঝলক দেখা দিয়েই নিজের ঘরে চলে গেল।

দলে আমরা কম ভারি ছিলুম না, আমি চিনু, চিনুর মেয়ে মনি, নরেশ প্রণবেন্দু, বুদ্ধদেব—সকলের মনই সেদিন খুব সুরে বাঁধা ছিলো। বুদ্ধদেব বারে বারেই বলছিলেন, 'নরেশ, তোমার পেপার সব চেয়ে ভালো হয়েছে, সব চেয়ে ভালো।'

প্রণবেন্দুও ঐ আসরে কোনো তর্ক বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে মঞ্চে উঠে তার কিছু বক্তব্য পেশ করেছিলো। বুদ্ধদেব তা নিয়ে খুব গৌরবান্বিত। তাঁর মতে সেই বক্তব্য নাকি অসম্ভব সারবান ছিলো। অতএব সফলতার সুখ সকলের মুখেই প্রতিফলিত।

নরেশের বাড়িতে আমরা দশদিন ছিলাম, সে বাড়িকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে বুদ্ধদেব আরো কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে এলেন, সঙ্গে সর্বদাই নরেশ। প্লেনে করে যাচ্ছেন আর ফিরে আসছেন, কতোটুকু আর সময় লাগে। যেদিনই কিছু থাকছে না, নরেশ একটা না একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ভরে রেখেছে দিন। এক সন্ধ্যায় মস্ত এক পার্টির আয়োজন করলো। গলওয়ের বান্ধবী শার্লির সঙ্গে মাত্রই কয়েক ঘণ্টার আলাপে সকলেরই এতো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো যে সেই সন্ধ্যার আসরে নরেশ তাকেও নিমন্ত্রণ করলো।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীও ছিলেন, আর একজন যিনি ছিলেন তাঁর নাম ডক্টর প্রফুল্ল মুখার্জি। নিউইয়র্কের বাসিন্দা। বহু বছর যাবৎ এদেশে আছেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী নিয়ে তিনিও কম উত্তেজিত নন। টেগোর সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, শীঘ্রই সেই সংস্থা থেকে তিনি 'রাজা' নাটক মঞ্চস্থ করছেন। এডোয়ার্ডের নিমন্ত্রণে এখানে এসেছেন।

এর নাম আমি বুদ্ধদেবের কাছে আগেই শুনেছিলাম। যেবার একা পিটসবার্গ কলেজে পড়াতে এসেছিলেন, তখন ডক্টর প্রফুল্ল মুখার্জি'ও পিটসবার্গে ছিলেন। ইংরেজ আমলের আদি বিপ্লবী।

এই সব লোকেদের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা। বিপ্লববাদী বলে নয়, আদর্শবাদী বলে। আদর্শের জন্য উৎসগীকৃত প্রাণ বলে। ইতিহাসের উৎকৃষ্ট অংশ বলে। ডক্টর ডেকারের বাড়িতে কনডেনস্‌সিকে দেখেও আমি সেই কারণেই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার প্রতিও কম কৃতজ্ঞ হইনি। পৃথিবীর এই সব মূল্যবান সন্তানকে এরাই তো সর্বদা মাতা হয়ে আশ্রয় দিয়েছে!

প্রফুল্ল মুখার্জির সঙ্গে বুদ্ধদেব আমাকে ইংরিজিতেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, বুদ্ধদেবের ধারণা ছিলো ইনি বাংলা ভুলে গেছেন। ভোলা অসম্ভব নয়, অন্তত অনভ্যস্ত তো বটেই। কথাবার্তা সর্বদাই ইংরিজিতে চলছিলো। সেইভাবেই আলাপ করিয়ে দেবার পরেও একজন সম্মানিত পিতার বয়সী বাঙালীকে পাশ্চাত্ত্য প্রথায় সম্ভাষণ করতে আমি সংকোচ বোধ করে নিজের দেশীয় পদ্ধতিতে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি পরম সংকোচে 'না না সেকি!' বলে পিছিয়ে গেলেন, তারপরেই এগিয়ে এসে মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' মানুষটি লাজুক লজ্জা লজ্জা ভঙ্গিতেই আবার বলেন, 'তা ভালো, তা ভালো—মানে এটাই তো আমাদের রীতি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।' ভারি চশমা পরা চোখে প্রসন্ন হাসি টল টল করতে লাগলো। বংলাতেই কথাগুলো বললেন। সেই সন্ধ্যার আসরে তিনি কোনো বাঙালীর সঙ্গেই আর ইংরিজিতে কথা বললেন না। পার্টিটা সেদিন অবশ্য প্রধানত বাঙালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু এ রকম অবিরত বাংলায় কথা বলতে প্রফুল্ল মুখার্জি প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন।

দেশ ছেড়েছিলেন উনিশশো ছয় সালে, তার মানে একষট্টি সালে ঐ দেশের বসবাসে তাঁর জীবনের পঞ্চান্নটা বছর কেটে গেছে। বিবাহও করছেন একটি আমেরিকান দুহিতাকে। বাংলা বলার আর সুযোগ কোথায়? ইচ্ছে করলেও উপায় কী? ভুলতে না চাইলেও ভুলে যেতে হয়।

পরে বলেছিলেন, কন্যাপ্রতিম একটি বাঙালী মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামই তাঁকে সেদিন মাতৃভাষায় কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। সম্ভবত সেই প্রণামই আমার জন্য তাঁর হৃদয় সত্যি সত্যি পিতৃস্নেহের আবেগ সঞ্চার করেছিলো। ভদ্রলোক নিঃসন্তান।

প্রফুল্ল মুখার্জিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম একষট্টি সালে, শেষ দেখি পঁয়ষট্টি সালে। তখন তাঁর বয়েস একাশি। কিন্তু বার্ধক্য কোথাও ছিলো না। সতেজ সটান এক বয়স্ক মানুষ, যার মাথার চুল পর্যন্ত সব পাকেনি।

সেবার নানান কার্যকারণে আমাকে একা দেশে ফিরতে হয়েছিলো। ব্লুমিংটন থেকে নিউইয়র্ক আসবো, নিউইয়র্কে এসে ভারতগামী উড়োজাহাজ ধরবো। কথাটা বলতে সহজ কিন্তু কাজটা ততো সহজ নয়, যদি না কোনো সহায়ক পাওয়া যায়। ব্লুমিংটন থেকে তুলে দেবার লোকের অভাব ছিলো না, কিন্তু নিউইয়র্ক বন্দরে এসে যা করবার আমাকে একাই করতে হবে। আমি খুব নার্ভাস ছিলাম।

আইডেলওয়াইল্ড বিমানবন্দরে যাঁরাই একটু ঘোরাফেরা করছেন তাঁরাই জানেন সেই বন্দরটির বিশালত্ব প্রায় গোলকধাঁধা। রাতদিন কতো চত্বর থেকে যে কতো বিমান ওড়ে তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কার বিমান কোন লাইনের অন্তর্গত তা হাজার মুখস্থ রেখেও তেমন তেমন ভ্রমণকারীরও ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ যায়। একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গার দূরত্ব সাংঘাতিক। তার উপরে ওজন কমাবার জন্য হাতে কাঁধে যে কতো মাল থাকে তার তো অন্তই নেই।

বেলা বারোটার সময় যখন নিউইয়র্কে গিয়ে নামিয়ে দিল প্লেন, চারদিকে তাকিয়ে আমার বক্ষস্পন্দন অতি দ্রুতবেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। সঙ্গে যে সব যাত্রীরা এসেছিলেন, তাঁদের যাত্রা এই শহরেই শেষ। সুতরাং, তাদের সঙ্গ ধরেও যে পিছে পিছে চলবো এমন কাউকে পাওয়া গেল না। যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই বলে 'এনকোয়ারিতে খোঁজ করো।'

'এনকোয়ারির অপিস কোথায়?'

'বোধ হয় অমুক জায়গায়। অমুক জায়গায়ও হতে পারে।'

শঙ্কিত হৃদয়ে চত্বর পার হয়ে ব্রীজের উপর উঠলাম—সবাই উঠলো বলেই উঠলাম, কিন্তু পথ ঐ একটাই নয়, দিকে দিকে প্রসারিত। সব পথেই হংসহাঁস পাখা মেলে মেলে যন্ত্রযান এসে দাঁড়াচ্ছে, কাকে কোথায় উগরে দিচ্ছে ঠিক নেই। আমার মতো অপরিচিত একজন যাত্রীর পক্ষে একেবারে বিহ্বল হয়ে যাবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ।

ব্রীজ পেরুতে প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল, নামবার মুখেই প্রথম গেটেই দেখি সেই একাশি বছরের বৃদ্ধ সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে যেন আলো জ্বলে উঠলো মুখে। কাছে যেতেই হাত থেকে অ্যাটাচি, থলি

ইত্যাদি সব টেনে নিলেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'হঠাৎ এখানে? কেউ এসেছেন? কেউ আসবে?' সেই রকম লজ্জা লজ্জা মুখে বললেন, 'তুমি —মানে তুমি আসবে বলেই এসেছি। একা একা হয় তো অসুবিধে হবে, তাই ভাবলাম—'

'তা সেই জন্যে আপনি এই চল্লিশ মাইল দূরে এয়ারপোর্টে এসেছেন? কী আশ্চর্য! কেমন করে এলেন? সিটি আপিস থেকে ওদের গাড়িতে?'

হাসলেন, 'না না, ওদের গাড়ি আমাকে দেবে কেন, আমি তো যাত্রী নই? এই প্রবেশ দ্বারে আসতেই আমাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। অনেক বোঝাতে হয়েছে। তুমি একা একজন ভারতীয় মেয়ে আসছো শুনে শেষ পর্যন্ত রাজী করানো গেল। আমি এমনি বাসেই এসেছি।'

'আমি তো জানতাম না আপনি আসবেন, তা হলে আমি খুব আপত্তি করতাম। কক্ষনো এতো দূরে আসতে দিতাম না। কতো কষ্ট হয়েছে—'

'এসো। দাঁড়িয়ে থাকলে অন্য যাত্রীদের চলতে অসুবিধে হয়।' এগুতে এগুতে বললেন, 'তুমি কাল রাত্রে যখন আমাকে ফোন করে বললে, আজ চলে যাচ্ছো, তখনই মনে হচ্ছিলো, আর একবাব দেখা হলে বড়ো ভালো হতো। যখন শুনলাম একা যাচ্ছো—'

পেঁছে গেলাম শেষ গেটে। দেখলাম, সাদা পোশাক পরিহিত একটি সুন্দরী যুবতী আমার দিকে হাত নেড়ে হাসলো, আমিও হাসলাম। এদেশে এভাবে চোখে চোখে হাসির সম্ভাষণ বড়ো সুন্দর।

কিন্তু শুধুই তা নয়, কাছে আসতেই বললো, 'নিশ্চয়ই একথা বললে ভুল হবে না যে, তুমিই মিসেস বোস, এয়ার ইন্ডিয়ায় ভারতবর্ষে যাচ্ছো' বুকের ব্যাজ দেখালো, পরিচয়পত্র দেখালো, 'আমি নিতে এসেছি তোমাকে।'

শাড়ি পরা মহিলা দেখেই চিনতে পেরেছিলো। এয়ার ইন্ডিয়ার এই সুচিন্তিত সুবন্দোবস্ত দেখে যুগপৎ আমি এবং ডক্টর প্রফুল্ল মুখার্জি একযোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। সে আমাদের নিয়ে মাইলখানেক হেঁটে বাইরে রাস্তার ধারে আকাশের তলায় এলো। যার যার লাইনের যাত্রীর জন্য তার তার অসংখ্য বাস দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর প্রফুল্ল মুখার্জিও উঠলাম। সেই বাস প্রায় দশ মিনিট চলবার পরে তবে পেঁছুলাম এসে আসল স্টেশনে। ভিতরে ঢুকে তেমনি এলাহি কাণ্ড। আমাদের এনে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে দিয়ে মহিলাটি ঘড়ি দেখে বললো, 'একটা পাঁচ, তোমার প্লেন সন্ধ্যা সাতটায়।'

অর্থাৎ এই অপেক্ষাগৃহে এখন ছ'ঘণ্টার অবস্থান। অবশ্য এই অবস্থানের কথা আমি জানতাম। আমার একা আসার পক্ষে ঐ ছ'ঘণ্টাই ভরসা ছিলো। ভেবেছিলাম, ছ'ঘণ্টার চেষ্টায় নিশ্চয়ই নিজের প্লেনটা খুঁজে নিতে পারবো।

অপেক্ষাগৃহটি আরামের প্রাচুর্যে ভরপুর। শোয়া বসা হাত পা ছড়ানোর জন্য কিছুরই অভাব নেই। এমন কি বাথরুমের ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধন দ্রব্যও সাজানো আছে।

প্রফুল্ল মুখার্জি বললেন, 'বোসো, কিছু খাবার নিয়ে আসি।' আমার বাধা মানলেন না। ফিরে এসে বললেন, 'ভারতবর্ষ দেখছি আমাদের মাথা বেশ উঁচুতে তুলে দিয়েছে এমন সুন্দর ব্যবস্থায়। আমারই ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে চলে যাই। একবার গিয়ে দেখে আসি সব। আমি ভাবতেই পারিনি তোমাকে কেউ আনতে যাবে। না গেলে ভেবে দেখো, এতো দূর আসতে কতো হাঙ্গামা আর কতো পরিশ্রম হতো।'

বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়ে অতি দুর্মূল্য একটি খাবারের প্যাকেট নিয়ে এসে এগিয়ে দিলেন আমার হাতে। সঙ্গে বড়ো পাতার চকোলেট। হেসে বললাম, 'আমি কি ছেলেমানুষ ?' তিনি বললেন, 'আমার কাছে তাই।'

প্রফুল্ল মুখার্জির আদি বাড়ি পূর্ব বাংলায়। বাল্যকালে আসাম প্রবাসী ছিলেন। সেখানেই রাজনীতির হাতেখড়ি। অপেক্ষাগৃহে বসেই কফি খেতে খেতে বলছিলেন : 'জানো, আমরা যখন ছোটো ছিলাম, সাহেবদের ভয়ে সব সময়েই জুজু। বিশেষত চা-বাগানের সাহেবরা যে কী অত্যাচারী ছিলো! কুলীদের তো জন্তুজানোয়ার ছাড়া ভাবতোই না, আমারও তথৈবচ। ওদের সব আলাদা, ইস্কুল আলাদা, ক্লাব আলাদা, প্লে-গ্রাউণ্ড আলাদা—আসাম তো যাওনি, বড়ো সুন্দর দেশ, ধুবড়ি শহরের সব সুন্দর অংশ নিয়েই তাদের এলাকা। ওই কয়েকটি মুষ্টিমেয় সাহেব-মেমদের হেলাফেলার অংশগুলোতে আমরা—যারা নিজগৃহে পরবাসী। ওদের ছেলেদের ইস্কুলের খেলার মাঠটাই আমাদের খুব আকর্ষণ করতো। আমাদের তো ওরকম কোনো মাঠ ছিলো না! বেড়াতে হলে, খেলতে হলে ওই ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর। একদিন সেখানে যেতেও তারা বাধা দিল। ওখান থেকেই সাহেবদের এলাকা শুরু কিনা! কাছেই টেনিস লন, তাদের পছন্দ হলো না আমরা কালো আদমিরা কিলবিল করে সেখানে ঘুরে বেড়াই। সেই আমাদের প্রথম বিদ্রোহ। আদেশ মানলাম না। নালিশ এলো ইস্কুলে হেডমাস্টারের কাছে ছেলেদের শাসন করো।

হেডমাস্টার ছিলেন ঢাকার মানুষ, স্পিরিটেড, বললেন, 'আমাদের ছেলেদের তো তোমাদের মতো মাঠ নেই, নদীর ধার ছাড়া বেড়াবে কোথায় ? অতোবড়ো নদীর তীর বন্ধ করে দিলে চলবে কেন ?'

ব্যস্, আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো, পেয়াদারা তাড়া করলো, তা-ও আমরা বেড়াতেই থাকলাম। তখন টেনিস লন থেকে বড়ো সাহেব বেরিয়ে এসে হাণ্টার দিয়ে আমাদের শায়েস্তা করলো। ওখানে আমরা ছোটো ছেলেরাই বেড়াতাম। এই ঘটনার পরে বড়ো ছেলেরা ক্ষেপে গিয়ে বললো, 'আর নয়, আর আমরা সহ্য করবো না। তোরা কে আসবি সঙ্গে আয়, আজ রাত্রেই এর শোধ নেবো।'

আমি তখন ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্র, তৎক্ষণাৎ মিলে গেলাম তাদের সঙ্গে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চল্লিশ-পঞ্চাশজন ছেলে বেরিয়ে পড়লাম লাঠি নিয়ে। গর্ত গর্ত জায়গা আর ঝোপঝাড়ে নিঃশব্দে বসে থাকলাম ওত পেতে। রাত্রিবেলা ক্লাব থেকে যেই ফুর্তিটুর্তি করে একটু মত্ত অবস্থায় সব বেরুলো, অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লাম বাঘের মতো। মেরে এক-একটাকে একেবারে লাশ বানিয়ে দিলাম। বড়ো বড়ো সাহেবগুলোকে ধরে নর্দমায় চুবিয়ে দিলাম। দারুণ চ্যাঁচামেচি, হইহট্টগোল। আমরা ততোক্ষণে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেলাম।

পালালে কী হবে, পরের দিন স্কুলে এসে যা তাণ্ডব করলো বলা যায় না। লাথি মেরে ভেঙে দিল দরজা, অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলো। কিন্তু হেডমাস্টারমশায় রজনীকান্ত বসু, ভয় পাওয়া বা অ্যাপোলোজাইস করা তো দূরের কথা, সমানে সাপোর্ট করতে লাগলেন আমাদের। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বললেন, 'যা করেছো করেছো আর নয়। এবার শান্ত হয়ে থাকবি, জুতোর দাগ পাওয়া গেছে, ট্রেসপাস হবে। দেখি উকিলরা কী বলে।'

উকিলরা বলবার আগেই যা হলো সারা শহর তোলপাড়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অকারণে মেরেধরে সার্চ করে নাস্তানাবুদ করে তুললো গৃহস্থদের। শেষে প্রমাণের অভাবে থামতে বাধ্য হলো।

আঠারশো সাতানব্বুই সাল সেটা। মানে আটষট্টি বছর আগে। আমার জন্ম আঠারশো চুরাশি সালে, জীবনের ধারা ওই সাতানব্বুই সালেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আপমানকে অপমান ছাড়া আর কিছুই ভাবিনি তারপর।'

'তখন তো আপনি বালক মাত্র।'

'তাতো বটেই। হিসেব মতো বয়েস তখন তেরো।'

'বাব-মা নিশ্চয়ই ছিলেন—'

'বাবা ওখানকারই প্রাইমারী ইস্কুলের হেডমাস্টার। ওই সামান্য আয়ে আমাদের চার ভাইবোনকে নিয়ে মা সব সময়েই বিপর্যস্ত। তবু কোনোদিন বলেননি, এ সব অপমান গায়ে মাখলে চলবে না, সংসারের ভাবনা ভাবো। কিন্তু আমি নিজেই সংসারের ভাবনা ভেবে, তাঁদের সুখের জন্য নিজেকে তৈরি করতে চেয়েছি, যোগ্য হতে চেয়েছি। ধুবড়ি থেকেই ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা সিটি কলেজে পড়তে এলাম। তারপরেই ভেসে গেলাম জোয়ারে। আমার বাবাও তো পূর্ব বাংলারই মানুষ, তিনিও যথেষ্ট তেজী ছিলেন।'

প্রায় ষাট বছর বিদেশে আছেন, আবাল্য আসামে থেকে বড়ো হয়েছেন, তবু কবে পূর্ব বাংলার মানুষ ছিলেন সেই টান আর ছাড়তে পারেন না।

বললেন, 'ভারি দেশে যেতে ইচ্ছে করে। যদি সম্ভব হয় যাবো।'

আমার হাতে খাবারের প্যাকেটটি তেমনিই ধরা ছিলো, খুলে দিলেন, 'খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' উঠে দরজা ঠেলে বাইরে গেলেন, আবার ফিরে এলেন তক্ষুনি। নিজের জন্য আর এক মগ কফি, আর আমার জন্য এক গ্লাস কোকাকোলা।

প্লেন সন্ধ্যে সাতটায়, তখন মাত্র বেলা দুটো। আমি বললাম, 'আপনি কতো কষ্ট করে এতোদূরে এসেছেন, ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু আপনাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কতো যে ভালো লেগেছিলো, কতো যে আশ্বস্ত বোধ করছিলাম। এখন আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে যে কতো গৌরব বোধ করছি বলতে পারি না। দেশে গেলে আমাকে কিন্তু নিশ্চয়ই আগে জানাবেন—আবার দেখা হবে—'

'আবার দেখা হবে?' থেমে থেমে সামান্য হেসে বললেন, 'আর কি হবে?'

'কেন হবে না?'

'কী জানি।'

'নিশ্চয়ই হবে।'

জানলার কাচে তাকিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করলেন; 'জানো, আমি তখন হ্যারিসন রোডের একটা মেসে থাকি। সেই সময়েই বুয়োর ওয়ার শেষ হলো, উনিশশো দুই কি তিন। লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন, 'বাংলা বিভাগ হবে।' লীডার সুরেন ব্যানার্জি, ভুপেন বোস, অম্বিকা মজুমদার, এ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিপিন পাল এঁরা একেবারে রুখে দাঁড়ালেন। অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) তখন যুবক, বরোদা

কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, ছেড়ে দিলেন চাকরি, আমরাও অনেকে কলেজ ছেড়ে ঢুকে পড়লাম নিয়মিত কাজের মধ্যে। সারা ভারতময় আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সেটাই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন। মস্ত মিটিং হলো টাউন হলে, রবিবাবু (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেখানে তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, গানও বেঁধে দিয়েছিলেন একটা, 'হে ভারত আজি তোমারি সভায় শোন এ কবির গান।' অজিত চক্রবর্তী ছিলো আমার সহপাঠী, আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে গানের দল নিয়ে এলো, কী উত্তেজনা! দেশটা যেন দপ করে জ্বলে উঠলো। রবিবাবু বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। টেবিলে চাপড় মেরে যখন বললেন, 'আমরা সরকারকে ছেড়ে নিজেরাই নিজেদের নির্ভর হবো,' সবাই একেবারে উৎসাহে ফেটে পড়লো। তারপরেই তৈরি হলো সাবানের ফ্যাক্টরি, জুতোর কারখানা —জানো তো, কংগ্রেসের প্রবর্তন হয়েছিলো আঠারো শো প'চাশি সালে, প্রথম প্রবর্তক ছিলেন আনন্দমোহন বসু, দাদাভাই নৌরোজি, সুরেন ব্যানার্জি, রমেশ দত্ত। প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি। প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেসের পত্তন হয় বরিশালে। নেতারা গিয়ে সবাই উপস্থিত সেখানে ব্যারিস্টর আবদুল রসুল হলেন সেসনের প্রেসিডেন্ট; অশ্বিনী দত্ত হলেন 'চেয়ারম্যান অব রিসেপসন কমিটি', শুরু হলো মিটিং। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের নোটিস এলো, 'সভা বন্ধ করো।' পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেল চারদিক। ভেবে দ্যাখো, কী কাণ্ড। তখন সুরেন ব্যানার্জি বললেন, মিটিং বন্ধ কোরো না, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে আসছি।

গেলেন তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে, বসলেন মুখোমুখি চেয়ারে, ভুরু কুচকে ম্যাজিস্ট্রেট বললো, 'আমি তো আপনাকে বসতে বলিনি।'

সুরেন ব্যানার্জি অসম্মানে রাগে লাল হয়ে বেরিয়ে এলেন। অতোবড়ো একজন লীডার, কতো উঁচুদরের একজন মানুষ, কোনো দ্বিধা নেই অভদ্রতা করতে! এরা আবার সভ্য জাত। ছিঃ। আর এদিকে মিটিং বন্ধ না করার দরুন পুলিশ লাঠিচার্জ করলো।

মারের চোটে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল সেখানে। কারো মাথা ফাটলো, কারো হাত ভাঙলো, কারো পা ভাঙলো...'

প্রফুল্ল মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন, এতোকাল বাদেও তাঁর চোখের তারা পাওয়ারফুল টর্চের মতো জ্বলতে লাগলো। পিছনে হাত রেখে হাঁটতে লাগলেন। এইসব অত্যাচারের নমুনা আমার নিজেরও কিছু জানা ছিলো। আমারও মনে

পড়লো। সে সব কথা। একবার আমাদের পাশের বাড়িতে অধিক রাত্তিরে হানা দিয়েছিলো পুলিশ। একটি পলাতক ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তারা। কোনো দুপুরে ধরেও ফেলেছিলো প্রায়, পিছন দিকের দেয়াল টপকে আমাদের বাড়ির ভিতর দিয়ে জলপাই বাগান পার হয়ে পালিয়ে যায়। সেদিন রাত্রে সেই ছেলে, যার বয়েস আঠারো, তার অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছিলো লুকিয়ে। সে নিজেও বহুদিনের অনিশ্চিত জীবনে কম ক্লান্ত ছিলো না। সেটা তার মামার বাড়ি। ছেলেটির মা বিধবা ছিলেন। মামারা বললেন, আজ থেকে যা। আপত্তি না করে সে-ও রয়ে গেল।' কিন্তু গোয়েন্দার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। মধ্যরাত্রে হুলুস্থুল। এক মামী সন্তানসম্ভবা ছিলেন, হুড়মুড় করে প্রায় আটজন-দশজন মিলে শোবার ঘরে ঢুকে ঢুকে হানা দিচ্ছিলো, মশারির ভিতর থেকে টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছিলো সব ঘুমন্ত বাচচাদের, ওই মহিলাকেও এক ধাক্কায় ফেলে দিল মাটিতে, তিনি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন, তাঁর স্বামী রুখে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে বুটের লাথি।

ধরলো হরিদাসকে। ছেলেটির নাম হরিদাস ছিলো। তারপর যে তাকে মারতে শুরু করলো, অকথ্য। অজ্ঞান হয়ে গেলো সে, সেইভাবেই ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুললো। সারা বাড়ির আর্তনাদে পাড়ার প্রতিটি অধিবাসী জেগে উঠে অক্ষম অসহায় রোষে ফুঁসতে লাগলো নিঃশব্দে। পরের দিন বেলা বারোটার মধ্যে ছ'মাস গর্ভবতী মামী অকালে একটি মৃত শিশু প্রসব করে যুদ্ধ করতে লাগলেন যমের সঙ্গে।

তারই কিছুদিন বাদে আর একটি দৃশ্য। ঢাকা ওয়ারির হেয়ার স্ট্রীটে থাকতাম আমরা। খুব ধরপাকড় চলছে কয়েকদিন যাবত, একসঙ্গে তিনজনের বেশী চলা বা দাঁড়ানো নিষেধ। সারাদিন টহল দিচ্ছে পুলিশ, হঠাৎ হঠাৎ কোনো বাড়িতে ঢুকে সার্চ করার নামে তাণ্ডব করছে, মুসলমানের আক্রমণ হলে আত্মরক্ষার সমস্ত উপায়, এমন কি কয়লা ভাঙা হাতুড়ি বা খাটের বুজু পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাচ্ছে। আর যাবার পরেই পাঁচ-সাতশো মুসলমান একসঙ্গে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে কেটে খুন করে আগুন লাগিয়ে সারা পাড়া শ্মশান করে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা লাগিয়ে হিন্দুনিধন করছে ইংরেজরা। বাঁচতে তো হবে? সবাই মিলে জোট না পাকালে সঙ্ঘবদ্ধ না হলে শত্রু রুখবে কী করে? বাধ্য হয়েই ছেলেরা তক্কে তক্কে থেকে একসঙ্গে হয়ে পড়ছে বারে বারে। বিকেল তখন চারটে হবে, আমি সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসেছিলাম। ছোটো বাগান পেরিয়ে

কাঠের গেটটি। খোলা রাস্তা দেখা যাচ্ছে সোজা। হঠাৎ একটা গোলমাল উঠলো। আমরা সকলেই তখন ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করতাম। আমাদের তো কোনো নিরাপত্তা ছিলো না? চকিতে উঠে দাঁড়ালাম এবং চকিতেই দেখতে পেলাম এক জাঁদরেল সাহেবের এক লাথিতে একটি যুবক ছিটকে এসে আমাদের গেটের ভিতরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। যুবকটিকে আমি চেহারায় চিনি, পাড়ার দুঃসাহসী রক্ষকদের একজন। এদের আপ্রাণ পরিশ্রম দুর্জয় সাহস এবং সতর্কতার বিনিময়েই আমরা তখনো বেঁচেবর্তে আছি।

সাহেবটি হচ্ছেন ঢাকার কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট হাডসন, যার অত্যাচারের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না, হৃদয়হীনতায় যে লোক হিংস্রতম জানোয়ারেরও অধম।

ছেলেটি উঠলো, আমি দৌড়ে কোনো সাহায্যের জন্য কাছে যেতে না যেতেই দাঁতে দাঁত পিষে বেরিয়ে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যেই হাডসনকে গুলি করে পালালো বিনয়। বিনয়-বাদল-দীনেশের বিনয়। যে ছেলেটিকে তিনজন ছেলের সঙ্গে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে তাড়া করে এ পর্যন্ত এসে লাথি মারতে পেরেছিলো তার নাম আমি জানি না। হতেও পারে এই তিনজনেরই একজন। আমি দিনেশকে ছাড়া আর কাউকেই চিনতাম না।

প্রফুল্ল মুখার্জির কাছে বিগতদিনের ইতিহাস শুনতে শুনতে আমি আমার বিগতদিনের ইতিহাসে ফিরে যাচ্ছিলাম। রাজনীতির সঙ্গে নানা কারণে প্রত্যক্ষ-ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে কেমন একটা যোগাযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। এ বিষয়ে আমার স্পষ্ট মতামত আছে, বলবার কথা আছে, উৎসাহ আছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা আছে। একজন প্রকৃত সংগ্রামীর মুখে এই লিপি পাঠ করতে করতে আমি অন্য এক জগতে চলে যাচ্ছিলাম। প্রফুল্ল মুখার্জিও কথা থামাতে পারছিলেন না, বিষয় বদলাতে পারছিলেন না, সেই সময়কার দেশ কাল পাত্র স্মৃতি বয়েস—সব তাঁর মনের অন্ধকার থেকে উঠে আসছিলো উপর তলায়, আমার মতো মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসছিলো সব। বললেন, 'সুরেন ব্যানার্জি ছিলেন বেঙ্গলীর এডিটর। শিয়ালদা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে কলুটোলা বেঙ্গলী আপিসে এসে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'উই ডিমান্ড ন্যাশানাল এডুকেশন।' বক্তৃতা হলো কলেজ স্কোয়ার, সেনেট হলে। ঐ সেনেট হলের শেষ গানটা কি জানো? 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' ঐ এক গানেই সব মাত্। হাজার হাজার কণ্ঠ গেয়ে

উঠতো 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' এই গান গেয়ে আমরা কতো চাঁদা তুলেছি, ট্রেজারার ছিলেন পশুপতি বোস, মস্ত জমিদার, সঙ্গীত সমাজ ছিলো ওঁদের বসবার বৈঠকখানা। রাত্রিবেলা গিয়ে সবাই চাঁদা জমা দিয়ে আসতাম। এক বছরে এক লাখ টাকা উঠলো, তার উপরে রাজা সুবোধ মল্লিক একলাই দিলেন এক লাখ, টি. পালিতও দিলেন, মস্ত ফাণ্ড হলো। ঐ ফাণ্ড থেকেই খোলা হোলো যাদবপুর কলেজ। 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' কী কথা! রাখী বন্ধনের জন্যই রবিবাবু লিখে দিয়েছিলেন সেই গান। রাখী পরিয়ে ঐ গান গাইলে কি আর কেউ থাকতে পেরেছে? আমাদের ভিক্ষার ঝুলি তখুনি ভরে গিয়েছে তাদের দানে। বিপিনবাবু বলতেন, 'নুন চিনির স্বদেশী চাই না হে, আসল স্বদেশী চাই।' নরেন গোস্বামী, ক্ষুদিরাম, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কতো সব বন্ধু কোথায় চলে গেল। আর কি দেখা হলো তাদের সঙ্গে? আরো কতো মানুষ ছিলো জীবনে; মা বাবা ভাই বোন—কতো কতো—সব কোথায় আজ?'

চুপ করে রইলেন। অন্যমনস্ক ভাবে আবার বললেন, 'কাণ্ড তো কম করিনি। বড়োবাজারে সেই স্বদেশী স্টোর, হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্কোয়ারে যার প্রধান ঘাঁটি—যেদিন স্টোর আরম্ভ হলো, চার পাঁচজন মিলে বড়োবাজারে তো বস্তা ভর্তি কাপড় কিনেছি, কেনা হয়ে যাবার পরে খেয়াল হলো, কারো পকেটেই তো একটি পয়সা নেই, নিজেরা তো হেঁটে যাবো, এই বোঝাগুলো নেবো কেমন করে? আমাদের সঙ্গে রমাকান্ত বলে একটি ছেলে ছিলো, সদ্য জাপান থেকে এসেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, মাথায় পাগড়ি, একেবারে ডায়ানামিক পার্সন, গেয়ে উঠলো 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'। গেয়েই এক হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল এক গাঁঠরি। ব্যস, সব সমস্যার সমাধান। প্রত্যেকের ঘাড়েই তখন উঠে গেল এক একটি বোঁচকা।

এর মধ্যেই একজন কৃষ্ণনগর অথবা মুর্শিদাবাদের হাকিমকে বোমা মেরে বসলো, হাকিম মরলো না, মরলো তার স্ত্রী। তারপরেই উল্লাস প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ইংরেজ অধ্যাপককে জুতো মারলো। দুটো নিয়েই সাংঘাতিক তোলপাড়। বোমা মারার জন্যে পিউনিটিভ পুলিস বসে গেলো, বেধড়ক ধর পাকড়ে দোষী-নির্দোষীর আর কোনো ভেদাভেদ থাকলো না। আর এদিকে জুতো মারার জন্য চাপ পড়লো সব প্রিন্সিপ্যালের উপরে। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন

পি. কে. রায়, তিনি তো কিছুই জানেন না, দল পাকিয়েই জুতো মারা হয়েছিলো, কাজেই কে মেরেছিলো কী করে বলবেন? যারা জানে তারা তো বলবেই না। অথচ খুঁজে বার করতেই হবে। ই. এম. ফস্টার তখন বঙ্গবাসীতে। তিনি বললেন, যদি বার করতে না-ই পারো, সব্বাইকে রাজটিকেট করে দাও এক বছরের জন্য। তাই ঠিক হলো। আবার হুকুম এলো, 'না, তাতে হবে না, সমস্ত সেকেণ্ড ইয়ারটাই তুলে দাও।'

এটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। পি. কে. রায় তখন নিরুপায় হয়ে ছুটলেন আশুতোষ মুখাজীর কাছে, আশুতোষ মুখার্জি সারদারঞ্জন রায়কে ডাকলেন। পরামর্শ করে শেষে ই. এম. ফস্টারকেও ডাকা হলো। বোঝানো হলো এসব ইমোশন্যাল ছেলেদের আরো ক্ষেপিয়ে লাভ নেই, আগুন আরো জ্বলবে, বরং শাস্তির উগ্রতা কমালে শান্ত হতে পারে। এ প্রস্তাব সমীচীন মনে হলো তাদের, মাত্র এক সপ্তাহের শাস্তি নির্ধারণ করেই নিষ্পত্তি হলো সে ঘটনার।

কিন্তু উল্লাস কলেজ ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঢেলে দিল দলের কাজে। পুলিস তো নিষ্ক্রিয় ছিলো না, নেতাদের মনে হলো জালে করে জেলে-দের মাছ তোলার মতো এবার ওরা একসঙ্গে আমাদের সব্বাইকে টান দেবে। সেই ভয়েও অনেকটা, আবার কিছুটা বাইরের জগতে আমাদের অবস্থাটা জানাবার জন্যেও কয়েকজন ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া স্থির করলেন তাঁরা।

আমরা চারজন—আমি হেরম্বলাল গুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, আর ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এলাম এদেশে। তারকনাথ দাস, রাসবিহারী ঘোষ আর ফণি ব্যানার্জি গেলেন জাপান।'

'এ দেশের খরচ তো বড়ো সহজ নয়! কী করে চলতো আপনাদের?'

'চলার কথা ভেবে তো আমাদের পাঠানো হয়নি! আমরা চলবোই কোনো রকমে এটাই ভেবেছিলেন। জেলে বসে আয়ুক্ষয় করার চেয়ে এই অনির্দিষ্ট জীবনই আমরা প্রেফার করেছিলাম।'

প্রফুল্ল মুখার্জির কণ্ঠস্বর বহুকাল বিদেশে বাস করার জন্যই কিনা জানি না খুব নিচু, আস্তে কথা বলা আভাস, তারই মধ্যে কিছুটা গলা তুলে বললেন, 'যারা বলে বাঙালীরা অলস, অপদার্থ, তাদের আমার বলতে ইচ্ছে করে ছাতু আর জল খেয়ে লোটা কম্বল সম্বল করে করে দাওয়ায় পড়ে থেকে বাঙালীরা বড়ো ব্যবসায়ী হবার মূলধন সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখে না বটে, তবে শিক্ষা সংস্কৃতি

স্বাধীনতায় নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্ন তারা দেখতে জানে। এই স্বাধীনতার যজ্ঞে বাঙালীর মূলধন বড়ো কম ছিলো না।' থেমে বললেন, 'এই যে আমরা এতো-গুলো আঠারো কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে ইংরেজের তাড়া খেয়ে স্বদেশ স্বজন ছেড়ে বিদেশের অজ্ঞাত অনিশ্চিত তিমিরে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, মেহনত না করে তো বেঁচে থাকিনি? সম্বল কী ছিলো? শীতের দেশ, কতো জামা জুতো লাগে, তাই কি আমাদের ছিলো?

'কী করলেন তবে?'

'প্রথম যে চারজন আমরা এসেছিলাম, লণ্ডন থেকে রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী নির্মলানন্দ আমাদের পরিচয় দিয়ে নিউ ইয়র্কের একজন জার্মানি ইঞ্জিনিয়ারের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠি পড়ে তিনিই একটা থাকার জায়গা ঠিক করে দিলেন, একটা কারখানার ম্যানেজারের কাছেও পাঠিয়ে দিলেন। ম্যানেজার বললেন, কী কাজ চাও? আমরা বললাম, যা দেবে তাই শিখে নেবো। হয়ে গেল চাকরি। এক সঙ্গেই চার জনের হলো।'

'বাঃ বেশ তো।'

'আমাদের তো কোনো চয়েস ছিলো না, চাহিদাও ছিলো না। সারাদিন ভূতের খাটুনি। এক বছর ছিলাম সেখানে। অতি কষ্টে থেকে সামান্য টাকা জমিয়ে ফেলেছিলাম, সেই টাকাতেই আমি গেলাম ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, ওখানকার টিউসন ফী খুব কম। একটা ফ্যাক্টরিতে টুকটাক কাজ করে সামান্য উপার্জনও হতো, এক বছর পড়লাম সেখানে।'

'আর ওঁরা।'

'ধীরেন গুপ্ত গেল হার্ভার্ডে, ধীরেন সেন টি. কোম্পানীতে কাজ নিল।'

'তারপর?'

'এক বছরের বেশী সেখানেও থাকতে পারলাম না। পড়াশুনো করে যতোটুকু সময় পেতাম, তাতে মাত্রই দু তিন ডলার উপার্জন হতো, খরচ চলতো না। খবরাখবর করে সামারে চলে এলাম পিটসবার্গে, স্ট্রীট প্ল্যাণ্টে কাজ যোগাড় করে নিলাম একটা। সেখানেও এক বছর। আবার হাতে কিছু জমলো, সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। ফ্রেটারনিটি হাউসে টেবিল সাফ করতাম, খাওয়াটা ফ্রি, একটা স্টোরে গিয়ে দাঁড়াতাম, তাতেও পেতাম কিছু, হাত খরচটা চলে যেতো। এই করে করে তিন বছরে ডিগ্রীটা হয়ে গেল। কিন্তু সে সব শুনে আর কী করবে?'

হেসে বললাম, 'আমি আর কী করবো, কোনো উদ্যোগী ছেলে হয়তো অনুপ্রাণিত হতে পারে। তাছাড়া স্বাধীনতার জন্য একজন উৎসর্গীকৃত মানুষের জীবন বৃত্তান্ত তাঁরই মুখে শোনাটাও তো কম মূল্যবান নয় ?'

'আরো অনেক ছেলে এসেছিলো তারপরে। শৈলেনও এলো, তুখোড় ছাত্র, স্টেট স্কলারশিপ পেয়েছিলো, নেয়নি। বোমার কেসে পড়েছিলো তো ? পালাতে হয়েছিলো। ব্রিটিশ সরকারের দক্ষ নজর এড়িয়ে পালানো সহজ নয়। ওয়ারেন্ট ছিলো। কীভাবে জাহাজের স্টোর কীপার হয়ে যে চলে এলো কে জানে ? আমরা কিন্তু ততোদিন বসে ছিলাম না। এখানে এসে কষ্ট করে শুধু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি বয়েস বাড়িয়েই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। সেটা আসল কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো। তারক চলে এসেছে জাপান থেকে, সুধীন বোস আছেন, তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রফেসর এদেশে। ছিলেন আয়োয়া সিটিতে, শিকাগোতে আছেন কুমারস্বামী। আদান-প্রদানে সমস্ত কাজ মসৃণগতিতে চলছে, মিমিওগ্রাফ করে ফ্রী হিন্দুস্থান নামে কাগজ বার করেছি, আইরীশরা আমাদের পক্ষ সমর্থন করে লিখেছে সেই কাগজে। টলস্টয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তিনিও চিঠি দিয়েছেন, কুমারস্বামীও লিখছেন। সমিতিও হলো একটা, নাম হলো 'হিন্দুস্থান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন', সুধীন প্রেসিডেন্ট আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট, রফিউদ্দীন আমেদ সেক্রেটারি। দেখতে দেখতে কতো ব্রাঞ্চ খোলা হয়ে গেল। নিউ ইয়র্ক শিকাগো উইসকনসিন মিশিগান বার্কলি ইলিনয় ওহায়ও—সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো কর্মীরা, সেনেটরদের সঙ্গে দেখাশুনো করে বন্ধু পাওয়া গেল অনেক, ওয়াশিংটনের সেনেটররা সত্যি খুব সাহায্য করছিলেন। আমাদের 'ফ্রেন্ড ফর ফ্রিডাম ফর ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে অনেক আমেরিকান যুক্ত হলো, আইরীশরা তো ছিলোই। লালা লাজপৎ রায় এলেন, আমিই সমস্ত বন্দোবস্ত করে তাঁকে নিয়ে এলাম আইরীশদের মিটিংয়ে। জন ডিভয় ছিলেন আইরিশ কাগজের লীডার। লাজপৎ রায় এসে বললেন, 'আমরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস চাই।' একথা শুনে আমাদের তো লজ্জায় মাথা হেঁট। খুব ঝগড়া হয়ে গেল আমার সঙ্গে। পিটসবার্গে আমার সঙ্গেই ছিলেন তিনি। যাই হোক, আমেরিকাতে আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এমন একটা ফিলিং তৈরি করতে পেরেছিলাম যে, ব্রিটিশকে যথেষ্ট দোষারোপ করে লেখালেখি করতে লাগলো ওরা। মিস মণ্ডে বলে এক মহিলা 'ওপিয়াম ট্রেইড ইন ইণ্ডিয়া' বলে একটা বইও লিখলেন ওদের বিপক্ষে।

তাতে লেখা থাকলো কী ভাবে ইংরেজরা খোলাবাজারে আফিম বিক্রী করে, লোককে 'করাপ্ট' করে, নিস্তেজ করে দেয়। চীনে জাতটাকে তো প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে—ভারতবর্ষে সেটাই শুরু করেছে এখন। পাটের আপিসে যেসব মেয়েরা কাজে আসে, তাদের ছেলেমেয়েদের ওরা আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে। বেশ একটা ঘৃণা তৈরি হলো সকলের মধ্যে।'

হঠাৎ উল্টে গেল হাওয়া, ইংরেজরা চিরকালই ধূর্ত জাত, তাদের সঙ্গে পারা কঠিন। আমরা চলছিলাম ডালে ডালে, তারা চলছিলো পাতায় পাতায়। যখন দেখলো সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আমেরিকা বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ প্রচার করলো আমরা সব বিদ্রোহী, সব শ্বেতাঙ্গদেরই শত্রু, সুতরাং সাবধান। আমাদের উপরও কড়া নজর রাখলো। তখন অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল আমাদের জীবন।'

পিট্‌স্‌বার্গে এসে শৈলেন আমার ভাই পরিচয় দিয়ে আমার কাছেই ছিলো। সুভাষবাবু চিঠি দিয়ে দিযেছেন ওকে রাখবার জন্য। নির্দিষ্ট পদ্ধতিও ঠিক করা ছিলো কাজকর্মের। সেই মতো নিউ ইয়র্কে এসে যেখানে সব লেবার আপিস সেখানেই একটা ছোটো ঘর নিয়ে আমাদের আপিস খোলা হলো। কিন্তু টাকার তো দরকার? আমি তখন গ্র্যাজুয়েট করে 'ইউনাইটেড স্টেটস্‌ স্টীল-কর্পোরেশনে' কাজ করি। শৈলেনও আইরীশদের 'ক্যাথলিক' চার্চে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে ভালোই উপার্জন করতে লাগলো। শৈলেন নিজেদের দৈন্য দুর্দশার কথা খুব সুন্দর করে বলতে পারতো। লোকেদের মন ভিজে যেত ভারতবর্ষের জন্য। তারপর চাঁটগাঁয়ের যে সব নাবিকরা নেমে আর জাহাজ ধরতে না পেরে বাধ্য হয়েই থেকে গেছে এদেশে, খুঁজে খুঁজে বার করা হলো তাদের। তারা ঘুরে ঘুরে বোতাম বিক্রী করে আমাদের টাকা তুলে দিত, ফ্ল্যাগও বিক্রী করতো। ন্যাশানাল ফ্ল্যাগ, লেখা থাকতো ফ্রী-ইণ্ডিয়া। ছোটো বড়োর দুরকম দাম ছিলো, পঁচিশ সেণ্ট আর পঞ্চাশ সেণ্ট। তা-ও কম বিক্রী হতো না। সব ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে তখন আমাদের যোগাযোগ, প্রায় আড়াইশো তিনশো ছেলে ছড়িয়ে আছে বিদেশে, তারা সবাই যুক্ত হলো এই একই প্রচারে। তার মধ্যেই যুদ্ধ লাগলো। উনিশ শো চোদ্দো সাল সেটা, ইংল্যাণ্ড জার্মানী ফ্রান্স। আমেরিকার কাছে সাহায্যের আবেদন এলো। আমরা তখন তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম 'তোমরা যদি ডেমোক্রেটিকই হও, তবে এদের কী করে সাহায্য করবে? এতবড়ো

একটা দেশকে যায়া ওরকম করে রেখেছে?' থেমে প্রফুল্ল মুখার্জি তাঁর নিবে যাওয়া চুরুটাকে ধরাবার জন্য লাইটার জ্বালাতে চেষ্টা করলেন। তখনই দরজায় টোকা পড়লো, এয়ার ইণ্ডিয়ার সহাস্য সুন্দরী অভ্যর্থনাকারিণী মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি, প্লেন এসে গেছে।' ঘড়িতে দেখলাম সাতটা বাজতে কয়েক সেকেণ্ড বাকী।

চমকিত হয়ে প্রফুল্ল মুখার্জি বললেন, 'তা হলে—'

আমি প্রণাম করে বললাম, 'আবার দেখা হবে দেশে।'

তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমা খুলে মুখ মুছলেন, জবাব দিলেন না। তারপর যতোদূর দেখা গেল উড়তে লাগলো সেই রুমাল। এক সময় সেই সূত্রটুকুও কখন হারিয়ে গেল! আমি ঝাপসা চোখে আকাশে উঠতে উঠতে বুঝতে পারলাম, সেই সুতো আর জোড়া লাগবে না কোনোদিন। এই শেষ।

সত্যিই আর আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি।

নরেশের বাড়ির পার্টি ভাঙতে সেদিন প্রায় রাত একটা। হাসি গল্প গান ছবি রাজনীতি সাহিত্য পরচর্চা সব মিলিয়ে একেবারে যাকে বলে জমজমাট। নরেশকে যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন এমন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি কোটিকে গুটিক। ঢালাও খাদ্যপানীয়ের সঙ্গে তার নিজের হার্দ্য ব্যবহার মিলেমিশে কোনো অতিথিকেই অতিথি বলে সচেতন করে রাখছিলো না। সবাই আনন্দিত ছিলো, সুখী ছিলো। এমন যে অমিয় চক্রবর্তী, যিনি বেশী হাসি পেলে মুখে রুমাল চাপেন, তিনিও ভুলে যাচ্ছিলেন সেকথা। আর বুদ্ধদেবের হাসিতে তো ইভানস্টোন শহরের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিলো।

দিন যায়, দিন ফিরে আসে না। ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ শোক-সান্ত্বনা শেষ পর্যন্ত স্মৃতির পাহাড়ে স্তূপীকৃত হয়।

মনোজ নামের একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলেও ছিলো সেই সভায়। হার্প বাজিয়ে গান গেয়ে মোহিত করে দিয়েছিলো সকলকে। এই ছেলেটি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র, নরেশ কিন্তু খুব ভালোবাসে ওকে, ও-ও ঐ প্রবাসে এইরকম একটি পরিবারের মমতা পেয়ে একেবারে ঘরের ছেলে। লিখতে লিখতে সেই ছেলেটিকে আবার ভীষণভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। শ্যামল রঙের কচি চেহারার একটি নিষ্পাপ তরুণ যুবা।

কয়েক বছর বাদে পাঠ সমাপ্ত করে দেশে ফিরেছিলো সে। এই কলকাতা শহরেই নববিবাহিত হয়ে সুখের সাগরে ভাসছিলো। একদিন হঠাৎ চিনু এসে বললো, 'আপনার মনোজকে মনে আছে?'

'মনোজ? তোমাদের সেই ইভানস্টোনের মনোজ? এসেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, কবেই তো এসেছে, এসে বিয়েও করেছে, তারপরে দেখুন কী কাণ্ড হলো।'

'কী?'

'একদিন শুনি ক্যানসার ধরা পড়েছে, কাল শুনলাম মারা গেছে।'

'অ্যাঁ।'

তারপর দুজনেই চুপ। মনোজ আমাদের কেউ না, কিন্তু মৃত্যু আমাদের সকলের, তাই সব মৃত্যুই কষ্ট বয়ে আনে। তা থেকে নিষ্কৃতি কোথায়?

এভানস্টোনে নরেশের বাড়ির সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় আড্ডায় তখন বঙ্গীয় আড্ডার মেজাজ দেখে গলওয়ে কিনেলের বন্ধু শার্লি ড্রাই একেবারে মুগ্ধ। যদিও সেই সভায় আমরা বাঙালীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে বাংলায় কথা বলে, বাংলায় গান গেয়ে অনেকটা সময়ই এই বিদেশীনীটিকে ভুলে, মানে ব্যক্তিটিকে ভুলে থাকছিলাম না, তার ভাষাকে ভুলে থাকছিলাম। তথাপি দেখলাম, তার ফুর্তির কোনো অভাব নেই। কিছু কিছু ভঙ্গিতে বুঝে নিয়ে, কিছু কিছু না বুঝলে জিজ্ঞেস করে নিয়ে কখন আমাদেরই একজন হয়ে হাসছে, হাঁটু চাপড়াচ্ছে, পাশে উপবিষ্ট আমাকে মুহুর্মুহু জড়িয়ে ধরছে।

আড্ডা ভাঙবার কিছুটা আগেই উঠতে হলো তাকে। একা যাবে, অতটা পথ, আর শহরটি হচ্ছে শিকাগো। আমি রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে এলাম, বললাম, 'সাবধানে যেয়ো, শুনেছি শিকাগো খুব গুণ্ডা অধ্যুষিত শহর।'

আঙুলে গাড়ির চাবি দোলাতে দোলাতে শার্লি বললো, 'আমি নিগ্রো পাড়া দিয়ে যাবো না, ওরা এখন খুব ক্ষিপ্ত।'

'কেন?'

'মিসিসিপিতে যা হচ্ছে, অকথ্য। নিজভূমে পরবাসী বলতে যা বোঝায় সেখানকার ন'লক্ষ নিগ্রো অধিবাসীরাই হচ্ছে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শোনো বাপু তোমাকে বলি, আমাদের মতো মানুষেরা হচ্ছে দুই দলেরই টার্গেট।

অর্থাৎ নিগ্রোরাও সাদা বলে থুতু ছিঁটোয়, রক্ষণশীল সাদারাও গুলি করবার জন্য ঘুরে বেড়ায়।'

আসলে সেই সময়ে জাতীয় সরকার এই ভেদাভেদ লুপ্ত করার জন্য শক্ত হাতে লাগাম ধরেছিলো। এবং রক্ষণশীলরা যাই বলুক, অধিকাংশ মার্কিনীই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে সকল রকমের সহযোগিতা তো করছিলোই, লিখছিলো কাগজে কাগজে, বলছিলো পথেঘাটে, সভাতে। নাগরিক অধিকার আইনসঙ্গত হবার পরে সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শত শত নাগরিক-অধিকার আন্দোলনকারী শ্বেতাঙ্গ কর্মী নিগ্রোদের মধ্যে সমস্ত রকম শিক্ষাবিস্তারের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিলো। সেই সঙ্গে যে সব সুখ সুবিধা এতোকাল ধরে শুধু সাদারাই ভোগ করে আসছিলো, নিগ্রোরাও যাতে তার সমান অংশীদার হতে পারে, কেউ যাতে বাধা না দেয় সেজন্যও আন্দোলন চালাচ্ছিলো তারা। কিন্তু কেন্দ্রের নিয়ম অথবা এদের আন্দোলন রাজ্য সরকাররা সর্বত্র মান্য করছিলো না। কারো হাতে সামান্য একটা লিফলেট দেখলেও গুণ্ডামীর অজুহাতে গ্রেপ্তার করে সকলকেই ফাটকে আটকাচ্ছিলো। এমন কি সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে সেই সব শ্বেতাঙ্গদের ঘেরাও করে পর্যন্ত রাখছিলো। বোমা ফেলে নিগ্রোদের গির্জে ধ্বংস করা হচ্ছে খবর পেয়ে একবার তিনটি ছেলে তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছিলো সেখানে, তার মধ্যে একটি ছেলের বয়েস চব্বিশ, মানহাটানে সেটেলমেণ্ট হাউসে কাজ করতো, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সমিতির সভ্য হয়ে নিগ্রোদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে ব্রতী হয়। আর একটি ছেলে কুইনস কলেজের ছাত্র, একশো বাহাত্তর জন কর্মী নিয়ে সে মিসি-সিপির নিগ্রো বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলো, তার বয়েস একুশ, এ দুজন শ্বেতাঙ্গ, অন্য ছেলেটি নিগ্রো, তার বয়েসও একুশ। একটি স্টেশন-ওয়াগনে করে মিসিসিপির দিকে রওনা হয় তারা। কিন্তু পথে রাজ্যের ডেপুটি শেরিফ তাদের থামান এবং ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘন করার অছিলায় গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে দেন। তখন ছিলো বিকেল, ছাড়া হলো গভীর রাত্রে। অত রাত্রে তারা আর কোথায় যাবে? গিয়েই বা কী করবে? ভেবেচিন্তে বাড়িই ফিরে আসছিলো কিন্তু ফেরা আর হলো না। অতগুলো লোক কোথায় উধাও হয়ে গেল কর্পূরের মতো। কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। দুদিন বাদে শুধু স্টেশন ওয়াগনটি শহর থেকে খানিকটা দূরে একটা হাইওয়ের কাছে পোড়া অবস্থায় দেখা গেল।

আরো কিছুদিন বাদে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হলো তাদের মৃতদেহ। এই সূত্রে পুলিস যে উনিশজনকে গ্রেপ্তার করে তার মধ্যে রাজ্যের শেরিফ এবং ডেপুটি শেরিফকেও বাদ দেয়া হয় না। পুলিসের ধারণা এদের ষড়যন্ত্র অনুযায়ীই এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। কিন্তু মামলা যখন রাজ্য সরকারের বিচারালয়ের অধীন হলো, কোনো সাক্ষীই পাওয়া গেল না। স্বয়ং জজসাহেব সকলকেই নিরপরাধ বলে খালাস করে দিলেন।

অবশ্য জাতীয় সরকার ছাড়লো না। মামলাটা ওয়াশিংটনের গ্র্যাণ্ড জুরিতে তুলে দিয়েছিলো। তবে নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যে যদি কোনো নরহত্যা হয় রাজ্য সরকারই হবে তার চরম বিচারক, এই ব্যবস্থা বদলানো খুবই কঠিন। তবু জাতীয় সরকার হস্তক্ষেপ করলো সেখানে। জাতীয় সরকারের পুলিস মোতায়েন হলো মিসিসিপিতে। মিসিসিপির রাজধানীর নতুন বাড়িতে গোয়েন্দা বিভাগের আপিসে অবিশ্রান্ত কাজ হতে লাগলো, সারা রাত আপিসের মাথায় উঁচু শক্তির আলো জ্বলতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

শার্লি গাড়ির পাদানিতে পা রেখে কথা বলছিলো, উঠতে উঠতে বললো, 'এ ব্যাপারটা আমাদের সারা মার্কিন দেশের দেহে একটি পাকা ফোঁড়ার মতো, বুঝেছো? সরকার তো কম চেষ্টা করছে না, হচ্ছে কই? এই তো সেদিন নিউইয়র্ক টাইমস কী রকম তুড়ে নিন্দে করেছে, টেলিভিশনে ধিক্কার দিচ্ছে দুবেলা, বার্কলির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা এ নিয়ে কতো বড়ো একটা ধর্মঘট করে জিতে গেল, বলতে গেলে শতকরা আশিজন আমরা কেউ এটাকে সমর্থন করছি না, তাতে কী? মন্দের শক্তি সব সময়ে সর্বত্রই প্রবল। নেতৃস্থানীয়রা মনে করছেন কিউক্লুসক্ল্যান নামের কুখ্যাত সমিতিটিই হচ্ছে এর পিছনে আসল শক্তি। ঐ জন্যই তো বললাম আমরা হচ্ছি দুদিককারই টার্গেট। আন্দোলনকারী শ্বেতাঙ্গরা তো বটেই, যারা আন্দোলনে নেই, শুধু সমর্থন এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন এমন কি সাদা-কালোর তফাত চায় অথচ এই ভায়োলেন্সটাকে অপছন্দ করে সেই সব শ্বেতাঙ্গরাও এই শ্বেতাঙ্গদের লক্ষ্যের বস্তু।'

'বাঃ, খুব ভালো।'

শার্লি ঠোঁট কামড়ে বললো, 'অনেকে ঠাট্টা করে বলে ওয়েদার ভালো নয় বলে যে অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন মিসিসিপির মাটির তলায় নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির গবেষণাটি স্থগিত রেখেছিল, ঐ আবহাওয়ার কথাটা তাদের

অছিলা, আসলে কিউক্লুসক্ল্যান দলটিই চুরি করে নিয়ে গেছে সব। তার জোরে তারা ওয়াশিংটনকেও শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।'

একটু থেমে বললো, 'ডক্টর কিংয়ের সঙ্গে আমার দুবার দেখা হয়েছে। কী সাবধানে চলেন, কী ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক-বিবেচনা করে কাজ করেন, কতো ভেবে চিন্তে কথা বলেন, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। উনি তো জানেন, ওঁর ছোট্টো একটা ভুলেও কতোবড়ো সর্বনাশ সম্ভব। ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে না সবাই ? যাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তারাই কি ছেড়ে দেবে ? তোমাদের গান্ধীকে দেখলে না ? কী দোষ ছিলো তাঁর ? তিনি শুধু সকলের ভালো করতে চেয়েছিলেন, এই তো ?' একটু লজ্জিতভাবে বললো, 'যাকগে কতোক্ষণ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। তা রেখেছি, তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, যাকে বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম, একেবারে ঠিক তাই। আজ চলি, কেমন ?'

চুমু খেয়ে হাত নেড়ে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চক্ষের নিমেষে কোথায় চলে গেল। প্রকাণ্ড অজগরের মতো হয়ে গিয়ে জনহীন রাস্তাটা নিমেষে সুনসান। স্বদেশ-বিদেশ ভালো-মন্দ সাধু-অসাধু সব কিছুর একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আত্ম-সমালোচনায় আমেরিকানদের জুড়ি নেই। এখানে নিগ্রো বিদ্বেষ, ইয়োরোপে শ্রেণীবিদ্বেষ, তফাত নেই কিছু। তফাত শুধু এই যে এরা সেজন্য দুঃখিত লজ্জিত ভাবিত এবং সমালোচনায় ক্লান্তিহীন। কিন্তু ইয়োরোপ ভুলেও মুখ খুলবে না সে বিষয়ে।

এই ভয়ংকর বিদ্বেষ বা ঈর্ষার যূপকাষ্ঠে যে শুধু জাতিগতভাবেই একটা সমাজের গলা কাটা যায় তা নয়, ব্যক্তিগত ঈর্ষার আগুনও মানুষকে কম উন্মাদ বা মূঢ় করে তোলে না।

দ্বিতীয়বার প্রবাসকালে একদা এক সুন্দর সকালে আমাদের মস্ত অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের লবিতে গিয়ে চিঠির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। খুব ভিড় জমেছে। প্রত্যেকের হাতেই চাবির রিং ঝুলছে ভঙ্গিতে অসহিষ্ণু। পাশে করিডোরের লম্বা দেয়ালে যার যার নাম লেখা চিঠির খোপ। চামড়ার জ্যাকেট গায়ে বলিষ্ঠ পিয়নটি দাঁতে চুরুট কামড়ে চিঠি রাখতে রাখতে গুনগুন করে গানও ভাঁজছিলো, আবার ফ্ল্যাটের অপেক্ষমান অধিবাসিবৃন্দের দিকে তাকিয়ে তার স্বদেশসুলভ দু'চারটা রসিকতাও ছাড়ছিলো। এক সময়ে কাজ শেষ হলো। অলরাইট বলে উঠে পড়লো সে। ডবল কাচের পুরু পাল্লাটা ফাঁক

হলো একটুখানি, এক ঝলক হিম ঢুকে পড়লো ভিতরে। পিয়নটি হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে চোখ টিপে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

আর আমরা, যারা চিঠির জন্য রুদ্ধ শ্বাসে দাঁড়িয়েছিলাম, যার যার খোপে গিয়ে চাবি ঘোরালাম।

আমার অপেক্ষাটা একটু অধীর ছিলো। প্রবাসে চিঠির মতো সুখ যে অল্পই আছে তা বোধ হয় একাধিকবার উল্লেখ করেছি। সেই সুখ আর রোজ পাই কোথায়? কিন্তু সেদিন হতাশ হতে হলো না। একটি পুষ্ট খাম দেখলাম ঠেস দিয়ে আছে কাচের গায়ে।

লবিতে বসেই পত্রপাঠে নিযুক্ত হয়েছিলুম। হঠাৎ মাঝামাঝি জায়গায় এসে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে জোরে হেসে ফেললুম। পত্রলেখক একজন তরুণ কবি। অন্যান্য অনেক আজগুবি খবরের সঙ্গে একটি দুর্ধর্ষ আজগুবি খবর বিশেষ উত্তেজনার সঙ্গে পরিবেশন করেছে। তার চিঠির সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

'ওদেশে যেমন অশিক্ষিতরাও ততো মূর্খ হয় না, এদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষ তথা বাংলদেশে) তেমনি এম. এ. পাশ মূর্খের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কয়েকদিন আগে কলকাতার একটি দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয়তে বেরিয়েছে যে বুদ্ধদেব বসু নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য আমেরিকার সমস্ত লাইব্রেরী থেকে অন্য বাঙালী লেখকের বই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। দেশের অবস্থা কী দুঃসহ মিথ্যা হিংসা আর অজ্ঞতায় ভরা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। দুরাচারের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে। আপনি তো ওখানে বসে 'ওয়াশিংটনের চিঠি লেখেন, সেই পূজনীয় পণ্ডিত সম্পাদকীয় লেখকটিকে কি দয়া করে জানাবেন যে, আমেরিকাটা বাংলাদেশ নয়। সেখানে থরে থরে বাঙালী লেখকের বই সাজানো থাকে না। অর্বাচীনটিকে একটু ভৌগোলিক শিক্ষা দেওয়াটাও আশু কর্তব্য। তার জানা দরকার, একটা দেহের পক্ষে আমেরিকার সব লাইব্রেরীতে ঢুকতে হলে অশরীরী ভূত হতে হয়। সে দেশে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যের দূরত্ব তিন হাজার মাইলের উপরেও আছে। এবং মাত্র একটি শহরের লাইব্রেরীর সংখ্যাও গণনার অতীত। যদি কোনো মানুষ, কোনো লাইব্রেরীতে ঢুকে ইচ্ছে মতো কোনো বই টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় অথবা দেয়, গ্রন্থাগার রক্ষক যে অবিলম্বে তাকে পাগলাগারদে পাঠাবে অন্তত এ কথাটি অনুগ্রহ করে সেই উৎকৃষ্ট সংবাদদাতাটিকে আপনার জানানো নেহাৎ কর্তব্য বলে মনে করি আমি। একজন সাহিত্যিক তো

দূরের কথা, (তা-ও বিদেশী) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং লিণ্ডন. বি. জনসনেরও কখনো সাহস হবে না একটা লাইব্রেরিতে ঢুকে এই রকম এটিকেট এবং আইন বিরুদ্ধ একটি কর্মে লিপ্ত হতে। কেন না তিনিও জানেন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দেশে এই অপরাধে তিনিও গারদবাস বা ফাটকবাসের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। এবং এই বুদ্ধিটুকুও সংবাদদাতার মগজে ঢোকানো দরকার যে, অন্য বাঙালী লেখকের বই ছুঁড়ে ফেলা মাত্রই নোবেল পুরস্কার কমিটি মালা নিয়ে ছুটে আসবে না। আরো একটু গুণ যোগ্যতার চাহিদা থাকবে তাদের। তাছাড়া ঐ কমিটিতে আমাদের দেশের মতো তৈলমর্দনেরও কোনো জায়গা নেই।

'শুনুন, সব সময় ওরকম নাক উঁচু করে এদের মূর্খ বলে অবহেলা ভরে চুপ করে থাকবেন না। অনেক পিঁপড়ে একত্র হয়ে একটা সিংহকেও মেরে ফেলতে পারে। মশাটাকেও চড় মেরে সজুত করতে হয়। জঙ্গলে বাস করলে জন্তুর সঙ্গে লড়াই না করে উপায় কী ? আর মানুষের সমাজে যাদের দাঁত পড়ে যায় তারা সব চাইতে বেশী ভয়াবহ।

'ছাপার অক্ষরে মাননীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে এমন নিকৃষ্টতম মিথ্যা উক্তি আর যেই সহ্য করুক, একজন বাঙালী হিসাবে, সমধর্মী ঘনিষ্ঠ কবি হিসেবে আমার কাছে তা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে। আর সেই কারণে আমি আমার সমস্ত তরুণতর লেখক বন্ধুদের নিয়ে কোনো সন্ধ্যায় একত্র হয়েছিলাম। জনসংখ্যা আমাদের মন্দ হয়নি। গুণে দেখেছি সবাই মিলে আমরা পঁচানব্বুই জন। যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়েছি, এখন অনুরোধ, আর একজন লেখক হিসেবে আপনাকেও কি আমরা আমাদের মধ্যে পেতে পারি ? হলেনই বা স্ত্রী, যা সত্য তাতো বলতেই হবে।'

চিঠি পড়া সমাপ্ত করে ভাঁজ করছিলুম, পার্শ্ববর্তিনী জিজ্ঞেসা করলেন, 'দেশ থেকে কী এমন মজার খবর এলো যে হাসি চাপতে পারছো না।'

মজা ? মজা কোথায় ? মানুষের অসূয়া মানুষকে কত দূর নিয়ে যেতে পারে, তার একটা চরম নমুনা দেখে উচ্চৈঃস্বরে যে হাসি হেসেছিলাম, এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা অকথ্য কষ্টে মনটা ভরে উঠলো। এই আমার স্বজন। এই তাদের চরিত্রচিত্র ? তরুণ কবিটির যে উত্তেজনা এতোক্ষণ সস্নেহে কৌতুকে উপভোগ করছিলুম, সেই মুহূর্তে তার প্রতিক্রিয়া আর আমার প্রতিক্রিয়া অভিন্ন হলো।

লবির এককোণে বিরাট এক টেলিভিশন চলছিলো সজোরে, বাচ্চারা দেখছিলো, চোখ পড়লো সেদিকে। আরেঃ, এ যে মার্টিন লুথার কিং। নোবেল পুরস্কার কমিটির হাত থেকে শান্তি পুরস্কার নিচ্ছেন। পাথরের মতো শান্ত সমাহিত গম্ভীর ঠাণ্ডা চেহারা। এদেশের বাইশ মিলিয়ন হতভাগ্য নিগ্রোর নতুন জন্মদাতা পিতা।

কিন্তু এই পিতার জীবনেরই বা নিরাপত্তা কোথায়? এঁকেও কতো লোক ঈর্ষা করছে, বিদ্বেষ করছে, ক্ষতির চেষ্টায় উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে, শুধু শ্বেতাঙ্গরাই নয়, নিগ্রোরাও। মার্টিন লুথার কিংয়ের নিগ্রো শত্রুও কম ছিলো না। কেন এমন হয়?

শার্লি ড্রাই রাত্তিরে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলো। রাত্রি মানে তো সাড়ে ছ'টা। ঐ সময়ে কোনো বাঙালী খেতে পারে? বুদ্ধদেব গিয়েই জেহাদ ঘোষণা করলেন।

'তবে ক'টা?'

'অন্তত ন'টা বাজতে দাও।'

'ঠিক আছে!'

অতএব ছ'টার সময় বলা যায় আমাদের নিয়মমতো বৈকালিক চা সমাপ্ত হলো এবং ন'টা নয়, খেতে বসা হলো দশটার সময়। শার্লির বড়ো ছেলে শার্লির সঙ্গেই থাকে, কিন্তু মেজ ছেলে থাকে নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে কোনো ইস্কুলের হস্টেলে, সে সেখানকারই ছাত্র। সপ্তাহান্ত কাটাতে এসেছে মার কাছে, আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উপলক্ষেই এই ভোজ। শুধু ভোজনই নয়, শয়নের ব্যবস্থাও পাকা। রাতটা আমরা সেখানেই কাটাবো।

ছেলে দুটির সঙ্গে শার্লির বন্ধুতা এবং বাৎসল্য ওদেশের পক্ষে একটু বিশেষ। তাদের পিতার সঙ্গে তাদের মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে, পিতা পুনরায় বিবাহিত। মাতাও কিছুদিন আগে এক জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলো, কিন্তু ভদ্রলোকটির স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স তো দেয়ইনি, বরং কানে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে নিজের অধিকারে। বলেছে, 'ফের যদি আমাকে ছেড়ে অন্য নারীর প্রতি এরকম গোপনে মনোযোগ দাও তা হলে আর আস্তো রাখবো না। দেখে নেবো কী করে তোমার চাকরি থাকে।'

এই বলেই খান্ত হয়নি, চেষ্টা চরিত্র করে সরকারী দপ্তরে কথাটা উঠিয়ে শিকাগো থেকে একেবারে নিজের দেশে বদলি করিয়ে নিয়েছে।

এসব কথা পরে শার্লি'র কাছেই শোনা। নিউইয়র্কে এসে দু'দিন ছিলো আমার সঙ্গে, সেই সময়ে মন খুলেছে রাত্রিবেলা।

বুদ্ধদেব কোথায় বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন, শার্লি হঠাৎ গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছে শিকাগো থেকে নিউইয়র্ক। এসেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। দূর তো কম নয়। সেই মুহূর্তেই আমরা রওনা হচ্ছিলাম, ভাগ্যিস বেরিয়ে যাইনি। শার্লিকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলাম। বুদ্ধদেবকে যেতেই হবে, তিনি গেলেন, আমি থাকলাম। অবশ্য এই কড়ারে যে ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে থাকতে হবে।

শার্লি বললো, 'কেন, ভয় পাও নাকি ?'

বললাম, 'পাবো না। যা তোমাদের দেশ।'

'কেন, কেন ?'

'মধ্যরাত্তিরে এসে মাতালরা দরজা ঠেলে।'

'সে কি।'

'সত্যি।'

'বলো তো ঘটনাটা।'

বললাম। একরাত্রির জন্য এরকম আরেকটা বক্তৃতায় যেতে হয়েছিলো বুদ্ধদেবকে। আমাদের এক বন্ধু, সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বোন, বলেছিলো, আমি এসে থাকবো বউদির সঙ্গে, তুমি একা যাও। বুদ্ধদেব চলে গেলেন। সে কিন্তু এলো না। আমার ভয় ভয় করছিলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বেশ রাত হলো। কী আর করি, খেয়ে নিলাম। তারপর আলো জ্বালিয়ে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম।

সাহসী বলে আমার সুনাম নেই। একটা ফ্ল্যাটে একা রাত কাটাবো সেকথা ভাবতেও ভয় পাই। তবে আমার ভয়টা ঠিক লৌকিক নয়, অলৌকিক। সোজা ভাষায় যাকে বলে ভূতের ভয়। সুতরাং, আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবো, তেমন বুকের পাটা নেই আমার।

মাথার কাছে ঘড়িটা টিকটিক করছিলো। ছোটো কাঁটা যখন দু'টোর ঘরে, এই সময় অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় ছোটো করে টোকা পড়লো দুটি। আমি চমকে উঠলাম, তারপর বন্ধুটি এসেছে মনে করে তখুনি লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে উদ্যত হলাম। হাতও দিয়েছিলাম, সহজ বুদ্ধি কাজ করলো। রাত দু'টোর সময় এই শীতের রাজত্বে একজন একা মহিলা এভাবে আসবে সেটা প্রায় অস্বাভাবিক। তাই খুলতে গিয়েও না খুলে বললাম, 'কে ?'

'আমি ডারলিং, আমি।'

কী মোটা আওয়াজ গলার। আমি কেঁপে গিয়ে বললাম, 'আপনি! আপনি কে।'

'প্রিয়তমা, কেন কষ্ট দাও, দরজা খোলো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো এমন হবে না।'

আমার হাত পা ঠাণ্ডা। দৌড়ে এসে বুদ্ধি করে নিচে ম্যানেজারকে ফোন করলাম, 'দ্যাখো, আজ আমি অ্যাপার্টমেণ্টে একা, কে একজন এসে দরজায় টোকা দিয়ে যা তা বলছে, আমি ভয় পাচ্ছি। তোমরা কেউ একটু আসবে?'

ম্যানেজার এই সংবাদে বিচলিত হবার বদলে মৃদু হাস্যে বললো, 'ভয় পেয়ো না সিস্টার, আমি দেখছি, সম্ভবত মাতাল, ফ্ল্যাট ভুল করেছে। যাই হোক দরজা খুলো না, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকো।'

আর আমি ঘুমুই? সারা বাড়ির সব আলো জ্বালিয়ে বসে রইলাম লিভিং-রুমে। ভোর হয়ে গেল।

এই গল্প শুনে শার্লি হাসতে হাসতে খুন। 'কিন্তু এতো তোমার অলৌকিক গল্প হলো না।'

'না হলো, তবু খুব বিশ্রী।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, একটাই তো রাত, আমি থাকবো। আমি দু'দিনের জন্য এসেছি, একরাত তোমার কাছে কাটাবো, আর এক রাত আমার এক অসুস্থ বন্ধুর কাছে।'

অসুস্থ বন্ধু বিষয়ে গল্পটাও খুব চমকপ্রদ। গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা লেগে হাইওয়েতে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়। সাংঘাতিক অ্যাকসিডেণ্ট। এক গাড়ির মালিক এই বন্ধু, অন্য গাড়িটিতে মাল ছিলো, সেই ড্রাইভারের বেশী কিছু হয়নি কিন্তু এই মহিলার হাড় পাঁজরা ভেঙে টুকরো টুকরো। মুখটা এমন থেতলেছে যে আর চেনা যায় না। ছ'মাসে হাড়-পাঁজরা প্রায় জুড়ে এসেছে, এখন মুখটা নিয়েই নানা কথা। মহিলা বলছেন, প্লাস্টিক সার্জারি যখন হচ্ছেই তখন তাঁর খুঁতগুলো একেবারে উচ্ছেদ করে দিতে। যেমন নাকটা ভালো না, চ্যাপ্টাই বলা যায়, সেটা একটু খাড়া করে দিক, নাকের পাশে বয়সের দাগ পড়েছে, চোয়ালের পাশে টেনে সেলাই করে সেই জায়গাটা টান করে দিক, মুখের চামড়াটা ততো কোমল নেই, টাকা দিয়ে অন্য কোনো সুন্দর চামড়া যদি পাওয়া যায় তা হলে যা লাগে যতো লাগে দেয়া যাবে, সেই চামড়াটাই লাগিয়ে দিক মুখে—

আমি শুনে থ।

যাই হোক, শার্লি থাকলো। আর বুদ্ধদেব চলে যেতেই আমাকে বগলদাবা করে সারা নিউইয়র্ক টহল দিতে বেরিয়ে পড়লো। গাড়িতে নয়, কখনো পদযাত্রা, কখনো বাস, কখনো মাটির তলার ট্রেন। ওদের দস্যির মতো গতরের সঙ্গে কি আমি পারি? একটা হার্লেম দেখতে চেয়েছিলাম, সেখানে নিয়ে গিয়ে এমন হাঁটালো যে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার দশা। আমি তখন বেঁকে বসে ট্যাকসি ডেকে উঠে বসলাম। বেলা তখন শেষ। সেই রাত্রিতেই সে সবিস্তারে এই প্রেমের গল্পটি বলেছিলো। বললো, 'একা একা বড় বিশ্রি লাগে, যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই, আশা নেই, আশঙ্কা নেই। একজন প্রেমাস্পদ ছাড়া কি বাঁচা যায়?'

'তাই তো। তবে তোমার ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়েছে, কাছে আছে—'

'কাছে? কাছে মানে কি? বড়ো ছেলে আমার অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে ঠিকই তবে সেটা আমার সঙ্গে থাকার জন্যে নয়, অত বড়ো বাড়ির একটা অংশ তার দখলে, সেখানে সে স্বাধীন। এখনো বিয়ে করেনি কিন্তু প্রেমিকা আছে, সে আসে, থাকে, আলাদাই জীবন। কখনো-সখনো লিভিংরুমে দেখা হয়ে যায়, ভালো লাগে এই পর্যন্ত। মেজ ছেলের বয়েস ষোলো, সে এখনো আমার অধীন, কিন্তু ষোলো বছরের একটা ছেলেকে তো আর কাছে থাকতে দেয়া যায় না? তাই তাকে বাধ্য হয়েই হস্টেলে দিতে হয়েছে। ছেলেও অদ্ভুত। ভাবতে পারো, হস্টেলে গিয়ে আমাকে কী চিঠি লিখেছে?'

'কী?

'বাড়ি আসবে, আমার সঙ্গে থাকবে, শিকাগোতে পড়বে। ওখানে মন টেঁকে না, কান্না পায়।'

'আহা তাতো পাবেই।'

'বলছো কি রানু? অতো বড়ো ছেলের কান্না পাবে? তা হলে মানুষ হবে কবে? এ রকম বাড়িমুখো হলে জীবনে উন্নতি হয় কারো? জানো, ছেলেটা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। ওকে ছেড়ে থাকতে আমারও খুব কষ্ট হয়। কিন্তু ছাড়তে তো হবেই।'

আমি বললাম, 'হুঁ।'

'এই সব সমস্যা আর ভালো লাগে না।'

ষোলো বছরের ছেলে বাড়ি থাকতে চায়, এটা যে একটা সমস্যা সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

তারপরেই শার্লি বললো, 'শুধু কি একটাই সমস্যা ? মেয়েটাকে তো দেখেছ, কী গম্ভীর। কী অমিশুক। চোদ্দো বছর বয়েস হয়েছে এখনো পর্যন্ত একটা ছেলের সঙ্গে ভাব করলো না।'

আমি বললাম, 'ও।'

'একটা পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই ওকে প্রথম কোনো পার্টিতে নিয়ে যাওয়া। একজন যুবক পছন্দ করে ওকে। চুমু খেয়েছিলো বলে চড় লাগিয়ে দিয়েছে। কী অসভ্য মেয়ে, ভাবতে পারো ?'

'ও।'

'একজন সঙ্গী না থাকলে এসব সমস্যা কাকে বলি বলো তো ? কে বুদ্ধি দেয় ? তা ছাড়া ঐ যে সকালে উঠে কোনো ব্যস্ততা নেই, হাঙ্গামা নেই, সুন্দরভাবে ব্রেকফাস্ট টেবিল সাজানো নেই, নতুন নতুন খাবার তৈরি করে সারপ্রাইজ দেয়া নেই, ধ্যেত এ একটা জীবন।'

তা অবশ্য সত্য।

সরল চোখে তাকিয়ে জোরে জোরে হাসলো শার্লি, 'অথচ দ্যাখো, এই সব নিয়েই কতো ঝগড়া হতো স্বামীর সঙ্গে। তখন ভেবেছিলাম, বাঁচা গেল। এখন দেখছি সেই সবই বেঁচে থাকার অংশ।'

আমি মাথা নাড়লাম।

'না, স্বামীর জন্য আমার একটুও কষ্ট নেই। ওর সঙ্গে আমার যায় না। তবে কতোদিন একসঙ্গে তো ছিলাম, কেমন মায়া পড়ে গেছে। ওর অসুখ করলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে সেবা করি। বন্ধু হয়ে গিয়ে আমরা ভালোই আছি। ছেলেমেয়েরা তো দু জনেরই, মাসে দুবার ওদের নিয়ে দেখা করি, সারাদিন একসঙ্গে কাটাই, বাইরে খাই, খুব ভালো লাগে। কিন্তু সত্যি সত্যি আমার যার সঙ্গে প্রেম সে ঐ জার্মান ভদ্রলোক। সে চলে যাবার পড়ে আমি যেন মরে গিয়েছিলাম। এতোদিন হয়ে গেল, ওকে ভুলতেও পারছি না।' বলতে বলতে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো। তারপরেই হাসলো, 'যাক গে, এসো আমরা অন্য গল্প করি। প্রোগ্রাম করি কাল সারাদিন কী করবো।'

চরিত্রগতভাবে শার্লি ভীষণ চটপটে, ছটফটে, ফুর্তিবাজ। হাসি ঠাট্টা গান গল্প নাচ এই ওর বহিরঙ্গ। যে রাত্রে ওর বাড়িতে আমরা খেতে গিয়েছিলাম, বলা যায় প্রায় সারা রাতই এক ধরনের হুল্লোড় হলো।

রাত এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে ওর ছেলেমেয়েরা শুতে গেলে বললো, 'চলো, নাইট ক্লাবে যাই।'

আমি খুব উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'চলো চলো, আমি কোনোদিন কোনো নাইট ক্লাবে যাইনি।'

'ওমা, তাই নাকি ? তবে তো নিশ্চয়ই যাওয়া দরকার।' তার বুক সমান উঁচু কুকুরটাকে বললো, 'এই, আমি বেরুচ্ছি, বাড়ি পাহারা দিস, বুঝলি ?'

নরম কার্পেটে পায়ের কাছে শুয়ে সে নিদ্রাভিভূত ছিলো, মাথা তুলে কথাটা শুনে নিয়ে আবার ঘুমোলো। রেকর্ডপ্লেয়ারে জোন বেইজের গান বাজছিলো, আমি জোন বেইজের গান পাগলের মতো ভালোবাসি। শুনতে শুনতে মন উধাও হয়ে যায়, কান্না পায়। চট করে বন্ধ করে দিল শার্লি, 'আর জোন বেইজ শুনতে হবে না, এবার দ্যাখো কী রকম জ্যাজ শোনাই। বেঁচে থাকা কাকে বলে বুঝবে শুনতে শুনতে। আরেঃ, বুদ্ধদেব, কী কেবল সিগেরেট খাচ্ছে ? জানো না সিগেরেট খেলে ক্যানসার হয় ? ওঠো ওঠো—' টেনে দাঁড় করিয়ে দিল।

শার্লির উৎসাহের মেশিনটা সর্বদাই সজোরে চলন্ত। দরজা লক করে দিয়ে উঁচু হিল ঠুক ঠুক করে আমাদের নিয়ে সে পথে নামলো। গাড়ি পথেই রাখা ছিলো, নিজের নির্জন পাড়া ছাড়িয়ে মিশিগানের তীর বেয়ে মুহূর্তে ডাউন টাউনে চলে এলো। কোন অলিগলি বেয়ে শেষে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়া ছায়া জায়গায় এনে গাড়ি থামিয়ে বললে, 'এসো।'

কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হলো। আসলে এটি একটি রেস্তোরাঁ। শার্লির ভার্সন হলো, এই ধরনের রেস্তোরাঁগুলো হচ্ছে নাইট ক্লাবে যাবার ভূমিকা। রেস্তোরাঁটিতে ঢুকতে বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের অর্থব্যয় হল। পুরুষ হিসেবে মহিলা দুজনের মর্যাদা রক্ষার্থে সেই অর্থব্যয় নিয়ে শার্লির সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রায় মারামারি হবার উপক্রম। শার্লিই জিতলো। তার তূণে বড়ো অস্ত্রই হচ্ছে, আমরা তার অতিথি।

উচ্চরোলে জ্যাজ বাজছে সেখানে, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন বাজনাদার বিভিন্ন বাজনা নিয়ে সারাটা মঞ্চে যেন দোল খেয়ে বেড়াচ্ছে। যারা দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে তারা তো বটেই, যারা বসে বাজাচ্ছে তারাও তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ সাপের ফণার মতো নাচাচ্ছে। সবচেয়ে মজা শুধু তারাই নয়, ঘোর ঘোর আলোতে মনে হচ্ছে সমস্ত ঘরটাই যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পের আলোড়নে উত্তরোল। চারদিকে অগুছালোভাবে কিছু টেবিল চেয়ার আছে বটে তবে বেশির ভাগ লোকই দাঁড়িয়ে। সকলের হাতেই পানীয়,

সকলেই তালে তালে কোমর দুলোচ্ছে। আমরা টেবিল চেয়ারেই বসলাম, চাহিদা মতো পটভর্তি কফি নিয়ে যে নিগ্রো পরিবেশনকারিণীটি এগিয়ে এলো সে-ও তালে তালে পা ফেলে পিছন নাচাতে নাচাতে এলো।

এই তা হলে জ্যাজ! এমন প্রলয়ংকরী। শব্দ আকাশের গুণ, আকাশ থেকে এরা সব শব্দ নিঃশেষে তুলে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিচ্ছে ঐটুকু একটা ঘরে। সুরের ঝড় বৃক্ষের মতো উথাল-পাথাল করে তুলছে মানুষের দেহ। সমুদ্রের ঢেউ পাখির, গান, বাতাসের আর্তনাদ, বৃষ্টির ঝমঝম, মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি সব মিলেমিশে একাকার। আশ্চর্য! আশ্চর্য! নিজের অস্তিত্ব ভুলে কখন আমরাও সেই সুরের যাদুতে সুরের অংশ হয়ে দুলতে লাগলাম।

নব্বুই মিনিট বাদে বাড়ি ঘর ভেঙে একটা সমবেত আওয়াজ একসঙ্গে উত্থিত হয়ে ঝপ করে থেমে গেল বাজনা। মুহূর্তে জগৎ সংসার বিলীন হয়ে গেল নৈঃশব্দ্যের পাথারে।

সামান্য ধাতস্থ হবার পরে আমরা উঠলাম। বাদকরা সবাই নিগ্রো, তারাও উঠে দাঁড়ালো, যেন জমাট মেঘ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। মোহের মতো আমি মঞ্চের সামনে গিয়ে তাদের অভিবাদন জানিয়েছিলাম, আমার বিদেশী মুগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি-ভালোবাসা নিয়ে। আমার সারা শরীরটা তাদের একটা পায়ের সমানও বড়ো নয়, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড মানুষেরা প্রায় প্রত্যেকে তাদের খুশির হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

রাস্তায় বেরিয়ে শার্লি বললো, 'এই হলো আসল জ্যাজ, এরা খুব বিখ্যাত দল। জ্যাজের জন্য এই জায়গাও খুব বিখ্যাত। নাইট ক্লাবে এই উত্তেজনা নিয়েই গিয়ে পেঁছিতে হয়।'

তাই পেঁছিুলাম। ঠিক সময়েই পেঁছিুলাম, একটা শো শেষ হয়ে আর একটা শো শুরু হচ্ছে। সেই ছায়া ছায়া রেস্তোরাঁ থেকে এইখানে এসে আলোর উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ফ্রিল তোলা আশ্চর্য জাঁকজমকপূর্ণ এক পোশাক পরে একটি মেয়ে তির তির করে নাচতে নাচতে ঢুকলো এসে স্টেজে, বসন্ত সমীরণ। সমবেত জনমণ্ডলী সহর্ষে হাত তালি দিয়ে উঠলো। মেয়েটি রূপের রানী।

শার্লি আরও এসেছে, জানে, আমার হাতে চাপ দিয়ে গুছিয়ে বসলো।

মৃদু লয়ে বাজনা শুরু হলো। আস্তে আস্তে নাচের লয় দ্রুত হলো, বাজনাও ঝমঝমিয়ে উঠলো। নাচের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পোশাকের ঘনতা কমিয়ে

ফেলছিলো মেয়েটি। এমন ভঙ্গী করছিলো যেন অন্য কোনো লোক খুলে ফেলছে সেই পোশাক, সে বাধা দিচ্ছে, লজ্জা পাচ্ছে, তবু শুনছে না। এই করতে করতে একটা সময়ে দেখা গেল তার পরনে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু নেই। খানিকক্ষণ একটি কল্পিত প্রেমিকের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে উর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাসটি যখন খুলে ফেললো আমি চোখ বুজে ফেললাম।

নিচের হ্রস্ব জাঙিয়াটিও যখন খুলি খুলি করছিলো আমি তখন শার্লির হাত চেপে ধরে ফিসফিস করলাম, 'এবার চলো!' শার্লি অডিটরিয়ামের ঝাপসা আলোয় আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'ভয় পেয়ো না, খুলবে না, পুলিশে ধরবে।'

আমাদের দেশে যেমন সিনেমায় চুমু খাওয়া বারণ বলে বিনিময়ে ঠোঁটে ঠোঁটে একচুল তফাত থাকতে থাকতেই দৃশ্যান্তর ঘটে, এখানেও তাই হতে লাগলো। কোমর থেকে জাঙিয়াটা নামিয়ে এনেই উঠিয়ে ফেলতে লাগলো। লোকেরা উত্তেজনায় গলা দিয়ে যে কতো ধরনের স্বর বার করতে লাগলো তার ঠিক নেই। কেউ কেউ সঙ্গিনীকে খামচে ধরতে লাগলো।

খেলা সাঙ্গ হলো। নাচতে নাচতে স্টেজ অতিক্রম করে চলে গেল মেয়েটি। আমরাও উঠলাম।

আমার একটু টয়লেটে যাবার দরকার ছিলো। শার্লি বেইজমেণ্টের সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। নেমে গিয়ে দেখলাম, ডাইনে বাঁয়ে দু দিকেই দরজা। দু দিকেই দুটি মোটা পর্দা ঝুলছে। আমি যে কোনো একটির পর্দা সরিয়েই ঢুকে পড়লাম। প্রথমে ড্রেসিংরুম, তারপরে বাথরুম। ড্রেসিংরুমে পা দিতেই একটি সরু অস্ফুট চিৎকারে চকিত হয়ে দেখি সেই নাচের মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গায়ে পাউডার দিচ্ছে। কারোকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি সামনে যে বসন পেয়েছে তাই আবরণ হিসেবে চেপে ধরে আতঙ্কিতভাবে চেঁচিয়ে উঠছে। বোধ হয় একজন স্ত্রীলোক দেখেই আশ্বস্ত হয়ে বললো, 'ও, তুমি! বাব্বা, আমি ভাবলাম কোনো দুষ্টু লোক এসে হাজির হলো নাকি!'

এতোক্ষণ দুষ্ট শিষ্ট শত শত লোকের সামনে যে অভিনয় সে করলো তার পরে তার এই ভয়, এই লজ্জা অমূলক ছাড়া আর কী ভাবা যায়?

মেয়েটি আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখতে দেখতে আবার বললো, 'সুন্দর পোশাক। কোন দেশ?'

'ভারতবর্ষ।'

'তুমি একটু ভুল করেছ, এই ডাইনের টয়লেটটা ব্যক্তিগতভাবে আমার। বাঁয়ে যাও, ওখানে সকলের।'

আমি অবাক হয়ে ওকে দেখছিলাম। হেসে ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে বললো, 'তুমি কি আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছ ?'

নেতি বাচক উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, এই, মানে—'

'আমাদের এই কাজ অবশ্য কারো শ্রদ্ধা উদ্রেক করে না, তবু যে তুমি একজন বিদেশী মেয়ে এলে, আমার খুব ভালো লাগছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে কথা বলবো এমন সময় আর আমার নেই। এরা পয়সা দেয় বটে কিন্তু খাটিয়ে নেয় ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা। স্বামী এসে অপেক্ষা করছে বাইরে, এক্ষুনি যেতে হবে। একটা দু' বছরের বাচ্চা আছে ঘরে কী মিষ্টি, কী সুন্দর। গেলেই ঝাঁপিয়ে কোলে আসবে। এখন একদম বাড়ি বাঁড়ি মন।'

তা হলে এই মেয়েরও ঘর আছে, সংসার আছে, স্বামী আছে, বাচ্চা আছে! কী আশ্চর্য! আবার লজ্জাও আছে। কাজটা তবে শুধুই কাজ? শুধুই উপার্জনের হাতিয়ার।

অভিভূত হয়ে হাত ধরে বললাম, 'আমি তোমাকে আটকে রাখবো না। তুমি খুব সুন্দর।'

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

মেয়েটি অমনি আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি রোমাঞ্চিত। ওদের এই আবেগ ভারি ভালো লাগে আমার।

উপরে আসতে দেখি শার্লি এবং বুদ্ধদেব দুজনেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমার দেরি দেখে। আমি আমার এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের কথা ওদের বললাম। শার্লি বললো, 'ও মা, তাই নাকি ? ঈশ্‌শ্‌, আমি তোমার সঙ্গে গেলে পারতাম। এ তো একটা অভিজ্ঞতা। আমি মধ্যে মধ্যেই এদের কথা ভাবি। আমার জানতে ইচ্ছে করে এরা কারা, কোথায় থাকে, এর চেয়ে কি আর কোনো ভালো জীবিকা এদের হয় না? না কি এরা একটা বিশেষ শ্রেণী!'

বাইরে এলাম। ঘড়িতে রাত একটা। এই রকম সময়ে শিকাগো শহরের অনেক অঞ্চলই নিরাপদ নয়। শার্লি সন্তর্পণে সেই সব পাড়া এড়িয়ে আসতে আসতে একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে বললো, 'ঐ দ্যাখো, ঐ বাড়িটায় সার্জেণ্ট শ্রীভার ছিলেন।'

'সার্জেণ্ট শ্রীভার ?'

'কেনেডির ভগ্নিপতি। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের ধারণা কি জান তো ? নির্বাচনে কেনেডির এই জয়ে এঁর অবদান মোটেও উপেক্ষার যোগ্য নয়। শান্ত শিষ্ট এই কেনেডি-ইন-ল'টি ভারি ভালো একটি বুদ্ধি দিয়েছিলেন তাঁর শ্যালককে। মার্টিন লুথার কিং তখন জর্জিয়ার কারাগারে বন্দী ছিলেন, ইনি কেনেডির কাছে গিয়ে বললেন, 'ওহে শোনো, তুমি এক কাজ করো তো— মিসেস মার্টিন লুথার কিংকে টেলিফোনে তাঁর স্বামীর জন্য তোমার একটা গভীর সহানুভূতি জানিয়ে দাও।'

'কেনেডি তৎক্ষণাৎ এই বুদ্ধিটা নিলেন। আর সেনেটর কেনেডির কাছ থেকে এই অপ্রত্যাশিত টেলিফোনটি পেয়ে মিসেস কিং এতো আনন্দিত হলেন যে, খবরটা তক্ষুনি ছড়িয়ে দিতে দেরি করলেন না। এ বুদ্ধিটা যে সত্যিই কেনেডির কতো কাজে লেগেছিলো সেটা বোঝা গেল নির্বাচনে জিতে যাবার পরে। এখন তো শ্রীভারের নাম সকলের মুখে মুখে। লোকটি বাস্তবিকই খুব যোগ্য। পীস-কোর নিয়ে ইনি যা করছেন, তার কোনো তুলনা নেই। জানো নিশ্চয়ই আমাদের সর্বজনপ্রিয় রাষ্ট্রপতিটির অনেক প্রশংসনীয় কাজের মধ্যে এই 'পীসকোর' স্থাপনাও একটি মহৎ কর্ম। পৃথিবীজুড়ে দুঃখ-দারিদ্র্যের তো কোনো অভাব নেই। ভেবে দ্যাখো, কতো দেশ এখনো কতো অনুন্নতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাই ওঁর মনে হয়েছে এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হয়তো কিছুটা আলো অন্তত সেখানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। দুঃখমোচনে হয়তো কিছুটা সহায়ক হতে পারে। উনি ঘোষণা করেছেন, এই শান্তি ফৌজে যখনই যাঁরা যোগ দেবেন তখনই তাঁরা যেখানে প্রয়োজন বিনা দ্বিধায় চলে যাবেন সেখানে। গিয়ে নানা ধরনের কাজ শেখাবেন সেখানকার অধিবাসীদের। কিছুটা লেখাপড়া, কিছুটা নার্সিং, হাতের কাজ, পরিচ্ছন্নতার ধারণা, সেনিটরি, এই সব আর কি—তবে তার মধ্যে একটা চুক্তি থাকবে। সে চুক্তিটা হলো এই, তাঁরা যখন যে দেশে এই কাজের জন্য যাবেন, সেখানে গিয়ে যাঁদের কাজ শেখাবেন ঠিক তাঁদেরি মতো জীবনযাপন করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে বাস করে, তাঁদেরি একজন নিকটতম মানুষ হয়ে তবে কাজে নামবেন। আমেরিকান বলে মনের নিভৃত কোণেও যদি কারো কোনো গৌরববোধ বা জাত্যাভিমান থাকে তা হলে সে অবশ্যই এই কাজের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। মোদ্দা কথা, কেউ লক্ষপতিই হোন বা কপর্দকশূন্যই হোন, ছেলেমেয়েনির্বিশেষে নিজেদের অন্তরেই একটা বিবেকবোধের দাস হয়ে করতে

হবে কাজ। এ জন্য তাঁরা কোনো মাইনেও পাবেন না। একটা খরচ অবশ্য দেওয়া হবে ভরনপোষণের জন্য, তা নিতান্তই অতি সরল জীবনযাত্রার উপযোগী।'

'খুব ভালো তো।'

'তবে জানো তো এই ধরনের কোনো আদর্শকে কল্পনায় রূপ দেওয়া এক কথা, কাজে খাটানো অন্য। সুতরাং, প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা গেলেও চালনা অতি কঠিন। এই ত্যাগের জীবনে বিশেষ কেউ এগিয়ে এসে নাম লেখাতে আগ্রহী নয়। কেনেডির আপ্রাণ চেষ্টা, অশেষ আশা সবই প্রায় বিফলতায় পর্যবসিত হতে চলেছিলো। স্বাভাবিক নিয়মেই লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করেছিলো, এ একটা আজগুবি খেয়াল। এমন একটা অবাস্তব আদর্শবাদের কল্পনার কোনো মানে হয় না। গুচ্ছ গুচ্ছ অর্থব্যয় না করে এই প্রতিষ্ঠান এক্ষুনিই তুলে দেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত তো এই শান্তি ফৌজ কংগ্রেসের কাছে একটা বিষম বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা স্থির করেছিল, একে আর আলাদা না রেখে 'বৈদেশিক সাহায্য নীতির' অন্তর্গত করে ফেলা হোক। হোয়াইট হাউস স্টাফ, বাজেট ব্যুরো, স্টেট ডিপার্টমেণ্ট, সব একমত এ বিষয়ে। বলা যায়, আমাদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট জনসন যদি একরোখা হয়ে না রুখতেন, তবে তাই হত। অবশেষে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে রফা হলো একটা। সার্জেণ্ট শ্রীভারই সব দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের ঘাড়ে। শান্তি ফৌজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁর সমস্ত দিনমানের সব পরিশ্রম উৎসর্গ করলেন। প্রথমটায় অবশ্য ভেবেছিলেন, 'হোয়াইট হাউসের' সাহায্য ব্যতীত বস্তুতই বুঝি এর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সেই ভয়েই কংগ্রেসের কাছে একে কম ঘোরাঘুরি, ধরাধরি, হাতপাতাপাতি করে অযথা ঘর্মক্ষরণ করতে হয়নি। তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ কেনেডির বোন বুদ্ধি দিলেন, এ সব আশা তুমি ছেড়ে দাও। যদি পারো তা হলে নিজের চেষ্টাতেই গড়ে তোলো।'

'তাই করছেন। মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতন। দিনের পর দিন অধৈর্যহীন চেষ্টা, ক্লান্তিহীন পরিশ্রম, বিরামহীন একনিষ্ঠতা আর একাগ্রতার দ্বারা ভদ্রলোক সত্যি এখন সফলতার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। এঁর যোগ্য পরিচালনায় এই 'শান্তি ফৌজ' দেশের কাছে দশের কাছে আমাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছে। এখন 'শান্তি ফৌজ' সকলের কাছেই শান্তির দূত। সার্জেণ্ট শ্রীভার এখন আর কেনেডি-ইন-লই শুধু নন, তিনি একটা নাম, স্বনামেই এখন বিখ্যাত।'

বাড়ির কাছে এসে গাড়ি থামালো শার্লি। কিন্তু কথা থামালো না। চাবি দিয়ে রাস্তাতেই গাড়িটি রেখে ভিতরে ঢুকে লিফট্ টিপতে টিপতে বললো, 'এখন আমরা মনে মনে বলি আমাদের এই নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিটি দীর্ঘজীবী হোন আর এঁরা তাঁর সহযোগী থাকুন, আশা করি, জগৎসভায় আর আমরা কোনো দোষে দোষী থাকবো না।'

শার্লির প্রার্থনা কিন্তু সফল হয়নি। উনিশ শো ষাট সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন কেনেডি, উনিশ শো একষট্টি সালের জানুয়ারীর শেষে সবাই তাঁর অভিষেক দেখেছিলো, উনিশ শো তেষট্টি সালের শেষেই মাত্র দু বছরের ব্যবধানে তাঁকে বিদায় নিতে হলো।

একষট্টি সালে বুদ্ধদেব নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমেস্টারের জন্য পড়াতে গিয়েছিলেন, অতএব সেখান থেকে অচিরেই ফিরে আসতে হয়েছিলো আমাদের। কিন্তু তেষট্টি সালের জন্য ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবার একটি আমন্ত্রণ এলো। ঐ এক সেমেস্টারের জন্যই পড়িয়ে আসতে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।

আমি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। আমাদের ছোটো কন্যা তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী। বাষট্টি সালে একটি বৃত্তি পেয়ে এই যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকেই এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে চলে গেছে। সেই একই বিশ্ববিদ্যালয় তার পিতাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, এই যোগাযোগ যে আমাদের পক্ষে সুখদা হবে সে তো অবধারিত। কিন্তু বুদ্ধদেব ইতস্তত করছিলেন। নিজের বিভাগ ছেড়ে কোথাও যেতেই তাঁর মন চায় না। জবাব দিতে তাই দেরি করছিলেন, তারই মধ্যে আর একটি চিঠি এলো। চেয়ারম্যান সেভাটিকেলে ইয়োরোপ ভ্রমণে যাবেন, এটি তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধভরা চিঠি।

এমনিতেই একটা কনফারেন্সে ছ সপ্তাহের জন্য যাচ্ছিলেন সেই সময়ে, সঙ্গে আর মাত্র চার পাঁচ মাস। সবাই বললো, 'কেন আপনি দ্বিধা করছেন। ছ মাস অনুপস্থিত থাকলেই বিভাগ আপনার উঠে যাবে নাকি? সহকর্মীদের উপর এতোটুকু বিশ্বাস নেই?'

এই সমবেত তাগাদায় ফল হলো। দেখা করলেন রেক্টারের সঙ্গে। তাঁর সম্মতিক্রমে হয়তো বা কিছুটা উৎসাহেও মনস্থির করে ফেলে চিঠি লিখে দিলেন। দেশেবিদেশে এই ধরনের অধ্যাপক আদান-প্রদানের ব্যাপারগুলো অনেক আগে

থেকেই স্থির হয়ে থাকে। এটাও তার ব্যতিক্রম হলো না। তারপরে প্রায় পুরো একটা বছর কেটে গেল চুপচাপ।

কিন্তু যাবার দু-চার মাস আগে যখন জানাজানি হয়ে গেল কথাটা, দেখা গেল কয়েকজন কর্মী এবং অধ্যাপক সজোরে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, "এই তো সেদিন ঘুরে এলেন আবার কেন? ওরকম বারে বারে যেতে দেওয়া হবে না। না। অসম্ভব।"

কেন যে এই গাত্রদাহ শুরু হলো তাদের কে জানে। এইসব ঘোঁট বোঝার মতো বুদ্ধি বা ধারণা কিছুই ছিলো না বুদ্ধদেবের। একান্তই বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ। বিশ্বাস এবং সারল্যের জন্য জীবন তাঁকে কম লাঞ্ছিত করেনি। অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন চরিত্র অনেক কষ্টের কারণ হয়েছে। এই অকারণ শত্রুতাও তাঁকে যথেষ্ট বিধ্বস্ত করলো।

প্রতিবাদের মধ্যে ঈর্ষা এবং রাজনীতি দুয়েরই সংমিশ্রণ ছিলো। একজন বন্ধুস্থানীয় অধ্যাপক আমাদের দুজনেরই পূর্বপরিচিত ব্যক্তি। কিছুকাল আগেই বছরখানেক কাটিয়ে এসেছেন সেই দেশে। আবারও যাবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। আমরা ফিরে আসার পরে অনেক সন্ধ্যায় এসে এ বিষয়ে কী ভাবে কী করা যায় আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেবের এমন কোনো 'ইনফ্লুয়েনসিয়েল' বন্ধুবান্ধব আছে কিনা সেখানে যাদের বললে কাজ হয়, বারে বারে জিজ্ঞেস করেছেন সে কথা। তিনি দেখলাম, খবরটা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'যাওয়া তা হলে স্থির?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তা একরকম স্থির তো বটেই।'

চা খেতে খেতে বিষম খেলেন। চোখ কুঁচকে বললেন, 'সে কী! কই এতো-দিন বলেননি তো।'

'এ আর বলবার কী আছে।'

'কীভাবে ঠিক করলেন যাওয়া? কার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন? কেমন করে ব্যবস্থা হলো?'

'ব্যবস্থা আর কী? বলা যায় একরকম বাধ্য হয়েছি। চেয়ারম্যান সেভাটিকেলে যাচ্ছেন!'

ঈষৎ ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললেন, 'খুব ভাগ্যবান বলতে হয়। কই আমাদের কাছে তো নিজে থেকে এরকম বছর বছর কোনো নিমন্ত্রণ আসে না। কবে যাচ্ছেন?'

• বুদ্ধদেব বিব্রত, 'আর বলেন কেন। পুরো তিন মাসও সময় আছে কিনা সন্দেহ। আমার তো কোনো কাজই শেষ হয়নি। মনে হচ্ছে না গেলেই ঠিক ছিলো। এমন উর্ধ্বশ্বাসে কিছুই আমি করে উঠতে পারি না।'

'এবারও মিসেস বোস যাচ্ছেন?'

'সেরকমই তো ঠিক আছে।'

'এবারও ওরা খরচ দিচ্ছে?'

'না দিলেও পাকেচক্রে হয়ে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে একটা বিশ্বসম্মেলন হচ্ছে, তারা একটা টিকিট পাঠিয়েছে যাবার জন্য। সেই টিকিটে আমারটা হয়ে গেলে আমার যাবার যে খরচটা ইণ্ডিয়ানা দেবে, সেটাতে ওঁর হয়ে যাবে।'

'বাঃ খুব ভালো আছেন। উঠি।'

এরপরে মস্ত এক মিটিং বসলো, ছুটি মঞ্জুর করা হবে কি হবে না সে বিষয়ে। বুদ্ধদেব তো হতচকিত। ছুটির প্রশ্ন তো অনেক আগেই চুকে গেছে। স্বয়ং রেক্টরের অনুমতিক্রমেই তো একবছর আগে ঠিক করা হয়েছে সব। যাবার মুখে এখন আবার এসব নিয়ে মিটিং ডাকার কী কারণ থাকতে পারে?

বিরোধীরা অবশ্য অনেক কারণই উপস্থিত করলো। কিন্তু ধোপে টিকলো না। না টিকলেও বন্ধ হয়ে গেলো না আলোচনা সভা। দল আরো পুষ্ট করে আবার মিটিং হলো। এই মিটিংয়েও পরাজয় ঘটলো তাদের। এর মধ্যে বহুদিন বাদে আবার সেই অধ্যাপক বন্ধুটি এলেন।

আমি খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করে বললুম, 'কেমন আছেন? অনেকদিন আসেননি?'

তিনি তাঁর পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'তা হলে যাওয়া স্থির?'

আমি বললাম, 'সেরকমই তো মনে হচ্ছে।'

'বুদ্ধদেবের ছুটি নিয়ে কিন্তু খুব গোলমাল হচ্ছে।'

'সেই তো। এখন এতোদিন বাদে এরকম করার কী অর্থ?'

বুদ্ধদেব বাড়ি ছিলেন না জেনেও বসলেন। বললেন, 'ছুটি না পেলে তো আর যাওয়া হবে না?'

আমি বললাম, 'ছুটি শেষ পর্যন্ত পাবেনই। মাঝখান থেকে মিছিমিছি অশান্তি। একরকম হয়রানি করা। খুব অন্যায়।'

'কী করে জানলেন, ছুটি শেষ পর্যন্ত পাবেই?'

'দুটো মিটিং তো হয়ে গেল।'

'কিন্তু আর একটা আছে।'

'আর একটাতে আর আটকাবে না। আপনি কী বলেন ?'

'ধরুন যদি আটকায় কী করবেন ?'

'আটকাবে কেন ? আমন্ত্রিত হয়ে একটা ডেপুটেশনে যাচ্ছেন, এই তো আপনি এক বছর থেকে এলেন। আবারও যাবার চেষ্টা করছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অম্লান দত্ত চলেছেন, অমিয়বাবু যাচ্ছেন—'

'সেসব উদাহরণ তো আছেই। সেই সঙ্গে আবার কতোগুলো বিশেষ অবস্থাও আছে। ছুটি না দিলে তো আর যাওয়া হবে না।'

'লিয়েনে যাবেন।'

'তা-ও না হতে পারে।'

'রেক্টর নিজে যেখানে সম্মতি দিয়েছেন—'

'ওসব ছেড়ে দিন। মুখের কথার আর কী দাম ? তখন একরকম সিচুয়েসন ছিলো, এখন অন্য রকম।'

একটু উষ্ণ হয়ে বললাম, 'অন্যরকম কিছু নয়। একান্তই উদ্দেশ্যমূলক শত্রুতা।'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'খুব রেগে যাচ্ছেন ?'

'তা যাচ্ছি। এসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে বেচারা জড়িয়ে পড়েছে ভাবতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। এই দুটো মিটিংই যথেষ্ট অপমানজনক। এর পরে তৃতীয় মিটিংয়েও যদি ছুটি না দেবার প্রশ্ন ওঠে আমি বলবো চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'বলবেন ? দেড় হাজার টাকা মাইনের একটা চাকরি ছেড়ে দিতে বলবেন আপনি ?'

'আপনি তো জানেন এখানে উনি আবেদন-নিবেদন করে কাজ নিয়ে আসেননি। ওঁর প্রস্তাবিত বিভাগে কর্তৃপক্ষই ওঁকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে এসেছেন।'

'এটা কি আমার প্রতি ইঙ্গিত নাকি ?'

'না, না ছি। আমি তা বলিনি। আমি বলতে চাইছি এখন ছুটি না মঞ্জুর করা মানে এঁকে অপ্রস্তুতে ফেলা। এই অসম্মানের মধ্যে উনি থাকবেন না। থাকা অন্তত উচিত নয়।'

প্রায় হঠাৎই উঠে পড়ে বললেন, 'আচ্ছা চলি।' সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, এই চক্রের ইনিও একজন অংশীদার নন তো ?

আমার অনুমান মিথ্যে ছিলো না। এই বন্ধুই শেষ পর্যন্ত শেষ মিটিংটায় বিপক্ষে দাঁড়িয়ে রেক্টরকে দিয়ে ছুটি না মঞ্জুর করিয়ে ছাড়লেন। তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ বুদ্ধদেবের প্রাণ। এই বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করতে, চালাতে, সম্মানের আসনে বসাতে পাঁচটা বছর ধরে নিজের কাজকর্ম ভুলে সমস্ত হৃদয় মনের একাগ্রতা দিয়ে কী না করেছেন তার ঠিক নেই। এবং তাঁর এই চেষ্টাকে সফল করতে যিনি সর্বদাই সহায় ছিলেন, তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রেক্টর ত্রিগুণা সেন। এই বিভাগ স্থাপনার মধ্যে তাঁর অবদান অনেকখানি। তিনি সাহস না করলে সারা ভারতবর্ষে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যা নেই তা সম্ভব হতো না। বুদ্ধদেব প্রস্তাবক মাত্র, কার্যকরী করার ভার এঁর হাতেই ন্যস্ত ছিলো।

তিনি কী করে এই অন্যায় দাবিকে প্রশ্রয় দিয়ে সেই দলের শরিক হলেন সেটা ভেবেই সবচেয়ে বেশী দুঃখ হলো। সেটাই বুদ্ধদেবকে আহত করলো বেশী।

যদিও সেই একষট্টি সালে দেড় হাজার টাকার মূল্য এখনকার চাইতে অনেকখানি বেশীই ছিলো তথাপিও সেই চাকরির মোহ তাঁর ছিলো না, তবে প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিলো। লেখার আয়ে সংসার চালানো সে সময়ে ছিলো অসম্ভব। তবু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করার চেষ্টায় আমাদের তরণী বারে-বারেই টালমাটাল হয়েছে। আর সেই তরণীতে আমরাই মাত্র দুজন যাত্রী ছিলাম না, শিশুরাও ছিলো, একজন বৃদ্ধাও ছিলেন। স্বাধীনতার মূল্য দিতে যে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে অবাঙালী নেতারা বাংলাবিভাগ করে বলি দিয়েছিলেন, এক বিন্দু হলেও তারও কিছু দায় ছিলো আমাদের ঘাড়ে। আর অন্তত সেই মুহূর্তে যে দায় সবচেয়ে বড়ো ছিলো সেটা তাঁর ছাত্রছাত্রী আর সহকর্মীর সঙ্গে বিচ্ছেদবেদনা। তাঁর বিভাগ!

কিন্তু মানের দায় যে সবচেয়ে বড়ো সে বিষয়েও সংশয় না থাকায় পদত্যাগ পত্র দিতে এক সেকেন্ডও ভাবতে হলো না।

এই প্রসঙ্গে আর একজন মানুষকে বড়ো বেশী করে মনে পড়ছে। এই সেদিন তিনি গত হলেন। প্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক। সেই সময়ে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছিলেন। ওরকম একজন সৎ মানুষ সচরাচর দেখা যায়

না। আমাদের বাড়িতে তখন ছাত্রছাত্রীদের খুব ভিড় ছিলো, প্রথম পর্যায়ে তারা তাদের মাস্টারমশায়ের দরবারেই আসতো, অল্পকালের মধ্যেই সবাই বাড়ির মানুষ। শীতকালের দুপুরে কোনো কোনো মেয়ের কোনো কোনো অকাল ছুটির অবকাশ আমার সঙ্গে আমার লেপের তলায় পা ঢুকিয়েই কেটে যেতো। আমি তাদের আমার মেয়েদের মতোই ভালোবাসতাম। অদ্যাবধি তাদের বিষয়ে আমার টান যথেষ্ট প্রবল। বিনিময়ে তারাও আমাকে দূরের মানুষ ভাবে না। ছেলেদের মধ্যে এখনও এমন কয়েকজন আমার জীবনে বর্তমান, যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একবারও ভাবি না আমি একটিই মাত্র পুত্রের জননী। দশ বারো হাজার মাইল দূরে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীরাও স্বদেশে ফিরলে এমন কখনো হয় না আমার কাছে তাদের সেই পুরনো আদর আবদার বন্ধুতার অধিকার নিয়ে এসে না দাঁড়ায়।

সেইসব ছাত্রছাত্রীদের মুখে সর্বদাই শুনেছি, 'আমাদের রেজিস্ট্রার। তিনি অজাতশত্রু। তাঁর মতো মানুষ হয় না। আমরা আমাদের কলেজে এক বাক্যেই সবাই যাকে ভালোবাসি, ভালো বলি তিনি ঐ রেজিস্ট্রার।' ভিতরে ভিতরে তাঁরও যে একটি মস্ত শত্রুব্যূহ তৈরী হচ্ছিলো তা তারা জানতো না।

বুদ্ধদেবের ছুটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের এই ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। প্রায় চ্যালেঞ্জ করে বললেন, 'আমি আপনাকে হাতে ধরে অনুরোধ করছি এই পদত্যাগপত্র আপনি প্রত্যাহার করুন। এখানে আমার যদি বিন্দুমাত্র ক্ষমতা থাকে আমি কিছুতেই এই অন্যায় হতে দেবো না। আসলে আপনার যে এতো সম্মান, আপনার বিভাগ যে এমন সুন্দরভাবে চলছে, বিভাগের প্রতি লোকের গুণগ্রাহিতা যে দিনে দিনে বাড়ছে এটাই কারো সহ্য হচ্ছে না। ওদের ধারণা এই সুযোগে আপনাকে যদি সরিয়ে দিতে পারে তাহলে এটা আর আলাদা না রেখে ইংরিজি বিভাগের একটা অংশ করে দেবে। আর সেই বাসনা পূর্ণ না করে আপনি যদি থেকে যান তাহলে একটা অপমানও করা হলো, আবার বিদেশ যাত্রার সম্মানটা যে পেলেন না তাতেও হিংসার আগুন কিছুটা নির্বাপিত হলো। আমি মিটিং ডাকবো, আমি এমন সব প্রমাণ উপস্থিত করবো যা খণ্ডন করা ওদের সাধ্যে কুলোবে না।'

সেই মিটিং তিনি ডাকতে পারেননি। তখনো পর্যন্ত কল্পনাও করেননি সেই সদ্যোজাত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাত্রে এরই মধ্যে কতো দুষ্ট ব্রণ তাদের সাপের মতো বিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোবলের অপেক্ষায়।

তিনি রাজা সুবোধ মল্লিকের পুত্র। তাঁর বাবার দানেই স্বদেশী আমলে এই বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন, মমত্ববশে অনেকদিন পর্যন্ত অনেক অন্যায় সহ্য করেও ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁকেও ছাড়তেই হয়েছিলো শেষে।

বলা যায় মানসিকভাবে কলকাতার পাট বেশ কিছুকালের জন্যই তুলে দিয়ে আমরা আবার বিদেশের পথে পাড়ি দিয়েছিলাম। প্লেন ছিলো মধ্যরাত্রে। সেই রাতটি ভোলার নয়। কতো দুঃখবেদনা অন্তরে নিয়ে যে বুদ্ধদেব রওনা হয়েছিলেন তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। নরেশ গুহ ততোদিনে তার ডিগ্রিটি পকেটে নিয়ে ফিরে এসেছে, তার হাতেই বিভাগের হালটি ধরিয়ে দিলেন। নরেশের প্রতি তাঁর ছিলো বিশ্বাস অখণ্ড। এই বিভাগের আর একটি শক্ত খুঁটি এঁদেরই প্রথম বছরের ছাত্র অমিয় দেব। সেও তখন পাশ করে সেখানে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছে। অমিয়কে শক্ত খুঁটি না বলে বলা উচিত শক্ততম খুঁটি। এতোদিনে তার বয়েস বেড়েছে কিন্তু তখন সে একান্তই সদ্য যুবক। কিন্তু ঐরকম একটি বিদগ্ধ বিচক্ষণ ছাত্র যে বুদ্ধদেবের পক্ষে কতো গৌরবের তার তুলনা নেই।

এয়ারপোর্টে অনেকেই এসেছে। তালিকা দীর্ঘ। প্রত্যেকেই সজল। ঠিক বিদায়ের মুখে অন্ধকার খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে নরেশ ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলো, অমিয় তার মাস্টারমশায়ের হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, 'আপনি ভাববেন না আমরা আছি।' বুদ্ধদেব কেঁদে ফেললেন।

'আপনি ভাববেন না।' এই শব্দ কটি যে কতো সত্য ছিলো তা সে তার জীবন দিয়েই আজ প্রমাণ করেছে। ইতিমধ্যে এই চাকরির দুঃখময় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুখকর ঘটনাও ঘটেছে। সেটি আমাদের প্রবাসী কন্যার বিবাহ।

ডিস্টেন্স কলে সে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলো, যাবার ঠিক দুমাস আগে বিবাহিত হয়। সুতরাং আমরা গিয়ে তাকে বিবাহিতই দেখলাম।

ছেলেটিও সেখানকার ছাত্র, বিজ্ঞানের। সে-ও পি. এইচ. ডি. করছে। অতি সুকুমার দর্শন অতি সুশিক্ষিত। প্রথমে গিয়ে তাদের বাড়িতেই উঠেছিলুম। সুন্দর বাগান ঘেরা ছোট্ট একটি একতলা অ্যাপার্টমেণ্ট, আপেল গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ। রাস্তা থেকে একটু উঁচুতে। ঘরের জানালা দিয়েই সেই আপেল গাছটি ছোঁয়া যায়, ফলের ভারে আনত। পরিচ্ছন্ন তলাটিতে যে কতো আপেল বিছিয়ে আছে ঠিক নেই। কেউ কিন্তু নিচ্ছে না, ছিঁড়ছে না, কুড়োচ্ছে না। নরম সবুজ

ঢাল ঢাল পাতার ফাঁকে রক্তাভ ফলগুলো শুধু শোভা বিতরণের জন্যই যেন রসে টুপটাপ হয়ে ঝুলে আছে।

এটিও একটি ক্যাম্পাস সর্বস্ব শহর। ইণ্ডিয়ানপোলিস থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করেই এই শহরের প্রাণ। যাঁরা পড়েন, যাঁরা পড়ান, যাঁরা কর্মচারী তাঁদের নিয়েই মোটামুটি শহরের সব কিছু গড়ে উঠেছে। মোটামুটি তাঁদের জন্যই দোকান, বাজার, সিনেমা, থিয়েটার, কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদি। আমেরিকার বয়সের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীন, একশো বছরের সংস্কৃতি এখানে দানা বেঁধেছে। খ্যাতি আছে দেশে দেশে। তা ছাড়া, বৈশিষ্ট্যও আছে কিছু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও যা সব ইয়ুনিভার্সিটিতে নেই, সেই তুলনামূলক বিভাগটি খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা আছে এখানে। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লিলি লাইব্রেরীতে অমূল্য এবং দুর্মূল্য গ্রন্থের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য, এত বড় সঙ্গীত বিভাগ নাকি ওরা বলে পৃথিবীতেই অন্যত্র কোথাও নেই। লোক সাহিত্যের বিভাগটিরও যথেষ্ট খ্যাতি। আর একটি বিশেষত্ব এই, এখানে যৌন-তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকের সংগ্রহ জগতের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথম সংগ্রাহক ইটালি।

এই লাইব্রেরীর অবস্থান মাটির তলায়। ছাত্রদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। মাস্টারদেরও বিশেষ অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। শুধু বই-ই নয়, স্থির ছবি, চলন্ত ছবিতেও অনেক দৃশ্য ধরে রাখা আছে। অনেক ছেলেমেয়ের স্বীকৃতির ডায়েরী আছে। লাইব্রেরীটির নাম কিঞ্জি লাইব্রেরী।

এই কিঞ্জি নামের ভদ্রলোকটি মানুষের যৌন জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সমস্ত সংগ্রহই তিনি মৃত্যুর আগে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দান করে গেছেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বুদ্ধদেবের পরিচয় নতুন নয়, দশ বছরের। ধারাবাহিকভাবে পড়াননি কিন্তু বারে বারেই এসেছেন বক্তৃতা দিতে। পুনর্মিলনে সকলেই আনন্দিত। বাড়ি আগে থেকেই এঁরা স্থির করে রেখেছিলেন। আনকোরা নতুন একটি বিশাল অট্টালিকা, সবসুদ্ধু একশো বাহান্নটি অ্যাপার্টমেণ্ট আছে এখানে। একান্তভাবেই শিক্ষকদের জন্য তৈরি। আলোতে ফুলেতে বাগানে মাঠে একশো বাহান্নটি পরিবারের প্রায় দুশো বাহান্নখানা পার্ক করা গাড়িতে এক জমজমাট ব্যাপার। কন্যার বাড়ি থেকে আমরা সেই নবনির্মিত গুরুগৃহের দক্ষিণতম কোণে পূর্বমুখী এক অ্যাপার্টমেণ্টের অন্তরে এসে অধিষ্ঠিত হলুম। ম্যানেজার এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন।

ফ্ল্যাটটি চমৎকার। পুবের সমস্তটা দেওয়ালজোড়া স্বচ্ছ কাচের জানালা, জানালার ওপিঠে বিশাল গোল নির্জন নীলাকাশ একান্ত উন্মুক্ত, সোজা তাকালে বিস্তৃত সবুজ মাঠ আর সবুজতর গাছের ঘনতরঙ্গ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, আকাশ নীচু হয়ে চুম্বন করছে পৃথিবীকে। নীচে মস্ত লনে অজস্র শিশুর মেলা। লাল নীল হলদে পোশাকে এক একটি ছোট বড় চলন্ত ফুল। রান্নাঘরের ব্যবস্থা দেখলাম আরো আধুনিক। কুকিংরেঞ্জের সঙ্গেই যান্ত্রিক অগ্নিকুণ্ড, বেসিনের গর্তের চাকতিটাকে একটা বিন্দুতে ঘুরিয়ে দিলেই সব আবর্জনা এক মুহূর্তে নিষ্কাশিত। ফ্রীজটি হাতল ঘুরিয়ে খুলতে হয় না, একটি বোতাম টিপতে হয়। সব মিলিয়ে অনেকটা সুস্থির বোধ হচ্ছিল। যে মেঘাবৃত মন নিয়ে কলকাতা ছেড়েছিলাম, তার অনেকটা পরিষ্কার হলো। কন্যা-জামাতার একটি গাড়ি ছিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শহর দেখালো ওরা। লম্বা লম্বা উঁচু নীচু ঢেউয়ের মতো রাস্তার দু পাশে গাছের সারির পাতারা, মাথায় মাথায় এক হয়ে বিতান হয়েছে, ফাঁকে ফাঁকে আকাশের আলপনা, দূরে উইলোর ঝোপ সমবেত কান্নায় ঝাপসা। হেমন্ত কাল, মাঠের গাঢ় সবুজ ঘাসের গালিচায় গেরুয়া রঙয়ের ছোপ। ওক মেপল আর আপেল গাছে লাল হলুদের বন্যা।

তখন উনিশ হাজার ছাত্রছাত্রী ছিল সেখানে। মাঠে-বাগানে-গাছের তলায় সব বড় বড় ডর্ম, বাড়িগুলো সুদৃশ্য, আয়াসের ব্যবস্থায় ত্রুটিহীন। একটা ছেলেদের ডর্ম, পাশে মেয়েদের। আবার ছেলেদের, আবার মেয়েদের। ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার সুবিধের জন্যই এই ব্যবস্থা।

আমার মেয়েও দু মাস আগে এই ডর্মেরই অধিবাসী ছিল। আমাকে এক সন্ধ্যায় নিজের ডর্মটি দেখাতে নিয়ে গিয়ে, একটি কালভার্ট দেখিয়ে বললো, 'নতুন এসে নিজেকে যখন নির্বাসিত ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না, দিনে রাত্রে যখন তোমাদের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি, কেবলি কান্না পায়, সেই সময়েই একদিন এই কালভার্টটায় বসে দেখি পাশে লেখা রয়েছে নবনীতা দেব। নবনীতারই হাতের লেখা। আমি একেবারে দু হাতে সেই লেখাটা চেপে ধরলাম। আমার যে কী ভালো লাগলো! ও-ও তা হলে একদিন এখানে বসে গেছে? এই রকম আমার মতোই নিশ্চয় মন খারাপ ছিল। যেন নবনীতাকেই পেলাম। কতক্ষণ বসে রইলাম একা একা!

নবনীতা দেব (এখন দেব সেন) বুদ্ধদেবের বিভাগেরই কৃতী ছাত্রছাত্রীদের একজন। সেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পি. এইচ. ডি. করেছিল।

ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গেলেও, অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই মাসে একদিন দুদিন করে বক্তৃতা দেবার জন্য কিছু আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ থাকত। ও দেশের এই আমন্ত্রণগুলো আর্থিক পারমার্থিক দুই অর্থেই খুব প্রীতিপ্রদ। অর্থাৎ সম্মান এবং অর্থ, দুইয়ের প্রাপ্তিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরো সুবিধে এই, বেশ ঘুরেফিরেও বেড়ানো হয়। অবসর বিনোদন বা ছুটি কাটাবার পক্ষে চমৎকার। দিন-তারিখ ঠিক করে বুদ্ধদেব সেভাবেই নিজের কলেজে এবং ক্লাশে রুটিন তৈরী করে নিয়েছিলেন।

গিয়ে একটু গুছিয়ে বসার কয়েকদিন বাদেই ঐ রকম একটি সফরে বেরুতে হলো তিনদিনের জন্য। আমি যাইনি। যেদিন সকালে গেলেন, সেদিন দুপুরেই ফোন করে বললেন, 'খবর শুনেছো ?'

'কী।'

'কেনেডিকে হত্যা করেছে।'

'সে কী।'

'আমি আজ রাত্রেই ফিরে আসবো। বেশী কিছু বলতে পারছি না, ছেড়ে দিচ্ছি।'

বোঝা গেল বেশ উত্তেজিত।

সেই সময়টায় জগতের রাজনৈতিক গগন কথঞ্চিৎ নির্মল ছিলো। যে ব্যক্তি যে-দেশের কর্ণধার, প্রত্যেকটি নেতাই তাঁদের স্ব স্ব আসনে স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় সৎভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অসূয়াবশত কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী হবার বাসনায় অথবা সিংহাসন রক্ষার তাগিদে উন্মত্ত ছিলেন না। তার মধ্যেও অধিক জনপ্রিয় ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফিট্জিরেল্ড কেনেডি এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

একা বাড়িতে এই খবর পেয়ে আমি খুব অস্থির বোধ করছিলাম। দৌড়ে এসে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। নিস্তব্ধ নির্জন মাঠ রোদ্দুরের তাপে কাঁপছে। নিচে নেমে লবিতে এলাম, একেবারে চুপচাপ, সুমসাম্। তা হলে কি এ খবর ঠিক নয় ? না কি এখনো শোনেনি কেউ ? শুনলে কলেজ-টলেজ সব বন্ধ হয়ে যেতো না ? আমাদের ছেলে মেয়ে জামাই সবাই তো ছাত্র, তারা ছুটে আসতো না বাড়িতে ? আমি আবার নিচে এলাম, ডবল কাঁচের পাল্লা ঠেলে চলে এলাম রাস্তায়, কোনো চিহ্ন নেই এতো বড়ো একটা খবরের। তাহলে এটা নিশ্চয়ই বাজে রটনা।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো, আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিলো। আমি মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম। ভারতবর্ষে থাকলে কী হতো জানি না, কিন্তু ওদেশে থাকার দরুন সব সময়েই চেহারা দেখছিলাম টেলিভিশনে, হাসিমুখে যখন বক্তৃতা দেন, দেখে এবং শুনে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, যা বলেন মনোমত হচ্ছিলো সব সময়েই, তা ছাড়া সকলের মুখে মুখেই তো এই নাম। এই নামের জয়গান।

আসলে খবরটা তৎক্ষণাৎই আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো। সবাই জেনে গিয়েছিলো তাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতি জন ফিটজিরেল্ড কেনেডি টেক্সাসে ডালাসের পথে নিহত হয়েছেন। টেক্সাস নিগ্রোবিদ্বেষীদের একটি কেন্দ্রস্থল বলা যায়, স্বাভাবিকভাবেই মনে হচ্ছিলো তাদেরই চক্রান্তের ফলে এই নিগ্রোপ্রেমিক সরকারের পতন। ঘরে ঘরে টেলিভিশন, তাই সবাই সেটাই খুলে বসেছে। রাস্তায় আর ভিড় করবে কেন? ছেলে মেয়ে জামাইও একটু বাদেই চলে এলো। প্রত্যেকেরই মন খারাপ। বুদ্ধদেবও রাত্তিরের আগেই ফিরে এলেন।

আমরাও টেলিভিশন খুলে বসলাম। যবনিকা উদ্ঘাটিত হলো প্লেনের সিঁড়িতে। দেখতে পেলাম সেখান থেকে হাসিভরা মুখ নিয়ে (এই হাসিই তাঁর আসল আকর্ষণ ছিলো) নেমে আসছেন কেনেডি, পাশে সুসজ্জিতা সুন্দরী স্ত্রী জ্যাকলীন।

টেক্সাসের গবর্নর সস্ত্রীক নিতে এসেছেন তাঁদের। সানন্দে পরস্পরকে অভিবাদন করলেন তাঁরা। তারপর বাইরে এসে গাড়িতে উঠলেন।

মস্ত গাড়ি, মাথার উপর রাজপুরুষদের নিরাপত্তার জন্য বুলেট-প্রুফ শক্ত কাঁচের ঢাকনা। সামনের সারিতে সস্ত্রীক গবর্নর বসলেন, পিছনে সস্ত্রীক কেনেডি।

পথের দু'পাশে অজস্র জনতার ভিড়। লাইন করে তারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় নেতাকে দেখবে বলে। মিস্টার কেনেডি তাদের জন্য গাড়ির মাথার উপরকার ঢাকনাটা খুলে দিতে বললেন। তারা আনন্দে উদ্ভাসিত হলো। রাষ্ট্রপতিকে যে তারা কতো ভালোবাসে সেকথা ছড়িয়ে দিল চোখে মুখে। গাড়ি ধীরে ধীরে শহরের দিকে এগুতে লাগলো। ভিড়ের চাপ দেখে গবর্নরের স্ত্রী মিঃ কেনেডির দিকে ফিরে সহাস্যে ঠাট্টা করে বললেন, 'এবার আর বলতে পারবেন না যে, টেক্সাসের লোকেরা আপনাকে ভালোবাসে না।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই রাস্তার বাঁ-পাশের মস্ত উঁচু এক বাড়ির ছ'তলার কোনো এক জানালা দিয়ে তীরবেগে ছুটে এলো বন্দুকের গুলি। পর

পর দুটি গুলি এসে কেনেডিকে বিঁধলো। তার মধ্যে একটা গুলি তাঁর কান ফুটো করে বেরিয়ে গেল। তৃতীয় গুলিটি লাগলো গবর্নরের গায়ে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড লাগলো ঘটনাটা ঘটতে। জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরে গেল, মিলিটারিরা বন্দুক উঁচিয়ে সঙ্গীন হলো, মিসেস কেনেডির আতঙ্কিত বিহ্বল মুখখানা ঝাপসা ধোঁয়ায় একবার দেখা গেল কি গেলো না। গাড়ি আর এক মুহূর্ত না থেমে সোজা চলে এলো পার্ক-ল্যাণ্ড হাসপাতালে। সেখানে এসে আধঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র প্রিয় নেতা, জন ফিটজিরেল্ড কেনেডি চির-দিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন।

গুলি ছোড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একজন পুলিস অফিসার কী সন্দেহে ধরে ফেলেছিলো একটি যুবককে। যুবকটি এক কোণে দাঁড়িয়ে কী যেন লক্ষ্য করছিলো। লম্বায় পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি, পরনে ধূসর রঙয়ের স্যুট, হালকা নীল টাই, মাথার চুল কপালে এসে পড়েছে, অত্যন্ত রোগা এবং ভঙ্গীটা অত্যন্ত হিংস্র। যে বাড়িটার কোণে সে দাঁড়িয়েছিলো এবং যে বাড়ির ছ'তলার জানালা থেকে গুলিটা ছোড়া হয়েছিলো, সেবাড়িটা টেক্সাসের স্কুল বইয়ের দোকান এবং গুদাম। ম্যানেজার এগিয়ে এসে জানালো, ছেলেটি তাদের কর্মচারী সন্দেহ করবার কিছু নেই।

জায়গাটা পুলিসে পুলিসে গমগম করছিলো। বাড়িটা তারা ঘিরে ফেলেছে ততোক্ষণে। তড়িৎ বেগে উঠে গেছে সেই ছ-তলার উপরে কাঁচভাঙা জানালার কাছে। মুখ থেকে মুখে চোখ বুলোচ্ছে সকলের।

এসে দেখলো, যে জানালা থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে তার চারপাশ ঘিরে গোল করে কতোগুলো বই, তাক, বাকস ইত্যাদি এমনভাবে রাখা আছে, যার ভিতরে অনায়াসে একটি লোক আত্মগোপন করে বসে থাকতে পারে। বন্দুকটা কতোগুলো বইয়ের আড়ালে শোয়ানো। সামান্য বারো ডলারের ইটালিয়ান বন্দুক। পুলিস কুড়িয়ে নিল সেটা।

এদিকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সেই লম্বায় পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি, পরনে ধূসর রঙের স্যুট শীর্ণ যুবকটি একটা বাসে উঠে বসলো। কে যেন বলে উঠলো, 'প্রেসিডেণ্টকে নাকি গুলি করা হয়েছে।'

আতঙ্কিত আওয়াজে জবাব এলো, 'গুলি! প্রেসিডেণ্টকে। আমাদের প্রেসিডেণ্ট—' তার গলা ডুবে গেল। সেই ছেলেটি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ গুলি! আপনাদের প্রেসিডেণ্টকেই।' তারপরেই

বাস থামিয়ে নেমে গেল চটপট। নেমেই ট্যাক্সি ধরলো একটা। খানিক পরে আবার রাস্তায় দেখা গেলো তাকে। পোশাক বদলেছে। গায়ে তখন গলাবন্ধ, কালো রঙের পুরো হাতের সোয়েটার। যখন রাস্তা দিয়ে আসছিলো, একজন পুলিস অফিসার এগিয়ে গেল তার দিকে। কী একটা বলতেই ছেলেটা গুলি ছুড়লো তাকে। গুলিটা খুব কাছে থেকে মেরেছিলো, অফিসারটি পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। মারাও গেল তক্ষুনি। সঙ্গে সঙ্গে সে পালালো সেখান থেকে। পালিয়ে একটা থিয়েটার হলে ঢুকে চুপচাপ বসে রইলো দর্শক হয়ে। কিন্তু এবার আর নিস্তার পেলো না। থিয়েটার হল ঘেরাও করে ফেললো পুলিস। তাকে বেরিয়ে আসতে বললো। কিন্তু তাদের কথা মান্য করতে প্রবল আপত্তি তুললো সে। ধস্তাধস্তি হলো খানিকক্ষণ এবং সে প্রথম সুযোগেই আবার গুলি ছুড়তে চেষ্টা করলো। কিন্তু এবার আর সফল হলো না। ধরা তাকে পড়তেই হলো।

মারামারি করতে গিয়ে একটা চোখ তার ফুলে উঠেছে। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। হিংস্র রুষ্ট ক্ষুধিত জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছিলো তাকে।

ছেলেটাকে প্রথমে পুলিস-স্টেশনে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও সারাদিনে তার কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করা গেলো না। অনবরত সে বলে গেল, পুলিস অফিসার বা প্রেসিডেণ্ট কাউকেই সে গুলি করেনি। তারি মধ্যে কয়েকবার ফোন করলো স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার জন্য। এরপরে পুলিস তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

একটি ম্যাপ রাখা ছিলো তার বুকর‍্যাকে। প্রেসিডেণ্টের গাড়ি কোন কোন রাস্তা দিয়ে যাবে সব দাগ দেয়া আছে তাতে। এবং যে বাড়ির ছ'তলার জানালা থেকে গুলি করা হয়েছিলো, সে জায়গাটিতে মোটা করে দাগ দেয়া। তাছাড়া তার নোট-বইতেও দেখা গেল, বসন্তকালে শিকাগো থেকে সে বারো ডলার দাম দিয়ে একটি ইটালিয়ান বন্দুক আনিয়েছে। পুলিস যে বন্দুক কুড়িয়ে পেয়েছে, সেই বারো ডলারের ইটালিয়ান বন্দুকটিও যখন যে-সময়ে যে নামে, যে দোকান থেকে আনানো এই বন্দুকটিও ঠিক তাই। একটি ফটোতেও দেখা গেল এই বন্দুকটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। আরো প্রমাণ পাওয়া গেল তার আঙুলের ছাপ থেকে। অপরাধী বলে ধৃত এই যুবকের হাতের ছাপের সঙ্গে বন্দুকের গায়ের হাতের ছাপ অবিকল এক। সেই দোকানের যে জানালা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো, সেখানে একটি বাকসের উপরেও কয়েকটি

আঙুলের ছাপ ছিলো। সেই আঙুলের ছাপের সঙ্গেও যুবকটির আঙুলের ছাপ এক বলে প্রমাণিত হলো। সেই বাকসটার কাছে, ডানদিক ঘেঁষে তিনটি গুলিও রাখা ছিলো।

ছেলেটির নাম লী হার্ভে অজওয়েল্ড। চব্বিশ বছর বয়েস। তিন বছর রাশিয়াতে ছিলো। বছর খানেক আগে দেশে ফিরে এসেছে। রাশিয়াতেই একটি রাশিয়ান মেয়ের সঙ্গে পরিচয়ের দেড় মাসের মধ্যেই তাকে বিয়ে করে, তার প্রথম সন্তানের জন্মও হয় সেখানে। স্ত্রীর বয়েস বাইশ বছর, প্রথম সন্তানটির বয়েস বাইশ মাস, দ্বিতীয়টি একমাসের। সে নিজের মুখেই স্বীকার করলো অল্প বয়েস থেকেই সে মার্কসপন্থী, মার্কসই তার জীবনের মূলমন্ত্র। সে কাস্ত্রোকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। কাস্ত্রোর স্বপক্ষে সে যে ইস্তাহার বিলি করছে, অতীতের সেই ছবিটিও টেলিভিশনের সাহায্যে দেখতে পেলাম।

এই বইয়ের দোকানটিতে সে নতুন চাকরি নিয়েছিলো। শুক্রবার অর্থাৎ বাইশে নভেম্বর (১৯৬৩) তারিখে যেদিন কেনেডিকে গুলি করা হয় সেদিন সকালবেলা যখন সে দোকানে এলো তার হাতে কাগজে জড়ানো মস্ত একটা প্যাকেট ছিলো। একজন জিজ্ঞেস করলো, এটা কী ? সে বললো,'জানালার পর্দা।' তারপর উঠে গেল উপরে।

টেলিভিশনে ছবিগুলো পর পর এমনভাবে আসছিলো, মনে হচ্ছিলো একটি পুরো গোয়েন্দা গল্পের ছায়াছবি দেখছি। অজওয়েল্ডের গলা বয়সের তুলনায় ভারি, মুখ বয়েসের তুলনায় গম্ভীর। চব্বিশ নভেম্বর যখন তাকে সিটি জেল থেকে কাউণ্টি জেলে বদলি করা হচ্ছিল, ঠিক তখুনি মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ের বেইজমেণ্টে একটি লোক তাকে গুলি করলো। পুলিসে পুলিসে গিজগিজ করছিলো জায়গাটা, কী করে যে একজন বাইরের লোক ঢুকতে পারলো সেখানে সেটাই তাজ্জব। সাজপোশাকে টিপটপ একটি মোটাসোটা ভদ্রলোক যে পিস্তল সহ হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছে তার দিকে, সে ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম টেলিভিশনের ছবিতে। কিন্তু তারও আগে দেখলাম অজওয়েল্ড তার দু'পাশের দুজন গোয়েন্দার মাথা ডিঙিয়ে যেন কার দিকে তাকালো। তাকাবার ভঙ্গিতে মনে হলো কারো সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করছে ! সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পাঁজরে ঠেকিয়ে গুলিটা ছুঁড়লো লোকটি। এতো কাছে থেকে মেরেছিলো যে শব্দটা পর্যন্ত শোনা গেল না ভালো করে।

অজওয়েল্ড মুখ বিকৃত করে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। পুলিসরা জাপটে ধরলো লোকটিকে। একজন পুলিস চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলো, 'রুবি, তুই ! কুত্তির বাচ্চা।'

লোকটির নাম জ্যাক রুবেইনস্টাইন। সবাই রুবি বলে ডাকে। বাহান্ন বছর বয়েস, দুটো নাইট ক্লাবের মালিক। ডালাস শহরের প্রায় সকলেরই পরিচিত। আগে শিকাগোতে ছিলো, সুনাম ছিলো না সেখানে। কিন্তু ডালাস শহরে আসার পর থেকে তেমন কোনো খারাপ রিপোর্ট নেই পুলিসের কাছে। মনে হলো পুলিসের অনেক লোকের সঙ্গেই তার বেশ দহরম মহরম।

অজওয়েল্ড মাটিতে পড়ে কতোক্ষণ ছটফট করলো তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল। আর একটি কথাও বেরুলো না তার মুখ থেকে। এতো বড়ো একটা হত্যাকাণ্ডের পিছনে আরো কোনো ভয়াবহ ষড়যন্ত্র আছে কিনা জানার উপায় রইলো না কোনো। দেশের প্রিয় নেতাকে খুন করেছে বলে যে রুবি এইভাবে প্রতিশোধ নিল এ কথাটা ভেবে নিয়ে কেউ সুখী হতে পারলো না। ধরা তো পড়েই ছিল, তবুও নিজের জীবন বিপন্ন করে ব্যূহের মধ্যে ঢুকে গুলি করে মেরে তার লাভ হলো কী ? মাঝখান থেকে অনেক গোপন তথ্য জানবার পথটা বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টা আগে যে হাসপাতালে প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, অজওয়েল্ডকেও ঠিক একইভাবে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। কয়েক ঘণ্টা আগে কেনেডির যেখানে শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিলো, অজওয়েল্ডের শেষ নিঃশ্বাসও সেখানেই গত হলো।

নিয়তির কী পরিহাস।

পুলিস গিয়ে তার মা আর এইটুকু ছোট্টখাট্টো তরুণী রাশিয়ান স্ত্রীকে নিয়ে এলো শেষ দেখা দেখাতে। তাকিয়ে দুহাতে মুখ ঢাকলো বউ, মা শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

দৃশ্যান্তর ঘটলো। দেখতে পেলাম প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মৃতদেহ ততোক্ষণ এসে গেছে ওয়াশিংটনে। হোয়াইট হাউসের হলঘরের মাঝখানে ব্রোঞ্জের কফিনের মধ্যে শুয়ে আছেন তিনি। জ্যাকলিন কেনেডি মূর্তিমতী কান্না হয়ে শেষবারের মতো আর একবার ডালা তুলে স্বামীকে দেখলেন। শবাধার সে রাতের মতো সেখানেই রইলো, পরের দিন নিয়ে আসা হলো রোটাণ্ডা হাউসে। এখন আর কী অধিকারে থাকবেন হোয়াইট হাউসে ?

গাড়ি বোঝাই হয়ে তখন তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সহ বেরিয়ে আসছিলেন।

শক্ত করে দুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে অনাথিনীর মতো শোকার্ত জ্যাকলিনও এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। উত্তরের পোর্টিকো দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জলে ভরে গেল তাঁর দুই চোখ। নিজেকে সামলাতে না পেরে ক্ষণিকের জন্য থমকে থাকলেন। কতো সুখ-স্মৃতি বিজড়িত এই হোয়াইট হাউস। ঘরে ঘরে তাকালেন, বারান্দায়, উদ্যানে, অলিন্দে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন আর প্রবোধ মানছে না হৃদয়।

মিলিটারি বাহকরা তাঁর স্বামীর শবাধার সযত্নে অন্য একটি আধারের উপর রেখে নিয়ে এলো বাইরে। ছটি শ্বেত-অশ্ববাহিত একটি খোলা গাড়ির উপরে মনিবের জন্য পা ঠুকছিলো, নাক উপরে তুলে কোন অমঙ্গলের গন্ধে উচ্চৈঃস্বরে রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে স্থাপন করলো সেটি। মিসেস কেনেডি কম্পিত পায়ে সিঁড়ি নামলেন, স্বামীর ষোলো বছরের পালিত আদরের আরোহীহীন ঘোড়াটি দুবার হ্রেষাধ্বনি করলো। লোকে লোকারণ্য রাস্তার মাঝখান দিয়ে তাকেও হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে রোটাণ্ডা হাউসে নিয়ে এলো সহিস।

রোটাণ্ডা হাউসে এসে শ্বেতপাথরের চত্বরে রাখা হলো সেই শবাধার। এই চত্বর উনিশ শো একষট্টি সালের জানুয়ারী মাসের কুড়ি তারিখে কেনেডির জন্যই তাঁর অভিষেকের দিন তৈরি করা হয়েছিলো। সামনের বড়ো দরজাটি খুলে দেয়া হলো জনসাধারণের জন্য। রাস্তার ষোলোটা ব্লক পর্যন্ত তিরিশ লক্ষেরও অধিক মানুষের একটি লম্বা লাইন অপেক্ষা করতে লাগলো শেষ দেখা দেখবে বলে। কেউ একটা কথা বলছিলো না, এতোটুকু গোলমাল হচ্ছিলো না, দরজা খুলে রাখার পরে একের পর এক এসে দেখে যেতে লাগলো তাদের মৃত প্রেসিডেন্টের শবাধার। মাথা নিচু করে ক্রুশচিহ্ন এঁকে শ্রদ্ধা জানালো। অনেকেই কান্না থামাতে পারছিলো না। লক্ষ লক্ষ পায়ের খসখস আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলো। সেই কান্নার ফোঁপানি আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ। ঘণ্টায় দশ হাজার করে লোক সারারাত ধরে দেখলো তাঁকে। দেহরক্ষীরা দেহাধারের চারপাশে পুরো ছত্রিশ ঘণ্টা একঠাঁয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো।

রোটাণ্ডা হাউসের পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে গোল হয়ে ঠিক ঢেউয়ের মতো এক লাইন উঠছিলো আর এক লাইন নামছিলো। একটুও ঠেলাঠেলি বা কোলাহল না থাকায় সমস্ত আবহাওয়াটাতে একটা স্তব্ধবেদনা টনটন করছিলো! অনেকেরই সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রেসিডেণ্ট এব্রাহাম লিংকনের কথা মনে পড়ছিলো। আটানব্বুই বছর আগে তাঁর মৃতদেহও এই রোটাণ্ডা হাউসেই রক্ষিত হয়েছিলো।

পঁচিশ তারিখ সকাল থেকেই আবার ভিড় জমতে শুরু করলো। সেদিনই তিনি সত্যিকারের বিশ্রাম নেবেন মাটির তলায়। বেলা দশটার মধ্যেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এসে গেলেন সবাই। প্রেসিডেণ্ট জনসনের পিছনে দুজন সৈনিক মস্ত মালা বহন করে নিয়ে এসে মৃতদেহের পায়ের তলায় রাখলো। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে ছ বছরের মেয়ের হাত ধরে মিসেস কেনেডি শবাধারের কাছে এলেন, হাঁটু ভেঙে বসে সেটা ছুঁলেন একবার, একবার শবাধারবস্ত্রে চুম্বন করলেন। মেয়েও তাই করলো। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাই অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি হাত ধরে নিয়ে চললেন তাঁদের। তাঁর গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিলো। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, সহকর্মীরা, বন্ধুরা, নিকট আত্মীয়রা সবাই একে একে কাছে এসে দাঁড়ালেন, নীরবে মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে গেলেন জায়গায়।

প্রধান বিচারপতি রুদ্ধগলায় ছোটো একটা বক্তৃতা দিলেন। সেনেটার এডোয়ার্ড কেনেডি বললেন, শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা যে আমরা সবাই একদিন সেখানে যাবো।

খুব সুন্দর ছিলো দিনটা। একটুও মেঘ ছিলো না, আকাশ গভীর নীল। প্রায় এগারোটার সময় তেমনি ছ'ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হলো শবাধার। আটজন বাহক ধরে থাকলো গাড়িটা। সামনে বিভিন্ন শাখার মিলিটারিরা বিভিন্ন যানে, বিভিন্ন সজ্জায় মিছিল সাজিয়ে রওনা হলো। শবাধারের ঠিক পিছনে দুই হাতে দুই শিশুসন্তান নিয়ে মিসেস কেনেডিও হেঁটে চললেন। দুপাশে দুই দেওর অ্যাটর্নি জেনারেল বরার্ট কেনেডি আর সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। তার পিছনে পরিবারের ঘনিষ্ঠতমরা। আর তাদের পিছনে সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রধান রাজপুরুষের দল।

সেই প্রধান পুরুষদের মধ্যে প্রথমেই যাঁকে নজরে পড়লো, তিনি প্রেসিডেণ্ট দ্যগল। সকলের চেয়ে মাথায় উঁচু। তারপর আস্তে আস্তে প্রত্যেককেই দেখা গেলো। গ্রীসের রাণী, জাপানের সম্রাট, রাজবেশে সজ্জিত ইথিওপিয়ার রাজা হাইলে সেলাসী, ডিউক অব এডিনবরা, ডেনমার্কের প্রিন্স জর্জ, লিবিয়ার ভাইস প্রেসিডেণ্ট, রাশিয়ার মিকোয়ান, পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার, অস্ট্রেলিয়ার চ্যান্সেলর, বেলজিয়ামের রাজা—একের পর এক এগিয়ে আসছেন, আলো পড়ছে মুখের উপর, পরিচয় দেয়া হচ্ছে সকলের, মস্ত লম্বা তালিকা।

উনিশ শো তেষট্টি সালের নভেম্বর মাসে কেনেডি মারা গিয়েছিলেন, উনিশ শো চৌষট্টি সালের মে মাসে, মাত্রই ছ মাসের ব্যবধানে আর একটি বজ্রপতন হল।

তখন আমরা ইণ্ডিয়ানা থেকে নিউইয়র্কে চলে এসেছি। বুদ্ধদেব ব্রুকলীন কলেজে পড়াচ্ছেন। সুন্দর একটি হোটেল অ্যাপার্টমেণ্টে জায়গা পাওয়া গেছে ভাগ্যগুণে। ভাগ্যগুণে এই জন্য যে বাড়ি অনেক পাওয়া যাচ্ছিলো কিন্তু হোটেল অ্যাপার্টমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছিলো না। আমাদের মতো সাধারণ অবস্থার লোকেদের পক্ষে হোটেলের সুাইটগুলোর দাম এতো বেশী যে লবিতে ঢুকেই চমকে ফিরে আসছিলাম। বিশেষত মেইড সার্ভিস চাইলে তো উপায়ই নেই। শেষ পর্যন্ত দৈবাৎ কোনো এক রাত্রে কোনো এক পার্টির পরে বেশ একটু রাত করে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, সখ হলো একবার সমুদ্রের ধারটা দেখে যাই। ব্রুকলীনের কর্মকর্তারা আমাদের জন্য যে বাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন, সে বাড়ির জানালা দিয়ে দূরে সেই সমুদ্র চোখে পড়ে। সমুদ্র মানে সমুদ্রের মোহনা। যেখান থেকে জলযান নদীতে ঢোকে। ঢোকার মুখে স্ট্যাচু অব লিবার্টি দাঁড়িয়ে আছে হাতে আলোর বর্তিকা নিয়ে। কতো দূর থেকে সেই আলো দেখা যায়। প্রমেনাদে লোকেরা বেড়ায় তা-ও চোখে পড়ে।

এসেছি মাত্রই তিন-চারদিন, এঁদের ঠিক করা বাড়ি আমাদের পছন্দ হয়নি। তাই অন্য বাসস্থানের সন্ধান। এমনি বাড়ি থেকে হোটেল অ্যাপার্টমেণ্ট অনেক সুবিধাজনক। শুধু যে মেইড সার্ভিসই পাওয়া যায় তাই নয়, নিরাপদও খুব।

বুদ্ধদেবকে মাঝে মাঝেই নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যেতে হয়। এক রাতের জন্যে গেলেও একা নিঃসঙ্গ বাড়িতে থাকতে আমার খুব খারাপ লাগে। একটু একটু ভয়ও পাই। সেসব দিক থেকে হোটেল খুব ভালো। লবিতে সারা-রাত আলো জ্বলে সারারাত লোক থাকে, গমগম করে বাড়িটা। ঘরে একা লাগলে বসলেই হ'লো সেখানে গিয়ে। বেশ আলাপ-সালাপ হবে কতো লোকের সঙ্গে।

প্রমেনাদে যেতে গিয়েই এই হোটেলটি চোখে পড়লো। প্রমেনাদ থেকে মাত্রই দু' ব্লক কি তিন ব্লক। 'চলো, চলো, দেখি, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লাম। পাঁচতলায় কোণের দিকে এইমাত্রই একটি সুাইট খালি হ'লো। এই যে লোকজন চলে যাচ্ছে মালপত্র নিয়ে।

কী ভাগ্য। দামও মারাত্মক নয়। দেখে খুব পছন্দ হ'য়ে গেল। এ বাড়িও চেলসী হোটেলের মতোই পুরোনো। তাই বেশ বড়ো বড়ো দু'টি ঘর, গলি বড়ো

বাথরুম। চমৎকার হাত পা ছড়ানো। একটু বড়ো বাড়িই তখন আমাদের দরকার ছিলো, কেননা আমাদের তিনটি সন্তানের মধ্যে দু'জন ছিলো এদেশে। বড়ো কন্যা জামাতা ছিলো কলকাতায়। তাদের চিঠি পেয়েছি তারাও আসছে তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে। এসে প্রথমে আমাদের কাছে আমাদের সঙ্গেই থাকবে কিছু-দিন। তারপর কর্মস্থলে যাবে। মনোমত বাড়ি পেয়ে খুশিতে ছলছল করতে লাগলাম। কাল পরিষ্কার ক'রে দেবে পর্সুই চলে আসবো। আর প্রমেনাদে যাওয়া হলো না। এ বাড়িতে এলে তো রোজই যেতে পারবো, এতো রাত্তিরে আর দরকার কী? হোটেলের ম্যানেজারও বললেন, রাত্রিবেলা জেটিতে যাওয়া উচিত নয় আপনার। বিদেশী, অনেক রকম বিপদ হতে পারে। হয়ও। পোর্টাররা মাতাল হ'য়ে নানারকম কাণ্ডকারখানা করে।

আরো মজা এই, যে কোণে আমরা ফ্ল্যাটটি পেলুম, সেইদিক থেকেই সমুদ্র থেকে উত্থিত বাতাস সোজা এসে বসার ঘরের একটি জানালায় ধাক্কা খায়। সেই জানালা দিয়ে খণ্ডিত ভাবে বেশ খানিকটা নীল জল দৃষ্টিকে অবাধ বিচরণে সমৃদ্ধ করে। হোটেলটির নাম, হোটেল বোসার্ট।

কিছুটা আর্থিক ক্ষতি হ'লো অবশ্য। ঐ বাড়িটার জন্যও তো আগাম ভাড়া দেয়া আছে, আবার এটাতেও দিতে হলো। 'তা হোল', বুদ্ধদেব বললেন, 'এ নিয়ে কিন্তু একটুও খুঁত খুঁত কোরো না। দেশে তো সারা বছরই অভাব-অভিযোগ লেগে আছে, এখানে আর সে কষ্ট টেনে এনে কী লাভ? কয়েকটা দিন অন্তত নিশ্চিন্ত ভাবে থাক তো তারপর যা হয় হবে।'

হোটেলে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই বড়ো কন্যার কাছ থেকে লম্বা চিঠি এলো, তাদের আসবার নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে।

ইয়োরোপ ঘুরে আসছে। সুনীল যে আমন্ত্রণে এসেছিলো, এটাও তাই, চিঠিভরা কেবল খুশি। মা বাবা ভাইবোনকে দূর বিদেশে পাঠিয়ে বলাই বাহুল্য তার মন একেবারেই টিঁকছিলো না। এই যোগাযোগে ভীষণ উচ্ছ্বসিত। জামাতার কর্মস্থল আয়ওয়া এবং শিকাগোতে ভাগকরে হবে ।গভী। সেটাও খুব সুখের ব্যাপার। তার কারণ ব্রুকলীন কলেজে পড়িয়ে বুদ্ধদেব ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন এক বছরের জন্য। শিকাগো সেখান থেকে মাত্রই দু' চার ঘণ্টার রাস্তা। রোজই আসা-যাওয়া করা যায়, সপ্তাহান্ত তো বেশ সুখেই কাটানো যায়। তাছাড়া ঐ সময়টায় শিকাগোতে আবারো কয়েকটি বক্তৃতার আমন্ত্রণ আছে তাঁর।

আমি একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়লাম বাড়ি সাজাবার ধুমধামে। ম্যানেজারকে বলে একটা হাইডবেড় ভাড়া করে এনে পেতে নিলাম বসার ঘরে। শোবার ঘরের পুরনো কার্পেট বদলে নতুন কার্পেট আনিয়ে পাতলাম। জানালায় হোটেলের পর্দা খুলে রেখে নতুন সৌখীন পর্দা কিনে টানালাম। দামী বেডকভারে বিছানা ঢাকলাম। এই ঘরটাতেই তো ওরা থাকবে? সাজিয়ে সাজিয়ে আর আমার মন ওঠে না। নাতনীর জন্য খেলা এসে গেল কতো। কতো বই এলো। কোণে ছোট্টো করে' তার জন্যও সাজানো হলো আলাদা জায়গা। এখন শুধু অপেক্ষা অপেক্ষা আর অপেক্ষা। বুদ্ধদেব গিয়ে কিং লিয়ারের টিকিট কিনে আনলেন চারখানা। প্রচণ্ড দাম। তা-ও পনেরো দিন আগে কিনলেন বলে পেলেন। ওরা এলে একসঙ্গে সব যাবো।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ কিন্তু আর যে কোনো খবর আসে না। বলেছিলো যেদিন রওনা হবে সেদিন টেলিগ্রাম করবে। অথবা ট্রাংককল। তা করলো না। যেদিন এসে পৌঁছুবার কথা সেদিনও কোনো খবর নেই। বললাম, 'কী দয়িত্ব-জ্ঞানহীন।' প্রায় দশটা দিন যে কী ভয়ানক উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কাটলো বলা যায় না। তারপরে মেয়ের একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি, 'কোনো বিশেষ কারণে যাওয়া পিছিয়েছে বিস্তারিত ভাবে পরে লিখছি, আমি একটু ব্যস্ত।'

কেন ব্যস্ত, কেন আসা পিছোলো এইসব পত্র চালাচালি করতে করতে উত্তর প্রত্যুত্তরে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পরে আমাদের পারিবারিক ডাক্তারের কাছ থেকে চিঠি এলো একখানা। প্রথম দিকে অনেক ভূমিকা করেছেন, অনেক রসিকতা করেছেন, তারপর হালকাভাবে যে খবরটি পরিবেশন করেছেন সে ছত্রটি পড়ে আমরা দুজনেই প্রায় মিনিট পাঁচেক কোনো কথা বলতে পারলাম না।

এদেশে আসবার সব আয়োজন ঠিক হ'য়ে যাবার পরে, এমন কি স্যুটকেসটি পর্যন্ত গুছিয়ে ফেলার পরে, এক্সরেতে ধরা পড়েছে জামাতা জ্যোতির্ময়ের ফুস-ফুস নিষ্কলঙ্ক নয়।

উনি অবশ্য একটুও চিন্তিত হ'তে বারণ করেছেন। উনি লিখছেন, 'খুব ছোট্টো একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে, ঠিক ধরা যাচ্ছে না। সব রকম টেসট্ই করা হয়েছে, রক্তে বা থুতুতে কিছু পাওয়া যায় নি, মণ্টো টেস্টেই যা একটু পাওয়া গেছে। তবে মণ্টো টেস্ট করলে কলকাতাবাসীর শতকরা পঁচাত্তরজন লোকেরই এই রোগ ধরা পড়বে। আমি এখানে আছি, মিমি আমার নিজের কন্যার মতো, আমি যা করবার সব করবো, আপনারা ভাববেন না। আশা করছি, এই দাগ কয়েক

সপ্তাহের মধ্যেই নির্মূল হবে, জ্যোতি সেই সময় আবার যাবার অনুমতি পেয়ে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।

এই ডাক্তারটির নাম অনেকেরই জানা আছে। ইনি শুধু ডাক্তারই নন, সাহিত্যিকও বটে। এঁর প্রথম বই 'ভেলকি থেকে ভেষজ' সেই সময়ে বোধ হয় ঘরে ঘরে পঠিত হয়েছে। শুধু ডাক্তারি গুণে নয়, তা তো আছেই, বইটি সাহিত্যিক গুণেই উৎকৃষ্ট। আমি সে বই উপন্যাসের স্বাদ নিয়ে পড়েছিলাম। কতো রোগীর কতো ধরন কতো চরিত্র যে এখনো স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে হয়ে আছে তার ঠিক নেই। ভদ্রলোকটির নাম অতুলানন্দ দাশগুপ্ত। ছদ্মনাম আনন্দ কিশোর মুন্সী কিন্তু এই নামে উনি লেখেননি, একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। এখন আমি কিছুতেই সেই নামটা মনে আনতে পারছি না।

এই মনে আনতে না পারাটা আমাকে মধ্যে মধ্যেই বড়ো কষ্ট দেয়। এই কয়েকদিন আগে পুরো একটা রাত বিনিদ্র কাটলো এই কথা ভেবে যে কোনো একজন বন্ধুর চোখের চশমার ফ্রেমটা কালো শেল কিনা! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম। শেষে মনে হ'তে লাগলো, আদতে চশমাই আছে তো? না কি নেই? আছে? না নেই? আছে? না নেই?

কতো ক'রে মনকে বোঝাই, থাকলে আছে না থাকলে নেই, কী আসে যায়। মন কথাই শোনে না। যা ভাবছে তাই ভাবতে থাকে। পরের দিন সকালে ফোন ক'রে বলি, 'এই যে, কেমন আছেন, কদ্দিন খবর নেই।'

উনিও তেমনি খেজুর দেন, 'খবর যেন আপনারই কিছু আছে। এই অভাজনদের কি আর মনে পড়ে আপনাদের মতো মানুষের?'

আমি আবার বলি, 'তা আর বলবেন না কেন? উল্টো চাপ দেয়াই তো সুবিধে।'

উনি হা হা ক'রে হাসেন, 'উল্টো চাপ, না? ভালো বলেছেন। কথায় যে পারবো না আপনার সঙ্গে সে আমি জানি। না, সত্যি আমি সব সময় আপনার কথা ভাবি। কতোবার যাবো যাবো ঠিক করি—'

এইভাবে আলাপ চলতে থাকে অনেকক্ষণ ধ'রে কিন্তু আসল কথায় আর আসতে পারি না। কী ভাবে উত্থাপন করবো ভেবেই পাই না। এরকম বলা যায় কি, 'আচ্ছা শুনুন, আপনার চোখে কি চশমা আছে না নেই?' অথবা 'শুনুন, আপনার চশমার ফ্রেমটা কি কালো শেলের না অন্যরকম?

দুটো প্রশ্নই এমন যে করা যায় না। এতো দিনের চেনা লোক, তার চশমা

আছে কি নেই নিশ্চয়ই আমার জানা উচিত। ভদ্রলোক ভাববে কী? আবার যদি জিজ্ঞেস করি চশমার ফ্রেমটা কালো শেল কিনা, তাতেও অসুবিধে আছে। যদি আদৌ চশমা না থাকে, তবে এই প্রশ্ন কি অবান্তর নয়?

শেষে ভেবেচিন্তে ঝপ করে ডুব দেই জলে, 'আচ্ছা, চশমা বিষয়ে আপনার মতামত কিঁ বলুন তো?'

'চশমা! হঠাৎ চশমা বিষয়ে মতামত কেন?'

'না, বলছিলাম, এই ফ্রেমটেমগুলো—'

'ওঁ, আপনি চশমা বদলাবেন নাকি?'

'না, ভাবছিলাম—'

'আপনার তো কালো ফ্রেমের চশমা, না?'

হ্যাঁ।'

'আমার মত যদি গ্রহণযোগ্য ভাবেন আমি নিশ্চয়ই বলবো ঐ কালো ফ্রেমের চশমাই সবচেয়ে ভালো।'

'আপনার তাই ভালো মনে হয়?'

'আপনি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, এ নিয়ে আমার তিনবার পাওয়ার বদল হ'লো, কিন্তু ফ্রেম ঐ কালো, শেল।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। তারপর ভদ্রলোক চশমা বিষয়ে আরো কী বললেন আর না বললেন কানেই এলো না।

ডাক্তার অতুলানন্দের নামটাও আজ কিছুতেই তেমনি মনে আনতে পারছি না। তাঁকে ফোন করারও সুবিধে নেই। ঐ নম্বরে নেই উনি। কোন নম্বরে আছেন তা-ও জানি না। বহুকাল যোগাযোগ ছিন্ন হ'য়ে গেছে।

এরকম কতো বন্ধু কতো বান্ধবের সঙ্গেই যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে! কোনো যোগাযোগ মৃত্যু এসে ছিঁড়ে দিয়েছে, কোনো যোগাযোগ হরণ করেছে কালস্রোত।

টিউবারকুলাসিসের চিকিৎসা এখন যতো সহজ মনে হয় চোদ্দ বছর আগে ততো সহজ মনে হতো না। এই ব্যাধি বিষয়ে আমরা এখন যতোটা নির্ভয় তখন তা ছিলুম না। তখনো আমাদের মনে এই ভীতির শিকড় অনেক গভীরে নিহিত ছিলো। এখানে হয়তো এ কথাটা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, জ্যোতির্ময়কে আমরা জামাতা হিসাবে যতো ভালোবেসেছিলুম, মানুষ হিসেবে তার চেয়ে বেশী। অন্তত বুদ্ধদেবের পক্ষে সেটাই ছিলো একান্ত সত্য। এই অতি কমবয়সী ছেলেটির বিদ্যা বুদ্ধি মেধা তাঁকে অভিভূত করেছিলো। বুদ্ধদেবের

চরিত্র অনুযায়ী তিনি কোনো সম্পর্কের বশীভূত ছিলেন না। সম্পর্ক নামক অভিজ্ঞানটির প্রতি তাঁর তেমন আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা ছিলো বলে মনে হয় না। বন্ধুতার প্রতিই তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। প্রথম দিকে কন্যার মনোনীত এই যুবকটিকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করতে তিনি প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সঙ্গত কারণও ছিলো। ছেলেটির বয়স ছিলো মাত্র উনিশ, মাত্রই বি. এ. পাশ করেছে, দশটি ভাইবোনের একজন, তখনো কোনো কাজে যোগদানের সুবিধা ঘটেনি, এমত অবস্থায় কোনো পিতাই হয়তো তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করতে রাজী হ'তে পারেন না। তাছাড়া এই ছেলেটি বিষয়ে কন্যা যখন মনোস্থির করেছে, তখন তিনি বিদেশে ছিলেন। এসে জেনে দেখে এবং সব শুনে খুব প্রফুল্ল হ'তে পারলেন না। কিন্তু যারা বিয়ে করবে, তারা নিঃসংশয় সুতরাং সে ক্ষেত্রে আমাদের হস্তক্ষেপ অবান্তর। সাধারণত সংসারের সকল দায়িত্বই আমি পালন করি। ঘরে বাইরে অভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে লোক-লৌকিকতা ষোলো আনার জায়গায় ষোলো আনাই আমাকে সম্পন্ন করতে হয়, কিন্তু এই একটি জায়গায় এসেই আমি সে ভার একার ঘাড়ে তুলে নিতে পারলাম না। আমার মনও ভারাক্রান্ত ছিলো। তথাপি বুদ্ধদেবকে মত করাতে আমাকেই দূতের ভূমিকা নিতে হয়েছিলো। কিন্তু বিয়ে হ'য়ে যাবার পরে, কাছাকাছি দেখে আলাপ ক'রে বুদ্ধদেব একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে এই দুই অসমবয়সী মানুষ গাঢ় বন্ধুতায় আবদ্ধ হ'লেন। জ্যোতির্ময়ের পড়াশুনোর বিস্তৃতি প্রায় গল্প করার মতো। সাহিত্যবোদ্ধা হিসেবে তার তুলনা বিরল।

আমার ভিতরে মাতৃত্বের অংশই প্রবল, আমি তার বুদ্ধি বিদ্যার বিনিময়ে তাকে মমতা করিনি, অর্ধেক করেছিলাম তার স্বভাব গুণে বাকী অর্ধেক সম্পর্কে।

এই সংবাদ আমাদের দু'জনকেই অত্যন্ত বেশী বিচলিত করলো। ডাক্তারের সহজ সুরে জানানো সান্ত্বনায় একটুও শান্তি পাওয়া গেল না। তাদের জন্য সাজানো ঘরে এসে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে বসে রইলাম। বুদ্ধদেব বসার ঘরে, সে পুস্তক পাঠে মন দিলেন।

সেই দিন আমাদের ঠিক সময়ে খাওয়া হলো না। বুদ্ধদেব কলেজে গেলেন না।

এই রকম সময়ে বন্ধুসমাগম ভালো লাগে। ভাবছিলাম কাকে ডাকা যায়। বুদ্ধদেব বললেন, 'একষট্টি সালে আমরা কিন্তু দু'জন বন্ধুকে ডাকিনি, সময়

ছিলো না। ভাস্কর আর্চিপেংকো আর অধ্যক্ষ ডক্টর ডেকার। এঁদের খেতে বললে হয়।'

আমি বললাম, 'খুব ভালো।'

তক্ষুণি ফোনের নম্বর ঘোরানো হলো। প্রথমে আর্চিপেংকো।

'হ্যালো—'

'মিঃ আর্চিপেংকো ?'

'আর্চিপেংকো ! আপনি জানেন না ?'

'কী !'

'তিনি তো বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রীও এখানে নেই। আমি কেয়ারটেকার।'

ঢোক গিললেন বুদ্ধদেব।

এরপরে ডক্টর ডেকার।

'হ্যালো—'

'ডক্টর ডেকার ?'

'ইয়েস—'

'আমি বুদ্ধদেব বোস বলছি।'

'আরে। বুদ্ধদেব বোস ? প্রফেসর বুদ্ধদেব বোস ?'

'হ্যাঁ। কেমন আছো বলো।'

'কবে এলে ?'

'বছরখানেক। তবে এখানে নয়, ইণ্ডিয়ানায় ছিলাম। ব্রুকলীন কলেজে এসেছি মাসখানেক হলো। আর্চিপেংকোকে ফোন করেছিলাম, উনি মারা গেছেন জানতাম না। খুব খারাপ লাগছে শুনে।'

'হ্যাঁ। কী আর করা। ওরকমই হয়। মিসেস বোসও এসেছেন কি ?'

'হ্যাঁ। আমরা দুজনেই চাই তুমি আর তোমার স্ত্রী কাল এসে রাত্তিরে আমাদের সঙ্গে খাও। অন্য কিছু নেই তো ?'

ডক্টর ডেকার ওপার থেকে সামান্য শব্দ ক'রে হেসে বললেন, 'না, অন্য কিছু নেই, তবে আমার স্ত্রীও নেই।'

'কোথায় গেছেন ?'

'আমাদের সকলকেই একদিন যেখানে যেতে হবে।'

'অ্যাঁ।'

'এই চৌষট্টি সালটা বড়ো খারাপ যাচ্ছে প্রফেসর বোস।'

'ডক্টর ডেকার, আমি যে কী বলে তোমাকে সমবেদনা জানাবো—।'

'আমি কাল নিশ্চয়ই যেতাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু কালই সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে পড়ছি কয়েকদিনের জন্য।'

'এ ঘটনা কবে ঘটলো?'

'আর্চিপেংকোর স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলেন, মেয়েটি বড় কাতর হয়ে পড়েছিলো। ফিরে এসেই সামান্য সর্দিজ্বর। দু-তিন দিনের মধ্যেই হয়ে গেল।'

'ঈশ্।'

'মিসেস বোস কেমন আছেন? একটু দাও, কথা বলি।'

কথা আর কী বলবো। ডক্টর ডেকারই বললেন, 'তোমাকে বলেছিলাম না সুখ বড়ো ক্ষণস্থায়ী, দেখছি তার চেয়ে সত্য কিছুই নেই। আমি কিন্তু একষট্টি সালের সেন্ট্রাল পার্কের রাত্রিটিকে ভুলি নি। মেরী তোমাকে খুব ভালোবেসেছিলো। আমরা প্রায়ই তোমাদের কথা বলাবলি করতাম! খুব ইচ্ছে ছিলো এক সেমেস্টারের জন্য প্রফেসর বোসকে আমাদের কলেজে নিয়ে আসি। সে আর হলো না। ইয়োরোপে যাচ্ছি বছর খানেকের জন্য।'

ব্রুকলীনে এসে আমাদের অন্য এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, ভদ্রলোক ডক্টর ব্যানার্জি, মহিলা আগমনী ব্যানার্জি। দু'জনই অতি সুশ্রী এবং অতি সংস্কৃত। ডক্টর ব্যানার্জির দাদা অভিনেতা ভানু ব্যানার্জি। কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নন, আমাদের সময়ে নিউ থিয়েটার্সের সব ছবিতে অভিনয় করতেন এই ভানু ব্যানার্জি। বেশ নাম করা অভিনেতা ছিলেন। এবং বস্তুত অভিনয় কৌশলে দক্ষও ছিলেন। আসলে সেটা কিছু পরিচয় নয়, তিনি নিজেই খুব একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ। এককালে স্বদেশী করেছেন, এদেশে বাস করছেন বহু বছর, আলাপে ব্যবহারে অতিশয় মার্জিত, হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এখানে ওখানকার সংবাদদাতা তিনি। আনন্দবাজারেও উনি টাটকা খবর পাঠান।

হঠাৎ এক সকালে একটা ফোন করলেন তিনি। সকাল মানে খুবই সকাল। ভোর ছটা। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছটা নয়, ঐ দেশের ছটা। আলো বিতরণে যা আমাদের পাঁচটারও অধম। আগের দিন কোনো পার্টি থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো, শুয়েছি প্রায় একটার সময়। ঐ সময় ঘুম

ভাঙেনি আমাদের। তার উপরে মেঘলা থাকার দরুন সূর্যও ফোটেনি তখন। এই সময়ে মাথার কাছে কড়কড় করে ফোন বেজে ওঠায় ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম।

এক সপ্তাহ আগেই কলকাতার চিঠি পেয়েছি, 'জ্যোতির্ময় খুব দ্রুত সেরে উঠছে। ঐ দাগটা প্রায় কিছুই না। তবে এই চিকিৎসার একটা নিয়মিত পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি মতো তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে হবে, সেই কারণেই সে বাধ্য হয়ে কয়েকদিন অন্তরীণ থাকবে। তবে ভেবে নিতে দোষ নেই যে খুব শীগ্‌গিরই দেখা হবে।' চিঠিটা জ্যোতির্ময় নিজেই লিখেছে। নিজের অসুস্থতা নিয়ে অনেক রসিকতা ভরা সেই চিঠি। প্রায় পাঁচ ছ' পৃষ্ঠা। চিঠিটা পড়ে মনের সকল ভার যেন মুহূর্তে পেঁজা তুলোর মতো কোথায় উড়ে উড়ে চলে গিয়েছিলো। ফোনের শব্দে হঠাৎ কেমন এক আতঙ্ক অনুভব করলুম। ভেবে পেলুম না এই দূর বিদেশে কে এমন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু আছে আমাদের যে, যখন তখন একটা ফোন করবে। এখানকার রাস্তাঘাট যেমন অঙ্ক-কষা, শিশুপালন যেমন বইপড়া, বন্ধুতারও তেমনি কতোগুলো আইন-কানুন আছে। যখন খুশি তখন ডাকলেই হলো না, যখন খুশি তখন কথা বললেই হলো না, যখন খুশি তখন এসে দরজা ধাক্কালেই হলো না।

তার জন্যে এরা খবরাখবর দিয়ে পূর্বেই গৃহস্বামী এবং স্বামিনীকে প্রস্তুত করে নেয়। নিতান্ত আপনজনের সঙ্গেও তারা এই নিয়ম অতিক্রম করে না। এতে দু'পক্ষেরই সুবিধে হয়। তা হলে কে এই অসময়ে ডেকে ঘুম ভাঙালো? খাবার সময় কি-না, ঘুমের সময় কি-না, বিশ্রামের সময় কি-না এসবই যেখানে বিচার্য সেখানে বলা যায় প্রায় শেষ রাত্রে কার এমন দুর্মতি হলো ঘুম থেকে তুলে কথা বলার?

এখানকার বাঙালী বন্ধুরাও এই নিয়ম পালন করেন। আর বাঙালী কে আছে এখানে? একজনের নামও তো মনে পড়ছে না। পড়লেও তারা সবাই নব পরিচিত। ভোর ছ'টার অন্ধকারে কেউ ডেকে আলাপ করবে এমন তো মনে হয় না। তা ছাড়া ভোর ছটায় এখানে ওঠেই বা কে? এ দেশে রাত্রি জাগরণে কারো ক্লান্তি নেই। কিন্তু সকালে ওঠা অসম্ভব।

আমার অন্য একটি টেলিফোনের কথা মনে পড়ে গেল। তিন বছর আগে কলকাতায় থাকতে ভোর চারটেতে এমনি করেই একটা ফোন বেজে উঠেছিলো। সেটা ছিলো জুন মাস। টেলিফোন ধরতেই ওপার থেকে একটি ধীর গম্ভীর গলা ভেসে এলো, 'একটু বুদ্ধদেববাবুকে চাই।'

ধরেছিলো আমার ছোটো মেয়ে। সে বললো, 'আপনি কে বলছেন?' সেই গলা জবাব দিল, 'আমাকে চিনবেন না। আমি সুধীন দত্তর বাড়ি থেকে বলছি। তিনি মারা গেছেন।'

'অ্যাঁ, কী—'

'বুদ্ধদেববাবুকে এখুনি এখানে চলে আসতে বলুন।'

'কী! কী! সুধীন দত্ত। সুধীন দত্ত। কী বলছেন আপনি? কবি সুধীন দত্ত।'

'কবি সুধীন দত্ত।'

ঐ ফোনের ওপরই আমার কন্যা দময়ন্তী কান্নায় ভেঙে পড়লো। সুধীন দত্ত তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে পড়ান। ওদের মাস্টারমশাই। কাল সুধীন দত্তর পড়ানো বিষয়েই পরীক্ষা। শুধু তো একজন বিশেষ মানুষই নন, একান্তই কাছের মানুষ। ছাত্রছাত্রীদের তিনি প্রাণ। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাঁর প্রাণ।

লাফিয়ে উঠে পড়লুম। বুদ্ধদেবের ঘুম ভাঙেনি এই শব্দে। ভেবে পেলাম না আচমকা জাগিয়ে তুলে কেমন করে এই ভয়ানক সংবাদ দেবো? কী অপ্রত্যাশিত খবর। দুদিন আগে আমরা একটি রেস্তরাঁয় গিয়ে একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছি। কালও তো কলেজে যাবার আগে নিচে গাড়ি থামিয়ে উঠে এলেন উপরে, বুদ্ধদেবকে নিয়ে গেলেন কলেজে। এর মধ্যে কী হলো? কী হলো? কেমন করে হলো? কখন হলো?

সে কথা কি ভোলবার? সেদিনের বেদনার কি কোনো তুলনা ছিলো?

এই ফোনের শব্দে হঠাৎ বুদ্ধদেব উত্তেজিতভাবে উঠে বসে বললেন, 'দাও, দাও, আমাকে দাও। মনে হচ্ছে জ্যোতির ফোন। আমি বলছি ওরা ইয়োরোপে এসে গেছে, সেখান থেকেই ফোন করছে। ওর স্বভাব তো জানোই, একটা সারপ্রাইজ দিল। এতো ছেলেমানুষ। হ্যালো—'

'আমি ব্যানার্জি, ব্যানার্জি বলছি।'

'ও, ব্যানার্জি? ডক্টর ব্যানার্জি? কী? কী খবর?'

'ঘুম ভাঙালুম নিশ্চয়ই?'

'ভালোই করেছেন, একদিন একটু সকালে ওঠা গেল।'

'একটা খবর।'

'খবর? কী?'

'নেহরু মারা গেছেন।'

'নেহেরু মারা গেছেন! সে কী!'

তারপর এপার ওপার দু'পারই চুপ।

তা হলে এই ভোরের টেলিফোনও সেই মৃত্যুর খবরই বহন করে এনেছে? যা তেমনিই অপ্রত্যাশিত, তেমনিই বেদনাবহ? অথচ আমি কী অধীর আগ্রহেই না কান পেতে ছিলাম, ওরা কখন এসে কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছবে সেই খবরটির জন্য। বিনিময়ে এই?

ওপার থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এলো, 'চমৎকার কাজকর্ম করছিলেন, খানিক আগেও চলে ফিরে বেড়িয়েছেন, আদেশ নির্দেশ দিয়েছেন, হঠাৎ—' থেমে থেকে 'হঠাৎই একটা স্ট্রোক আর কি।'

'কী আশ্চর্য!'

'মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেছে।'

'স্বাভাবিক।'

'এতো অস্থির বোধ করছি যে ফোনটা না করে পারলাম না। জানি তো এতো সকালে ঘুম ভাঙবার কথা নয়।'

'আপনি কখন জানলেন?'

'আমি কাল রাত্তিরেই খবর পেয়েছি। সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি।'

'কী কাণ্ড।'

'ভাবছি আমাদের দেশে এখন কে ওঁকে রিপ্লেস করবে।'

'তাই তো।'

তাই তো। কে ওঁকে রিপ্লেস করবে। জগতেই তো এমন মানুষ দুর্লভ। আমাদের অবস্থা একটা ব্যক্তিগত শোকের আকৃতি নিল। দেশের বাইরে এগারো হাজার মাইল দূরে বসে নিজেদের নির্বান্ধব মনে হলো। এখানে এ কথা কার সঙ্গে বলি? কে বুঝবে? এই জাতিগত দেশগত নৈর্ব্যক্তিক শোকের সময়ে দেশ জাত এবং জনতার জন্যে স্বভাবতই মন বড়ো চঞ্চল হয়। কলকাতা থাকলে এতোক্ষণে আমাদের বাড়ি ভরে যেত লোকে।

বুদ্ধদেব মুখ হাত ধুয়ে রাত-পোশাক ছেড়ে নেমে গেলেন নিচে। রাস্তা পার হয়ে একটু দূরে গিয়েই খবরের কাগজ রাখা আছে গাড়িতে, গর্তে পয়সা ফেলে নিয়ে এলেন একখানা। দেখলাম প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড়ো বড়ো অক্ষরে

বেরিয়ে গেছে খবরটা, সঙ্গে একখানা আবক্ষ ছবি। সমস্ত কাগজখানা চোখের তলায় ঝাপসা হয়ে গেল।

এই সেই মানুষ, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটিবার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গলায় যাঁর নাম প্রতিদিন উচ্চারিত হয়েছে, যিনি আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান পুরুষ, প্রথম প্রতিনিধি, যাঁর জন্যে জগৎসভায় আজ আমরা সম্মানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। দরিদ্র হলেও যে আমরা দীন নই, নিঃসম্বল হলেও লোভী নই, আমরা যে কেড়ে নিতে ঘৃণা করি, আদর্শে বিশ্বাস করি, নীতিকে রাজনীতির কুটিলচক্রে পিষ্ট করি না, ভারতবর্ষের এই সম্মান যিনি বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

কয়েক দিন আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জে একটা অধিবেশন হয়ে গেল। ভিতরে ঢুকবার ছাড়পত্র পেয়েছিলাম। তাতে মার্কিনীরা কোন দেশে কতো ঋণ দিয়েছে, কী চুক্তিতে দিয়েছে, সেই ঋণ কোন কোন দেশ তার প্রতিশ্রুতিমতো কীভাবে শোধ করছে, সেই সবের হিসেবনিকেশ দিচ্ছিলো। দেখা গেল একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোনো দেশই নিয়মিত নয়। যে শর্তে নিয়েছে ভারতবর্ষ আক্ষরিক অর্থে তা পালন করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। অন্যরাও শোধ করছে কিন্তু চুক্তিমতো নয়, সুবিধেমতো। আর 'শোধ করতে পারবো না, যা খুশি করো' বলে যারা মুষ্ট্যাঘাত করছে সামনের ডেসকে তারা সবই কমিউনিস্ট কান্ট্রি।

যার নাম বাক্, যা পৃথিবীর আদি সত্য, তার প্রতি নেহরুর এই শ্রদ্ধা ভারতবাসী হিসেবে আমাদের কম গর্বের কারণ হয়নি। অন্যের চোখেও আদর্শ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে জগতের দুই প্রান্তের দুটি বিবেকবান প্রধান পুরুষের মৃত্যু ঘটলো মাত্র ছ' মাসের ব্যবধানে।

জানতে কৌতূহল হচ্ছিলো এই মৃত্যু এই মার্কিন মুলুকের চেতনাকে কোন স্রোতে প্রবাহিত করছে। রাজনীতি অতি জটিল ব্যাপার, অতি ক্রূর, অতি নিষ্ঠুর। এর ভালোমন্দের কোনো নির্দিষ্ট ছক নেই। সমস্তটাই কেবল স্বার্থ আর সুবিধার অধীন।

কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমস-এ দেখলুম সমস্ত লেখাই সমান সহৃদয়। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নামী লোক। তাঁদের সুলিখিত ভাষণ বেদনাবিদ্ধ ছিলো। নেহরুর মহত্ত্ব বিষয়ে কোথাও কোনো সংশয় ছিলো না সেই সব লেখায়।

বেরিয়ে গিয়ে আরো কয়েকটা কাগজ কিনে আনলুম। বেলা বেড়েছে ততোক্ষণে, খবরটা ছড়িয়েছে, ভারতীয় দেখে অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ছিলো, অনেকেই অনেক কথা বলে অনেক খেদ প্রকাশ করছিলো, এই সূত্রে কেনেডির কথা বলেও দুঃখ করছিলো অনেকে।

সারা দিন ধরে টেলিভিশনে বারেবারে বলছিলো খবরটা, সেই সঙ্গে বক্তৃতাও দিচ্ছিলেন অনেকে। রাত্রের দিকে মৃতদেহটি দেখানো হলো। দেখলাম, যতো দূর চোখ চলে শুধু শোকার্ত জনতার ভিড়। বারেবারেই দেখাচ্ছিলো সেই ভিড়ের দৃশ্য।

বেশী রাত্তিরে প্রায় হাজার মাইল দূর থেকে এক মার্কিন মহিলা ফোন করলেন। ক্রন্দন বিজড়িত গলায় বললেন, 'এ কি হলো। এ কি হলো। তিনি মারা গেলেন? তাঁর মতো মানুষ কি আর কেউ আছে? আমাদের মতো শান্তিকামী লোকেদের যে তিনিই একমাত্র আশা ছিলেন।'

একজন বিদেশিনীর এই ব্যাকুলতা আমাদের মনকে আরো আর্দ্র করলো।

এর পরে যতোটা সম্ভব যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতীয়রাও একত্রিত হলো একদিন। একটি শোকসভার আয়োজন হলো। সেই শোকসভায় মার্কিনী স্ত্রী-পুরুষরাও আপনজনের মতো এসে অংশ নিল পাশে দাঁড়িয়ে।

আবার কমিউনিটি চার্চেও একদিন মিলিত হলেন সকলে। অনেকেই অনেক কিছু বললেন তাঁর সম্বন্ধে। বলতে বলতে অনেকের গলাই ধরে এলো। তারই মধ্যে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন তাঁকে, তাঁর চিন্তাধারাকে, তাঁর সক্রিয় কর্মকে, তাঁর আদর্শবাদের বিশ্বাসকে যে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিলো আমরা ভারতীয়রাও হয়তো এমন গভীরভাবে কখনো তাঁকে তলিয়ে দেখিনি। আমাদের চরিত্রে আবেগও যতো প্রবল শত্রুতাও ততোই প্রবল। এই দায়ের প্রাবল্যে সব বিশ্লেষণ ভেসে যায়।

পরের দিন একটি জীবনালেখ্যও দেখানো হলো টেলিভিশনে। কেম্ব্রিজ-ফেরতা টগবগে একটি যুবক ছটফট করতে করতে এসে দাঁড়ালো চোখের সামনে। সেই যুবকই নানাভাবে নানা কর্মে নানা বয়সের মধ্য দিয়ে একদিন ভারতবর্ষের একচ্ছত্র নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। কখনো তিনি অসহযোগ আন্দোলনের পুরোধা, কখনো তিনি জেলে। কখনো চিন্তিত মুখে বসে আছেন মহাত্মাজীর পায়ের কাছে, কখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায় আপন দেশের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন তীব্র ভাষায়।

ব্রিটিশ আমলের অত্যাচারের নমুনাও দেখানো হলো অনেকটা। লবণ আইনের সময় পুলিসের লাঠির আঘাত, বুটের ঠোক্কর, বেয়নেটের গুঁতো, ঘরে ঘরে ঢুকে হৃদয়হীনভাবে স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে মারপিটের দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে চললো। ক্ষিপ্ত নেহরু ক্ষিপ্ততর হলেন, মহাত্মাজীর মুখ কঠিনতর হলো। সমস্ত দেশ জেগে উঠলো একযোগে, গলায় গলায় কী গর্জন। তারপর একদিন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাদের কর্ণধার হলেন।

সমস্ত দিন ভরে তাঁর কাজ, রাত ভরে তাঁর চিন্তা। তারই মধ্যে কতো পার্টি, কতো সভা আর কতো সমিতি। তিনি যে দেশবিদেশে সকলের কাছেই কতো সহজে অধিগম্য ছিলেন, দেখলাম তার নমুনাও এরা ধরে রেখেছে ছবিতে। বাচ্চাদের সঙ্গে শিশু হয়ে যাওয়া চাচা নেহরুকে দেখলাম, বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধু নেহরুকে দেখলাম, জগতের উচ্চতম রাজপুরুষদের সঙ্গে প্রাজ্ঞ নেহরুকে দেখলাম। আর দেখলাম চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে একাত্ম নেহরুকে। ভাবলেশহীন চীনা মুখে হেসে হেসে যে লোক ঐ সরল সৎ আদর্শবাদী বিশ্বাসপ্রবণ নির্বিরোধী মানুষটিকে দশ বছর ধরে প্রবঞ্চনার গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে শেষে অতর্কিতে এসে ছোরা বসিয়েছে বুকে।

এ কথা মনে করলে কি খুব ভুল হবে যে, এই চীন আক্রমণই তাঁর মৃত্যুর সবচেয়ে বড়ো দরজাটি খুলে দিয়েছিলো? সেই সময়ে যে কতো বড়ো একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিলো তাঁর মাথার উপর দিয়ে তা কি তিনি ছাড়া আর কেউ জানে?

আমরা দেশবাসীরাও কি সারা জীবনের সব ঋণ ভুলে ক্ষমাহীনভাবে তাকাইনি তাঁর দিকে? বন্ধুকে বিশ্বাস করার ভুলের মাসুল অত্যন্ত উঁচু হারেই শোধ করতে হয়েছে তাঁকে।

সব নিঃশব্দে সহ্য করেছেন। তারপর একদিন সেই সহ্যের সীমান্তে পৌঁছে বাহাত্তর বছরের চিরতরুণ যুবকটি হঠাৎ যেন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। আর বার্ধক্যই যে মৃত্যুর বাহক তা কি আমরা জানি না? এ-ও জানি, একই শতাব্দীতে দু'জন নেহরু কখনো জন্মাবেন না।

সেই সময়টায় ওয়ার্ল্ডফেয়ার হচ্ছিলো নিউইয়র্ক শহরে। সারা মানহাটান একেবারে উত্তাল। খুবই উত্তেজক ব্যাপার সন্দেহ নেই। একে বসন্তকাল, তায় এই বিশ্ব মেলার ঢেউ, বলা যায় সবাই যেন সেই তরঙ্গে ভাসমান। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে দেশ।

প্রায় সাড়ে ছ' শো একর জমি জুড়ে আয়োজন হয়েছে এই মেলার। দেশ-দেশান্তর থেকে অগুণতি লোক এসে আলোড়িত করে তুলেছে দ্বীপটিকে। পথে-ঘাটে কেবল মানুষের মিছিল। কাগজে বলছে আনুমানিক দশ কোটি লোক এসে জড়ো হয়েছে এই উপলক্ষে, হোটেলগুলো আকণ্ঠ, ভাড়া বাড়িগুলোর একটি ঘরও কোথাও খালি নেই। মাটির তলায় যে-কোনো রুট থেকে সোজা মেলায় গিয়ে পৌঁছুবার জন্য আল্লাদা রেল চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে, অবিরাম চলেছে সেই ট্রেন, তবু তিল ধারণের জায়গা থাকছে না কোনো ট্রিপে।

কয়েক দিন আগে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্ত সস্ত্রীক এসেছিলেন এ-দেশে। এক বছর পড়িয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন এবার। এলেন শিকাগো থেকে। শিকাগোতেও এঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিলো। এক রাত সারা প্রহর আড্ডা দিয়েছিলেন। ফিরে যাচ্ছেন জেনে মন খারাপ হয়ে গেল। যে ক'দিন থাকলেন নিউইয়র্কে, একসঙ্গে ঘোরাফেরা এবং প্রাত্যহিক সাক্ষাতের মধ্য দিয়েই কেটে গেল সময়। এর মধ্যে একদিন এই বিশ্বমেলাতেও ঘুরে এলাম। তখনো জমে ওঠেনি তেমন, তা ছাড়া এমন বৃহৎ ব্যাপার যে এলোমেলো ঘরে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেল, তবুও কিছুই প্রায় দেখা হলো না।

সাড়ে ছ'শো একর জমি জুড়ে যে কাণ্ডকারখানা তা একদিন এক বেলায় দেখে ফিরবো সাধ্য কি? যদিও পুরো মেলাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ ম্যাপ ছিলো সেখানে, তা হলেও নয়।

শেষে পণ্ডশ্রম করে বাড়িতে ফিরে এসে আরাম করে বসে চা কফি খেয়ে, যারা এই সব হুজুগে মাতে তাদের মুণ্ডপাত করতে করতে ক্লান্তি দূর হলো।

আমি কিন্তু আর একদিন গেলাম। আমার সেই বাড়িটি দেখার বড়ো ইচ্ছে ছিলো, যেটা কিউবা সংকটের সময় তৈরী হয়েছিলো, যখন নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়ে এঁরা ভীষণ ত্রাসিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন, যখন জনগণমনে সুখ শান্তি স্বস্তি বলে কোনো পদার্থ ছিলো না। তারা বলছিলো, এই ভয়ংকর মৃত্যু থেকে আমাদের বাঁচাও।

আর তখনই মাটির তলায় এই আশ্রয়শিবিরের পরিকল্পনা। এই বাড়িটির কথা আমি এর আগেও লিখেছি। অনেক প্রযুক্তিবিদের অনেক জ্ঞান এতে খরচ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত টেক্সাসের একজন ইঞ্জিনিয়র শুধুমাত্র পরিকল্পনাই নয়, তৈরী করে মাটির তলায় গিয়ে নিজেই সপরিবারে বাস করতে লাগলেন। তাঁর দাবি এই যোগ্য নিবাসটি, মাটির উপরে আকাশের তলায় বাস করার চাইতেও অনেক আরামের এবং সুবিধাজনক। পার্ক উদ্যান টেনিস কোর্ট সুইমিং পুল ইত্যাদি সব আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থাই তিনি করেছেন সেখানে। তা হয়তো হলো কিন্তু ইনি যে বলেছেন সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, আকাশের তারা, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, ধূ ধূ দূরের জঙ্গল পাহাড় ইত্যাদিও থাকবে সেখানে সেটা কাগজে পড়েই আমি খোদার উপর খোদকারির এই অচিন্ত্যনীয় (অন্তত আমার পক্ষে) ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। বিজ্ঞাপন দিয়েছে এই চমকপ্রদ বাড়িটিও সেই মেলার একটা বিশেষ আকর্ষণ।

বুদ্ধদেবকে বলে লাভ নেই, সে যাবে না। বলবে, 'কী ছেলেমানুষি।' কিন্তু এই বিদেশে বিভুঁয়ে আমি যাই কার সঙ্গে। শেষে ভেবেচিন্তে ডক্টর রোডেরিক মার্শেল আর তাঁর স্ত্রী মার্গারেটের শরণাপন্ন হলাম। এঁরা যে আমার আবদার সহাস্যে সস্নেহে পালন করবেনই তা আমি জানতাম। এই মার্শেল দম্পতির কথাও আমি আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি। এঁদের তুলনাহীন বন্ধুতায় আমারও যেমন আপ্লুত, এঁদের তুলনাহীন মমতায় বুদ্ধদেবের অনেক ছাত্রছাত্রীও তেমনি সমৃদ্ধ। এ-দেশে তুলনামূলক বিভাগ থেকে যখনই যারা এসেছে, এঁরা স্বামী-স্ত্রী পিতা-মাতার মতো প্রত্যেককেই আদর করে নিয়ে গেছেন নিজের বাড়িতে। ছেলেমেয়েদের মাতার মতো প্রত্যেককেই আদর করে নিয়ে গেছেন নিজের বাড়িতে। ছেলেমেয়েদের সদ্য সদ্য স্বজনবিরহিত কাতর হৃদয়ে স্নেহ সিঞ্চন করেছেন, তারপর তাদের দেখিয়ে শুনিয়ে ঘুরিয়ে যে যেখানে যাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন সেখানে। এসবেব তো কোনো তুলনা নেই।

ডক্টর মার্শেল তো প্রস্তাব শুনে হেসেই অস্থির। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, মার্গারেট তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। ও সব চেনে। বুদ্ধদেবকেও আমি রাজী করাবো, ভেবো না। তার আগে একবার এসো এখানে, রাত্তির খাবে আমাদের সঙ্গে। বড়ো বড়ো কাঁকড়া খাওয়াবো।'

ডক্টর মার্শেলরা থাকেন কলম্বিয়াতে, ভারি সুন্দর একটি ফাঁকা অংশে। পথের ধারে রেলিং ঘোরানো নদী। ওদের বাড়ি যাবার কথায় বুদ্ধদেব খুব

খুশী। আমি আর মেলার কথা বললাম না। জানি ঝামেলা হবে। যা বলবার মার্শেলরা বলুন, আমি কেন অশান্তির মধ্যে যাই।

যেদিন যাবো সেদিন সকাল থেকে খুব হাওয়া বইছিলো। মার্গারেট ফোন করে বললেন, 'তোমরা কিন্তু একটু বেলাবেলিই এসো, হাওয়াটা ভালো না, সাবধান।'

বেলাবেলিই বেরুলাম। বড়ো সুন্দর দিন হয়েছে। হাওয়া, কিন্তু বৃষ্টি নয়, অন্ধকার নয়, রোদের ঝিলিক আছে। তবে সৌন্দর্যভোগ করা হলো না বেশীক্ষণ, আমাদের বাড়ি থেকে কলম্বিয়া সহজ দূর নয়। সুতরাং, ট্রেন ধরার জন্য মাটির তলাতেই নামতে হলো। সেখানে আকাশও নেই, প্রকৃতিও নেই। ট্রেন থেকে নেমে আবার যখন আকাশের তলায় উঠে এলাম, দেখা গেল আমরা ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। মার্গারেট এ বিষয়েও সাবধান করে দিয়েছিলেন। কলম্বিয়া অঞ্চলটাতে সাধারণত নিগ্রোদেরই প্রাধান্য বেশী। দু' একটা পাড়াই সাদাদের দখলে। মার্গারেট বলেছিলেন, 'অনেকেই উপরে উঠবার সিঁড়িতে দিক ভুল করে তারপর মুশকিলে পড়ে। তোমরা যেন সে বিষয়ে সতর্ক থেকো।'

বুদ্ধদেবের ধারণা তাঁর মতো রোড সেন্স খুব কম লোকেরই আছে। এ বিষয়ে এক বিন্দু মতভেদও তিনি সইতে নারাজ। সুতরাং মার্গারেটের এই সতর্কবাণীতে খুব হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন আমি প্রথমবার এসে কলম্বিয়ারই অধিবাসী ছিলাম। তা ছাড়া, পথঘাট আমার ভুল হয় না।'

কিন্তু হলো। এবং এই প্রথম নয়, অনেকবারের মধ্যে আর একবার। অবশ্য সে কথাটা আমি উচ্চারণ করলাম না। অন্ধের মতো চলতে লাগলাম সঙ্গে সঙ্গে। আসলে মার্গারেটের কথামতো সেই ভুল সিঁড়িতেই উঠেছিলাম। উঠেই এমন একটি পাড়ার ভিতরে ঢুকে পড়লাম যেখান থেকে আর বেরুবার পথ পাই না। দেখা গেল একান্তভাবেই সেটি একটা মস্ত বড়ো হার্লেম। এবং স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই রাস্তায়। শিশুরাও। পুরুষেরা প্রায় সকলেই মদের নেশায় উন্মত্ত, মেয়েরাও অনেকে। ঐ পথের মধ্যেই তারা নাচছে, গাইছে, হল্লা করছে, উৎকট ভাষায় গালাগালি করছে, ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে। রাস্তা-ভরতি উনুন জ্বলছে, বারবিকিউ করছে, ডিনারের আয়োজন। বেলা প্রায় ছ'টা, অন্ধকার নেমেছে পথে, তার উপরে হাওয়ার জোর এতো প্রবল হয়ে উঠেছে যে চলতে গেলে পড়ে যেতে হয়।

হাওয়ার জোর আসলে এই রকমই ছিলো, মানহাটানের স্কাইস্ক্র্যাপারের চাপে ঠিক বুঝতে পারিনি। রাস্তার উপরেই মিছিলের মতো এতো নিগ্রো স্ত্রী-

পুরুষের দিকে তাকিয়ে সহসা আমি ভারি ভয় পেয়ে গেলাম। বুদ্ধদেবও কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। ছুটে এসে কয়েকজন ঘিরে ধরলো আমাদের। একজন আমার হাত চেপে ধরলো, 'খাম্ অন হানি! খাম্ অন'। লোকটি পুরো মাতাল। আর একটি মাতাল এসে ঠাস করে একটা চড় মারলো তাকে, 'তুই কে রে? স্কাউন্ড্রেল। এসো হানি, আমি তোমাকে খাওয়াবো। কী খাবে? হুইস্কি? ব্রান্ডি? রাম? জিন?' বলতে বলতেই হাসির ফোয়ারা ছুটলো, 'ছোট্ট পাখি, ও মাই লিটল বার্ড—'। এটা গানের কলি।

আমি প্রায় অজ্ঞান, বুদ্ধদেব ব্যাকুলভাবে একটা ট্যাক্সির জন্য এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, 'বলে দাও কোন দিকে গেলে একটা ক্যাব পাওয়া যাবে। প্লীজ, প্লীজ। আমরা অন্য জায়গায় যাবো।' একজন মেয়ে দৌড়ে এলো, 'চলো, আমি তোমাদের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।' বলে অন্য একটা সিঁড়ি দেখিয়ে দিল, 'এটা দিয়ে নদীর ধার ধরে চলে যাও, ওখানে ক্যাব পাবে।'

ততোক্ষণে ঐ মাতাল দুজনে প্রচণ্ড মারামারি করতে শুরু করেছে। মেয়েটির নির্দেশিত পথে বলা যায় আমরা প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। এগিয়ে আবার এক ধাপ সিঁড়ি নেমে তার পরেই বাঁক নিয়ে নদীর ধার। সেখানে এসে নামতেই একটা হাওয়ার ঝাপটায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। উঠতে চেষ্টা করতেই দুর্দান্ত ঝড় যেন একটা কাগজের ডেলার মতো উড়িয়ে নিয়ে চললো কোথায়। ছুটতে ছুটতে কোনো বাড়ির আড়াল পেয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। মনে হচ্ছিলো না রক্ষা পাবো। এই সময়ে আপাদমস্তক ঢাকা আর একজন লোক এসেও আশ্রয় নিল সেখানে। সে যথেষ্ট বলবান, তা ছাড়া এই আবহাওয়া তার চেনা, সে বুদ্ধি দিয়ে ঝড় ঠেকাবার কৌশল প্রয়োগ করছিলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁচকা টানে অন্য কোনো একটা দিকে সরিয়ে নিয়ে এলো। বললো, 'দেয়াল ধরে শক্ত হয়ে থাক, বাতাসটা বয়ে যেতে দাও। উত্তুরে ঝড়, রীতিমতো ব্লীজার্ড।' দু' হাতে ধরেও রইলো আমাদের দু'জনকে।

হাওয়াটা বয়ে যেতে বোধ হয় মিনিট খানেক লেগেছিলো, তাতেই সব লণ্ড-ভণ্ড। তারপরে একটু কমলে ঐ লোকটিই ছুটে গিয়ে একটা ক্যাব ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'গুড নাইট'। তারপর হেঁটে হেঁটে অন্য দিকে চলে গেল। আমরা যে কতো কৃতজ্ঞ হলাম, বলবারও অবকাশ পেলাম না। তার মুখটাও দেখা হয়নি, শুধু গলার আওয়াজ।

মার্শেলদের তেরোতলা বাড়ির লবিতে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত বিশ্বাস

হচ্ছিলো না পেঁাছতে পারবো। এতো হাওয়া চলছিলো যে ট্যাক্সির দরজাটা আটকানো যাচ্ছিলো না। চালক বলছিলো, 'এর মধ্যে আমরা সোয়ারী নিই না, বিপদের সম্ভাবনা থাকে।'

মিসেস মার্শেল একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন অবস্থা দেখে। বললেন, 'আমি ফোন করেছিলাম, যাতে তোমরা না বেরোও, কিন্তু দেখলাম বেরিয়ে পড়েছ। যাই হোক, ভালোমতো পেঁাছেছো সেটাই ঢের।'

ডক্টর মার্শেলের বাড়ি মনসার পুতুলে ভরতি। সারা ভারতবর্ষে ঘুরে সব প্রদেশ থেকে এই সব সংগ্রহ করেছেন তিনি। এ বিষয়েই তাঁর গবেষণা এখন। ভারি ভক্ত মা মনসার। হাসতে হাসতে বললেন, 'পেঁাছবে না তো কী? মাদার মনসাই নিয়ে এসেছে ফণায় ঢেকে।'

খেতে বসা হলো। সত্যিই বিশাল এক কাঁকড়া এলো প্লেটে। আমি তো কিছুই সুবিধা করতে পারছিলাম না, কৌশলই জানি না খাবার। পাশে বসে সাহায্য করলেন ডক্টর মার্শেল। আন্তরিকভাবেই বলতে পারলাম এই ছোটো ছোটো কচ্ছপের মতো কাঁকড়া খেতে সত্যিই খুব ভালো। আর কাঁকড়া খেতে খেতেই মার্শেল বিশ্বমেলায় যেতে রাজী করালেন বুদ্ধদেবকে।

এত কাণ্ড করেও অবিশ্যি বাড়িটা দেখা হলো না আমার। মেলার মধ্য দিয়েই ছোট ছোট লাইন পাতা হয়েছে, তাতে ট্রামের মতো ছোট ছোট ট্রেন নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে ওখানে। মার্গারেটই অগ্রণী হয়ে টিকিট কেটে আমাদের ওঠালো সেই ট্রেনে, নিয়ে গেল গন্তব্যে। দূর থেকেই দর্শকদের কিউ দেখে ভির্মি খেয়ে ফিরতে হলো। মনে হলো না তিন দিন বাদেও এই জনসংখ্যা ভেদ করে নামতে পারব সেই মাটির তলার মনুষ্যরচিত জগতে।

অগত্যা অন্যান্য দৃশ্য। মার্গারেট বললো, 'চলো স্প্যানিশ আঙিনায় যাই।'

'চলো।'

গিয়ে অবশ্য মুগ্ধ। স্প্যানিশ আঙিনা বিখ্যাত। আমাদের চকমেলানো বাড়ির আঙিনার মতো। চারদিকে ঘিরিয়ে আবার বসবার সোপান। দেখা গেল, নাচের দল এসেছে আঙিনায়। বসবার জায়গা পাওয়া গেল ভাগ্যগুণে। স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়ে প্রায় তিরিশ-চল্লিশজন এসে দাঁড়ালো নাচের পোজ নিয়ে, তারপর একসঙ্গে ঝমঝম করে বেজে উঠলো বাজনা। সেই তালে পোশাকও ঝিলিক দিয়ে উঠলো। মেয়েদের পোশাকের রং প্রায় চোখ-ধাঁধানো গাঢ়, সারা গায়ে হাতের কাজ। সেই রঙে রং মিলিয়ে ছেলেরা পরেছে মখমলের সাজ। সকলের হাতেই

করতালের মতো একরকম বাজনা। মোহের মতো কেটে গেল সময়। ভিতরে ছবির ঘর। কত ছবি। ডালি, মিরো, পিকাসো, গইয়া, ভ্যালাকুই মিরোলিয়োর মাস্টারপীস গোটা একটা মিউজিয়াম। পাশের ঘরে পুরোনো হাতের কাজ, পটারি—দেখলে এদের অতীত গৌরবের কাছে মাথা নোয়াতে হয়।

এর পরেই হাওয়াই। এখানকার হাওয়াই নয়, উনিশ শতকের হাওয়াই। সেই পোশাকে একের পর এক সব ঢেউ হয়ে এসে গীটার নিয়ে দাঁড়ালো, একেবারে ছবি। বাজনার পর ফুলের পোশাকে হুলাহুলা নাচ। সবুজ ঘাসে (তৈরি করা) উন্মুক্ত আকাশের তলায়। ভিতরে আদিকালের হাওয়াই দেশের মডেল। কত পোশাক, কত পাতা-লতার তৈরি জিনিস, কত মাটির ভাণ্ড—দেখতে দেখতে ভুলে যেতে হয় কোন্ কালে আছি।

পনেরোটা স্টেট। ভ্যাটিকেন প্যাভিলিয়ানেও যাওয়া হলো, তারপর ফ্লোরিডা, থাইল্যাণ্ড, চায়না, বেলজিয়ান গ্রাম—এসব ছুঁয়ে ছুঁয়ে শেষে ভারতীয় প্যাভিলিয়ানে এসে হাজির হলাম। জিনিস এসেছে প্রচুর, কিন্তু সাজানোর বিশৃংখলায় কেউ ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, খুঁজে পাচ্ছে না। আর দেখবার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করে যেসব মেয়েদের বা ছেলেদের (ছেলে খুব কম) নিয়ে আসা হয়েছে, অন্যান্য প্যাভিলিয়ানে তারাও প্রায় দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক দেশের ছেলেমেয়েরাই তাদের নিজস্ব পোশাক পরে দেশকে রিপ্রেজেণ্ট করছে, শুধু ভারতীয় মেয়েরাই ছাঁটা চুলে বাঁকা উচ্চারণে ইংরিজি বুলিতে, মুখে চোখে গভীর রং মেখে, শাড়িটাকে প্রায় ফ্রকের কায়দায় বেঁধেছেঁদে পুরো অ্যাংলিসাইজড মূর্তিতে এসে হাজির হয়েছে। কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে, ঢং করছে, এই সব ময়ূরপুচ্ছ লাগানো দাঁড়কাককে কে দেখবে? এরা সবই পাঞ্জাবী মেয়ে। বাঙালী মেয়ে দেখলাম না, মাদ্রাজী বা ওড়িয়াও নেই, একটি আসমীয়া মেয়ে আছে। তাকে দেখেই সব ভিড় করছে সেখানে। মেয়েটি অসম্ভব মিষ্টি। লালপাড় একটি গরদের শাড়ি পরেছে, কপালে লাল টিপ, কোমর ছাপিয়ে লম্বা বেণী, মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব, একটু বা বিপন্ন, ঠেকে ঠেকে আধো আধো ইংরিজিতে কথা বলছে, মনে হচ্ছে যুবকরা আর এই লালিত্যময়ী কন্যাটিকে দেখে দেখে চোখ ফেরাতে পারছে না।

শুনলাম পাঁচ শো মেয়েকে এখানে পাঠাবার যোগ্যতা বিচারের জন্য ইণ্টারভিউ নিয়েছিল, পঞ্চাশজনকে বেছেছে। হংস মধ্যে বক যথা এই নকলনবিসহীন মেয়েটি কেমন করে এই নির্বাচনে ঢুকে পড়েছে কে জানে। আসামের মন্ত্রী তখন চলিহা, কে জানে সেই সুবাদেই হয়তো। মেয়েটিও ঐ বাড়িরই বধূ।

আমাদের দেখে সব ফেলে এগিয়ে এলো। আমার হাত ধরে বললো, 'আমি মীনাক্ষীর বউদি হই। আমি আপনাকে চিনি।' মীনাক্ষী আমার কন্যার সহপাঠিনী, আগে চৌলিহা ছিল, এখন বসু। দেবযানী চৌলিহা এখন দেবযানী চৌলিহা নামে বিখ্যাত নাচিয়ে।

এভানস্টোনে নরেশদের ওখানে দশ দিন অত্যন্ত আনন্দে কাটিয়ে নিউ-ইয়র্ক ফিরে এসে বড় বিরস লাগছিল। কথা আছে সামনের কোনো ছুটিতে খুব শীগ্‌গিরই ওরা আসবে এখানে। দিন পনেরো থাকবে। আমি সেদিনের অপেক্ষাতেই তাকিয়ে ছিলাম। উনিশ শো একষট্টি সালের ভ্রমণ-পঞ্জীতে নিউ-ইয়র্কের পালা তখন আমাদের শেষ হয়ে এসেছে।

এর মধ্যেই 'এশিয়া সোসাইটির' বনি ক্রাউন কিছু একটা জরুরী কথাবার্তার প্রয়োজনে তাঁর আপিসপাড়াতেই লাঞ্চে ডাকল আমাদের। দেখলাম আমরা দুজন ছাড়া আরো একজন তৃতীয় অতিথিকে সে ডেকেছে। অল্পবয়সী অতি সুন্দর এক ভদ্রলোক, নাম সিলবারম্যান, 'ডায়াল পাব্লিসার' কোম্পানীর পরিচালক।

এদের কাগজেই একবার বুদ্ধদেবের 'One or Two Roses' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা কলকাতা থাকতে মিসেস ক্রাউন এঁর কথা বুদ্ধদেবকে অনেক লিখেছিল। এঁরা বুদ্ধদেবের কাছে একটা উপন্যাস চাইছেন। বুদ্ধদেব নানান কাজে বিব্রত থাকায় সে বিষয়ে খুব মনোযোগ দিতে পারেন নি। মাতৃভাষা থেকে ইংরিজীতে ভাষান্তরিত করা কঠিন কর্ম তো বটেই, যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। সে সময় তাঁর ছিল না।

এই দ্বিপ্রাহরিক ভোজ উপলক্ষে বনি ক্রাউনের মধ্যস্থতায় ভদ্রলোক সেই প্রস্তাবেরই নতুন আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। দেখা গেল, ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ এবং উৎসাহ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন, বলছিলেন, তোমরা সর্বদাই রবীন্দ্রনাথকেই উপস্থিত করো বিদেশীদের কাছে। স্রোত যদি সেখানেই থেমে না থাকে তবে তাঁরা কারা, কী তাঁদের নাম, তোমার বিবেচনায় কে কে প্রধান লেখক যদি সে বিষয়ে আমাকে বলো এবং উপদেষ্টা হও তবে খুব ভালো হয়।

ভালো ওদের কতটা হয় বা না হয় সেটা গৌণ, নিজের দেশকে তুলে ধরতে পারলে আমাদের যে সত্যি গৌরব বাড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? স্বভাবতই উৎসাহিত হয়ে ওঠার কথা। হলেনও। কিন্তু ঐ একই সমস্যা। অনুবাদ করবে কে। যে দু'চারজন ভারতীয় লেখকের বই ইংরিজীতে প্রকাশিত হয়েছে

সে দেশে, তাঁদের কথা বলেছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি জানতেন না তাঁরা ইংরিজীতেই লিখেছেন, মাতৃভাষা থেকে ভাষান্তরিত নয়।

একথা শুনে বড় হতাশ হলেন। বললেন, 'তা আমরা চাই না। তোমাদের মাতৃভাষা সাহিত্যে কোথায় স্থান পাবার যোগ্য আমরা সেটাই জানতে চাই। বলতে পার জ্ঞানের পিপাসা। সর্বসাধারণের মধ্যে সেটা ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে চেয়েছি। তোমাদের টেগোরকেও তো আমরা অনুবাদেই পেয়েছি ?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'কতটুকু পেয়েছ ? কত যে পাওনি তার পরিমাণ জানা সম্ভবই নয় তোমাদের পক্ষে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আমাদের একজন প্রধান ঔপন্যাসিকের একখানা বিখ্যাত উপন্যাস "পদ্মা নদীর মাঝি"।'

এইটুকু বলতেই বনি ক্রাউন বলে উঠলো, 'আমি অনুবাদে পড়েছি। ইংরিজী বড় খারাপ। ঠিক বোঝা যায় না।'

'সে জন্যই বলছি কতগুলো নাম শুনিয়ে কী লাভ যদি কখনো তাদের তোমরা পড়তে না পার।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'তা তো সত্যিই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যখন তোমাদের ভাষায় কোনো অভিজ্ঞ লোক নেই তখন তুমিই যদি যোগ্য লোক নির্বাচন করে কাজটা একটু আরম্ভ করে দাও, দু'একখানা ভালো বই বেরুলেই দেখা যাবে মার্কিনীদের মধ্যে মূল ভাষা শেখার একটা উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। তুমি প্রথমে তোমার নিজের একটা বই আমাদের দাও, আমরা খুব খুশী হব। আর্থিক দিক থেকেও তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও সে ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই করব।'

এর পরে দু'একটা উপন্যাসের সারাংশ শুনে 'তিথিডোর' বইটি খুব মনে ধরলো। মুখে মুখে স্থির হয়ে গেল সব কথাবার্তা। বুদ্ধদেব শুধু রাজীই হলেন না, যথেষ্ট উৎসাহিতও হলেন। এবং শুধু তাঁর উপন্যাসই নয় বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লেখকদের লেখার একটা সংকলন গ্রন্থের বিষয়ে প্রস্তাব করেও প্রায় রাজী করিয়ে নিলেন।

আমাদের সাহিত্যের প্রতি এদের এই তৃষ্ণায় আমরা উভয়েই খুব উৎসাহিত হয়ে বাড়ি চলে এলাম। স্থির করলাম দেশে ফিরেই এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের স্ত্রী লীলা রায়, আমাদের জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটা চেষ্টা করা যাবে। অনেকে আছেন, যদি তাঁরা রাজী থাকেন কিছু ভালো বই অনুবাদ করানো হয়তো সম্ভব হবে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই

দেশে ফিরে এমন একটা ভয়ঙ্কর শত্রুতার কবলিত হতে হলো বুদ্ধদেবকে যার নিশ্ছিদ্র নীচতা তাঁর অনেক মূল্যবান চিন্তা এবং মূল্যবান সময় অতর্কিত বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

সেই সময়ে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মার্কিনমুলুকে সত্যিই বেশ একটা আবেগের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। এক বাড়িতে গিয়ে একটি মার্কিনী কন্যার মুখে 'হামরা নটুন যৌবনেরি ডুট' শুনে চমৎকৃত। কিছুদিনের মধ্যেই টেগোর সোসাইটির উদ্যোগে ভারতীয় এবং মার্কিনীরা সমবেত হয়ে 'রাজা' নাটকটি মঞ্চস্থ করল। রানী, সুরঙ্গমা এবং রোহিনী তিনজনই ভারতীয় (যদিও বাঙালী নয়) কিন্তু কী সুন্দর করেছে। কী বাচনভঙ্গি, কী চমৎকার ইংরিজী উচ্চারণ, আর কি নিখুঁত অভিনয়। দেখতেই বা কী সুন্দর মেয়ে তিনটি। বিশেষ করে রানী তো একেবারে অতুলনীয়। বাকি সবাই আমেরিকান। আমেরিকান ঠাকুরদাদাটি দারুণ মিষ্টি।

রানীর আকুলতায় রাজা যখনই ছায়া হয়ে দেখা দিচ্ছেন আধো অন্ধকার কক্ষে, মঞ্চের উপর সেই ছায়া মনে হচ্ছিল ঈশ্বরের ছায়া। বিশাল বিরাট এক অপূর্ব গ্রীক দেবতার ভাস্কর্যের মতো তার দেহসৌষ্ঠব। যতবার দেখছিলাম ততবার রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। কী হাততালি। 'ব্র্যাভো ব্র্যাভো' রবে প্রেক্ষাগৃহ উচ্চকিত। সেই ছায়া একটি নিগ্রো যুবকের।

কিছুদিন বাদেই আবার সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে ছায়াছবির বিজ্ঞাপনে শহর ভরে গেল। বুদ্ধদেব টিকিট কেটে নিয়ে এলেন! সকালবেলায় আবার আকাশের মুখ অন্ধকার। আমাদের চেলসী হোটেলের বারান্দার আঙুরলতা কাটা কালো কুচকুচে লোহার রেলিং থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু হলো। দিন ভরা রোদ না থাকলে আমার একটুও ভালো লাগে না। এখানে তো লাগেই না, কলকাতায়ও না। বর্ষাকাল বুদ্ধদেবের প্রিয়। আমি ছটফট করি সূর্যের জন্য। সূর্য কক্ষনো পুরোনো হয় না আমার কাছে।

এ দেশে এসে যা বুঝলাম, তিনটে ঋতু খুব প্রবল। আর যেটা মেঘ বৃষ্টি সেটা সব ঋতুরই সখা। সব সময়েই তার স্বাধীন গতিবিধি। শীতেও আছে, বসন্তে হেমন্তেও সে স্তব্ধ হয়ে বসে নেই। কোনো দিন যদি কোথাও কোনো উৎসবের উপলক্ষ থাকে তবে তো আসবেই ঘনঘটা করে।

আমাদের তিনটে টিকিট কাটা ছিল। আমরা দুজন আর আমাদের এক বান্ধবী। কথা ছিল সিনেমাটা দেখে বুদ্ধদেব রাত্তিরের ক্লাস করতে

ইয়ুনিভার্সিটিতে চলে যাবেন, আমি ফিরে আসব সেই বান্ধবীর সঙ্গে। এই বান্ধবীটি বাঙালী। আমার একান্তভাবেই বান্ধবী, কিন্তু সম্পর্কে বুদ্ধদেবের ভগিনী। এর নামও রাণু। রাণু ঢাকার মেয়ে, আমরা উভয়েই যখন অবিবাহিত ছিলাম, সেই সময়েই আমাদের পরিচয়। রাণু অবিবাহিত অবস্থাতেই সতেরো আঠেরো বছর বয়সে তার কাকার সঙ্গে এ দেশে চলে আসে।

তার কাকা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী পরমানন্দ। ইনিই আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্থাপয়িতা, কোহাসেটে এঁর স্থাপিত বিশাল আশ্রম বিপুলসংখ্যক বিদেশী সন্ন্যাসীর দ্বারা আকীর্ণ। সেই আশ্রমের শাখাপ্রশাখা অন্য রাজ্যেও বিস্তৃত।

পরমানন্দ বহুকাল আগেই গত হ'য়েছেন, কিন্তু তাঁর সেবাশ্রম স্থায়ীভাবেই সমুজ্জ্বল। রাণুর এক দিদি গায়ত্রী দেবীই হচ্ছেন সেইসব আশ্রমের একচ্ছত্র নেত্রী। আশ্রমমাতা। এই মাদারের রূপের কোনো তুলনা নেই। অল্পবয়সে বুদ্ধদেব এই পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এদের কথা তিনি তাঁর 'ছেলেবেলা' নামের বইতে অনেকটাই লিখেছেন। এদের দাদা প্রভু গুহঠাকুরতা বুদ্ধদেবের সেই জীবনে এক বিশেষ মানুষ। মানুষও তিনি বিশিষ্ট ছিলেন।

প্রভু গুহঠাকুরতার বোনেদের কারো কারো সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য থাকলেও তাদের এই দাদাকে আমি বিবাহের পূর্বে কখনো দেখিনি। দেখলাম বিবাহের পরে। তখন আমরা রসা রোডের মোড়ে গোলাম মহম্মদ ম্যানসনের একটি তেতলার ফ্ল্যাটে থাকি। ভদ্রলোককে দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। প্রভু গুহঠাকুরতা শুধু যে বিদ্যায় বুদ্ধিতেই উচ্চাঙ্গের মানুষ ছিলেন তাই নয়, রূপেও তিনি কন্দর্প। আমার ঠিক মনে পড়ছে না তাঁর স্ত্রী নীলিমাদেবীও সঙ্গে এসেছিলেন কিনা। তবে পরে অনেক দেখেছি। দেখে মনে হয়েছে তাঁকে বিদ্যুৎ আখ্যা দিলেই বোধহয় ঠিক হবে। তিনি রূপবতী নন, শ্রীমতী। কিন্তু কী তাঁর জমকালো উপস্থিতি, দুরন্ত কথাবার্তা, বুদ্ধির চমক, চূড়ান্ত ফ্যাসান—সবটা মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের সমাজে আমার কাঁচা বয়সকে চমকে দেবার মতো মেয়ে।

দেখা হতেই প্রভু গুহঠাকুরতা বললেন, 'এই তো আমাদের ঢাকার রাণু, রাণু সোম। বাব্বা, চোখ সার্থক হলো কিনা এতোদিন পরে? কী কাণ্ড? আগে দেখা হলে কতো ভাল হ'তো। আমরা ছেলেরা চাই ভালো ভালো মেয়েরা সব অবিবাহিত থাকুক। কী বলো বুদ্ধদেব?' তারপরেই খুব হাসি,

এমন কুৎসিত দর্শন বাড়িটির পিছনেই যে এমন ভয়ংকর সৌন্দর্য লুকোনো ছিলো কে জানতো। আরো সন্ধান মিললো পরের দিন স্নান করতে গিয়ে। সমুদ্র তো সমুদ্র নয়, এতো কাছে যে মনে হয় খিড়কির পুকুর। জন মনিষ্যিরও চিহ্ন না থাকায় মনের আনন্দে বালুবেলাতেই সময় কাটছিলো। আমাদের মালিকানী এসে পা ছড়িয়ে বসলো আলাপ করতে। অবিশ্রান্ত বিড়ি খাচ্ছিলো, এবার বুদ্ধদেবের কাছ থেকে গোল্ডফ্লেক চেয়ে নিয়ে মনের সুখে টানতে টানতে বললো, 'বুঝলে মাস্টার, এইটুকু বয়সে এতো সিগেরেট খেয়ো না ; ফুসফুস ফুটো হয়ে যাবে। খোকিকে আমার কাছে দাও, তারপর তোমরা চান করে নাও।'

এসব বিষয়ে খোকিকে নিয়ে আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে ছিলো না, পথে ঘাটে সর্বদাই মালের মতো তাকে আমরা কুলির কাঁধে চরিয়ে ঘুরেছি। এই রমণীকেও সে অপছন্দ করলো না। সামান্য গাঁইগুঁই করেই চলে গেল তার সঙ্গে, আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকলাম স্নানের সরঞ্জাম নিতে। ফিরে গিয়েই দেখি আরো দুজন মানুষ নেমেছেন স্নান করতে। তাঁদের একজন এম. সি. সরকারের স্বত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকার, অন্যজন তাঁর বন্ধু। বুদ্ধদেব আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলে গেলেন কাছে। আমি তো এঁদের বউমা, সুতরাং লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে, মাথার আঁচল একটুও পড়তে না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম দূরে।

এই অতলান্ত মহাসাগরের ব্যাকওয়াটার দেখে একষট্টি সালে আমার সাঁইতিরিশ সালের বঙ্গোপসাগরের ব্যাকওয়াটার মনে পড়ে গেল। ডক্টর ক্লার্কের বারো বছরের কন্যাটি অন্তরঙ্গ হয়ে ফিসফিস করলো, 'ড্যাডিকে বলো, আমরা স্পীডবোটে চড়বো।'

দেখলাম এই ব্যাকওয়াটারের তীরে অনেক আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। তৈরী করা ঘাটে সব সাদা সাদা ডিঙি, মাছ ধরার জায়গা, বসবার জন্যে ছাতার তলায় আসন, ক্লাব ঘর, জলের উপর অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা সাঁকো—মিসেস ক্লার্ক ডাকলেন, কাজেই তাঁর কন্যার স্পীডবোটে চড়ার আবদারটা তার ডাডিকে আর জানানো হলো না।

এতোক্ষণে ওঁদের বড়ো মেয়েটিকে দেখলাম। মেয়েটি যে কী সুন্দরী বলা যায় না। ঢেউতোলা পিঠে ছাপানো সোনালী চুলগুলো যেন স্বপ্ন। নীল রংয়ের মদির চোখ তুলে বললো, 'সে আমাদের সঙ্গী হতে না পারার জন্য লজ্জিত এবং দুঃখিত। সামনেই কী পরীক্ষা। পড়া তৈরি করছে বসে বসে। মিসেস ক্লার্ক

স্বামীর সাহায্য ব্যতিরেকেই চটপট সব কিছু তুলে ফেললেন গাড়ির পিছনে, তারপর বসলেন এসে আমার পাশে। বোঝা যাচ্ছিলো খুব কাজের মানুষ।

অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদ্র-তীরে এসে পৌঁছুনো গেল। কিছুটা দূর থেকেই হাওয়ার ঝাপটা মুখে এসে লাগছিলো। গাড়ি পার্ক করে কাছাকাছি আসতে একেবারে উড়িয়ে নিল। ধারে এসে দাঁড়িয়ে মহান বিস্তারের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে গেলাম। তা হলে এই অতলান্ত মহাসাগর!

সুন্দর রোদ দেখে রোববারের দুপুরে আরো অনেকেই এসেছে, মাইল ব্যাপী বৃক্ষশোভিত সমতলে আগন্তুকেরা কেউ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সূর্যের তাপ নিতে, কেউ প্রণয়ে আসক্ত, কেউ দল বেঁধে হুল্লোড়ে মত্ত, কেউ ছবি তুলছে ঘুরে ঘুরে, কেউ কেউ বা উনুনে মাংস সেঁকছে—মিসেস ক্লার্ক খুঁজে খুঁজে সুন্দর একটি জায়গা বেছে নিলেন।

সাধারণত সমুদ্রের ধারে যেমন ঢালু হয়ে তীর নেমে যায় এ সে রকম নয়। উপরে মাঠের মতো সমান জায়গা, নিচে সমুদ্র, ধারে পাহাড়ের মতো বিশাল বিশাল সাদা কালো সবুজ লালচে উপলখণ্ড। একেবারে জলের ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে উঁচু হয়ে হয়ে। দোতলা তেতলা সমান ঢেউ ছুটে এসে এসে ধাক্কা খাচ্ছে সেই পাথরে, ফেটে চৌচির হয়ে রুষে ফুঁসে উৎক্ষিপ্ত জলে ঝরনার সৃষ্টি করে ফিরে যাচ্ছে আবার। আবার আসছে, আবার যাচ্ছে। এই খেলা চলছে অবিরত, অনিবার। আমি ছোটো মেয়েটির হাত ধরে নেমে গিয়ে একটা পাথরের উপর দাঁড়ালাম, আমাদের শরীর ভিজে যাচ্ছিলো। ডক্টর ক্লার্ক এগিয়ে এসে ছবি তুললেন কয়েকটা। মিসেস ক্লার্ক ততক্ষণে টেবিলে ঢাকনা পেতে, বাস্কেট থেকে কাটাচামচে প্লেট গ্লাশ সাজিয়ে খাবার জায়গা করে ফেললেন। ভুল নেই কিছুতেই, একটি ফুলদানিও নিয়ে এসেছেন ফুল সমেত, সেটিও রাখলেন মাঝখানে।

ভ্রমণবিলাসীদের জন্য সব ব্যবস্থাই আছে। জায়গার তো অভাব নেই, মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে সিমেন্টের টেবিল পাতা, দু' দিকে দুটি লম্বা হেলান দেওয়া সিমেন্টের বেঞ্চ। ছোটো বড়ো সব রকমের টেবিলই আছে, দুজন চারজন ছজন আটজন যার যেমন দরকার।

সবাই অবশ্য টেবিলে বসে না, কেউ কেউ মাঠের উপরই চাদর পেতে খাবার সাজায়। অনেকে তো শুয়েই আছে।

যতোক্ষণ বাড়ি পৌঁছুলাম ততোক্ষণই সে আলাপ করলো। শুধু তাই নয়, একদিন এসে আমাদের দুজনকে দু'টি উপহার দিয়ে গেল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের দু'টি ভারি ভারি দুষ্প্রাপ্য খাঁটি রুপোর ডলার।

তখনই বললো, সে ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়ে। যতোদিন ফ্রেশম্যান, সফোমোর, আর জুনিয়ার ছিলো ততোদিন মা বাবা চালিয়েছেন, কিন্তু এখন সে সিনিয়ার গ্রুপ, সাবালিকা, এখন নিশ্চয়ই তাঁদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। তাছাড়া এই কিছুদিন আগে এক সহপাঠীকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে, তাই স্বামীকে এবছর গ্র্যাজুয়েট হ'তে দিয়ে নিজে সেই সংসারের খরচ চালাবে, পরের বছর স্বামী উপার্জন করবে সে গ্র্যাজুয়েট হয়ে নেবে।

জীবনযাপনের এই পদ্ধতি আমাকে কম বিস্মিত করেনি। যে কোনো কাজে এই দ্বিধাহীনতাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

রাণুর সঙ্গে দেখা হলো যখন ফিরে আসছিলাম। এইট্থ্ অ্যাভিনিউর তেইশ স্ট্রীটের স্টেশনটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। এই সময়েই দেখি ও পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সব দিনই শাড়ি পরে না, ভাগ্যগুণে সেদিন পরেছিলো। শাড়ি না পরলে আমরা লক্ষ্য করতাম না।

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কিছু কিনছিলো, বুদ্ধদেব বলে উঠলেন, 'আরেঃ রাণু না?' তারপরই এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কী আশ্চর্য! তুমি?'

'ওমা তুমি! কী কান্ড!'

এমনভাবে দেখা হ'য়ে যাওয়াটা সত্যিই কান্ড।

এরপরে একসঙ্গে উঠে এলাম মাটির উপরে। কথা আর ফুরোয়না। এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে উভয় পক্ষই সমান আনন্দিত। রাণু বললো, বুদ্ধদা যে এখানে এসেছে তা আমি ভাসা ভাসা শুনেছি কিন্তু উপায় কী এই বিশাল নগরে কেউ কোনো ঠিকানাবিহীন মানুষকে খুঁজে বার করবে। রাণুও তখন বছরখানেক যাবত নিউইয়র্কবাসিনী।

দেখলাম বাংলা বলতে অনভ্যস্ত হ'য়ে গেছে, বেশ কয়েকটা বর্ণ ঠিক মতো উচ্চারিত হচ্ছে না জিবে। তবু আমার সঙ্গে যতোটা সম্ভব বাংলাতেই কথা বলছিলো, আর তার চোখেমুখে সবচেয়ে যেটা বেশী করে ফুটে উঠেছিলো সেটা কবেকার ফেলে আসা দেশের প্রতি দুর্নিবার ভালোবাসা এবং ফিরে যাবার আকুতি।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে এসে চল্লিশে পা দিয়েও সে আকুতি কমলো না।

মাতৃভূমি একটা বস্তুই বটে। আমাকে দেখে তার ঢাকার স্মৃতি উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। খেয়ে যাবার জন্য ধ'রে রাখলুম তাকে, দিশী রান্না ভাত তরকারি মাংস খেতে খেতে স্বাদে গন্ধে একেবারে বিমুগ্ধ। যখন যাবার জন্যে উঠলো, অর্থাৎ না উঠলেই নয়, তখন ঠিক থাকলো, কাল এসে বাচ্চাদেরও তাদের মামীর হাতের এই অপূর্ব রান্না খাইয়ে নিয়ে যাবে। এরপরে যতোদিন রইলাম রাণুর নিত্য-নিমন্ত্রণ, রাণুকে ছাড়া আর আমরা কিছু ভাবি না। আর রাণুও সেই সময়টায় কোনো ব্যক্তিগত কারণে খুব উদ্‌ভ্রান্ত ছিলো, এই মিলন তার পক্ষেও সান্ত্বনার হলো।

সত্যজিৎ কৃত রবীন্দ্রনাথের জীবনী-চিত্র যে কোন্ পাড়ায় কোন্ হলে হচ্ছিলো তা আমার মনে নেই। হলটা বেশী বড়ো নয়। দোতালায় পিছনের দিকে গিয়ে বসলাম। শুরু হ'লো ছবি। দেখতে দেখতে সত্যজিতের হাতের গুণে একসময়ে সত্যমিথ্যার ভেদাভেদ ভুলে গেলাম, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত হ'য়ে আমাদের সঙ্গ দিতে লাগলেন। সত্যজিৎ তো আর ছবিকে শুধু ছায়াতেই ধ'রে রাখেন না, সাহিত্যের দরজায় উত্তীর্ণ করে দেন।

কিছুক্ষণ আগেই বুদ্ধদেব উঠে গিয়েছিলেন। তখন জানি না কেন গিয়েছিলেন, রাণু বলছিলো, বোধহয় কলেজের সময় হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা চাপা চাপা মৃদু ফোঁপানির শব্দে অনেকেই চকিত হ'য়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। আসলে নিজেকে সংযত করতে না পেরেই বুদ্ধদেব সকলের পিছনে একেবারে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিছুতেই কান্না দমন করতে পারলেন না।

দেশে থাকলে এই শব্দ হয়তো আরো অনেক হৃদয় দলিত করেই বেরিয়ে আসতো। কিন্তু এখানে এই শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত প্রেক্ষাগৃহে এই শব্দ হয়তো স্বাভাবিক নয়। রাণু ফিস্‌ফিস্ করলো, 'বুদ্ধদা।'

আমি রুদ্ধস্বরে বললাম, 'জানি।'

তারপর লক্ষ্য করে দেখলাম, কখন বেরিয়ে গেছেন বাইরে।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরাও বাড়ি ফিরে এলাম। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিনগুলো আমার মনে পড়ছিলো। শান্তিনিকেতনে গিয়ে মৃত্যুর ঠিক আগেই কয়েকদিন ছিলাম আমরা তাঁর কাছে। যখন গিয়েছিলাম তখন অতটা অসুস্থ ছিলেন না, পিছনের বারান্দায় বসতেন, কথা বলতেন, ডেকে পাঠাতেন। যখন ফিরি তখন ডাক্তাররা একান্তভাবেই বিশ্রামে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারো

সঙ্গে দেখা করাই প্রায় বারণ। শুধু 'দিদিমণি, সান্ত্বনার খনি' নন্দিতাই (মীরা দেবীর কন্যা) সর্বক্ষণের সেবিকা। আসবার দিন দেখলাম সকলের মুখই থমথমে। উত্তরায়ণের খাবার ঘরে দাঁড়িয়ে প্রতিমাদেবীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। ধু ধু দুপুর তখন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঘর অন্ধকার ক'রে আলো জেলে রাত তৈরি করা হয়েছে। প্রতিমাদেবী বললেন, 'সূর্য না ডোবা পর্যন্ত তো বাবুমশায়কে শোয়ানো যায় না, আজকাল ডাক্তাররা এই কৌশলই ক'রে দিয়েছেন, বলা হয় এখন রাত।'

আমি অন্যায়ভাবেই একটু দেখে যেতে চাইলাম।

শোবার ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিলো, প্রতিমাদেবী খুব আস্তে একটু ফাঁক ক'রে দিলেন, মাথার কাছে একটি আলো জ্বলছে, তাঁর হাতে একখানা বই, কিন্তু পড়ছেন না। আমি মোহের মত্নে কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচু হ'য়ে পায়ে হাত রাখলাম, তিনি নিঃশব্দে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

সেই শেষ। তারপরেই অস্ত্রোপচারের জন্যে কলকাতায় নিয়ে আসা হ'য়েছিলো। বুদ্ধদেব যেতেন। আমি আর দেখিনি। অবস্থা যখন সংকটাপন্ন, দু'রাত বুদ্ধদেব ফেরেননি। আমাকে বলেছিলেন কাল তোমাকে নিয়ে যাবো। সেই কাল কালস্রোতে হারিয়ে গেল।

আমার পাঁচ বছরের কন্যা নিচে খেলতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সংবাদ নিয়ে এলো, 'মা, গল্পের রাজা মরে গেছেন।'

'এক যে রাজা ছিলো' এই গল্প শুনতে শুনতে যখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রথম সে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলো, তৎক্ষণাৎ ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠেছিলো, 'মা এই দ্যাখো গল্পের নাজা—'। সেই থেকে উনি ওর গল্পের রাজা অর্থাৎ কল্পিত রাজার বাস্তব রূপ। এ-ও স্মৃতি।

নিউইয়র্কের পাশেই কনটিকেট নামে একটি শহর আছে। ভারি সুন্দর শহর। একেবারে সমুদ্রের তীরে। মাত্রই এক ঘণ্টার রাস্তা। এক সকালে সেখানে গেলাম। সেখানকার একটি গির্জেতে বক্তৃতা ছিলো বুদ্ধদেবের। এ পর্যন্ত কোনো গির্জেতে গিয়ে আর বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পাননি। সব সময়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানেই নানা শহর পরিভ্রমণ। গির্জেতে যাবার প্রস্তাবে বেশ কৌতূহলই হয়েছিলো।

বক্তৃতা ছিলো বেলা দশটা নাগাদ। সকালেই বলা যায়। তাঁদের নিজস্ব

গাড়ি এসেছিলো নিয়ে যেতে। গিয়ে পেঁছুতেই ধর্মযাজকরা বেরিয়ে এলেন। এই পুরোহিতদের মধ্যে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সহ আরো কয়েকজন শিক্ষাব্রতীও ছিলেন। শ্রোতারা সব ছাত্রছাত্রী নয়, শহরের উচ্চপদে সমাসীন বয়স্ক ব্যক্তিরা। ভারতবর্ষ বিষয়ে কেউ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান পুরোহিত জ্ঞানে বিজ্ঞানে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। বৃদ্ধ হয়েছেন, ধবধবে পোশাকে, গাত্রবর্ণে, দাড়িতে দেবতাভ্রমে তাকিয়ে থাকতে হয়। বেদবেদান্তে দখল আছে তাঁর, একটু একটু জ্যোতিষ চর্চা করেন, ভারতীয় দর্শনে অগাধ শ্রদ্ধা।

গির্জেটি মনোহর। অবশ্য সব গির্জেই মোটামুটি এক রকম। এঁরা রোমান ক্যাথলিক, তাই নানা মূর্তি এবং পাথরশোভিত গির্জেটি আমাদের মনে মন্দিরের ভাব উদ্রেক করলো।

দিনটি চমৎকার ছিলো। আকাশ নির্মল, চারপাশে গাছে ভর্তি ছায়াচ্ছন্ন রোদ, ফুল বাগানে ফড়িং প্রজাপতির ভিড়, পাখির কলরব, আর উত্থিত সুগন্ধ —সবটা মিলিয়ে আশ্রমের আবহাওয়া যেন পবিত্রতার প্রতীক। পিতারা পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। এ পাশে ও পাশে ধার ঘেঁষে কার্পেট মোড়া দুটি রাস্তা সোজা উঠে গেছে মঞ্চের উপর, মাঝখানে বসবার জন্য কারুকার্যখচিত মেহেগনি আসনের মাঝখান দিয়েও একটি রাস্তা।

বক্তৃতার প্রধান বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ হলেও আলোচনা শেষ পর্যন্ত তুলনামূলক ভাবে পৌরাণিক তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। ঘড়ির কাঁটা সময়ের বাইরে অধিক দূরে চলে গেলেও পণ্ডিতদের আগ্রহ নিবারিত হলো না। তবু এক সময়ে ভাঙতেই হলো সভা।

লাঞ্চের ব্যবস্থা অধ্যক্ষের গৃহে। গৃহিণীটিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হালকা ছিপছিপে হাসিখুশি আমারই বয়সী এক মহিলা। বাড়িতে নিয়ে আসতে আসতে তাঁর সংসারের যাবতীয় খবর জানিয়ে দিলেন। ছেলে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, সেখানেই থাকে। দুটি মেয়ে আছে। একজনের বয়েস বারো, আর একজনের সতেরো, মেয়ের একটি প্রেমিক আছে, ভালো ছেলে, 'গোয়িং স্টেডি', কিন্তু মেয়ে গ্রাজুয়েট না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ না করুক সেটাই তাঁদের ইচ্ছে, ইত্যাদি। তার পরেই বললেন, 'আজকের দিনটা এতো সুন্দর যে ইচ্ছে করছে আপনাদের আপত্তি না থাকলে বাড়ি থেকে খাবার দাবার নিয়ে সমুদ্রতীরে চলে যাই, সেখানে গিয়ে আকাশের তলায় বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে আহার গ্রহণ করি।'

অতি উত্তম প্রস্তাব। এতে আর কারোই আপত্তি থাকতে পারে না।

গির্জে থেকে তাঁদের বাড়ির দূরত্ব নেহাৎ মন্দ নয়। তা ছাড়া সারা শহরটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে নিয়ে এলেন অধ্যক্ষ ডক্টর ক্লার্ক, গম্ভীর দর্শন সুপুরুষ ব্যক্তি, স্বল্পবাক্।

দু'পাশে বৃক্ষশোভিত খুব সুন্দর একটি রাস্তার উপরে একটু উঁচুতে উঠে তাঁর বাংলো। আমেরিকানদের ঘর সাজাবার পদ্ধতি ঠিক ইংরেজদের মতো সোফাসেটি অটোমান, কর্নার সেলফ ইত্যাদিতেই আবদ্ধ নেই। তার বদলে প্রয়োজন মতো সব হালকা হালকা চেয়ার ইজিচেয়ার অগুণতি কুশনশোভিত লম্বা আসন, আসনের গদি ইত্যাদি নানা রংয়ের এলোমেলো বস্তু তাঁরা আমদানি করছেন। অধ্যক্ষের ঢাকা গোল বারান্দা এবং ওঁদেরই ভাষায় বিশাল লিভিংরুমটি সেই আধুনিক আসবাবে আধুনিক পদ্ধতিতেই সুসজ্জিত। সারা দেয়াল জুড়ে সিলিং পর্যন্ত বইয়ের পাহাড়। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পাশের জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনে তাকিয়ে আমি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে উচ্ছ্বসিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সমুদ্র! সমুদ্র!'

ডক্টর ক্লার্ক নিঃশব্দে হেসে পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর বাকসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, 'ব্যাক ওয়াটার। চলুন দেখিয়ে আনি।'

মিসেস ক্লার্ক খাবার গুছোতে গিয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বাথরুমে গিয়েছিলেন, ওঁদের বারো বছরের মেয়ে আমাকে দেখছিলো গভীর মনোযোগ দিয়ে, সে নেচে উঠে হাত ধরলো, 'চলো।'

জলটা একেবারেই বাড়ির পিছনে, ভেজা ভেজা পা বসে যাওয়া লম্বা লম্বা ঘাসের উপর দিয়ে সামান্যই কয়েক কদম হাঁটতে হলো। তার পরেই দিগন্তব্যাপী জলরাশি বিছিয়ে আছে পাটির মতো। অবশ্য ঠিক পাটির মতো নয়। মাঝখানটা শান্ত দেখালেও ধারে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ ধাক্কা খেয়ে ফেনা তুলছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ডক্টর ক্লার্ক মৃদুস্বরে বললেন, 'অ্যাটলান্টিকের ব্যাকওয়াটার। আমরা এই অ্যাটলান্টিকের তীরেই যাবো এখন।'

'অ্যাটলান্টিকের ব্যাকওয়াটার!'

'ব্যাকওয়াটার আগে কখনো দেখেছেন?'

মনে পড়লো দেখেছি। সেই কবেকার কথা, যেন পূর্বজন্মের। বিয়ের কিছুকালের মধ্যেই ওয়ালটেয়ার বেড়াতে গিয়েছিলাম, পথে গোপালপুর-অন-সি। ক্লান্ত হয়ে নেমে পড়েছিলাম সেই মধ্য স্টেশনে। তখন এখনকার মতো

এমন কঠিন ছিলো না ভ্রমণ। এমন অসম্ভব ছিলো না জায়গা পাওয়া। যে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে গেলেই হলো, কতো টিকিট চাও ? কোন ক্লাশের চাও ? সব মজুত আছে। যে কোনো জায়গায় যাও, স্টেশনে নামলে হোটেলের লোকেরাই নিয়ে যাবে সাধ্যসাধনা করে। সেভাবেই হঠাৎ ঠিক করে চলে গিয়েছিলাম।

সঙ্গে আমাদের এক বছরের কন্যা মীনাক্ষী। বেলা বেড়ে উঠতে উঠতে সে ছটফট করছিলো সেই ট্রেনের দীর্ঘস্থায়ী আবাস ছেড়ে মাটিতে নামার জন্য। অতএব এসো এখানেই নামি। তখনই বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'ভালোই হলো, গোপালপুরের বিখ্যাত ব্যাকওয়াটারটাও দেখা হয়ে যাবে।' সেই স্টেশনে অবিশ্যি কোনো হোটেলের কোনো লোক আমাদের সাধ্যসাধনা করতে উপস্থিত ছিলো না। সেই ধরনের কোনো হোটেলই ছিলো না সেখানে। কিন্তু ইংরেজ আমলের ডাক-বাংলো ছিলো সর্বত্র। একটি ফিটনে চড়ে ডাকবাংলোর সন্ধানেই গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি সেটি সেদিন কী কারণে সব শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষে ভর্তি। তখন সেই ফিটন চালকই আমাদের অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে এলো, বললো, 'এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, দাম সস্তা।'

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে বালুকারাশির উপরেই মস্ত এক ইট বার করা বাড়ি, কোনো কম্পাউন্ড বা ফটকের বালাই নেই, ঢোকবার মুখে ধারে দুটি বসবার সিমেন্টের বেঞ্চি রেখে খিড়কির দরজার মতো এক দরজা দিয়ে ভিতরে গেলে তবে জানা যাবে সন্ধান আপিসটি কোথায়।

ভিতরে গিয়েও কোনো বাগান বা আঙিনা ছিলো না, সেই বালির উঠোন। সেই উঠোনটি মাঝখানে রেখেই চারপাশে সব ঘর। ঘরের বাইরে খোলা বারান্দা। একটি মোটাসোটা দীর্ঘাঙ্গী কুচকুচে কালো দক্ষিণী রমণী এগিয়ে এসে আমাদের ভেকু ভেকু চেহারার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী চাই ?' বললাম, 'একটু থাকবার জায়গা পাওয়া সম্ভব কিনা এবং কার কাছে গেলে সেটা জানা যাবে।'

খটখটিয়ে হেসে উঠে হিন্দিতে বললো, 'এই আমার কাছেই জানবে। আও খোকি আও।' হাত বাড়িয়ে কোলে নিল মেয়েকে। শূন্যে তুলে আদর করতে করতে ডান দিকের বারান্দা দিয়ে নিয়ে এলো ঘরে।

একটি ঘর নয়, বিরাট বিরাট তিনটি ঘরের মালিক করে রেখে চলে গেল নিজের কাজে। ভাড়া দিনে দু টাকা। পিছনে দরজা খুলেই দেখি বালুবেলা, তার পরেই সমুদ্র। পাশে অদূরেই ব্যাকওয়াটার ঢুকে এসেছে শহরে।

এমন কুৎসিত দর্শন বাড়িটির পিছনেই যে এমন ভয়ংকর সৌন্দর্য লুকোনো ছিলো কে জানতো। আরো সন্ধান মিললো পরের দিন স্নান করতে গিয়ে। সমুদ্র তো সমুদ্র নয়, এতো কাছে যে মনে হয় খিড়কির পুকুর। জন মনিষ্যিরও চিহ্ন না থাকায় মনের আনন্দে বালুবেলাতেই সময় কাটছিলো। আমাদের মালিকানী এসে পা ছড়িয়ে বসলো আলাপ করতে। অবিশ্রান্ত বিড়ি খাচ্ছিলো, এবার বুদ্ধদেবের কাছ থেকে গোল্ডফ্লেক চেয়ে নিয়ে মনের সুখে টানতে টানতে বললো, 'বুঝলে মাস্টার, এইটুকু বয়সে এতো সিগেরেট খেয়ো না ; ফুসফুস ফুটো হয়ে যাবে। খোকিকে আমার কাছে দাও, তারপর তোমরা চান করে নাও।'

এসব বিষয়ে খোকিকে নিয়ে আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে ছিলো না, পথে ঘাটে সর্বদাই মালের মতো তাকে আমরা কুলির কাঁধে চরিয়ে ঘুরেছি। এই রমণীকেও সে অপছন্দ করলো না। সামান্য গাঁইগুঁই করেই চলে গেল তার সঙ্গে, আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকলাম স্নানের সরঞ্জাম নিতে। ফিরে গিয়েই দেখি আরো দুজন মানুষ নেমেছেন স্নান করতে। তাঁদের একজন এম. সি. সরকারের স্বত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকার, অন্যজন তাঁর বন্ধু। বুদ্ধদেব আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলে গেলেন কাছে। আমি তো এঁদের বউমা, সুতরাং লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে, মাথার আঁচল একটুও পড়তে না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম দূরে।

এই অতলান্ত মহাসাগরের ব্যাকওয়াটার দেখে একষট্টি সালে আমার সাঁইতিরিশ সালের বঙ্গোপসাগরের ব্যাকওয়াটার মনে পড়ে গেল। ডক্টর ক্লার্কের বারো বছরের কন্যাটি অন্তরঙ্গ হয়ে ফিসফিস করলো, 'ড্যাডিকে বলো, আমরা স্পীডবোটে চড়বো।'

দেখলাম এই ব্যাকওয়াটারের তীরে অনেক আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। তৈরী করা ঘাটে সব সাদা সাদা ডিঙি, মাছ ধরার জায়গা, বসবার জন্যে ছাতার তলায় আসন, ক্লাব ঘর, জলের উপর অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা সাঁকো— মিসেস ক্লার্ক ডাকলেন, কাজেই তাঁর কন্যার স্পীডবোটে চড়ার আবদারটা তার ড্যাডিকে আর জানানো হলো না।

এতোক্ষণে ওঁদের বড়ো মেয়েটিকে দেখলাম। মেয়েটি যে কী সুন্দরী বলা যায় না। ঢেউতোলা পিঠে ছাপানো সোনালী চুলগুলো যেন স্বপ্ন। নীল রংয়ের মদির চোখ তুলে বললো, 'সে আমাদের সঙ্গী হতে না পারার জন্য লজ্জিত এবং দুঃখিত। সামনেই কী পরীক্ষা। পড়া তৈরি করছে বসে বসে। মিসেস ক্লার্ক

স্বামীর সাহায্য ব্যতিরেকেই চটপট সব কিছু তুলে ফেললেন গাড়ির পিছনে, তারপর বসলেন এসে আমার পাশে। বোঝা যাচ্ছিলো খুব কাজের মানুষ।

অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদ্র-তীরে এসে পেঁছুনো গেল। কিছুটা দূর থেকেই হাওয়ার ঝাপটা মুখে এসে লাগছিলো। গাড়ি পার্ক করে কাছাকাছি আসতে একেবারে উড়িয়ে নিল। ধারে এসে দাঁড়িয়ে মহান বিস্তারের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে গেলাম। তা হলে এই অতলান্ত মহাসাগর!

সুন্দর রোদ দেখে রোববারের দুপুরে আরো অনেকেই এসেছে, মাইল ব্যাপী বৃক্ষশোভিত সমতলে আগন্তুকেরা কেউ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সূর্যের তাপ নিতে, কেউ প্রণয়ে আসক্ত, কেউ দল বেঁধে হুল্লোড়ে মত্ত, কেউ ছবি তুলছে ঘুরে ঘুরে, কেউ কেউ বা উনুনে মাংস সেঁকছে—মিসেস ক্লার্ক খুঁজে খুঁজে সুন্দর একটি জায়গা বেছে নিলেন।

সাধারণত সমুদ্রের ধারে যেমন ঢালু হয়ে তীর নেমে যায় এ সে রকম নয়। উপরে মাঠের মতো সমান জায়গা, নিচে সমুদ্র, ধারে পাহাড়ের মতো বিশাল বিশাল সাদা কালো সবুজ লালচে উপলখণ্ড। একেবারে জলের ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে উঁচু হয়ে হয়ে। দোতলা তেতলা সমান ঢেউ ছুটে এসে এসে ধাক্কা খাচ্ছে সেই পাথরে, ফেটে চৌচির হয়ে রুষে ফুঁসে উৎক্ষিপ্ত জলে ঝরনার সৃষ্টি করে ফিরে যাচ্ছে আবার। আবার আসছে, আবার যাচ্ছে। এই খেলা চলছে অবিরত, অনিবার। আমি ছোটো মেয়েটির হাত ধরে নেমে গিয়ে একটা পাথরের উপর দাঁড়ালাম, আমাদের শরীর ভিজে যাচ্ছিলো। ডক্টর ক্লার্ক এগিয়ে এসে ছবি তুললেন কয়েকটা। মিসেস ক্লার্ক ততক্ষণে টেবিলে ঢাকনা পেতে, বাস্কেট থেকে কাটাচামচে প্লেট গ্লাশ সাজিয়ে খাবার জায়গা করে ফেললেন। ভুল নেই কিছুতেই, একটি ফুলদানিও নিয়ে এসেছেন ফুল সমেত, সেটিও রাখলেন মাঝখানে।

ভ্রমণবিলাসীদের জন্য সব ব্যবস্থাই আছে। জায়গার তো অভাব নেই, মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে সিমেণ্টের টেবিল পাতা, দু' দিকে দুটি লম্বা হেলান দেওয়া সিমেণ্টের বেঞ্চ। ছোটো বড়ো সব রকমের টেবিলই আছে, দুজন চারজন ছজন আটজন যার যেমন দরকার।

সবাই অবশ্য টেবিলে বসে না, কেউ কেউ মাঠের উপরই চাদর পেতে খাবার সাজায়। অনেকে তো শুয়েই আছে।

ডক্টর ক্লার্ক ওয়াইন পরিবেশন করে মাংস কাটলেন। সুন্দর রান্না করেছিলেন মিসেস ক্লার্ক। অমন সুন্দর তরকারি সেদ্ধ আমরা কখনো করতে পারি না। ম্যাওনিজ দিয়ে চিংড়ি মাছ মাথাটা অমৃত। ফ্রুট স্যালাডটাই বা কী চমৎকার। খেতে খেতে শতমুখে প্রশংসা করলাম।

এই ভোজন সমাপ্ত হতে হতেই পড়ে এলো বেলা। এবার যাবার পালা। মাত্রই কয়েক ঘণ্টার সান্নিধ্য সুখও বিচ্ছেদ বেদনা ঘনিয়ে আনলো। ডক্টর ক্লার্ক ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, 'আবার একদিন তাঁর কলেজে যদি আসতে পারেন বুদ্ধদেব তা হলে খুব ভালো হয়।' বুদ্ধদেব ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, তাঁরা যদি একবার নিউইয়র্ক আসেন এবং আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন তা হলে খুব ভালো হয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কারো ইচ্ছেই কেউ পূরণ করতে সমর্থ হননি। অদ্যাবধি সেই দেখাই প্রথম, সেই দেখাই শেষ। শুধু স্মৃতিতেই আটকে আছে কয়েকটি দণ্ড পল মুহূর্ত।

এর পরেই নরেশরা এলো সপরিবারে। যে দু' সপ্তাহ তারা ছিলো, দিন কাটলো উড়াল দিয়ে।

ওদের উপলক্ষে কিছু না কিছু প্রোগ্রাম তৈরিই আছে আমাদের। অতিথি অভ্যাগত আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ পার্টি ককটেল—এ ছাড়াও একসঙ্গে নগর পরিক্রমা তা-ও একটা কম উত্তেজক ব্যাপার নয়। একদিন এখানকার চিড়িয়াখানায় যাবারও একটা প্ল্যান করে ফেললো নরেশ। সে শুনেছে, এই চিড়িয়াখানা নাকি পৃথিবীর মধ্যে সেরা। এখানকার পশুপাখি সব ছাড়া থাকে। এসেছি যখন দেখাই উচিত। কিন্তু দূরত্ব তিরিশ মাইল, সেটাই সমস্যা। পথঘাট বিষয়েও কেউ ওয়াকিবহাল নয়। ট্যাকসিতে গেলে কোনো অসুবিধে ছিলো না, সব পাড়ার সব ঠিকানাতেই তারা পেঁছে দিতে পারে। শুধু বলে দিলেই হলো কোথায় যাবো। কিন্তু ভাড়া অসম্ভব। গাড়িওলা বন্ধুরা যেচে সেধে সারা শহরের কতো কিছু দেখিয়েছেন, একবারও চিড়িয়াখানার নাম কারো মনে পড়েনি। না আমাদের, না তাঁদের। নরেশেরও বোধহয় পড়তো না যদি তার একটি বালিকা কন্যা সঙ্গে না থাকতো। আমি কিন্তু বেজায় উৎসাহিত। শেষ পর্যন্ত বাসে যাওয়াই স্থির হলো।

তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না সেরে খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হলাম সবাই। বুদ্ধদেব গেলেন না। মেরিল্যান্ডে তাঁর বক্তৃতা ছিলো, চলে গেছেন ভোর বেলা। ভাগ্যিস যাননি। কপালদোষে অত দূর বাসে করে ভুলভাল পথ ঠেঙিয়ে যথেষ্ট হেঁটে

যথেষ্ট পরিশ্রম করে পেঁছে গিয়ে দেখা গেল চিড়িয়াখানার লোহার গেট তিন সপ্তাহ যাবৎ একেবারে সিল করে বন্ধ। তাদের স্ট্রাইক চলছে। আমেরিকাতেও স্ট্রাইক! এ সংবাদ এতোই নতুন এতোই অপ্রত্যাশিত যে বিশ্বাস হচ্ছিলো না। এখানকার জনসাধারণ বড়ো আত্মতুষ্ট। সব সময়েই বিদেশীদের কাছে নানা রকম গর্বের উক্তি লেগেই আছে। তাদের ভিক্ষুক নেই, বেকার নেই, শ্রমিক আন্দোলন নেই, এসব বলতে তারা খুব ভালোবাসে। কিন্তু ভিক্ষুক আছে। যদিও খুব কম। ব্রুকলীনে কোনো কোনো অংশে তিন চারবার আমাদের ভিক্ষুক দর্শন হয়েছে। নিজেরা হাত পাতে না, কুকুরের গলায় টিন বেঁধে রাখে, শাঁসালো লোক দেখলেই কুকুরটা গলা নেড়ে টিন ঝাঁকায়. কোনো কোনো কুকুর সাংঘাতিক ন্যাকামি করে। ল্যাজ নাড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে পায়ের উপর, দুই পায়ে খাড়া হয়ে বসে, কুকুরটার নমুনা দেখেই কিছু দেবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। কোনো বেকার লোকের সঙ্গে অবিশ্যি দেখা হয়নি। কিন্তু এই স্ট্রাইক দেখে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরলে কি হবে, কোথায় বেশ খুশিও হলাম। এদেরও যে আমাদের মতো 'চলবে না চলবে না' চলছে এই সুখে চিড়িয়াখানার পশুপ্রাণী না দেখার দুঃখ ভুলে মনে মনে বললাম, 'খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে।'

অসুয়া ভালো নয়, কিন্তু সেদিনের সেই অসুয়া বড়ো তৃপ্তিদায়ক হয়েছিলো।

চিড়িয়াখানা দেখার সখ না মিটোতে পেরে আর একটি সখের প্রস্তাবনা তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেল। এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং। যারা আমেরিকাতে আসে তারা কে না এই ঐতিহাসিক সাংঘাতিক উঁচু বাড়িটিতে না ওঠে? এমপায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের মাথায় উঠে কে না নিচে তাকিয়ে ঘূর্ণিত মস্তকে ফিরে আসে? বুদ্ধদেবের এসব সখ নেই। আমার খুব আছে। বুদ্ধদেবের উন্নাসিকতায় যেগুলো ছেলেমানুষী অথবা মফস্বলীয় অথবা অমুক অথবা তমুক, তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমার আগ্রহ একবিন্দু দমিত নয়। ভালো লাগলেই ভালো, তার আবার জাত কী?

বোধহয় এমপায়ার স্টেট বিল্ডিংটাও বুদ্ধদেবের দর্শনের পক্ষে বড্ড সাধারণ বলে মনে হয়েছিলো। একটা উঁচু বাড়ি কি একটা রেমব্রানটের ছবি যে দেখতে যাবো? আর আমারও এতো ঘোরাফেরার মধ্যে মনেই পড়েনি কথাটা। সুতরাং এখানে যাওয়া ঠিক হওয়াতে আমি দারুণ উৎসাহিত। এ ব্যাপারে অবশ্য বুদ্ধদেবকে রাজী করাতে বেশী বেগ পেতে হলো না। নরেশ আছে তো। আমার 'চলো' বলা আর নরেশের 'চলুন' বলা কি এক?

আর সত্য বলতে কি, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সর্বোচ্চতলায় উঠে নিচের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে হাওয়ার ঝাপটায় উলটে পড়ে যেতে যেতে যে ধরনের অনুভূতি হয় তা অসাধারণ। বুদ্ধদেবও স্বীকার করলেন, 'এসে ভালোই হয়েছে। এতো উঁচুতে উঠে নিচের জগতের চেহারা দেখা মন্দ অভিজ্ঞতা নয়।'

নরেশরা থাকতে থাকতেই এক সকালে নবনীতা আর অমর্ত্য (নবনীতা দেব সেন এবং খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন) এসে উপস্থিত। 'আরে কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য।' ওদের এই অজানা অপ্রত্যাশিত আগমনে আমরা সকলেই সমান আনন্দে কলরব করে অভ্যর্থনা করলাম। নবনীতা বুদ্ধদেবের ছাত্রী, সেই সুবাদে অমর্ত্য নিশ্চয়ই আমাদের জামাই। কিন্তু তার আগেও আমাদের কন্যা জামাতার বন্ধু হিসেবে একটা সংশ্রব ছিলো। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন অমর্ত্যর সঙ্গে জ্যোতির্ময় (আমাদের জামাই) এবং মীনাক্ষীর (আমাদের কন্যা) বন্ধুতা নিবিড় ছিলো। অবশ্য তখন সকলেই ছাত্রছাত্রী এবং অবিবাহিত।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি আর চিনু তাকে জামাই আদরেই গ্রহণ করলাম। নবনীতাও তার পিত্রালয়ে আসার সুখে সোহাগে উদ্বেল হয়ে সকলকে জড়িয়ে ধরে ধরে আদর করতে লাগলো। দিনটা যেন সোনায় মুড়ে গেল।

আর একটি মেয়ের সঙ্গেও নিউইয়র্ক ছাড়বার মুখে আমাদের দেখা হয়েছিলো, তার নাম রেণুকা বিশ্বাস। ছোটোখাটো এইটুকু এক অবিশ্বাস্য পরিশ্রমী মেয়ে। প্রায় সাত বছর যাবৎ বাস করছে সেই দেশে, একান্ত স্বাবলম্বী, যাকে বলে 'সেলফমেইড' ঠিক সেই রকম মানুষ। আলাপ হয়েছিলো ডক্টর প্রফুল্ল মুখার্জির বাড়িতে। সমাজ সংস্কারই সম্ভবত তার কর্মের অঙ্গ ছিলো, সেই কাজে তার দক্ষতা ছিলো অতুলনীয়।

যেদিন নিউইয়র্ক ছাড়লাম, সেই সকালেই কলকাতা থেকে বড়ো মেয়ের এক চিঠি পেলাম, 'এতোদিন তোমাকে জানাইনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এসে হঠাৎ জানবার চেয়ে তোমার জেনে আসাই ভালো যে ভুতু মারা গেছে।' ভুতু আমার কুকুর। 'স্মৃতি সততই সুখের' প্রথম কিস্তি বিমান ভ্রমণের ভূমিকাতে আমি এর কথা লিখেছিলাম। আসবার সময়ে সে সামান্য অসুস্থ ছিলো। ডাক্তার বলেছিলেন আপনাকে না দেখে মনের কষ্টে হার্টফেল করাও বিচিত্র নয়। তাই হলো শেষ পর্যন্ত। বলাই বাহুল্য, এই চিঠি হস্তগত হবার পর থেকে আমার

আর কোনো কাজেই কোনো উদ্যম ছিলো না। রান্না খাওয়া জিনিসপত্র গুছোনো পাঠানো লেবেল লাগানো সব পড়ে থাকলো একাকার হয়ে।

এই সময়ে এই স্বল্প পরিচিত মেয়েটি এসে ব্যাকুলভাবে বললো, 'শুনলাম আপনারা আজই চলে যাচ্ছেন?' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার কী হয়েছে?'

সব শুনে ঢুকে গেল রান্না ঘরে, কিছুই করতে দিল না আমাকে। রেঁধে বেড়ে খেয়ে খাইয়ে বাসনকোসন মেজে ঝুড়িতে ট্রাংকে সুন্দর করে গুছিয়ে দিয়ে সজল চোখে বললো, 'আবার দেখা হবে। আজ যাই।' একটি স্মরণ চিহ্নও সে রেখে গেল, রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতের কাজ করা ছোটো একটি টেবল-ঢাকা। এই কাজ ওখানে দুষ্প্রাপ্য। চিহ্নটি এখনো আছে, মানুষটিকে আর দেখিনি।

প্লেন ছিলো রাত আটটায়। আমাদের খুব মন খারাপ লাগছিলো নিউ ইয়র্ক শহরকে বিদায় জানাতে। কদিন অসম্ভব পরিশ্রম গেছে, এখন এই মুহূর্তে এই বয়সে সে কথা স্মরণ করে কেবলি মনে মনে এই লাইনগুলো আওড়াচ্ছি—

'তুমি যতো ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা—
আমি যতো ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা।
....
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও—
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি, এ যাত্রা মোর থামাও।'

সত্যিই বোঝা অনেক জমে গিয়েছিলো। বুদ্ধদেব পাগলের মতো বই কিনেছেন। অধ্যাপনা করলে বইয়ের উপর অনেক কমিশন পাওয়া যায়, তাছাড়া সব বই তো দেশে পাওয়াও যায় না, উপরন্তু দামও আমাদের নাগালের বাইরে। এইসব কারণে এই সংগ্রহের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে পড়েছিলো। প্যাক করে করে কিছু ডাকে পাঠানো হচ্ছে, কিছু জাহাজে পাঠানো হচ্ছে, ছ'ঘণ্টা সাত ঘণ্টা বসে বসে এই করতে করতেই বেলা যাচ্ছে, তবু ফুরোচ্ছে না। তার উপরে অন্যান্য মালপত্র তো আছেই। এখন দেশে প্রায় সবই পাওয়া যায় কিন্তু তখন যা দেখেছি তাই নতুন। মনে হয় সব কিনি, সব কিনি। তা ছাড়া আত্মজরা সকলেই দেশে, বন্ধু পরিজনের সংখ্যাই বা মন্দ কী? মস্ত ট্রাংক কিনে পুরো এক ট্রাংক শুধু উপহারেই ভরে গেল। সংসার পাততে যা কিনেছি কিছুই ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না। সেই পর্বত প্রমাণ জিনিসও গোছাতে গোছাতে একেবারে প্রাণান্ত।

বেচারা বুদ্ধদেব! পার্থিব ব্যাপারে এমন নাজেহাল জীবনে হননি। উপায় কি? ঐ বিদেশে অনেক কিছুই আমার অধিগম্য নয়। জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ, পঞ্চাশবার পোস্টাপিসে দৌড়ানো, ওদিকে কলেজ, এদিকে বক্তৃতার আমন্ত্রণে মাঝে মাঝেই শহরের বাইরে যাওয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের আনাগোনা, নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই। নিজের কাগজপত্রটাও গুছিয়ে ওঠার সময় পাচ্ছেন না। বিদায়কালীন আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের পর্বও তো কম নয়, উপহারই বা কতো এসে গেল!

কে জানতো এমন দুর্দান্ত বিদেশে এমন অপ্রত্যাশিত সব ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে এতো মানুষের সঙ্গে। এইসব প্রাপ্তির কোনো তুলনা নেই। পরের বছর আমাদের কন্যা দময়ন্তী যখন এলো নিউইয়র্ক শহরের বন্ধুরা তাকে পিতামাতার আদরে গ্রহণ করেছিলেন। একা এয়ারপোর্টে নেমে অচেনা জগতের দিকে তাকিয়ে তাকে বিহ্বল হতে হয়নি, আপনজনের অভাবে অশ্রুমোচন করতে হয়নি। এমন কি সেইসব লেখক এবং অধ্যাপক-বন্ধুরা ওকে আর্থিকভাবেও সাহায্য করেছেন। এদেশ থেকে যে ক'টি ডলার হাতে নিয়ে ওদেশে গিয়ে নামবার সরকারী নির্দেশ বলবৎ ছিলো তা এতোই অকিঞ্চিৎকর যে ঐটুকু একটি একান্তই তরুণীকন্যাকে ঐ সম্বল দিয়ে পাঠিয়ে আমাদের মন সুস্থির ছিলো না। আমরা ঐ দেশেই বসবাসকারী কোনো প্রবীণ বাঙালী লেখক-বন্ধুকে লিখেছিলাম দরকার পড়লে তিনি যেন সাহায্য করেন, ওর বৃত্তির টাকা থেকে পরে ও তা শোধ করে দেবে। তিনি কিন্তু সেই সাহায্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন। বিদেশীবন্ধুরা দিয়েছিলেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। এইসব ঋণ কখনোই পরিশোধনযোগ্য নয়।

সাতটা মাল জাহাজে পাঠানো হয়ে গেল, তবু যে কতো রইলো, তাকিয়ে কাঁদবার দশা। এরোপ্লেনে কতোটুকু নিতে পারি। দুজন মানুষের দুটি স্যুটকেসেই তা প্রায় পূরণ হয়ে যায়। বাদ বাকী সব হাতে। থলি ব্যাগ ইত্যাদির পরেও যা পড়ে রইলো তার পরিমাণ দেখেও হকচকিয়ে দৌড়ে গিয়ে আরো দুটি স্যুটকেস কিনে নিয়ে এলাম। স্যুটকেসগুলোর অবশ্য কোনো ওজন নেই। নানা রঙে ছাপা ছাপা এক ধরনের বিশেষ কাপড়ে তৈরী, ঢাকনাটাও কাপড়ের, ফাস্‌নার দেওয়া। প্লেনে বহন করবার জন্যই বানানো।

এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখা গেলো, ওজন এতো বেশী হয়েছে যে তার জন্য গুণাগার দিতে হবে টাকার অঙ্কে পাঁচশো টাকা। মাথায় হাত। সিটি আপিস

পর্যন্ত দুজন বন্ধু নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের গাড়িতে। দুটি ছাত্র এবং দুটি ছাত্রীও এসেছিলো বিদায় দিতে। তারা চলে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত ছিলো রাণু। সে বললো, বরং বেছে দাও, আমি কিছু ফেরত নিয়ে গিয়ে জাহাজে পাঠিয়ে দেবো।

প্লেনের সময় হয়ে গেছে, বাছবো কেমন করে? যদি সোজা দেশে উড়ে যেতাম তা হলে না হয় রাণুর উপরই সব ফেলে রেখে চলে যেতাম।

এখন যাচ্ছি লণ্ডনে। কয়েকদিন থাকবো সেখানে। লণ্ডনের পরেও ইয়োরোপে আরো অন্তত দশ বারোটা দেশ এভাবেই কয়েকদিন কয়েকদিন করে থাকতে হবে, নিত্যব্যবহার্য জিনিস কিছু কম লাগবে না। পরিধেয় বস্ত্র যথেষ্ট প্রয়োজন। বাড়ি তো নয় যে ধুয়ে বা ধোপায় দিয়ে চলতে পারে। ধোবো কোথায়? ময়লা হবে আর জমবে, বার করতে হবে নতুন সেট। এই করে করে ধোয়া ধুয়ির পালাও যেমন একেবারে ঘরে ফিরে তেমনি বোঝাও পড়বে দ্বিগুণ।

শীতের দেশ, গরম কাপড়েই ঠাসা সব। গরম কাপড়ের যেমন ওজন তেমনি জায়গা লাগে। মেয়েদের ততোটা নয়। কিন্তু ছেলেদের একটা দুটো স্যুট সোয়েটারেই এক স্যুটকেস ঠেসে যায়। জীবনধারণের অনুপান এই রকমই। আর যেখানে সব সময়েই বাইরের জীবন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রোগ্রামে ঠাসা।

অতএব ঐ পাঁচশো টাকা দিতেই হলো বিমান কোম্পানীকে। বিদায়ের মুহূর্তে রাণু চোখ মুছলো, আমরাও ঝাপসা চোখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ব্রিটিশ ইয়োরোপীয়ান এয়ারওয়েজের অভ্যন্তরে গিয়ে অধিষ্ঠিত হলাম। আমেরিকার মাটি ছেড়ে বিমান আমাদের নিয়ে যখন শূন্যতার অন্ধকারে ঝিম ধরলো, উপলব্ধি করলাম এ-সব দিন আর জীবনে ফিরবে না। মানুষের শেষ প্রাপ্তি এই শূন্যতার অন্ধকারেই নিহিত থাকে।
